পৌর-বিজ্ঞান

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. (অর্থনীতি ও ইতিহাস)
অধ্যাপক—সিটিকলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক—প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (বাগেরহাট),
বিদ্যাসাগর কলেজ (নবদ্বীপ), হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সীগঞ্জ),
ভিক্টোরিয়া কলেজ (কুচবিহার)।

প্রাপ্তিস্থান
দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক হাউস
১।১।১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক :
জয়ন্তকুমার ঘোষ
৩০নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য—ছয় টাকা

মুদ্রাকর :—
শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিউ আর্য্য মিশন প্রেস
১১, রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

বাঙলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার পুস্তক প্রণয়ন হইতে শুরু হইয়াছে। এ ঘটনা কিন্তু অধিক দিনের নহে। বাঙলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা চলিবে বিশ্ববিদ্যালয় এই ঘোষণা করিবার পর হইতেই এ প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রচেষ্টা সাধু; কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত না হয় তাহা বিদেশী ভাষা আয়ত্তকারী কয়েক জনকে আত্মম্ভরিতার অবকাশ দেয় বটে কিন্তু উহার সহিত জড়িত থাকে বহু অধ্যবসায়ীর অপচয় এবং বহু হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীর ব্যর্থতার বেদনা। এই অপচয় ও ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে যে শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও প্রসার, উহা প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্তাশীলতা যেরূপ পরিপোষণ করিতে পারে না, সেইরূপ দেশের মাটিতে ইহা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নবতম ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ সমালোচনা ঘটিলেও ইহার যৌক্তিকতা অচিরেই সর্ব্বজনস্বীকৃত হইবে। ইংরাজী ভাষার যে স্তরের পুস্তক আমরা ছাত্রছাত্রীদিগের হাতে তুলিয়া দেই, অন্ততঃ তাহার সমমর্য্যাদা সম্পন্ন কোন পুস্তক যদি বাঙলা ভাষায় লিখিত হয়—তাহা হইলে ইংরাজী পুস্তকখানি অপেক্ষা বাঙালী ছাত্রছাত্রীদিগের পক্ষে উহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।

বাঙলা ভাষায় একাধিক পৌরবিজ্ঞান লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা উপলব্ধি করা হয় নাই যে ইংরাজী ভাষার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাঙলা পুস্তক হয় না। প্রত্যেক ভাষার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে—উহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান পুস্তকে এই প্রচেষ্টা করিয়াছি—সেইজন্য তড়িৎ গতিতে পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা না করিয়া পাণ্ডুলিপির উপরে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়াছি। ইহার সার্থকতা বিচারের সময় ভবিষ্যতের গর্ভে এবং উহার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রী

সুধীবৃন্দের উপর। শিক্ষকবৃন্দের নিকট হইতে সমালোচনা এবং পুস্তকটীকে ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত ও অধিকতর সুন্দর করিবার জন্য সহায়তা একান্তভাবে কাম্য।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক এবং আমার শিক্ষক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা ভাষায় উত্তর প্রদানের অনুমতি ঘোষণা করিবার পূর্ব্বেই, বাঙলা ভাষায় Civics লিখিবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন এবং অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণা ব্যতীত এই পুস্তক লিখিতই হইত না। তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ এম্, এ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া অনেক জটিল বিষয় সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপিত করিতে সহায়তা করিয়াছেন। তিনিও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীমতী মুকুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছাত্রী শ্রীমতী আভা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনায় প্রুফ্ সংশোধনে ও সূচীপত্র প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে—তাহারা ধন্যবাদার্হ।

উষা-কুটীর
বারাসত, ২৪ পরগণা
শ্রাবণ, ১৩৫৭

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভারতের শাসন ব্যবস্থা

প্রাথমিক অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতি

পৌর-বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু

Subject Matter of Civics

(অণুচ্ছেদ-১) পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও পরিধি—*Definition and Scope of Civics.*

মানুষ স্বভাবতই সঙ্গপ্রিয়। সাধারণ মানুষ নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করিতে অক্ষম। তাই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহারা সমাজ গঠন করে এবং সমাজ-বদ্ধ মানুষ রূপেই জীবন অতিবাহিত করে। পরন্তু সমাজ গঠন করিলেই যথেষ্ট নহে; উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এবং উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু সমাজ গঠন করিতে হইলে, বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ও উন্নত করিতে হইলে সমাজ-বদ্ধ মানুষকে নানাবিধ বাধা-নিষেধ ও নিয়ম কানুনের প্রাচীর দ্বারা নিজ জীবন বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হইবে। পরিবর্ত্তে অবশ্য তাহারা সমাজ-জীবনের নানাবিধ সুখ সুবিধা ভোগ করিবারও অধিকারী হয়। সমাজের মধ্যে বাস করিয়া যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দ ও উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে—সেই উদ্দেশ্যে সমাজ-বাসী মানুষ সমাজ গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির প্রচেষ্টায় বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে। সমাজ জীবনের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া নিজ জীবন ধারণ ও জীবনের বিকাশ সাধনের নিমিত্ত মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন করে। সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপ বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনার উদ্দেশ্যে বিবিধ বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইগুলিকে বলা হয়, সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences)।

পৌরবিজ্ঞান বা Civics এইরূপ একটী সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজ জীবনের এক একটী দিক এক একটী সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। সেইরূপ সমাজ

জীবনের একটী পর্য্যায়, পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়; এই পর্য্যায়টি হইল সমাজ জীবনের মধ্যে মানুষের "পৌরজন" অর্থাৎ "নাগরিক" (Citizen) হিসাবে ক্রিয়াকলাপ।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করিলে নাগরিক বলিতে নগরের অধিবাসী বুঝায়। প্রাচীন গ্রীসে পাশ্চাত্যের সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই সময়ে ঐ দেশে বহু নগরের অস্তিত্ব ছিল। এই সকল নগরের অধিবাসীদের বলা হইত নাগরিক (Inhabitant of a city)। একটি নগরের অধিবাসীবৃন্দকে একই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে দৈনন্দিন জীবনে সমস্বার্থ সম্পর্কিত গোটাকয়েক অভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত—যথা নগর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও মেরামত করা, জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। উপরন্তু প্রাচীন গ্রীসে প্রত্যেক নগরের মধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ শাসন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল—অর্থাৎ প্রত্যেক নগরই ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বা (State); সেই জন্য ইহাদিগকে বলা হয় নগর রাষ্ট্র (City-state)। অতএব যাহারা নগরের অধিবাসী তাহারা রাষ্ট্ররূপ সংগঠনেরও সদস্য ছিল। সেক্ষেত্রে নাগরিকদের শুধুমাত্র নগরজীবনের প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ থাকিলেই চলিত না—রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্যার সহিত তাহাদিগকে জড়িত হইতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের (যথা মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড প্রভৃতি) কার্য্যে ও রাষ্ট্রের কার্য্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে ঐ পার্থক্য বিধানের অবকাশ ছিল না, কারণ নগর ও রাষ্ট্র ছিল সমপ্রসারী ও অভিন্ন। সেই জন্য নিছক নগরের অধিবাসী হিসাবে একজন ব্যক্তিকে যেমন নাগরিক বলা হইত, রাষ্ট্রের সদস্যরূপেও তেমনি তাহাকে নাগরিক বলিয়াই অভিহিত করা হইত। অতএব নগরের অধিবাসীবৃন্দ যেমন নাগরিকরূপে নগরজীবনে সমস্বার্থসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হইত, তেমনি ঐ নাগরিকরূপেই তাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইত—কিন্তু এই দুই পর্য্যায়ের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সুনিশ্চিত পার্থক্য-রেখা অঙ্কন করাও সম্ভব হইত না।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রীসে এবং জগতের অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্র আর নগরের সহিত সমব্যাপক নাই; রাষ্ট্র যত ক্ষুদ্রই হউক, নগর অপেক্ষা উহা অধিকতর বিস্তীর্ণ। নিছক নগরের অধিবাসী হিসাবে সম্মিলিত ভাবে জনগণ যে ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে (যথা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা, জল সরবরাহ করা, রাস্তা আলোকিত করা ইত্যাদি) রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ উহা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিবাসী ও সদস্য হিসাবে একজন ব্যক্তির "নাগরিক" নামটিই রহিয়া গিয়াছে। নাগরিক বলিতে এখন আর নিছক নগরের অধিবাসী বুঝায় না—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক ও

সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র-নামক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে এক্ষণে একজন ব্যক্তি "নাগরিক" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতএব নাগরিক হিসাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু—ইহা বলিতে বুঝায় যে এই বিজ্ঞান, গ্রাম বা নগরের অধিবাসী হিসাবে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা—তাহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব, সুবিধা ও অসুবিধা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—যেমন পর্য্যালোচনা করে—তেমনি ইহা রাষ্ট্রের অধিবাসী ও সদস্য হিসাবে মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করে, তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—এইগুলির পর্য্যালোচনা এবং বিশ্লেষণও করে।

উপরন্তু আধুনিক জগতে প্রত্যেক রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্র সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের কার্য্যকলাপের দ্বারা কোন একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের কার্য্যকলাপ বহুক্ষেত্রেই নির্দ্ধারিত বা প্রভাবিত হইয়া থাকে। জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হইতেছে। চিন্তানায়কেরা বলেন যে রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা জগতের সকল মানুষের সত্যকার স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। অতএব ব্যক্তি যে প্রগতির পথ বাহিয়া চলিয়াছে তাহা যেমন নগর জীবনে সমাপ্ত হয় নাই তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনেও সমাপ্ত হয় নাই—বিশ্বরাষ্ট্র গঠন ঐ পথের পরিসমাপ্তি। অন্ততঃ জাতি-নিরপেক্ষ ভাবে এক অখণ্ড মানব সমাজকে উপলব্ধির প্রয়োজন। অতএব ব্যক্তির কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও জীবনের সমস্যা শুধু নগর জীবনে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র মানব সমাজের সহিত উহা সম্পর্কিত; এবং ব্যক্তি শুধু রাষ্ট্র-সদস্য হিসাবে নাগরিক নহে—সমগ্র মানব সমাজের সদস্যরূপেও সে নাগরিক।

(অতএব পৌরবিজ্ঞান বলিতে সেইরূপ সামাজিক বিজ্ঞানকে বুঝায় যাহা আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত রাষ্ট্রের সদস্যরূপে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে, মানুষের ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যালোচনা করে।)

(অনু-২) পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক —*Relation of Civics with other Social Sciences*

সমাজবদ্ধ মানুষের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সহিত সম্পর্কিত যে অপরাপর বিজ্ঞান সমূহ রহিয়াছে তাহাদের সহিত পৌরবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান** (Civics and Politics)—বিশ্ব-রাষ্ট্র এখনও গঠিত হয় নাই অথচ নগর-জীবনের মধ্যেও ব্যক্তির সত্তা সীমাবদ্ধ নহে। তাহার নগর জীবন যাপনের সীমা ও পদ্ধতি রাষ্ট্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত এবং সমগ্র মানব-সমাজের সহযোগিতা যেটুকু বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা রাষ্ট্রীয় সংগঠন স্বীকৃতির মাধ্যমেই হইয়াছে। নাগরিক রূপে ব্যক্তির যে সত্তা, রাষ্ট্রীয় জীবনের মাধ্যমেই উহার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। অতএব পৌরবিজ্ঞান, যাহা নাকি নাগরিক হিসাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা করে—উহার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সংগঠন, উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এবং কিভাবে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন শাসন কার্য্য পরিচালিত হয় বা হওয়া উচিত, মানব সমাজের কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত—এই সকলই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য। এই সকল বিষয়ের সহিত নাগরিকের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তবে পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্রের ও শাসন ব্যবস্থার সংগঠন ও কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহা নাগরিকগণ যে গ্রাম বা নগরের অধিবাসী সেই সকল স্থানের যৌথ-জীবন-যাত্রা-সূচক প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন এবং কার্য্যাবলীও পর্য্যালোচনা করে। অতএব পৌরবিজ্ঞানের বৃহৎ অংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্র ও আলোচনার দ্বারা পূর্ণ হইলেও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান অপেক্ষা পৌরবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর।

(২) **পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি** (Civics and Economics)—সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করে যে বিজ্ঞান উহার নাম অর্থনীতি। অর্থনীতির সহিত পৌরবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান; কারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য কিছু না কিছু সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। দেশের মধ্যে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের পদ্ধতির উপর নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। অতএব কি পদ্ধতিতে সমাজের মধ্যে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন হয় পৌরবিজ্ঞান উহার সহিত সম্পর্কিত। উপরন্তু পৌরবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাধ্যমেও, অর্থনীতির সহিত সম্পর্কিত; রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ও রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকদের মঙ্গলবিধানের সামর্থ্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বহু মতবাদ—রাষ্ট্রের কার্য্যের কি পরিধি হওয়া উচিত' এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বও—অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবান্বিত। যেহেতু সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা প্রভাবিত এবং

পৌরবিজ্ঞানের বৃহদংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা অধিকৃত, সেহেতু অর্থনীতির সহিত পৌরবিজ্ঞানের সুপরিস্ফুট সম্পর্ক বিদ্যমান।

(৩) **পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র** (Civics and Ethics)—মানুষের কার্য্যকলাপ ও চিন্তাধারার ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার নীতিশাস্ত্রের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহা ন্যায় অন্যায়ের তারতম্য বিশ্লেষণ করে এবং কার্য্য ও চিন্তার ন্যায়সঙ্গত মান নির্দ্ধারণ করে। পৌরবিজ্ঞানও মানুষের নাগরিক হিসাবে কোন্ কার্য্য করা উচিত ও কোন্ কার্য্য করা অনুচিত তাহার বিশ্লেষণ করে এবং নাগরিকরূপে মানুষের কার্য্যকলাপের ন্যায়সঙ্গত মান নির্দ্ধারণ করে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। তবে, পৌরবিজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশাস্ত্র অধিকতর ব্যাপক, কারণ প্রথমতঃ পৌরবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের ঔচিত্য অনৌচিত্য কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আভ্যন্তরীন চিন্তা ধারা—উভয়েরই ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করে ; দ্বিতীয়তঃ সমাজে মানুষ যতরূপে বাস করে—পুত্র কন্যারূপে, পিতামাতারূপে, ছাত্রছাত্রীরূপে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরূপে, উপার্জ্জনকারীরূপে, ভোগকারী-রূপে, ধর্ম্মানুসরণকারীরূপে ইত্যাদি—সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের কার্য্য ও চিন্তার ন্যায়-অন্যায় বিশ্লেষণ নীতিশাস্ত্রের আলোচনার পর্য্যায়ভুক্ত কিন্তু পৌরবিজ্ঞান শুধুমাত্র নাগরিকরূপেই মানুষের ক্রিয়াকলাপের ন্যায় অন্যায় বিশ্লেষণ করে।

(৪) **পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস** (Civics and History)—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পৌরজীবন বা নাগরিকজীবনকে বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। সেই কারণে পৌরবিজ্ঞানে ইহাদের আলোচনা আসিয়া পড়ে। কিভাবে উহাদের কোন্ পরিবর্ত্তন সাধনের দ্বারা নাগরিক জীবন উন্নত হইতে পারে পৌরবিজ্ঞানের মধ্যে তাহার বিবেচনা প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে, কিভাবে উহারা পৌরজীবনকে প্রভাবান্বিত করে এবং কোন্ দিকে কিভাবে উহাদের পরিবর্ত্তন সাধন করিলে নাগরিক জীবন উন্নত হইবে তাহা সঠিক অনুধাবন করা যায় না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া উহাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমরা পাইয়া থাকি। সেই কারণে পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত অনেক বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে উহাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকার আলোচনা প্রয়োজন হয়।

(৫) **পৌরবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান** (Civics and Sociology)—মানব সমাজের সংগঠন, প্রকৃতি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকে বলা হয় সমাজ বিজ্ঞান

(Sociology)। সমাজ বিজ্ঞান সমাজজীবনের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করে; কিন্তু সমাজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রই মোটামুটিভাবে ইহার আলোচনার পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও, কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইহার পর্য্যায়ভুক্ত নহে। পৌরবিজ্ঞান সামাজিক জীবনের একটি মাত্র ক্ষেত্র—অর্থাৎ পৌরজীবনের ক্ষেত্র—বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উহার বিস্তারিত আলোচনা করে। অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান যে বিষয়সমূহ বিস্তারিত তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি-ভাবে আলোচনা করে সেই বিষয়গুলির মধ্যে একটির বিস্তারিত আলোচনা হইল পৌর-বিজ্ঞানের কার্য্য।

Questions & Hints

1. Define the scope of Civics. (1930) [অণুচ্ছেদ ১]

2. What is meant by Civics and what does it deal with ? (1927) [অণুচ্ছেদ-১]

3. What do you understand by the term Civics ? How is the subject related to Politics, Economics and Ethics ?

[প্রথম অণুচ্ছেদের শেষ তিন পংক্তি—"(অতএব) পৌরবিজ্ঞান………পর্য্যালোচনা করে" এবং দ্বিতীয় অণুচ্ছেদের (১), (২) এবং (৩)]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ ও ব্যক্তি

Society and the Individual

(অণুচ্ছেদ-১) সমাজ কাহাকে বলে—*What Society means*

মানুষের মধ্যে যূথবদ্ধতার সহজাত প্রবৃত্তি বিদ্যমান। উহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ নিজেদের মধ্যে একতার বন্ধন সৃষ্টি করিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছুক। শুধু তাহাই নহে বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে বসবাস করিতে প্রণোদিত হয়। এই প্রয়োজন সামান্য হইতে পারে (যথা অপরের সহিত বাক্যালাপে নির্জ্জনতা হইতে মুক্তি লাভ) অথবা ব্যাপক হইতে পারে (যথা অর্থনৈতিক সহযোগিতার দ্বারা পরস্পরের খাদ্যের, পরিধেয়ের ও আশ্রয়-স্থানের প্রয়োজন মিটানো)। প্রবৃত্তির তাগিদেই হউক বা প্রয়োজনের তাগিদেই হউক—পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া কিছু সংখ্যক মানুষ যে একটি দল সৃষ্টি করিয়া বসবাস করে তাহাকেই বলা হয় সমাজ।) অধ্যাপক উইলোবাই বলেন, "একত্রিতভাবে বসবাসকারী এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্পর্কসমূহের দ্বারা সম্মিলিত মনুষ্যসমূহের সমষ্টিকে আমরা সমাজ বলি।"* অপরাপর ইতর প্রাণীর দলবদ্ধতার সহিত মানুষের সমাজের পার্থক্য হইল যে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্মিলিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনার অস্তিত্ব থাকে। মানুষ সমাজ গঠন করে, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি, উভয়ের দ্বারাই।

(অণু-২) সমাজের উৎপত্তি ও প্রসার—*Origin and Development of Society*

যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তি থাকার দরুণ মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ গঠন করিয়া বাস করিতে প্রণোদিত হয়। উপরন্তু জীবন ধারণের জন্য নানাবিধ

* "An aggregate of men living together and united by mutual interests and relationships we term a society." WILLOUGHBY—The Nature of the **State.**

প্রয়োজনগুলিও বিভিন্ন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে বসবাস করিতে বাধ্য করে। অতএব দলবদ্ধতার প্রবৃত্তি এবং জীবনধারণের প্রয়োজনগুলির মধ্যে সমাজের উৎপত্তির কারণ নিহিত রহিয়াছে।

মনুষ্য-সভ্যতার প্রথম স্তরে যে দল বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কার্য্যের পরিসর বিশেষ সীমাবদ্ধই ছিল। ক্রমশঃ মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনগুলি সংখ্যায় ও প্রকৃতিতে যতই বিস্তারিত হইতে লাগিল, মানুষের পরস্পরের সহিত সহ-যোগিতার পরিধিও ততই বিস্তৃত হইল এবং সেই অনুপাতে সমাজও প্রসারিত হইতে লাগিল। যে কোন কারণেই হউক এই সহযোগিতার পরিধি রাষ্ট্রের ভূসীমানায় আসিয়া প্রতিহত হইয়াছিল এবং বহুকাল অবধি মানুষের সহযোগিতার পরিসর পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্রীয় সীমানায় আবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে বাণিজ্য-তৎপরতা, ধর্ম্ম-প্রচার এবং জ্ঞান বিজ্ঞান অনুশীলনের বৃদ্ধির সহিত মানুষ তাহার সহ-যোগিতার এলাকা রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত করিয়া দিল। অতএব এক এক যুগে মানুষ তাহার প্রয়োজন মত সমাজের এক একটী ব্যবস্থাবদ্ধরূপ বা প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিয়াছে। (অবশ্য রাষ্ট্র একবার যে সম্মান ও প্রতিপত্তি পাইয়াছে তাহা হইতে ইহাকে বঞ্চিত করা সম্ভব হয় নাই।)

(১) **পরিবার** (family)—সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যবস্থাবদ্ধরূপ বা প্রতিষ্ঠান হইল পরিবার। পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একত্র বসবাস করিতে থাকে এবং পিতামাতা সন্তান এইরূপ নিকটতম পরিজনের একত্রিত বসবাসের দ্বারা পরিবারের সৃষ্টি। ক্রমশঃ পরিবারের মধ্যে ভ্রাতাভগ্নী, খুড়া ইত্যাদি আত্মীয় একত্রিত হইতে থাকে, কারণ নিকট পরিজন যত অধিক সংখ্যায় একত্রিতভাবে বসবাস করিত ততই তাহাদের আত্মরক্ষার ও দৈনন্দিন অর্থনৈতিক অভাব মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার সুবিধা হইত। কিন্তু একটী পরিবারের সহিত অপর পরিবার-গুলির সহযোগিতা ছিল না।

রাজনীতিবিদ্‌গণ বলেন প্রাচীন পরিবারগুলির দুইটী পৃথক্ রূপ দেখা যায়—(ক) পিতৃতান্ত্রিক এবং (খ) মাতৃতান্ত্রিক।

(ক) **পিতৃতান্ত্রিক** (Patriarchal) **পরিবার**—এইরূপ পারিবারিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি কোন পুরুষের মাধ্যমেই জন্ম-পরিচয় জ্ঞাপন করিত এবং পরিবারভুক্ত সকলেই একজন সাধারণ পূর্ব্বপুরুষের মাধ্যমে তাহাদের উদ্ভব নির্ণয় করিত। পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ যে থাকিত সেই সমগ্র পরিবারটীর উপর শাসন-

ক্ষমতার অধিকারী ছিল। † ইহার নাম পিতর বা পিতৃ শ্রেষ্ঠ (Patriarch); সমগ্র পরিবারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির উপরে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার ইহার ছিল।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) **পরিবার**—কোনো কোনো দেশে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পুরাকালে সুসংবদ্ধ বিবাহ প্রথা না থাকায় কোনো পুরুষের মাধ্যমে জন্ম নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব ছিল। প্রত্যেকে তাহার জন্ম পরিচয় প্রদান করিত তাহার মাতার মাধ্যমে এবং পরিবারভুক্ত সকলেই কোনো নারীর মাধ্যমে তাহাদের জন্ম পরিচয় অবগত থাকিত। পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোক পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিত; ইহার নাম ছিল মাতৃ-শ্রেষ্ঠা (Matriarch)।

(২) **গোত্র** (Clan)—বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাসূত্র গ্রথিত হইয়া গোত্রের সৃষ্টি হয়—বিভিন্ন পরিবার একত্রিত হইয়া এক একটী গোত্র সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি একই আদিপুরুষ হইতে উদ্ভবের ধারণায় নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। সঠিকভাবে এইরূপ কোনো আদিপুরুষের সন্ধান না পাইলে কাল্পনিক কাহাকেও এই মর্য্যাদা দেওয়া হয়; ইহাতে গোত্রভুক্ত মনুষ্য সমষ্টিকে একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখা সম্ভব হয়। গোত্র গঠনের পরে মানুষ তাহার ক্রিয়াকলাপের পরিসর পারিবারিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র গোত্র জীবনের মধ্যে উহা ব্যাপ্ত করে সমগ্র গোত্রের অপরাপর ব্যক্তিগণকে আপনজন বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রসমূহ হইতে উহার পার্থক্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিত—সেইজন্য আদিম গোত্রগুলির মধ্যে এক একটী বিশেষ চিহ্ন বা নিদর্শক (Totem ব্যবহারের প্রচলন ছিল। গোত্রের মধ্যে একজন প্রধান থাকিত—গোত্রের উপর ইহার শাসন প্রযুক্ত হইত।

(৩) **গোষ্ঠী** (Tribe)—ক্রমশঃ গোত্রসমূহের পার্থক্যবোধ অপসৃত হইতে থাকে এবং একাধিক গোত্র সম্মিলিত হইয়া একটী গোষ্ঠী গঠন করিতে থাকে। গোষ্ঠী ভুক্ত ব্যক্তিগণ সমগ্র গোষ্ঠীর বৃদ্ধশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মান্য করিত এবং তাহার দ্বারা শাসিত হইত। এই গোষ্ঠীপতি প্রয়োজনমত ও সাধ্যমত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে

† The patriarchal family is that in which descent is traced to common male ancestor, through a direct male line, and in which t authority of rule vests in the eldest living male ascendant." W. WILSON The State.

নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিত। গোষ্ঠীপতি সামরিক, বিচার-বিষয়ক ও ধর্ম্ম বিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হইত। প্রথম দিকে এইরূপ গোষ্ঠীর যাযাবর জীবনই ছিল স্বাভাবিক।

(৪) **রাষ্ট্র** (State)—যখন গোষ্ঠীসমূহ পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া যাযাবর জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল এবং সম্মিলিত গোষ্ঠীপুঞ্জের প্রাচীনতম গোষ্ঠীপতি নির্দ্দিষ্টভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিল তখন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। মানুষ অনুভব করিল রাষ্ট্রই সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাবদ্ধ রূপ।

কিন্তু রাষ্ট্র আধুনিক সমাজের একমাত্র ব্যবস্থাবদ্ধরূপ বা সংগঠন—ইহা মনে করিলে ভ্রান্ত ধারণার পরিপোষণ হইবে। আধুনিক সময়ে রাষ্ট্রীয় বন্ধনই সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে একমাত্র বন্ধন নহে—রাষ্ট্র ও সমাজ সমবিস্তারী নহে। হয়তো গোত্র-চেতনা বা গোষ্ঠী চেতনা আধুনিক সময়ে মানুষের জীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না বলিলে চলে,—কিন্তু পরিবার ও অন্যান্য দল সম্পর্কে চেতনা তাহার জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের সভ্য জীবনের প্রয়োজন সংখ্যায় ও প্রকৃতিতে যতই বিস্তৃত হইয়াছে মানুষ ততই বিভিন্ন সংগঠন (Organisation) সৃষ্টি করিয়াছে এবং যত্ন ও আনুগত্য দ্বারা উহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের জন্য ধর্ম্মসভা, বিদ্যার জন্য বিদ্যালয়, শারীরিক চর্চ্চার জন্য ক্রীড়াসমিতি, অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ, বণিক সঙ্ঘ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি কত প্রকারের সংগঠনই যে মানুষ তাহার সভ্যজীবনের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব তৃপ্ত করিবার প্রেরণায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব-সমাজের বিকাশ হইতে যেমন একদিকে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তেমনি অপরদিকে অন্যান্য বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রকে এইসকল সংগঠনের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে†। বর্ত্তমানে রাষ্ট্র অন্যান্য সকল সংগঠন ও দল অপেক্ষা সর্ব্বাধিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট এবং ইহার কর্ম্ম পরিধি অন্যান্য দল অপেক্ষা বহুগুণ ব্যাপক তবুও রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ অধিকতর ব্যাপক—কারণ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সকল সংগঠনগুলি লইয়া সমাজ গঠিত।

(অনু-৩) সমাজ ও ব্যষ্টি—*Society and the Individual*

ব্যক্তির জীবনে সমাজের প্রভাব অপরিসীম, সমাজের মধ্যেই মানুষের সভ্যতার

† পুরাকালে রাষ্ট্রকে চার্চ্চের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল, আধুনিক সময়ে বণিক সমিতি ও শ্রমিক সমিতি ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে।

বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায় "শুক্তির অন্তরে মুক্তার বিকাশ হয়; মানুষও নিজের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সেইরূপ বিকশিত হইয়া উঠে।" সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বটে কিন্তু ইহা নিছক ব্যক্তির সমষ্টিই নহে। "প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক ভাবে যেরূপ কাজ বা চিন্তা করে সামাজিক পরিবেশে আসিয়া তাহা আর ঠিক সেইরূপ থাকে না; কারণ সমাজ তাহার চিন্তা এবং কর্ম্ম সমস্তই প্রভাবিত করিয়া ফেলে। সভা, মিছিল, প্রভৃতি জনসন্নিবেশে মানুষ প্রকৃতই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়; আর উহা না হইলে অন্তত: ইহা দ্বারা প্রভাবিত যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। ঘড়ির কলকব্জার যোগফল হইতে আসল ঘড়িটি গুণের দিক দিয়া অনেক বেশি,—ঠিক সেইরূপ সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টিমাত্রই নয়, তাহাও ব্যক্তির যোগফল হইতে গুণের দিক দিয়া বড়। এই জন্য "সমাজ=মানুষ+মানুষ নয়, সমাজ=মানুষ×মানুষ।"‡ ইহাতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই সৃষ্ট। ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের প্রভাব সমাজ জীবনে সঞ্চারিত হয়—একে অন্যকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভাবিত করিয়া ব্যক্তি সমাজ জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে, আবার উহার দ্বারা ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়। সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তির যে বিকাশ, তাহা হইল সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সহায়তা। অতএব সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক পারস্পরিক এবং নিগূঢ়।

কিন্তু এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। সমাজ জীবন গঠনের প্রথম স্তরে, চিন্তাশক্তি অপেক্ষা প্রবৃত্তি দ্বারাই যখন মানুষ চালিত হইত অধিক, তখন তাহাদের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত কার্য্যের দ্বারা সমাজ জীবন বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। সেই জন্য সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত অত্যধিক। তখন ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইত যে সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব একটি বাহিরের অলৌকিক বস্তু এবং ইহার নিকট হইতে প্রতিদানের কথা চিন্তা না করিয়া চির-অবনতভাবে জীবন যাপনই মানুষের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তখনকার সময়ে, সমাজ জীবন যখন মানুষকে ভাষা দিতেছে, চিন্তাশক্তি দিতেছে—এক কথায় যখন মানুষকে মানুষে পরিণত করিতেছে,—তখন এই ধারণার পরিপোষণ (অর্থাৎ ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ায় সমাজ জীবনে যে প্রাণ সঞ্চার হয় তাহা আধিভৌতিক এবং ব্যক্তি উহাকে সমীহ করিবে, প্রশ্ন করিবে না) ব্যক্তির হিতসাধনই করিয়াছিল। কিন্তু সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন হইবার পর (যথা এক একজন লোক কিছু পরিমাণ জমি তাহার একক অধিকার-

‡ রাহুল সাংকৃত্যায়ন—মানব-সমাজ (সুবোধ চৌধুরী অনুদিত)।

ভূক্ত বলিয়া গণ্য করে) অল্প কয়েকজন ব্যক্তি সমাজ জীবনে প্রভাবশালী হইয়া উঠিল এবং সমাজ-জীবনকে নিজেদের স্বার্থের খাতে প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইল। তাহাদের অবিচার ও অত্যাচারে আর্ত্ত জনসাধারণের মধ্যে সমাজে মর্য্যাদার—অর্থাৎ ব্যক্তির গুরুত্ব উপলব্ধির, দাবী উত্থিত হইল। আধুনিক মানুষ আবার উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে যে ব্যক্তির হিতের জন্য সমাজের অস্তিত্ব সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণ ব্যক্তির (অর্থাৎ জনগণের অন্তর্ভূক্ত যে কোনো ব্যক্তির) জীবন-বিকাশের জন্য। যে সমাজকে সাধারণ ব্যক্তির কল্যাণ-সাধনের অনুপযুক্ত করিয়া তুলা হইয়াছে, তাহাকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুহায়ক করিবার জন্য নূতন ভাবে গঠন প্রয়োজন। ব্যক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে অতএব ইহাও উপলব্ধি করা হইয়াছে যে সমাজের পরিবর্ত্তনের উপায় কেবলমাত্র ক্রমবিকাশই নহে—আর একটী উপায় হইল বিপ্লব—অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা সুপরিকল্পিত ভাবে সমাজের পুনর্গঠন।

Questions & Hints

1. Describe the development of society—[অণুচ্ছেদ-২]

2, What do you mean by Society? Analyse the relation between society and the individual. [অণুচ্ছেদ ১ এবং ৩]

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক রাষ্ট্র ও শাসন প্রতিষ্ঠান

The Modern State and Government

(অণুচ্ছেদ-১) "রাষ্ট্র" কাহাকে বলে—*What State means*

সমাজে বসবাসকারী মানুষ রাজনৈতিকভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে। একদল লোক যখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট শাসন কার্য্য কায়েম করে তখন তাহাদিগকে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত (Politically organised) বলা হয়। এইরূপ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত বা ব্যবস্থাবদ্ধ জনসমষ্টি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে, যখন তাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিয়া একটি শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং সেই শাসন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তাহাদের সমবেত ইচ্ছাকে সামাজিক জীবনে কার্য্যকরী করে ; অর্থাৎ সকল ব্যক্তিই ঐ শাসন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরস্পরের সহিত সকল অবস্থাতেই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে এবং উহার দ্বারা সকল ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে উহার স্বরূপ সঠিক বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ **লোকসমষ্টি** (Population)—মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, অতএব রাষ্ট্র বলিতে কিছু সংখ্যক লোকের সমাবেশ বুঝাইবে। লোক সংখ্যা ব্যতিরেকে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নহে, জল ব্যতিরেকে যেমন সাগর সম্ভব নহে,—কবির কল্পনা ব্যতীত যেমন কবিতার উদ্ভব অসম্ভব। অতএব লোক বসতিহীন পৃথিবীর কোন ভূভাগ 'রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তবে রাষ্ট্রের লোক সংখ্যা কত পরিমাণ হইতে হইবে—এসম্বন্ধে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কোনো রাষ্ট্রে লোক সংখ্যার দাপটে ধরণী প্রকম্পিত (যথা চীনদেশ ৪০ কোটী মানুষের ভার• ধারণ করে) আবার কোনো রাষ্ট্রে লোক সংখ্যার বিরলতায় প্রকৃতি ম্রিয়মান (যথা অষ্ট্রেলিয়ায় এক কোটীরও কম সংখ্যক লোক অবস্থান করে)। দ্বিতীয়তঃ **ভূখণ্ড** (Territory)—ঐ লোক সংখ্যাকে কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে

স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে হইবে। গোত্রবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যখন পৃথিবীর কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন না করিয়া দলবদ্ধ ভাবে এক স্থান হইতে অপর স্থানে শুধু বিচরণ করিত—একস্থানে প্রকৃতিদত্ত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইত—তখন পৃথিবীতে লোক সংখ্যা ছিল কিন্তু রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত করিয়াই জীবন-ধারণের অভ্যাস পরিত্যাগ করিল; প্রকৃতির সহিত সহযোগিতা করিয়া খাদ্য ফলাইবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিল এবং এক স্থানে বসবাস করিয়াই জীবন ধারণ করা সম্ভব তাহা বুঝিল। তখন এক একটী মনুষ্য-দল পৃথিবীর এক একটী নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে লাগিল এবং তাহারা রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হইল। তৃতীয়তঃ **শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার** (Government)—একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে কিছু সংখ্যক লোক বসবাস করিলেই উহা রাষ্ট্র হইবে না। এই লোক সমষ্টির মধ্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকিবে যাহা অসৎ ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে এবং যাহার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থাকিয়া জনগণ তাহাদের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করিতে পারিবে। ইহারই নাম গভর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্রের শাসন প্রতিষ্ঠান। ইহার অস্তিত্ব ব্যতীত কোনো লোক-সমষ্টি রাষ্ট্র হইতে পারে না। চতুর্থতঃ **সার্ব্বভৌমত্ব** (Sovereignty)—রাষ্ট্র হইতে গেলে কোনো দেশে বসবাসকারী লোক সমষ্টিকে সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী হইতে হইবে। সার্ব্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায়—সেই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা—যাহার বলে কোনো এক লোক সমষ্টি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই তাহাদের সমবেত জীবন যাপন করে। এমন যদি কোনো দেশ থাকে যেখানকার অধিবাসীবৃন্দ অপর কোনো জনসমষ্টির কর্ত্তৃত্বাধীন (অর্থাৎ পরাধীন) - যেমন ভারতবাসীরা ছিল বৃটিশ জাতির কর্ত্তৃত্বাধীন—তাহা হইলে ঐ পরশাসনক্লিষ্ট দেশকে রাষ্ট্র বলা চলিবে না। একটি জনসমষ্টির ক্ষমতার উপর কোনো প্রতিবন্ধক না থাকিলে তবেই তাহারা সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তবেই তাহারা "রাষ্ট্র" আখ্যা পাইবে।

অতএব রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন এক জনসমষ্টি, যাহারা শাসন-প্রতিষ্ঠানের গঠনের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ এবং সমবেতভাবে সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী।

(অণু-২) শাসন প্রতিষ্ঠান—*Government*

রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত লোকসমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। শাসন প্রতিষ্ঠান হইল এই রাজনৈতিক সংগঠনের নিদর্শন। ইহার কার্য্য হইল রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করা। ইহা হইল রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র,—

অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় "সেই যন্ত্র যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যসমূহ সুসংবদ্ধ করে ও কার্য্যকরী করে।" ["the machinery through which the purposes of the state are formulated and executed"—GETTEL] মানুষের যেমন মস্তিষ্ক, রাষ্ট্রের সেইরূপ শাসন প্রতিষ্ঠান। ইহা রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ, রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং উহার দ্বারাই রাষ্ট্রের সকল কার্য্য পরিচালিত হয়।

(অণু-৩) রাষ্ট্র ও শাসন প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য—*Difference between State and Government*

রাষ্ট্র ও শাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান বলিয়া সাধারণ আলোচনায় রাষ্ট্র ও শাসন প্রতিষ্ঠান অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে এই দুইটীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্র ও শাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ এই ভাবে করা হইয়া থাকে :—

(১) শাসন-প্রতিষ্ঠান হইল রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্র শাসন-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বৃহত্তর। অবশ্য শাসন প্রতিষ্ঠান হইল রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করে, কিন্তু তবুও উহা রাষ্ট্রের সহিত সমান নহে। যেমন একটি রেলগাড়ীর এঞ্জিনের দ্বারা রেলগাড়ী পরিচালিত হয়,—রেলগাড়ীর উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হয়, কিন্তু তবুও এঞ্জিন হইল সমগ্র রেলগাড়ীর অংশ মাত্র, তেমনি রাষ্ট্র হইল সমগ্র জিনিষ, শাসন প্রতিষ্ঠান হইল যাহার একটী অংশ মাত্র। (২) রাষ্ট্রের সদস্য সংখ্যা বিপুল, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের † লোক সংখ্যা দশলক্ষ। অতএব রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই একসঙ্গে উহার শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে পারে না; রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে জন কয়েক ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের সমবায়ে শাসন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়—অন্যথায় আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য পরিচালনা অসম্ভব। অতএব রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই যখন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত, তখন শাসন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি (৩) যাহারা শাসন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত, তাহারা শাসন প্রতিষ্ঠানের মালিক নহে,—শাসন প্রতিষ্ঠানে চিরকাল আধিপত্য করিবার তাহারা অধিকারী নহে। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব-মাত্র তাহাদের উপর ন্যস্ত। যে ব্যক্তিবর্গের উপর একবার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, জনগণ তাহাদের নিকট হইতে উহা

† আলবেনিয়া।

উঠাইয়া লইতে পারে এবং নূতন একদল ব্যক্তির উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পন করিতে পারে। জনগণ এইভাবে শাসন-প্রতিষ্ঠান প্রায়ই পুনর্গঠিত করিয়া দেয়—হয় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অথবা বিপ্লবের মধ্য দিয়া। কিন্তু উহা দ্বারা রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হইল বলা যায় না—রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা চিরপ্রবাহিত। অতএব শাসন প্রতিষ্ঠান মাত্রেই অস্থায়ী, যে কোনো মূহুর্ত্তে ইহা পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ—কিন্তু রাষ্ট্র স্থায়ী। (৪) জনগণের আনুগত্য মূলতঃ রাষ্ট্রের প্রতি—শাসন প্রতিষ্ঠান যে আনুগত্য পায় তাহা রাষ্ট্রেরই নামে এবং উহার পক্ষ হইতেই পায়। রাষ্ট্র হইল যেন সূর্য্য—শাসন প্রতিষ্ঠানরূপ চন্দ্র শুধু তাহার প্রতিফলন করিয়াই গৌরবের অধিকারী। অতএব শাসন প্রতিষ্ঠান যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম হয়, জনগণ উহাকে তাহাদের আনুগত্য দিয়া পরিপুষ্ট করিতে অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য চিরন্তন। (৫) দেশ যদি সুশাসিত হয় এবং উহার দ্বারা জনগণ নিজদিগকে সুখী বলিয়া অনুভব করে তাহা হইলে শাসন প্রতিষ্ঠান যাহারা গঠন করিয়াছে সেই শাসক-বর্গকে নির্দ্দেশ করিয়া তাহারা বলিতে পারে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দেশের সুখ শান্তি আনয়ন করিয়াছে। অপরপক্ষে কুশাসনের ফলে অশান্তি ও দারিদ্র্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে জনগণ ঐ শাসকবর্গকে তাহাদের দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে; উহাদিগকে অপসরণ করিয়া শাসন প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত করিতেও পারে। শাসন-প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনুভব করিয়া থাকি, উহাকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রশংসা করিতে পারি বা নিন্দা করিতে পারি, প্রয়োজনমত পুনর্গঠন ও পরিবর্ত্তনও করিতে পারি। ইহা আমাদের অনুভূতি সাপেক্ষ এবং আয়ত্তের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এইজন্য শাসন প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় বস্তু-বিষয়ক ও নির্দ্দিষ্ট (Concrete); ইহার বিপরীত হইল 'Abstract' অর্থাৎ এমন একটা কিছু যাহা বস্তু-নিরপেক্ষ অনির্দ্দিষ্ট ভাব, যাহা আছে বলিয়া জানি কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না। রাষ্ট্র হইল সেই বস্তু-নিরপেক্ষভাব, কারণ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুভূত হয় না—উহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে বলিয়া স্মরণই থাকে না। উইলোবাইয়ের ভাষায়, "যখন নাকি রাষ্ট্র একটি বস্তু নিরপেক্ষ শব্দ, শাসন প্রতিষ্ঠান হইল সুনিশ্চিতভাবে বস্তু-বিষয়ক।" ["While 'State' is......an abstract term, Government is emphatically concrete"—WILLOUGHBY†]

†The Nature of the State.

(অণু ৪) **সার্ব্বভৌমত্ব ও ইহার প্রকৃতি**—*Sovereignty and its Nature*

সার্ব্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য। ইহাকে রাষ্ট্রের মৌলিক ধর্ম্ম বা মূল উপাদান বলা চলে।† সার্ব্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা। ইহার দ্বারাই রাষ্ট্র জনগণের জীবন বা কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে জনসাধারণ যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠন করে, সেইগুলির ক্রিয়াকলাপও রাষ্ট্র তাহার সার্ব্বভৌমত্বের বলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহা হইল আভ্যন্তরীন জীবনে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা—রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীন জীবনে প্রয়োগযোগ্য রূপ (Internal aspect of Sovereignty)।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে, সার্ব্বভৌমত্বের বলে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন এবং মর্য্যাদায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই অপরের সমান ; যে দেশ অপর কোনো জাতির অধীন তাহার সার্ব্বভৌমত্ব নাই। উপরন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র সার্ব্বভৌমত্বের বলে কেবলমাত্র যে পরশাসন হইতে মুক্ত তাহাই নহে, প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রগুলির সহিত কিরূপ আচরণ করিবে তাহা ঐ রাষ্ট্র নিজেই স্থির করিবে। ইহা হইল, বহির্জীবনে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা—রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বের বহির্জীবনে প্রয়োগযোগ্য রূপ (External aspect of Sovereignty)।

অতএব সার্ব্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের সেই সীমাহীন ও স্বৈর ক্ষমতা যাহার বলে রাষ্ট্র তাহার অভ্যন্তরস্থ সকল ব্যক্তি ও সঙ্ঘকে তাহার আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিতে বাধ্য করে এবং যাহার বলে রাষ্ট্র অপরাপর দেশ সমূহের সহিত সমান মর্য্যাদা ভোগ করে এবং তাহাদের প্রতি আচরণ নির্দ্ধারণে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী থাকে।

(অণু-৫) **রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘ**—*State and other Associations*

পরস্পরের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মানুষ যেমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে তেমনি নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা তাহারা অন্যান্য বিবিধ সঙ্ঘও গঠন করে। এইরূপ সকল প্রকার সঙ্ঘের সমাবেশের দ্বারাই সমাজ গঠিত। তবে রাষ্ট্র হইল বিশেষ প্রকৃতির ও অনন্যসাধারণ সঙ্ঘ। রাষ্ট্রের এই বিশেষত্ব এবং অনন্যসাধারণত্ব বুঝিবার জন্য সাধারণ সঙ্ঘগুলির সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

†"The real essence of the state is found to be Sovereignty"
—GETTEL, Political Science.

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘের সাদৃশ্য—(১) রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য থাকে। শাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সার্ব্বভৌমত্ব প্রয়োগের দ্বারা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ও জনসাধারণের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতির সহায়তা করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। অনুরূপ ভাবে প্রত্যেক সঙ্ঘেরও কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। যথা সাহিত্য সমিতির উদ্দেশ্য সাহিত্য অনুশীলনের দ্বারা মানসিক বৃত্তির বিকাশ সাধন, ক্রীড়া সমিতির উদ্দেশ্য শারীরিক উন্নতিবিধান, ধর্ম্ম-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তৃপ্তি, শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য শ্রমিকজীবনের সমস্যা সমাধানের সহায়তা ইত্যাদি। (২) রাষ্ট্র হইল কিছু সংখ্যক লোকের সমষ্টি; লোক সংখ্যা না থাকিলে যেমন রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নহে, তেমনি লোক সংখ্যা না থাকিলে কোনো সঙ্ঘও গঠিত হইতে পারে না।

মোটকথা, অন্যান্য সঙ্ঘও, রাষ্ট্রের ন্যায়ই, উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোক সমষ্টি।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘের বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য—(১) ক্ষমতাগত পার্থক্য—সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দের উপর সঙ্ঘের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কোনো সঙ্ঘের কোনো সদস্য যদি উহার নিয়মকানুন অমান্য করে তাহা হইলে সঙ্ঘ তাহাকে জরিমানা করিতে পারে অথবা সভ্য তালিকা হইতে তাহার নাম অপসারণ করিতে পারে। কোনো সঙ্ঘ বল প্রয়োগের দ্বারা তাহার সদস্যকে সঙ্ঘের অন্তর্ভূক্ত থাকিতে বাধ্য করিতে অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা সঙ্ঘের নিয়ম মান্য করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্যবৃন্দের অর্থাৎ নাগরিকদিগের উপর রাষ্ট্রের প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা সীমায়িত নহে; বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র নাগরিকদিগকে তাহার আদেশ-নির্দ্দেশ পালনে বাধ্য করিতে পারে। ইহার কারণ, কোনো সঙ্ঘ সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী নহে কিন্তু রাষ্ট্র সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী। (২) প্রকৃতিগত বা উদ্দেশ্যগত পার্থক্য—যে কোনো একটি সাধারণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে উহা একটি সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ এবং নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য—যথা সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাহিত্য চর্চ্চা, ব্যায়াম সঙ্ঘের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কোনো একটি সংক্ষিপ্ত নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নহে—উহা অতীব ব্যাপক। কারণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল সমাজ জীবনে এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি যাহাতে মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধান সম্ভব হয়; কিন্তু এমন কোনো একটি-দুইটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই, যাহা সম্পাদন করিলে রাষ্ট্র নাগরিকদের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য করণীয় সব কিছুই সম্পাদন করিয়াছে বলা যাইবে। মোটকথা কোনো সাধারণ সঙ্ঘ অপেক্ষা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুগুণ অধিক ব্যাপক এবং সেই দিক হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতির

অনন্যসাধারণতা বিদ্যমান। (৩) সীমাগত পার্থক্য—কোনো সঙ্ঘের ক্রিয়াকলাপ যেমন একটি গ্রাম বা একটি পাড়ার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে (যথা গ্রামের দরিদ্র-সাহায্য সমিতি) তেমনি অনেক সঙ্ঘ থাকিতে পারে যাহাদের ক্রিয়াকলাপ কোনো একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, একাধিক দেশ ব্যাপিয়া—হয়তো সমগ্র সভ্যজগত ব্যাপিয়া উহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত (যথা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি)। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় এলাকার দ্বারা সীমায়িত। রাষ্ট্র তাহার সার্ব্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে সমগ্র রাষ্ট্রীয় এলাকার উপরে অথচ রাষ্ট্রীয় এলাকার এতটুকু বাহিরে (অর্থাৎ অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের উপর) রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র নাই। [আধুনিক জগতে রাষ্ট্র ও সঙ্ঘের মধ্যে এই পার্থক্য ক্রমশঃ অবলুপ্ত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের এলাকা রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরেও প্রসারিত হইতেছে—অবশ্য সার্ব্বভৌমত্বের প্রয়োগের দ্বারা নহে বরং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা।] (৪) সভ্যগত পার্থক্য—সভ্যগত পার্থক্য দুই দিক হইতে বিচারযোগ্য: (ক) একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে একসঙ্গে অনেকগুলি সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারে কিন্তু কোনো ব্যক্তি একসঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য অর্থাৎ নাগরিক হইতে পারে না। একটি রাষ্ট্র তাহার সদস্যকে অপর কোনো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করিতে দিবে না। রাষ্ট্র যেন ঈর্ষাক্লিষ্টা মাতা—বিমাতার প্রতি ভক্তিমান সন্তান তাহার কাম্য নহে। (খ) একজন ব্যক্তিকে কোনো সাধারণ সঙ্ঘের সভ্য হইতেই হইবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। কোনো সঙ্ঘের সভ্যভুক্ত হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ; কিন্তু একজন ব্যক্তি তাহার জন্মগত রাষ্ট্রের সভ্য হইতে বাধ্য।

(অনু-৬) ব্রিটিশ উপনিবেশ—ইহারা কি রাষ্ট্র ?

পৃথিবীতে গোটাকয়েক দেশ আছে যেগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ বলা হইয়া থাকে যথা কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, পাকিস্থান ও সিংহল। কিছুকালের জন্য ভারতও ডমিনিয়ন ছিল। ব্রিটেনের রাজা এই দেশগুলির রাজা বলিয়া স্বীকৃত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা ব্রিটেনের অধীন দেশ নহে। এই দেশগুলি শুধুমাত্র নামে ইংলণ্ডরাজকে রাজার মর্য্যাদা দেয় কিন্তু কার্য্যতঃ শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় উপনিবেশের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত মন্ত্রিদিগের দ্বারা—ইহারা স্ব স্ব দেশের অধিবাসীদিগের নিকট দায়ী থাকিয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন এবং বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই দেশগুলির প্রত্যেকেই "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনভোগী জনসমষ্টি যাহারা

ব্রিটিশ জাতি সমবায়ের মধ্যে পরস্পরের সহিত স্বাধীন ইচ্ছানুসারেই যুক্ত এবং যাহারা একই নৃপতির প্রতি আনুগত্যের দ্বারা বদ্ধ হইলেও পরস্পরের মধ্যে সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন এবং আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি আর একটির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।"‡ অতএব উপনিবেশ অভিহিত প্রত্যেক দেশই কার্য্যতঃ স্বাধীন। সুতরাং প্রত্যেক উপনিবেশকে রাষ্ট্র বলা চলে।

(অনু-৭) ভারতীয় রাজ্যসমূহ—*Indian States*

ভারতবর্ষে অনেকগুলি পৃথক এলাকা ছিল যেগুলিকে ষ্টেট্‌ বলা হইত। ব্রিটিশ শাসনের আমলে ইহারা কোনো বিদেশের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিত না এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশরাজের চরম কর্তৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা সমর্পন করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইয়াছে যদিও আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার রাজ্যের শাসকের উপর ন্যস্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক রাজ্যকে যুক্ত করিয়া রাজ্য সমবায় গঠন করা হইয়াছে এবং সমগ্র সমবায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনেক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। কোনো ক্ষেত্রেই ভারতীয় রাজ্যগুলি সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী নহে। অতএব রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিচারে এইগুলিকে State অর্থাৎ রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া চলে না।

Questions & Hints

1. What is meant by State? Explain the distinction between State and Government. (1937) [অনুচ্ছেদ ১ এবং ২]

2. Define State and distinguish between State and Government. Is India a State? (1943) [১ নং অনুচ্ছেদের শেষ তিন পংক্তি, অনুচ্ছেদ ৩ ও অনুচ্ছেদ ৬]

3. What do you mean by the term State? How does the State differ from other types of social organisation? (1945)

[অনুচ্ছেদ ১—"রাষ্ট্রের বৈশিষ্টগুলি" হইতে "সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী" পর্য্যন্ত এবং ৪নং অনুচ্ছেদের "রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘের বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য।"]

4. What are the essential characteristics of the State? Explain the distinction between State and Government. (1949)

[অনু-১ সংক্ষেপে ও অনু-৩]

---

‡Balfour Report.

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয় সম্পর্কিত মতবাদ

Theories of the Origin of the State

(অণুচ্ছেদ-১) বিভিন্ন মতবাদ—*Different Theories*

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর করিবার জন্য, কিসের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হইল তাহার আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্গণ অভিন্ন অভিমত প্রদান করেন না; এ সম্পর্কে একাধিক মতবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

(অণু-২) ঐশ্বরিক সৃজনের মতবাদ—*Theory of Divine Origin*

ঐশ্বরিক সৃজনের মতবাদের মূলকথা হইল যে রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর যেমন জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সমষ্টিগত জীবন ধারণের জন্য তিনি স্বয়ং রাষ্ট্র গঠন করিয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্রের শাসক কে হইবেন তাহা ঈশ্বরই নির্দ্ধারিত করিয়া দেন—অতএব রাজা অপর কেহই নহেন; তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। উপরন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতাই রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধান অনুযায়ীই রাজা শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। অতএব লোকে যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে রাজাকেও পূর্ণ আনুগত্য প্রাদান করা তাহাদের কর্ত্তব্য। পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে আমরা এই মতবাদের চিহ্ন পাইয়া থাকি এবং বাস্তবক্ষেত্রে একাধিক দেশের একাধিক নৃপতি এই মতবাদ পোষণ করিবার এবং বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই মতবাদ গ্রহণ করে না। প্রথমতঃ রাষ্ট্র যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং রাষ্ট্রের শাসক যদি তিনিই নির্ব্বাচিত করেন, তাহা হইলে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন কি ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়? গণতান্ত্রিক শাসনে রাষ্ট্র-পরিচালকগণ জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত

হন এবং জনগণের নিকট হইতে তাঁহাদের ক্ষমতা উদ্ভূত—এ সম্পর্কে তাঁহাদের সচেতন থাকিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে করুণাময় রূপে গণ্য করা হয় কিন্তু বহু দেশের বহু নৃপতি নিজেদের স্বার্থ অনুসরনের জন্য অথবা ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অগণিত নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচারের প্লাবন প্রবাহিত করিয়াছেন —ইতিহাসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পরম কারুণিক ঈশ্বর তাঁহারই সৃষ্ট সংগঠনের মধ্যে তাঁহারই অগণিত নিরীহ ভক্তবৃন্দের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠানের জন্য হৃদয়হীন শাসক মনোনয়ন করিবেন—ইহা ধারণার অতীত। পরন্তু গীতার ভাষায়, ন্যায় ও সত্যের আধার ঈশ্বর যেন ভক্তবৃন্দকে এই প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস প্রদান করেন, যে দুষ্কৃতদিগকে দমনের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে। তৃতীয়তঃ এই মতবাদ জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী, কারণ যে কোনো রাজা তাঁহার স্বৈর শাসনকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন; এক্ষেত্রে অজ্ঞ জনসাধারণ যেরূপ দুর্ভিক্ষ মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গণ্য করে সেইরূপ রাজকীয় অত্যাচারকেও তাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও দান বলিয়া গণ্য করিতে প্রণোদিত হইবে—উহা নীরবে সহ্য করিবে, প্রতিবাদ করিবে না।

(অণু-৩) **শক্তি-প্রয়োগের মতবাদ**—*Theory of Force*

শক্তি প্রয়োগের মতবাদ বা শক্তিবাদের তাৎপর্য্য হইল যে শক্তিহীনের উপর শক্তিমানের আধিপত্য বিস্তারের দ্বারাই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে; শক্তিশালী ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তিদের উপর বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিত এবং বল প্রয়োগের দ্বারাই এইরূপ দল ক্রমশঃ বৃহত্তর হইয়াছে। দলপতি যখন কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিয়া তাহার শক্তিপ্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে অপর ব্যক্তিদিগকে তাহার আইন কানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য করিল—তখনই হইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা! শক্তিবাদীগণ বলেন যে ইতিহাস এইরূপই সাক্ষ্য দেয়, উপরন্তু বর্ত্তমান যুগেও রাষ্ট্রের কাঠামো বজায় রাখিবার একমাত্র উপকরণ হইল রাষ্ট্রীয় শক্তি। প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যের ধর্ম্মযাজকগণ রাষ্ট্ররূপ পার্থিব প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং উহার তুলনায় আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গির্জ্জার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সমর্থনের জন্য, রাষ্ট্র নিছক শক্তিপ্রয়োগর দ্বারা উদ্ভূত, ইহার কোনো নৈতিক ভিত্তি নাই—ইহাই প্রমাণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। বর্ত্তমানে সমাজতন্ত্রীগণ এই মতবাদ প্রচার করেন কারণ তাঁহারা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মালিকদের পক্ষে শ্রমিক নিষ্পেষনের যন্ত্ররূপে প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছুক।

সমালোচনা—শক্তিবাদের মধ্যে এই সত্য নিহিত রহিয়াছে যে রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তির অস্তিত্ব অপরিহার্য্য—রাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং রাষ্ট্র বজায় রাখিবার জন্য শক্তির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অসৎ ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপ হইতে আভ্যন্তরীন শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য, রাষ্ট্রকে অবশ্যই শক্তির আধাররূপে বিরাজ করিতে হইবে।

কিন্তু এতদ্বারা ইহাই বুঝায় না যে রাষ্ট্রের একমাত্র বন্ধন হইল শক্তি—শক্তিই ইহার উৎস, একমাত্র শক্তির দ্বারাই ইহার প্রকৃতি নির্ণীত। রাষ্ট্রের একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে—মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের সহায়তা করা। অতএব রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি বিদ্যমান। এইরূপ নৈতিক ভিত্তি সম্পন্ন এবং মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত একটি প্রতিষ্ঠান নিছক পশুশক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; অথবা ইহার অস্তিত্ব নিছক শক্তির দ্বারাই বজায় রাখা হয়, তাহাও ধারণা করা সম্ভব নহে। শক্তি শুধু শক্তিরই পরিচায়ক, শক্তি ন্যায় ও নীতির পরিচায়ক নহে; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে সমান অধিকার বণ্টনের জন্য এবং শান্তির সহিত নীতি-সম্মত জীবন যাপন করা জনগণের দ্বারা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য,—রাষ্ট্র তাহার বিভিন্নমুখী ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে। কিন্তু নিছক পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। রাষ্ট্র যে শক্তি দ্বারা আভ্যন্তরীন জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি বিষয়ক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে তাহা হইল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনুগত্য—বা সদিচ্ছা। রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী রাষ্ট্রকে তাহাদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আনুগত্য প্রদান করে বলিয়াই (—তাহারা রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে তাহাদেরই সকলের সমবেত ইচ্ছার প্রকাশরূপে গণ্য করে বলিয়াই,—) রাষ্ট্র অল্প সংখ্যক দুষ্ট ব্যক্তিকে দমন করিয়া আভ্যন্তরীন শান্তি রক্ষা করিতে পারে। উপরন্তু রাষ্ট্র যে জনগণের মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পাদন করিবে তাহার মূলেও জনগণের সদিচ্ছা প্রয়োজন। যে রাষ্ট্রের পিছনে জনগণের আন্তরিক সমর্থন নাই সে রাষ্ট্র জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিতে কখনই সক্ষম হইবে না,—শুধু তাহাই নহে, জনকল্যাণের আদর্শকে নিজ সম্মুখে তুলিয়া ধরাই তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু নিছক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান জনগণের আন্তরিক সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভ করিতে পারে না। অতএব রাষ্ট্রকে যে শক্তির অধিকারীরূপে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে শক্তির উৎস হইল জনগণের ইচ্ছা। রাষ্ট্র জনগণের সদিচ্ছার দ্বারা পুষ্ট হইয়াই শক্তিমান—তাহার শক্তি হইল নৈতিক; রাষ্ট্রীয় শক্তি সেই নৈতিক শক্তির প্রতিফলন মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্ররূপ বিরাট এবং জটিল প্রতিষ্ঠান কোনো একটি মাত্র উপাদানের দ্বারা গঠিত হয় নাই; রাষ্ট্র গঠনে শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়াছিল কিন্তু ইহাই একমাত্র উপাদনরূপে ক্রিয়া করে নাই। উপরন্তু শক্তি প্রয়োগ অন্যতম উপাদানরূপে ক্রিয়া করিয়াছিল মাত্র,—ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে ক্রিয়া করিয়াছিল এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই।

অতএব যেহেতু (১) বিশ্লেষনের দিক হইতে শক্তি প্রয়োগই রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে না এবং (২) ঐতিহাসিক ঘটনার দিক হইতে শক্তি রাষ্ট্র গঠনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে ক্রিয়া করে নাই,—সেহেতু শক্তিবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয়কারী মতবাদরূপে গৃহীত হয় না।

(অণু-৪) সামাজিক চুক্তি বিধানের মতবাদ—*Theory of Social Contract.*

সামাজিক চুক্তি বিধানের মতবাদ বা চুক্তিবাদ বলে যে জনসাধারণের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি হইতে রাষ্ট্র উদ্ভূত। আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ প্রকৃতির ক্রোড়ে স্বাভাবিক রাজ্যে (State of Nature) বাস করিত। এই স্বাভাবিক অবস্থার জীবনে মানুষের উপর কোনো বাধা নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কারণ কোনো সাধারণ শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অস্তিত্বই ছিল না। স্বভাব রাজ্যের মধ্যে মানুষ প্রাকৃতিক আইনের (Law of Nature) আওতার মধ্যে বসবাস করিত এবং স্বাভাবিক অধিকার (Natural right) প্রয়োগের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিত। কিন্তু সাধারণ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ না থাকায়, স্বভাব রাজ্যে স্বাভাবিক অধিকার প্রয়োগের দ্বারা বসবাস করা অসুবিধাজনক বা অসহনীয় বোধ হইল। তখন মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকেই এইরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল যে একটি সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যেকেই তাহার স্বাভাবিক অধিকার সমর্পন করিয়া দিবে এবং ঐ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলি মাত্রই তাহারা ভোগ করিবে। ইহাই সামাজিক চুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে,—**উইলোবাই** বলেন ইহাকে "রাজনৈতিক চুক্তি" আখ্যা দেওয়া উচিত। যাহা হউক, এই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ গঠিত হইল এবং মানুষ স্বাভাবিক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল।

যদিচ এই মতবাদটী বহু প্রাচীন, তথাপি তিনজন রাজনীতিবিদ এই মতবাদের বিশদ্ ব্যাখ্যা করিয়া চুক্তিবাদ প্রচারের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া

আছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন হইলেন ইংরাজ রাজনীতিবিদ টমাস্ হব্স্ (১৫৮৮-১৬৭৯ খৃঃ) এবং জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪ খৃঃ)—অপরজন হইলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক জীন্ জ্যাকেস্ রুশো (১৭১২-১৭৭৪ খৃঃ)। একই মতবাদের ব্যাখ্যাতা হইলেও ইঁহারা চুক্তিবাদের তিন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারা তিনজনেই স্বীকার করেন যে (১) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মানুষ স্বভাব-রাজ্যে বাস করিত এবং (২) চুক্তি সম্পাদন পূর্ব্বক তাহারা স্বভাব-রাজ্য পরিহার করিয়া আধুনিক রাষ্ট্র স্থাপন করে। কিন্তু তাঁহাদের মতের পার্থক্য হইল এই বিষয়গুলি সম্পর্কে :—

(ক) **স্বভাব রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে**—হব্স্ (HOBBES) বলিলেন যে প্রাগ্-রাষ্ট্রীয় যুগে মানুষ যে স্বভাব রাজ্যে (State of Nature) বাস করিত তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবলের আধিপত্য, দুর্ব্বলের অসহায়ত্ব এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব ও কলহ। মানুষ যে জীবন যাপন করিত তাহা ছিল জঘন্য, দরিদ্র, পাশবিক এবং অল্পকাল স্থায়ী। লক্ (LOCKE) বলিলেন যে স্বভাবরাজ্য সুখেরই ছিল, ইহা ছিল সাম্য এবং স্বাধীনতার অবস্থা; কিন্তু সাধারণ কর্তৃপক্ষের অভাবে প্রাকৃতিক আইন ব্যাখ্যা এবং বলবৎ করিবার মতন কেহ না থাকায়, অসুবিধা হইত। রুশো (ROUSSEAN) এই অভিমত প্রদান করিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বভাব রাজ্য ছিল আদর্শ সুখের অবস্থা কারণ, মানুষের জীবনে কোনোরূপ কৃত্রিম বন্ধন ছিল না; কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এবং সভ্যতার অগ্রগতির দরুণ, সাধারণ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ না থাকায় একাধিক অসুবিধার উদ্ভব হইল। সেই কারণে, মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল।

(খ) **শাসন কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃতি বা ক্ষমতা সম্পর্কে**—'হব্স্' বলিলেন যে চুক্তির দ্বারা জনগণ শাসন কর্তৃপক্ষের হস্তে কর্ত্তৃত্ব চিরকালের জন্য সমর্পণ করিয়াছিল. কিন্তু শাসক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নাই। সেহেতু তিনি তাঁহার ক্ষমতা যেভাবে ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারেন; হব্সের মতে রাজা হইলেন আইনতঃ অপ্রতিহত এবং স্বৈর শাসক। 'লক্' কিন্তু এইরূপ অভিমত প্রদান করিলেন যে শাসক চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন; তিনি চুক্তির দ্বারা প্রজার নিকট সুশাসনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব কোনোরূপ অন্যায় কার্য্য করিবার তাঁহার আইন সঙ্গত অধিকার নাই। 'রুশো' বলিলেন যে জনগণ চুক্তির দ্বারা তাহাদের শাসন ক্ষমতা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপর অর্পন করে নাই—তাহারা তাহাদের সমবেত ইচ্ছার দ্বারা শাসিত হইবার জন্য চুক্তি

করিয়াছিল। জনগণই সমষ্টিগগতভাবে রাষ্ট্রের শাসক। অপর কোনো রাজা বা শাসক নাই।

সমালোচনা—রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে মূলগত কোনো পার্থক্য নাই—ইহা সামাজিক চুক্তি বিধানের মতবাদ প্রদর্শন করে। জনগণের সম্মতির উপরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত—ইহাই চুক্তিবাদ প্রতিপন্ন করে। অতএব চুক্তিবাদ রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে, জনগণের উপর গুরুত্ব অর্পন করে এবং আমাদিগকে ইহাই উপলব্ধি করিতে বলে যে যেহেতু জনগণের সম্মতিদ্বারাই রাষ্ট্র গঠিত সেহেতু জনগণের সম্মতির দ্বারাই উহা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবে ঐশ্বরিক সৃজনের মতবাদ এবং শক্তি প্রয়োগের মতবাদের বিরোধিতা করিয়া চুক্তিবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র কেন ও কিভাবে উদ্ভূত হইল তাহার সদুত্তর এই মতবাদ প্রদান করিতে পারে না। (১) এই মতবাদ ইতিহাস বিরুদ্ধ। একাধিক ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হইল—ইতিহাস পর্য্যালোচনা হইতে এইরূপ একটি দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই না। ব্লাণ্টশলির ভাষায়, একাধিক রাষ্ট্রের চুক্তির দ্বারা একটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান বটে, কিন্তু সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন কয়েকজন নাগরিকের দ্বারা চুক্তি সম্পাদনের মারফতে, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানীর ন্যায়, একটি রাষ্ট্র গঠিত হইল—এইরূপ দৃষ্টান্ত একটিও নাই। (২) এই মতবাদ সঙ্গতি বিহীন। এই মতবাদ অনুমান করে যে যাহারা চুক্তি সম্পন্ন করিল তাহারা চুক্তি সম্পন্ন করিবার মতন স্বাধীনতা এবং সমান মর্য্যাদা ভোগ করিত। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ সমান মর্য্যাদা ভোগ বা স্বাধীনতা ভোগ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই সম্ভব—রাষ্ট্রের বাহিরে সম্ভব নহে। কারণ, রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায় প্রবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে সমান স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব ছিল না। (৩) চুক্তি সম্পাদিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে যাহারা চুক্তি সম্পাদন করিল তাহারা চুক্তির মুল্য উপলব্ধি করে—চুক্তি যে মান্য করা কর্ত্তব্য ইহা তাহারা শিখিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে বাস না করিয়া তাহারা চুক্তি মান্য করা কর্ত্তব্য, এই শিক্ষা কোথা হইতে পাইল? যে মানুষ রাষ্ট্র গঠন না করিয়াই চুক্তির শুচিতা (Sanctity of contract) সম্পর্কে এরূপ প্রগতিশীল ধারণার অধিকারী হইতে পারে, তাহার পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজনই উদ্ভূত হইতে পারে না। (৪) এই মতবাদ বিপজ্জনক। এই মতবাদের দ্বারা সাধারণ ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করিতে

প্রণোদিত হয় যে রাষ্ট্র তাহারই সৃষ্টি এবং সেহেতু সে আইনসঙ্গত ভাবেই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগী হইতে পারে।

(অনু-৫) বিবর্ত্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদ—*The Evolutionary or Historical Theory*

বিবর্ত্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদের তাৎপর্য্য হইল যে মনুষ্য সমাজের বহুযুগ ব্যাপী ক্রম বিবর্ত্তনের দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র হইল সমাজের অতি উন্নত ধরণের ব্যবস্থাবদ্ধ রূপ—ইহা একটি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান। ইহা মানুষেরই সঙ্ঘবদ্ধতার ফল এবং ইহার শক্তি হইল জনগণের সমবেত শক্তি। অতএব ইহাকে ঈশ্বরের হস্তশিল্পরূপে গণ্য করা সম্ভব নহে এবং নিছক অধিক শক্তিশালীর শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ইহা গঠিত, এইরূপ ধারণা করাও সম্ভব নহে ; অপর পক্ষে সহসা কোনো একটি বিষয়ের দ্বারা ইহার উদ্ভবও কল্পনাতীত। প্রকৃতপক্ষে বহু যুগ ধরিয়া বহু কার্য্য কারণের সংমিশ্রনে এবং বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। আদিম যুগে মনুষ্যসমাজ নানা ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি দিয়া সুরু করিয়া, মনুষ্যসমাজ ধীরে ধীরে কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়াছে। † মনুষ্য-সমাজের সেই ক্রমিক ও নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি হইতে রাষ্ট্রের জন্মলাভ হইল ; অর্থাৎ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে বহুকাল ব্যাপি মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের মধ্য হইতে।

সমাজের এই ক্রমবিবর্ত্তনের মোটামুটি যে বিষয়গুলি ক্রিয়া করিয়াছিল সেগুলি হইল :—

(১) সম্পর্কীয়তা (Kinship)—আদিম সামাজিক সংগঠন সম্পর্কীয়তার ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছিল। একাধিক ব্যক্তি নিজদিগকে অভিন্ন রক্তের সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত বিবেচনা করিয়া নিজেদের মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। এইরূপ দলবদ্ধতাই রাষ্ট্ররূপ বিরাট মহীরূহের অঙ্কুর। অতএব আদিম মানুষের জীবন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ছিল না,—ইহা ছিল দল কেন্দ্রিক এবং এই দলের বন্ধন ছিল রক্তের সম্পর্ক। বিভিন্ন কারণে একাধিক দলের সংমিশ্রনের দ্বারা বৃহত্তর দল সৃষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু প্রত্যেক দলের বন্ধন ছিল আত্মীয়তার বন্ধন। রক্তসম্পর্কের দ্বারা গ্রথিত দলের মধ্যে বসবাস করিয়া মানুষ কর্তৃত্ব মান্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে কর্তৃত্ব মান্য করিবার অভ্যাস অপরিহার্য্য।

† "...it is the gradual and continual development of human society, out of a grossly imperfect beginning, through crude but improving forms of manifestation, towards a perfect and universal organization of mankind." BURGESS—"Political Science and Constitutional Law."

(২) **ধর্ম্ম** (Religion)—রাষ্ট্র গঠনে ধর্ম্ম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের সমাজ-জীবনের প্রথম স্তরে, মানুষ তাহার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ধর্ম্মের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইত। প্রথমে ধর্ম্ম বলিতে 'ভীতি' বুঝাইত—মৃত পূর্ব্ব-পুরুষ সম্পর্কে ভীতি ও প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তিকে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ কল্পনা করিয়া প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সেই কাল্পনিক অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ভীতি। এই ভীতি হইতেই মৃত পূর্ব্বপুরুষের পূজা এবং প্রকৃতির পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। একই গোষ্ঠীর বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের অভিন্ন পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার প্রেরণা লাভ করিত। দল যখন বৃহত্তর হইত তখন হয়তো রক্তসম্পর্ক শিথিল হইত এবং একই পূর্ব্বপুরুষের পূজা হয়তো সম্ভব হইত না; তখন একই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সামগ্রীর পূজার একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার সূত্র খুঁজিয়া পাইত। দলপতি সাধারণ ব্যক্তির এই ভীতি প্রবনতাকে কাজে লাগাইতেন—তিনি হইতেন সমগ্র দলের ধর্ম্মগুরু এবং সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ধর্ম্মের ধারকরূপে আনুগত্য প্রদর্শন করিত। এইরূপে মানুষ ঐক্য-বদ্ধ জীবন যাপন করিয়া শাসন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইতে শিখিল।

ক্রমশঃ মানুষের বুদ্ধি বিকাশের সহিত, ধর্ম্মের মধ্যে নীতির আবির্ভাব ঘটিল। এই সকল ধর্ম্মীয় নীতি মানুষকে কর্ত্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ন, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান, এবং অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়াপরবশ হইতে শিক্ষা দিল। এইভাবে মানুষ নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিল—যে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিত্তি।

অতএব ধর্ম্ম রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করিয়াছিল প্রথমতঃ ভীতির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ নীতির মাধ্যমে।

(৩) **সামরিক প্রয়োজন** (Military necessity)—বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়শই সংগ্রাম হইত। এই অবিরত সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যেক দলই উপলব্ধি করিত যে আত্মরক্ষার অথবা অপর কোনো দলকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইলে দলের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি থাকা প্রয়োজন। এই সংহতি সাধনের জন্য প্রত্যেক দলই অভিন্ন শাসককে মান্য করিত। সেই কারণে, "যুদ্ধ হইতে রাজার উদ্ভব" এই প্রবাদ বাক্যটি অনেকাংশে সত্য।

(৪) **অর্থনৈতিক প্রয়োজন** (Economic necessity)—ক্রমশঃ মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হইতে থাকে, মানুষের অভাব সংখ্যায় ও প্রকৃতিতে বর্দ্ধিত হইতে

থাকে। তাহারা কৃষি সামগ্রী উৎপাদন করিতে শিখে এবং সম্পদ উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান পায়। ইহাতে তাহারা যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিতে প্রণোদিত হয়। দলের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ ঐ ভূখণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লয় এবং উহার সাহায্যে সম্পদ উৎপাদন করে। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং বিনা বাধায় সম্পদ উৎপাদন ও ভোগের কার্য্য পরিচালনার জন্য তাহারা দলপতিকে পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা শক্তিশালী করিতে প্রণোদিত হয়।

(৫) **রাজনৈতিক চেতনা** (Political consciousness)—মানুষ ক্রমশঃ সভ্যতার আস্বাদ পাইল,—কৃষিতে, শিল্পে, ধর্ম্মে, দর্শনে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে তাহার জয়যাত্রা সুরু হইল; কিন্তু অচিরেই তাহারা উপলব্ধি করিল যে তাহাদের অগ্রগতি যে দুরভিসন্ধিপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রতিহত হয় তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ন্যায় বিচারও থাকা প্রয়োজন। উপরন্তু তাহারা উপলব্ধি করিল যে দলের সমষ্টিগত শক্তির প্রয়োগ করিয়া এরূপ বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করা যায় যাহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে সভ্যতার বিকাশে, মানুষের নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতি বিধানে, সহায়তা করা যায়। এই উপলব্ধির নাম রাজনৈতিক চেতনা। মানুষের মধ্যে এই রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভবের সহিত রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল। কারণ এক্ষণে রাষ্ট্রের ভিত্তি নৈতিক ভিত্তিতে রূপায়িত হইল—অর্থাৎ আমরা রাষ্ট্রকে যে নৈতিক জীবনের সহায়ক বলিয়া গণ্য করি, রাজনৈতিক চেতনা তাহাই সম্ভব করিল।

(অনু-৬) জীববৈদেহিক মতবাদ—*Organismic Theory*

এই মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে না; ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। এই মতবাদের তাৎপর্য্য হইল রাষ্ট্র একটি নিছক জড় পদার্থ বা প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা জীবদেহের ন্যায় প্রাণবন্ত এবং ইহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। ব্লাণ্টসলি বলেন যে রাষ্ট্র কোন ক্রমেই একটি প্রাণহীন যন্ত্র বিশেষ নহে—ইহা একটি প্রাণবন্ত জীব। রাষ্ট্র কেবলমাত্র গোটাকয়েক বাহ্যিক বিধিনিষেধের সমষ্টি নহে।

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয় এইরূপে:—(১) জীবদেহের আত্মা ও শরীরের সমাবেশ বিদ্যমান—অর্থাৎ বাস্তব পদার্থ ও জীবনীশক্তির সংমিশ্রন। শাসনতন্ত্রের দ্বারা রাষ্ট্রের যে কাঠামো নির্দ্ধারিত হয় তাহাই (অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ

শাসক, বিভিন্ন কর্ম্মচারী, ন্যায় বিচারের আদালত, সৈন্যবাহিনী এবং মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের সহায়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এই গুলির সমাবেশ) হইল রাষ্ট্রের দেহ বা বাস্তব পদার্থ ; অপরপক্ষে জাতীয় ইচ্ছা (National will) হইল রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি বা প্রাণ। (২) একটি জীবদেহের বিভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র কার্য্য থাকে ; প্রত্যেক অংশের দ্বারা তাহার নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদিত হইলে সমগ্র জীবদেহটীর বিভিন্ন প্রয়োজন তৃপ্ত হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক পরিষদসমূহ এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলি রাষ্ট্রের এইরূপ অংশ এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে। প্রত্যেকে তাহার নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রের কার্য্য সম্পন্ন করে অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তরগুলি সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনের সেবা করে। (৩) প্রত্যেক জীবদেহ আভ্যন্তরীন পরিপুষ্টির দ্বারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ইহার বাহ্যিক বিকাশ রহিয়াছে। রাষ্ট্রেরও এইরূপ বিকাশ হইয়া থাকে।

স্পেন্সার, শ্যাফ্‌ল্‌ প্রমুখ জীবদৈহিক মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রের অধিবাসী-দিগকে জীবদেহের বিভিন্ন অংশ বা কোষসমূহের (cells) সহিত তুলনা করিয়াছেন। জীবদেহ যেরূপ বিভিন্ন কোষসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত,, রাষ্ট্রও সেইরূপ অধিবাসীদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত।

সমালোচনা—জীবদৈহিক মতবাদের গুণ হইল যে ইহা রাষ্ট্র ও তাহার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা জনসাধারণের জীবন সুসংবদ্ধভাবে পরিচালিত হইবে অপর পক্ষে জনগণের সহায়তা পাইয়া রাষ্ট্র শক্তিশালী হইবে—পরোক্ষভাবে জীবদৈহিক মতবাদ এইরূপ ধারণা ব্যক্ত করে।

কিন্তু রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের বিস্তারিত সাদৃশ্য স্থাপন করা সম্ভব নহে। ইহার কারণ হইল :—

(১) সকল জীবদেহ অপর কোনো জীবদেহ হইতে প্রাণ লাভ করে কিন্তু রাষ্ট্র অপর কোনো প্রাক্‌বিদ্যমান বস্তু বা সংগঠন হইতে তাহার প্রাণ লাভ করে না—যদি জাতীয় ইচ্ছা বা সার্ব্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের প্রাণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

(২) জীবদেহ, জীবজগতের নিয়ম অনুযায়ী, আপনাআপনি বর্দ্ধিত হয়। জীবদেহ তাহার নিজ ইচ্ছা প্রয়োগের দ্বারা নিজের বিকাশ সাধন করে না। কিন্তু

রাষ্ট্র এরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যখন সুপরিকল্পিত ভাবে সে তাহার নিজ উন্নতি বা বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হয়।

(৩) রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে যদি জীবদেহের কোষের সহিত তুলনা করা হয় তাহা হইলে বলা যায় যে জীবদেহের কোষ বা অঙ্গসমূহের নিজস্ব প্রাণ বা বুদ্ধিবৃত্তি থাকে না কিন্তু ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রাণ বা বুদ্ধিবৃত্তি থাকে। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অঙ্গের কোনো ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় না।

Questions & Hints

1. State, explain and criticize the Divine Origin theory (অণু-২)

2. "The State is the result of brute force" Discuss the validity of this theory of the State (1941, 1945). How far is it true to say that the origin of the State lies in force ? (1948) (অণু-৩)

3. Discuss critically the Social Contract theory of the Origin of the State (1939) (অণু-৪)

4. "The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance, it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss the statement and indicate the process through which the state has come into existence (1944) (অণু-৫)

5. "The State is a living organised unit, not a lifeless instrument." Discuss the soundness or otherwise of this view (1940, 1946) (অণু-৬)

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয়তা, জাতি ও জাতীয়তাবাদ

Nationality, Nation and Nationalism

(অনুচ্ছেদ-১) জাতীয়তা ও জাতি—*Nationality and Nation*

জাতীয়তা—কিছু সংখ্যক ব্যক্তি—তাহাদের মধ্যে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার দরুন—যথা একই কুল হইতে উদ্ভব, একই ধর্ম্ম অনুসরণ, একই ভাষা ইত্যাদি—নিজেদের মধ্যে সূক্ষ্ম ঐক্যবোধ করিতে পারে ; এই বিশেষ ঐক্যবোধের দরুণ তাহারা যেমন নিজেদের মধ্যে নৈকট্য বা ঘনিষ্টতা বোধ করে তেমনি তাহারা অনুভব করে যে সমষ্টিগতভাবে অবশিষ্ট মনুষ্য সমাজ হইতে তাহারা কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিজেদের মধ্যে এই ঐক্যবোধ এবং অপরাপর জনসমষ্টি হইতে স্বাতন্ত্র্য-বোধ—ইহাকেই বলা হয় জাতীয়ভাব এবং যে জনসমষ্টির মধ্যে এইরূপ জাতীয়ভাব বিদ্যমান তাহাদিগকে বলা হয় জাতীয়তা (Nationality)।

জাতি—জাতি বলিতে বুঝায় এমন এক জনসমষ্টি যাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং যাহারা রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত (Politically organised) হইয়া সেই সংগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানকে অর্থাৎ শাসন প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন কর্ত্তৃপক্ষরূপে রাখিয়াছে বা রাখিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত। অতএব জাতির মধ্যে জাতীয় ভাব থাকিতেই হইবে কিন্তু শুধুমাত্র জাতীয় ভাব থাকিলেই জাতি হইবে না—উহার জন্য আরও দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন ; প্রথমতঃ জাতীয় ভাবযুক্ত ব্যক্তিবর্গ (অর্থাৎ জাতীয়তা) কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিবে, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে একটি শাসন প্রতিষ্ঠান থাকিবে যে শাসন প্রতিষ্ঠান হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীন হইবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টিত।

জাতীয়তা (nationality) বলিতে নিছক জাতীয়ভাবযুক্ত এক জনসমষ্টিকে বুঝায় ; জাতি বলিতে বুঝায়—জাতীয়তা এবং নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস এবং স্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী শাসন প্রতিষ্ঠান। বহু লোক পৃথিবীর নানাদেশে ছড়াইয়া থাকিয়াও

নিজেদের মধ্যে জাতীয়ভাব বোধ করিতে পারে—ইহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে বলা হইবে জাতীয়তা কিন্তু ইহারা যদি কখনও কোনো একটি দেশে বসবাস করিয়া স্বাধীন সরকার গঠন করিতে পারে তাহা হইলে ইহারা জাতিতে পরিণত হয়। যথা ইহুদী সম্প্রদায় ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠন করিবার পূর্ব্বে ছিল জাতীয়তা কিন্তু ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইহারা জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

(অণু-২) জাতীয়তা গঠনের উপাদান—*Elements of Nationality*

যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলে জাতীয়ভাবের উদ্ভব সম্ভব হয় সেইগুলিকে জাতীয়তা গঠনের উপাদান বলা যায়। এই উপাদানগুলি এইরূপ: (১) **অভিন্ন কুল** (common race)—একই কুল হইতে উদ্ভূত হইলে কোনো জনসমষ্টি রক্তের টানেই পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বোধ করিতে পারে। ইহুদীগণ এইরূপ একই কুল হইতে উদ্ভূত হইয়া সমষ্টিগতভাবে নিজেদের মধ্যে জাতীয় ভাব বোধ করে। (২) **অভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য**—(common language and literature)—একাধিক ব্যক্তি একই ভাষায় কথা বলিলে এবং একই সাহিত্য অনুশীলন করিলে তাহাদিগের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে ঐক্যবোধ জাগরূক হয়। একই ভাষায় কথা বলিলে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই ভাবের আদান প্রদান হয় এবং একই সাহিত্য অনুশীলন করিলে একই মুকুরে সকলের জীবনের প্রতিফলন হয়। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি এবং আকর্ষণ বোধ জাগে। (৩) **অভিন্ন আচার, রীতি ও ঐতিহ্যনিষ্ঠা**—(common habits, customs and tradition)—সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যাহাদের মধ্যে একই আচার ও রীতি বিদ্যমান অথবা অতীতের ইতিহাস হইতে যাহারা একই ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তাহাদের মধ্যেও জাতীয় ভাবের উদ্ভব ঘটিতে পারে। (৪) **অভিন্ন ধর্ম্ম** (common religion)—কোনো ব্যক্তির সমষ্টি একই ধর্ম্ম অনুসরণ করিলে, তাহারা একই ধর্ম্মের একই অনুশাসন পালন করে এবং ইহকাল পরকাল সম্পর্কে একই মতবাদ পোষণ করে ও একই রীতিতে ঈশ্বর উপাসনা করে। এক্ষেত্রে তাহাদের পারস্পরিক সহানুভূতি ও ঐক্যবোধ সহজেই উদ্ভূত হয়। (৫) **অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি** (common education)—শিক্ষা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, মনের উন্নতি বিধান করিয়া উচ্চ আদর্শের সহিত গ্রথিত করে। অভিন্ন শিক্ষাধারা কোনো জনসমষ্টিকে জীবনের নানাক্ষেত্রে একই অনুপ্রেরণা প্রদান করে, তাহাদের সম্মুখে একই আদর্শ উত্তোলন করে। (৬) **অভিন্ন শাসন ব্যবস্থা** (common administration)—অভিন্ন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিলে,

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধের উদ্ভব হইতে পারে। কারণ, একই শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিয়া তাহারা সকলেই সমান অধিকার ভোগ করে এবং সমান কর্তব্য পালন করে। শাসন ব্যবস্থা সুপরিচালিত বা কুপরিচালিত হইলে তাহারা সকলে সমান ভাবেই লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং একই শাসনের মধ্যে বসবাস করিলে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অভিন্ন স্বার্থবোধ জাগে। বিশেষভাবে এই শাসন ব্যবস্থা যদি বিদেশী দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে পরাধীন জনসমষ্টির মর্ম্মবেদনা তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। (৭) **ভৌগলিক ঐক্য** (Geographical unity)—একই এলাকা অর্থাৎ দেশের মধ্যে বসবাস করিতে থাকিলে বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সমস্বার্থবোধসম্পন্ন হইয়া উঠে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই বিষয়গুলিকে জাতীয়তা গঠনের উপাদানরূপে বর্ণনা করিলেও, ইহাদের মধ্যে কোনো একটী বিষয় জাতীয়তা গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। ইহাদের মধ্যে যে কোনো একটি দুইটি বিষয়ের দ্বারাই জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে। কোন্ জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তা গঠনের জন্য কোন্ বিষয়টি ক্রিয়া করিয়াছে তাহা বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

(অনু-৩) জনগণ, জাতীয়তা ও জাতি—*People, Nationality and Nation*

যখন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি একই ভৌগলিক সীমানা অর্থাৎ দেশের মধ্যে বাস করে, ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে সমান চেতনা বোধ করে, অভিন্ন রীতি অনুসরণ করে এবং যখন তাহাদিগের অভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থাকে, তখন তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় **জনগণ** (People)।

জনগণ এবং **জাতীয়তার** মধ্যে পার্থক্য হইল যে জনগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূসীমানায় বসবাস প্রয়োজন হয় কিন্তু একই জাতীয়তার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জনগণের জন্য ঐ সকল অভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহের সবগুলির অস্তিত্ব প্রয়োজন, কিন্তু জাতীয়তা গঠনের জন্য কোন্ বিষয়টি কখন ক্রিয়া করিবে তাহার কোনো সুনির্দ্দিষ্ট বিধান নাই।

জনগণ এবং **জাতির** মধ্যে প্রভেদ হইল যে জনগণ রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ নাও হইতে পারে এবং জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য্য।

(অনু-৪) ভারত কি এক জাতি ?—*Is India a Nation ?*

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে ভারতে একজাতি বলিয়া কিছুই ছিল না। ভারতবর্ষের বহু সংখ্যক অধিবাসী কুল. ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের দিক হইতে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত ছিল এবং এরূপ কিছুই ছিল না যাহা তাহাদিগকে সকল পার্থক্যের উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এক-জাতীয়তার বন্ধনে গ্রথিত করিতে পারিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সুব্যবস্থিত শিক্ষা পদ্ধতির অভাব ঘটিয়াছিল, তাই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের ধর্ম্মগত, ভাষাগত, আচারব্যবহার ও রীতি-নীতিগত পার্থক্যগুলি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। ইংরাজ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সমগ্র ভারতকে অভিন্ন আইনের দ্বারা চালিত অভিন্ন শাসন পদ্ধতির অধীনে আনয়ন করিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইল। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হইল। পাশ্চত্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের দ্বারা ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে নবগঠিত শিক্ষিত সমাজ পাশ্চত্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। প্রাদেশিক ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ইংরাজি ভাষা সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের এবং ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও প্রাদেশিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ভাবের আদান প্রদানে সমর্থ করিল। বৈদেশিক শাসকবর্গ শাসনের অন্তরালে যে শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছিলেন এবং প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন, নূতন জাগ্রত ভারতের শিক্ষিত সমাজ সেগুলি সম্পর্কে ক্রমশঃ অবহিত হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল পৃথিবীর নানা দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রভেদ সত্ত্বেও একই রাষ্ট্রে বাস করিয়া থাকে। অতএব জাগ্রত ভারতের চিন্তানায়কগণ ভারতের সকল শ্রেণীর অধিবাসীকে এক জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইতে সচেষ্ট হইলেন। সমগ্র ভারতে জাতীয়তার বন্যা প্রবাহিত হইল, ভারতের অগণিত অধিবাসী একাধিক বিভেদ সত্ত্বেও সূক্ষ্ম ঐক্যবোধ অনুভব করিল এবং বৈদেশিক শাসন-মুক্ত স্বাধীন সরকারের দাবী করিতে লাগিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সেই দাবীর নিকট শাসক নতি স্বীকার করিল; কিন্তু চতুর বৈদেশিক জাতীয়তার প্রবাহ প্রতিরোধের জন্য যে বাঁধ নির্ম্মানের পরিকল্পনা বহুদিন যাবৎ কার্য্যকরী করিতেছিল তাহা জাতীয় প্রবাহকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিল। ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত হইল,—ভারত এবং পাকিস্থান।

বর্ত্তমান ভারতের অধিবাসীবৃন্দ এক অখণ্ড জাতি গঠন করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে; কিন্তু দেশ বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণ কি এক জাতিতে পরিণত হইতে পারিয়াছিল? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া দুরূহ কারণ ইহার উত্তর নির্ভর করে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর। কেহ কেহ বলেন যে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা মানিয়া লওয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের অপরাপর অধিবাসীদিগের সহিত একজাতিভুক্ত বলিয়া কোনোদিনই মনে করে নাই, তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি ছিল। অপর পক্ষে, কেহ কেহ বলেন যে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা দুনিয়ার ক্ষমতাগত রাজনীতির (power politics) চূড়ান্ত নিদর্শন মাত্র, মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র জাতীয়তার স্বীকৃতি নহে। অন্যথায় ভারত প্রজাতন্ত্রের মুসলমান অধিবাসীগণ বর্ত্তমানে ভারতীয় জাতির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া দাবী করিবেন কি অধিকারে?

(অণু-৫) আধুনিক রাজনীতিতে জাতীয়তা—*Nationality in Modern Politics*

ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় জগতে বহু রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল যেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে একাধিক জাতীয়তা অন্তর্ভূক্ত হইয়া বাস করিত। এইগুলিকে বহু জাতি রাষ্ট্র (poly-national state) নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ একটি বহুজাতি রাষ্ট্রে যতগুলি জাতীয়তা বাস করিত সেগুলি যুক্তভাবে হইত ঐ রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী—অতএব এইরূপ রাষ্ট্রের প্রত্যেক জাতীয়তাকেই (স্বতন্ত্রভাবে না হইলেও, অপর জাতীয়তার সহিত যুক্তভাবে) রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত বলা যাইত। সেই কারণেই এইরূপ জাতীয়তা "জাতি" বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত।

কিন্তু কালক্রমে একটি বহুজাতি রাষ্ট্রের মধ্যে অপর জাতির সহিত একত্রিত ভাবে থাকা অনেক জাতির নিকটেই অযৌক্তিক এবং ন্যায়-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অনেকেই চাহিল বহুজাতি রাষ্ট্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যেক জাতির জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হউক। বহুজাতি রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে একজাতিরাষ্ট্র (mono-national state) গঠনের দাবী উত্থিত হইল।

যাহারা একটী সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য জাতির সহিত সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমান অংশীদাররূপে বাস করিত, শুধু যে এইরূপ এক একটী জাতি প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবী করিল তাহাই নহে; যে সকল জাতীয়তা অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির অধীনে বাস করিত তাহারাও অনেকে স্বাধীন শাসন-

প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়া সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। অতএব একজাতি গঠনের দাবী দুই দিক হইতে উত্থিত হইল; (১) বহুজাতি রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী করা হইল এবং (২) পরাধীন জাতি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী করিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং পরে প্রত্যেক জাতির জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবীকে আদর্শ এবং নীতিরূপে প্রচার করা হয় এবং ইহার নাম দেওয়া হয় জাতীয় আত্মনির্দ্ধারণ নীতি (principle of national self-determination)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, মধ্য ইউরোপে ভৌগলিক সীমারেখা নূতনভাবে অঙ্কন করিবার সময়ে এই নীতি অনুযায়ী তথায় পৃথক পৃথক জাতির জন্য কয়েকটী নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে হইলেও, আত্মনির্দ্ধারণ নীতিকে যে সুপরিকল্পিত নীতিরূপে কার্য্যকরী করা হইল,—ইহাতে সকল জাতির জন্য স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইল এবং ক্ষুদ্র পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে অধিকতর চেষ্টিত হইল। অপর দিকে যে শক্তিমান জাতিগুলি বহুজাতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিল, তাহারা এইরূপ রাষ্ট্র বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি তাহাদের পদানত কিন্তু স্বাধীনতা-কামী জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই প্রক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি হইল এবং সর্ব্বত্র (বিশেষ করিয়া এশিয়ায়) স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য লাভের উদ্দীপনা ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

এইরূপে জাতীয়তাবাদ (nationalism) বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। ইহা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিচ্ছিন্ন জাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিল এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াস করিয়া ইহা রাষ্ট্রের এতাবৎ পরিচিত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এতদিন বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম এক্ষণে জাতি ও রাষ্ট্র সমান হইতে লাগিল, রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং জাতীয় ঐক্য হইল অভিন্ন।

বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের এইরূপ ক্রিয়া রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনীতিবিদ্‌গণ জাতীয়তার দ্বারা গঠনযোগ্য রাষ্ট্র সম্পর্কে (অর্থাৎ জাতীয় আত্মনির্দ্ধারণ-নীতি সম্পর্কে) নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়া, উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানাযুক্তি প্রদান করিয়া, মতবাদের ক্ষেত্রে উহার বিচার বিশ্লেষণ

করিতে লাগিলেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মধ্যে জাতীয় আত্মনির্দ্ধারণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। অতএব বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে জাতীয়তার গুরুত্ব সমধিক।

(অনু-৬) আত্মনির্দ্ধারণ নীতি—*Principle of Self determination*

আত্মনির্দ্ধারণ নীতির অর্থ হইল, প্রত্যেক জাতি পৃথকভাবে তাহার রাজনৈতিক ভাগ্য ও কার্য্যকলাপ স্বয়ং নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে। ইহার জন্য বহু জাতি রাষ্ট্র-গুলিকে ভাঙ্গিয়া "একটী জাতি, একটী রাষ্ট্র" (one nation, one state) এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দিতে হইবে। আত্মনির্দ্ধারণ নীতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

স্বপক্ষে :—(১) একাধিক জাতি একই রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করিলে জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের পার্থক্যগুলি সকল সময়েই অনুভব করে। জাতীয় ভাবের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য-বোধের অস্তিত্ব থাকে উহা একই রাষ্ট্রের বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। ফলে বিভিন্ন জাতিগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হয় এবং উন্নতিমূলক বা গঠনমূলক কার্য্যে যে সময় ও উদ্যম প্রয়োগ করা যাইত উহা বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অপব্যয়িত হইয়া যায়। (২) একই রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি, প্রবল এবং দুর্ব্বল জাতি, বসবাস করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা প্রবল জাতি অন্যান্য জাতিগুলির উপরে আধিপত্য এমন কি অত্যাচার করিতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ সকল জাতির অগ্রগতি সম্ভব হয় না; সুতরাং তাহাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠন প্রয়োজন। (৩) প্রত্যেক জাতির পৃথক সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। প্রত্যেক জাতি উহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের যাহাতে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ-সাধন করিতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক জাতির আত্মনির্দ্ধারণের অধিকার থাকা উচিত।

বিপক্ষে :—(১) একই রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক জাতি একসাথে বাস করিলে একটি জাতি অপর জাতি সমূহের সৎবৈশিষ্ট্য এবং তাহাদের সংস্কৃতির উন্নত ধরণের উপাদানগুলি গ্রহণ করিতে পারে, একটি জাতি অপর জাতিগুলির শিক্ষণীয়-বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। ইহাতে প্রত্যেক জাতি সভ্যতায় দ্রুত অগ্রসর হইবে এবং এইভাবেই জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন হইয়াছে। (২) একাধিক জাতি

একই রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করিয়া দ্বন্দ্ব কলহের দ্বারা যদি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্বেকার মনোমালিন্যের তিক্ত স্মৃতি তাহারা বহন করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে কারণ এক্ষণে পৃথক জাতিগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবে। অতএব বহুজাতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত পৃথক জাতিগুলির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, পৃথক রাষ্ট্র গঠনকেই উহার চরম নিষ্পত্তি বলিয়া প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া উচিত নহে। (৩) জাতীয় অন্তর্নির্দ্ধারণ নীতি কার্য্যকর করিলে জগতের বহু শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে; এই ক্ষুদ্র অংশগুলি তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে কিন্তু রক্ষা করিতে পারিবে এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই। (৪) বিভিন্ন জাতির লোকে এরূপভাবে ছড়াইয়া থাকিতে পারে যে প্রত্যেক জাতির অন্তর্ভূক্ত সকল ব্যক্তিকে একটি ভূসীমানায় একত্রিত করিয়া দৃঢ় সংবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হইবে এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মধ্য ইউরোপে আত্মনির্দ্ধারণ নীতি অনুযায়ী যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে একটী জাতি একটী রাষ্ট্র গঠন করিলেও এক জাতির বহু ব্যক্তি অপর রাষ্ট্রে থাকিয়া গিয়াছিল—যথা বহু শ্লাভ ছিল ডালমাটিয়ায়, বহু জার্ম্মাণ ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায়। এইরূপ ঘটনা আন্তর্জ্জাতিক শান্তির পক্ষে যে নিরাপদ নহে তাহা মিউনিক চুক্তির (১৯৩৮) অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায়।

তবে পরাধীন জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে স্বাধীনতা পাইবে—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

৫। (অনু-৭) জাতীয়তাগুলির অধিকার—*Rights of Nationalities*

একজাতি রাষ্ট্র গঠন করা যদি সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হয়, একাধিক জাতীয়তা যদি একই রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করিতে থাকে, তাহা হইলে, প্রত্যেক জাতীয়তার গোটাকয়েক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকা উচিত। এই অধিকার হইল সেইগুলি যেগুলি ভোগের দ্বারা একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেক জাতি অপর জাতিগুলির সহিত সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার সমান অধিকারীরূপে বাস করিতে পারিবে, উপরন্তু আপন আপন সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে ও উন্নত করিতে পারে। জাতীয়তার অধিকারগুলি এইরূপ :—

(১) **রাজনৈতিক জীবনে**—প্রত্যেক জাতি রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারগুলি সমানভাবে ভোগ করিতে পারিবে। অধিকারের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ

করা হইবে না। সকল জাতির লোকেই সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে, সকলেই ভোট দিতে পারিবে, সকলেই আইন পরিষদের সদস্য হইবার জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে পারিবে। কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে রাষ্ট্রের আইনপরিষদে উহার মধ্যেকার প্রত্যেক জাতির জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি থাকা কর্ত্তব্য।

(২) **অর্থ নৈতিক জীবনে**:—একই ভিত্তির উপরে একই নীতি অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রভুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করিতে হইবে; এই করলব্ধ অর্থ রাষ্ট্র এরূপ ভাবে ব্যয় করিবে যাহাতে সকল জাতির সমানভাবে উপকার সাধিত হয়।

(৩) **সামাজিক জীবনে**—প্রত্যেক জাতি তাহার নির্দোষ আচার, ব্যবহার ও রীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারিবে। জাতিগুলির পৃথক ভাষা ও সাহিত্য থাকিতে পারে—সেক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি তাহার ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চ্চার সুযোগ পাইবে, উহারই মাধ্যমে প্রত্যেক জাতি তাহার বিশেষ ভাবধারার সহিত পরিচিত থাকে। প্রত্যেক জাতি তাহার সংস্কৃতি বজায় রাখিতে পারিবে।

(৪) **আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে**- সকল জাতীয়তার স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই স্বাধীনতা বহুজাতি রাষ্ট্রের মধ্যেও সম্ভব, কিন্তু বহুজাতি রাষ্ট্রই হউক বা একজাতি রাষ্ট্রই হউক, সকল রাষ্ট্রই পরশাসন হইতে মুক্ত থাকিবে।

(অনু-৮) জাতীয়তাবাদ,—সাম্রাজ্যিকতা ও আন্তর্জ্জাতিকতা—*Nationalism,—Imperialism and Internationalism*

রাজনৈতিক জগতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়—সাম্রাজ্যিকতা (Imperialism) ও আন্তর্জ্জাতিকতা (Internationalism)।

জাতীয়তাবাদের দুইটী দিক ছিল, নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং অপর মনুষ্য-সমাজ হইতে স্বাতন্ত্র্যবোধ। পৃথিবীর কতিপয় শক্তিশালী জাতি অপর জাতিগুলির সহিত তাহাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে লাগিল এবং এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল যে তাহাদের স্বার্থের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির স্বার্থের সামঞ্জস্য নাই- বিভিন্ন জাতির স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। আধুনিক শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি প্রসার লাভ করিলে, শক্তিশালী জাতিগুলির স্বার্থের বিরোধিতা উগ্র: আকার ধারণ করিল কারণ এক্ষণে প্রত্যেক শক্তিশালী জাতি শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এবং পণ্য-বিক্রয়ের জন্য দুর্ব্বল জাতিগুলিকে জয় করিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

অবতীর্ণ হইল। জাতীয়তার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ নিহিত ছিল তাহা হইতে প্রসূত হইল সাম্রাজ্যলিপ্সা; সাম্রাজ্যিকতা (Imperialism) নামে ইহাকে অভিহিত করা হয়। ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং তথাকার রাষ্ট্রনীতিক 'ডিস্রাইলী' ছিলেন জাতীয়তাবাদের এই উগ্ররূপের প্রধান প্রচারক এবং পরিপোষক।

জাতীয়তার যে ব্যবস্থা হইতে সাম্রাজ্যিকতা উদ্ভূত উহা জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা জগতের পক্ষে কল্যাণপ্রদ, কারণ জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা পরাধীন জাতি স্বাধীনতা পায় এবং জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগরূক হয়; অনেক দেশে ঐক্যহীন পরাধীন লোক-সমষ্টি জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঐক্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে এবং জাতীয়তার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে উহা দ্বারা তাহারা পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। প্রকৃত জাতীয়তার লক্ষ্য হইল স্বাধীনতা এবং ঐক্য। এই স্বাধীনতা শুধু দুই একটি দেশের জন্য নহে, এই স্বাধীনতা পরশাসনক্লিষ্ট প্রত্যেক জাতির জন্য; ঐক্য শুধু একটি জাতির জন্যই নহে, ঐক্য প্রসারিত হইবে সকল জাতিগুলির মধ্যে, কারণ পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা হইতে সকল জাতির পক্ষে উন্নতির সমান সুযোগ লাভ করা সম্ভব হইবে। ইহাই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সুষ্ঠু পরিণতি—ইহাকে আন্তর্জ্জাতিকতা নামে অভিহিত করা হয়। ইংলণ্ডের চিরস্মরণীয় রাষ্ট্রনীতিক 'গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্' জাতীয়তার এই রূপেরই ব্যাখ্যাতা ও পরিপোষক ছিলেন এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

(অনু-৯) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান – *United Nations Organisation*

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, আন্তর্জ্জাতিক শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে 'লীগ্ অফ নেশনস্' বা জাতি সঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে স্বীয় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে ইহা অক্ষম হয় এবং ১৯৪৪ সালে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরে একটি নূতন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ইহার নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (U.N.O)। ইহার উদ্দেশ্য হইল (১) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এবং প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্রসমূহের যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা আক্রমণাত্মক নীতিকে ব্যাহত করিয়া, আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা;

(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যজীবনের নানাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য জগতের সকল জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রসার করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত বিভাগগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে: (১) **সাধারণ পরিষদ** (General Assembly)—ইহার মধ্যে সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত। চক্রশক্তির (ইটালী, জার্মাণী ও জাপান) বিরুদ্ধে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাঁহারা এই সাধারণ পরিষদের আদি সদস্য কিন্তু অপর রাষ্ট্রসমূহেরও যোগদানের পথ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। (২) **নিরাপত্তা পরিষদ** (Security Council)—ইহা হইল জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ; এগারো জন সদস্য রাষ্ট্র লইয়া ইহা গঠিত। ইহাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীন—এই পাঁচটী স্থায়ী সদস্য—অপর ছয়জন সদস্য দুই বৎসর অন্তর নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। সংখ্যাধিক সদস্যের অনুমোদন অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে, তবে এই সংখ্যাধিক সদস্যের মধ্যে, স্থায়ী পাঁচটী সদস্যের প্রত্যেকেরই অনুমোদন প্রয়োজন। (৩) **আন্তর্জ্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত** (International Court of Justice) আন্তর্জ্জাতিক আইন ঘটিত কোনো বিষয় সম্পর্কে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই আদালতে নালিশ করিতে পারে। (৪) **সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিষদ** (Social and Economic Council)—সাধারণ পরিষদের দ্বারা নির্ব্বাচিত আঠারোজন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত। ইহার মারফৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির উন্নয়নের এবং আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা প্রসারের প্রচেষ্টা করা হইয়া থাকে। (৫) **অছি-পরিষদ** (Trusteeship Council)—অনগ্রসর দেশগুলি শাসনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক অছি শাসনের ব্যবস্থা করা ইহার উদ্দেশ্য। (৬ **দপ্তরখানা** (Secretariat) —দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেক্রেটারী জেনারেলের পরিচালনাধীনে ইহা স্থায়ী দপ্তরখানা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সেক্রেটারী জেনারেল নির্ব্বাচিত হন।

Questions & Hints

1. What is a nation? Is India a nation? (1930)—[অনু-১ জাতি; অনু-৪]

2. What are the elements of nationality? Is nationality a satisfactory basis of modern States? (1938) [অনু-২; অনু-৬]

3. Discuss the rights of nationalities. Why is nationality the most dominant factor in modern politics? (1943) [অনু-৭ ; অনু-৫]

4. What are the essential factors that go to create the consciousness of a common nationality ? (1948) [অনু২]

5. "The development of the principle of nationalism and of the idea of the nation state has contributed to a material change in the essential character of the state." Elucidate. (1940) [অনু-৫]

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ

Activities of the State

(অণুচ্ছেদ-১) দুইটী মতবাদ - *Two theories*

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিসর কতদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত, জনকল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে কতগুলি কার্য্য সম্পাদন করা প্রয়োজন, রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ সম্পর্কে একমত নহেন। তাঁহাদের মতামতকে মোটামুটি দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং (২) সমাজতন্ত্রবাদ।

(অণু ২) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ —*Individualism*

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলে যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিসর যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত—অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বারা করণীয় কার্য্যের সংখ্যা হওয়া উচিত ন্যূনতম। রাষ্ট্রের কার্য্যের পরিধি যতই বিস্তৃত হইবে জনসাধারণের কার্য্যকলাপের উপরে ততই অধিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের অধিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ সমর্থন করে না—তাঁহারা জনসাধারণকে যতটা সম্ভব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিবার পক্ষপাতী। ইঁহাদের মতে, রাষ্ট্রের কার্য্য হওয়া উচিত কেবলমাত্র ব্যক্তিকে হিংসাত্মক আক্রমণ হইতে ও প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করা। বিখ্যাত জার্মাণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হিউমবোল্ট (Humboldt) বলেন "ইহা (রাষ্ট্র) জনসাধারণ যে উদ্দেশ্য নিজেরা সিদ্ধ করিতে পারে না কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ নিরাপত্তা উপলব্ধি করিবে।" অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণের মতে যে কার্য্যগুলি জনসাধারণের নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন—কেবলমাত্র সেইরূপ রক্ষামূলক কার্য্যই রাষ্ট্র সম্পন্ন করিবার অধিকারী। রাষ্ট্র বৈদেশিক আক্রমণের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সামরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবে, অভ্যন্তরীন শান্তি বজায় রাখিবার জন্য পুলিশ বাহিনী

গঠন ও পরিচালনা করিবে, দোষীর শাস্তি বিধানের জন্য বিচারালয় স্থাপন করিবে। এইগুলি ভিন্ন, জনগণের কল্যাণের নামে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। রাষ্ট্র কেবলমাত্র শক্তি প্রদর্শনকারী বা আদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান,—ইহাই এই মতবাদের দ্বারা সূচিত হয়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে মোটামুটি চারি প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। (১) **ন্যায়ের যুক্তি**—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ দাবী করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে নিজস্ব বিষয় তদারক করিবার এবং নিজ জীবন যাপন করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন। অতএব ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের অধিক হস্তক্ষেপ অন্যায়। (২) **নৈতিকযুক্তি** - রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে যতই হস্তক্ষেপ করিবে—বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র যতই জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিবে,—ততই নৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। মানুষের নৈতিক বিকাশের জন্য, কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত, স্বাধীন আবহাওয়া বা পরিবেশ প্রয়োজন—যেরূপ স্বাস্থ্যের জন্য মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন। উপরন্তু, জনগণের পক্ষ হইতে রাষ্ট্র যত অধিক সংখ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবে, জনগণ ততই কম আত্ম-নির্ভরশীল হইবে; অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মোন্নতির জন্য আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করা প্রয়োজন। (৩) **অর্থনৈতিক যুক্তি**—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে,—জনগণের মধ্যে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে,—তাহা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্বাধিক প্রসার লাভ ঘটিবে, দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে সম্পদ উৎপাদন হইবে ও ভোগ করা হইবে। (৪) **বৈজ্ঞানিক যুক্তি**—জীব জগতের নিয়ম হইল "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest); অর্থাৎ যাহারা যোগ্যতম কেবলমাত্র তাহারাই বাঁচিয়া থাকিবে, যাহারা নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিতে পারিবে না তাহারা বিনষ্ট হইবে—ইহাই হইল প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম। অতএব যাহারা শরীরে ও মনে দুর্ব্বল, নিজ চেষ্টায় যাহারা সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে না, তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য। উন্নতি বিধায়ক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা—যথা শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি—ইহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত কার্য্য নহে; উহা বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধী।

সমালোচনা—আধুনিক জগতে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র আদেশ প্রদানকারী সংগঠনরূপে,—অর্থাৎ পুলিশী রাষ্ট্ররূপে রাখা সঙ্গত নহে: শুধু অসঙ্গতই নহে,—উহা অসম্ভবও বটে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কার্য্যকরী করা সঙ্গত নহে কেন?—প্রথমতঃ, যাঁহারা মনে করেন যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকাই ব্যক্তির অধিকার,—ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ন্যূন সংখ্যক হওয়া উচিত,—তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রের দ্বারাই সৃষ্ট। সকল ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা* ও সমান অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে শুধু শান্তি রক্ষা ব্যতীত বিবিধ অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপও সম্পাদন করিতে হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** রাষ্ট্র বিবিধ উন্নতি বিধায়ক কার্য্য সম্পাদন করিয়া মানুষের নৈতিক বিকাশের সহায়তা করে। অজ্ঞ জনসাধারণ সকল সময়ে তাহাদের হিতাহিত বুঝিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের হিতার্থে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ সমর্থনযোগ্য। উপরন্তু, যে কার্য্যগুলি জনসাধারণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় করিতে সক্ষম হইবে না, রাষ্ট্র যদি সেই কার্য্যগুলি করিয়া দেয়, তদ্দ্বারা জনগণের আত্মনির্ভর-শীলতা ক্ষুন্ন করা হয় না; **তৃতীয়তঃ,** অর্থনৈতিক জীবনে অবাধ প্রতিযোগিতা জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর—কারণ একপক্ষ আর এক পক্ষের উপর অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সকল সময়েই সচেষ্ট। মালিক শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, ব্যবসাদার খরচা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক মূল্য দাবী করে—এইরূপে প্রতিযোগিতার নামে যে স্বার্থের রেষারেষি চলে তাহাতে বহুব্যক্তি অন্যায়ের বোঝা বহন করিতে বাধ্য হয়। অতএব রাষ্ট্রের উচিত অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা। **চতুর্থতঃ,** যাহারা অবাধ প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া থাকে তাহারাই যে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যোগ্যতম—তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। তাহা হইলে, দস্যু, তস্কর এবং নিছক শক্তিশালীদিগকেই মনুষ্য জীবন ধারণের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করা যাইত; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে মানুষ শুধু দেহ দিয়াই বাঁচে না, মানুষ বাঁচে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও। অতএব রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইবে যাহাতে পরিচর্য্যার অভাবে কোনো প্রতিভা নষ্ট না হয়। উপরন্তু হতভাগ্য ব্যক্তির ভাগ্যোন্নতির জন্য মানুষের প্রচেষ্টাই হইল সভ্যতার নিদর্শন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কার্য্যকরী করা সম্ভব নহে কেন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিশিষ্ট পরিপোষক **জন ষ্টুয়ার্ট মিল** স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে যে সকল ক্ষেত্রে কোনো এক ব্যক্তির কার্য্য অপরাপর ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, (অর্থাৎ অপর ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় বা প্রভাব বিস্তার করে) সেই সকল ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মিলের এই উক্তির দ্বারাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী কার্য্য করা যে সম্ভব নহে, তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। আধুনিক সমাজে একজন ব্যক্তির

এরূপ কার্য্যকলাপের সংখ্যা খুবই কম, যাহা অপর কোনো ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া না ঘটায় বা প্রভাব বিস্তার না করে।

(অণু-৩) **সমাজতন্ত্রবাদ**– *Socialism*

সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঘোরতর বিরোধী—সমাজতন্ত্রীগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের কার্য্য পরিসর যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের সংখ্যা হইবে ঊর্দ্ধতম। রাষ্ট্র জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্য এবং সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য দায়ী। ইহার জন্যই সমাজের বহু বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এই বহু বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রধানতম বিষয় হইল,—অর্থ নৈতিক।

সমাজতন্ত্রবাদ মূলতঃ একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সহিত সমাজের ও রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকায় সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ নির্দ্ধারিত করে; সেহেতু মূলতঃ অর্থ নৈতিক মতবাদ হইলেও, ইহা একটি রাজনৈতিক মতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে মোটামুটি দুইটী বিষয় লক্ষ্য করা যায়; প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তাহার ফলাফল বিশ্লেষণ করে; দ্বিতীয়তঃ ইহা নূতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও উহার ভিত্তিতে নূতন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করে।

(ক) **সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা আধুনিক অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ**—কোনো সামগ্রী উৎপাদনের জন্য গোটা কয়েক উৎপাদক বস্তু প্রয়োজন—যথা জমি, কলকারখানা, পুঁজি ইত্যাদি। শ্রমিকগণ এই উৎপাদক বস্তুগুলির সাহায্যেই সামগ্রী উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় জনকয়েক ব্যক্তি এই উৎপাদক বস্তুগুলির মালিক এবং এই উৎপাদক বস্তুর সাহায্যে যে সামগ্রী উৎপাদন করা হয় সেই সকল সামগ্রীরও তাহারাই মালিক। মালিকগণ উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পান তাহা হইতে শ্রমিকদিগকে খুব অল্প পরিমাণই মজুরী হিসাবে প্রদান করেন—যাহার দ্বারা শ্রমিকগণ কোনোক্রমে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতে পারে মাত্র। শ্রমিকগণ তাহাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না; মালিকগণ শ্রমিকদিগের পরিশ্রম হইতে মুনাফা (Profits) রূপে মোটা আয় করিয়া থাকেন। এইরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর কুফল রহিয়াছে: (১) একই রাষ্ট্রের মধ্যে মুষ্টিমেয় জনকয়েক ব্যক্তি-অর্থাৎ মালিক শ্রেণী, ক্রমশঃই ধনী হইতে থাকে এবং শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত অগণিত

জনসাধারণ চিরকাল দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য থাকে। ইহাতে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা—অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পরিপূর্ণ সুযোগ ভোগ করা সম্ভব হয়। সংখ্যাধিক জনগণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। (২) মালিকগণ কেবলমাত্র তাঁহাদের মুনাফা অনুযায়ীই সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। যে সামগ্রী উৎপাদন করিলে মালিকদিগের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ বা মুনাফা হইবে, তাঁহারা সেই সামগ্রী গুলিই উৎপাদনের আয়োজন করিবেন—কোন্ সামগ্রী কত পরিমাণে উৎপাদন করিলে সমাজের কল্যাণ হইবে, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। সেই কারণে দেশের মধ্যে জনকল্যাণকর বা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব সত্ত্বেও বিলাস সামগ্রীর—এমন কি জনগণের নীতি বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রীরও, প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে জাতীয় সম্পদের যে প্রভূত অপচয় ঘটে, তাহা অতীব বেদনাদায়ক। (৩) মালিকশ্রেণীর প্রচুর আয় এবং প্রচুর অবসর; তাঁহাদের উদ্যম ও বুদ্ধি তাঁহারা প্রবাহিত করেন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে। শ্রমিক সাধারণের এরূপ অবকাশ, উদ্যম বা অর্থ থাকে না যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপে যোগদান করিতে পারে বা উহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। এমন কি, রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে চিন্তা করিবার বা রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকিবার মতন অবকাশ বা উদ্যমও তাহাদের বহুক্ষেত্রেই থাকে না।

(খ) সমাজ-তন্ত্রবাদের দ্বারা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব—সমাজ-তন্ত্রবাদীগণ বলেন যে এইরূপ মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দেশের সকল উৎপাদক বস্তুগুলিকে—যথা সকল জমি, পুঁজি, কলকারখানা—রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। এইগুলির একমাত্র মালিক থাকিবে রাষ্ট্র—কোনো ব্যক্তিগত মালিক থাকিবে না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রই সকল উৎপাদনের আয়োজন করিবে—উহাই হইবে একমাত্র নিয়োগ-কর্ত্তা। জনগণের মধ্যে পৃথক মালিক শ্রেণী বলিয়া কেহই থাকিবে না, সকলেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষিতে শিল্পে ও ব্যবসায়ে শ্রমিকরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিবে। এতদ্দারা (১) সম্পদ বণ্টনের অসাম্য বিদূরিত হইবে, অর্থাৎ সমাজের এইরূপ ছবি থাকিবে না যে একদিকে রহিয়াছে মুষ্টিমেয় অলস বিত্ত ধনী মালিকগণ এবং অপর দিকে রহিয়াছে বিপুলভাবে সংখ্যাধিক, পরিশ্রমী কিন্তু চির দরিদ্র শ্রমিকগণ। মানুষ এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে সম্পদ ভোগের দ্বারা জীবন-ধারণ করে; সম্পদ বণ্টনে সাম্য আনয়নের তাৎপর্য্য হইল যে সকলের নিকটে, নৈতিক

ও বৈষয়িক উন্নতির সমান সুযোগ উপস্থিত হইবে ; (২) রাষ্ট্র জনগণের,—অতএব রাষ্ট্র যে উৎপাদনের আয়োজন করিবে তাহা করা হইবে জনকল্যাণের দিক হইতে বিচার করিয়া।

এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্যে সকল শিল্প-বাণিজ্য একমাত্র রাষ্ট্রই পরিচালনা করিবে—জনগণের অর্থনৈতিক জীবন পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহাতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। কিন্তু জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য, সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে যেখানে যেরূপ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সেখানেই রাষ্ট্রের সেইরূপ হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য। অতএব ব্যক্তির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সমগ্র সমাজ ব্যাপিয়া রাষ্ট্রের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ থাকিবে।

সমালোচনা—সমাজতন্ত্রবাদের যে সমালোচনা করা হয় তাহা হইলে (১) ব্যক্তিগত মুনাফার প্রলোভন না থাকিলে, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীগণ যথাসম্ভব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিবার অনুপ্রেরণা পাইবে না ; (২) সমাজতন্ত্র-বাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার জন্য শাসকবর্গের অতি উচ্চস্তরের শাসন-দক্ষতা প্রয়োজন। শাসকবর্গ খুব বিচক্ষণ এবং দক্ষ না হইলে, সমাজ-তন্ত্রবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার চেষ্টা শুধু নিরর্থকই হইবে না, সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনে বিপর্য্যয় আনিয়া ফেলিবে ; কিন্তু এইপ্রকার উচ্চধরণের শাসনক্ষমতা খুবই বিরল ; (৩) রাষ্ট্র যদি সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে জনসাধারণকে প্রতি পদেই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিতে হইবে। ব্যক্তির নৈতিক মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতির পক্ষে অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ অহিতকর হইতে পারে।

(অনু-৪) রাষ্ট্রের প্রকৃত কার্য্যকলাপ—*Actual functions of the State*

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ এই দুইটীর কোন একটী মতবাদই সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করা হয় না। কেবলমাত্র রাশিয়ায়, পূর্ব্ব ইউরোপের দুই একটী রাষ্ট্রে এবং চীনদেশে সাম্যবাদ বা কম্যিউনিজ্‌ম্ নামে সমাজতন্ত্রবাদকে কার্য্যকরী করা হইয়াছে—কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে সুনির্দ্দিষ্টভাবে সমাজতন্ত্রবাদকে পরিপূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু আধুনিক কোনো রাষ্ট্রই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী তাহার ক্রিয়াকলাপকে শুধুমাত্র শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রাখিতে

সম্মত নহে। কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা বহুলাংশে সমগ্র সভ্য জগৎ মানিয়া লইয়াছে। তদ্ভিন্ন, সকল রাষ্ট্রেই ইহা উপলব্ধি করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা আদর্শ হইল, জনসাধারণের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা; রাষ্ট্র জনসাধারণের জীবনে অল্প বা অধিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতেছে—নিছক ইহার উপরেই রাষ্ট্রের উপযোগিতা নির্ভর করে না—জনসাধারণের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির কতখানি সহায়তা ইহা করিতেছে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ রাষ্ট্রের উপযোগিতা নির্ভর করে। শুধু আদেশ প্রদান করাই ইহার কার্য্য নহে—জনকল্যাণ সাধনের আদর্শের দ্বারাই ইহার ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ সমাজতন্ত্রবাদকে পুরাপুরি কার্য্যকরী করুক বা নাই করুক, সকল রাষ্ট্রেই ইহা উপলব্ধি করা হইয়াছে যে শুধু দুষ্টের দমনই রাষ্ট্রের কার্য্য নহে, রাষ্ট্রের প্রধান কার্য্য শিষ্টের পালন, এবং শুধুমাত্র দুষ্টের দমনের দ্বারাই শিষ্টের পালন সম্ভব নহে; উহার জন্য অর্থাৎ জনকল্যাণ সাধনের জন্য,—সুনির্দ্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে হইবে। জনসেবাসাধনকে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য বা আদর্শরূপে গণ্য করা হয়।

এই আদর্শ উপলব্ধির জন্য, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ যে কার্য্যাবলী সম্পন্ন করে সেগুলিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণ দুইটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করেন; (ক) আবিশ্যিক কার্য্যাবলী এবং (খ) ইচ্ছামূলক বা উন্নতি বিধায়ক কার্য্যাবলী।

(ক) আবিশ্যিক কার্য্যাবলী (*Constituent or Essential functions*)

সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে কাজগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় সেইগুলি হইল আবিশ্যিক কার্য্যাবলী। (১) রাষ্ট্রকে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী রক্ষার ও তদারকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন শান্তি বজায় রাখিবার জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন ও তদারক করিতে হইবে। (৩) অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের কার্য্যের উপর নজর রাখা এবং তাহাদের সহিত যথাযোগ্য সম্পর্ক নির্ণয় করা অবশ্য প্রয়োজনীয়; সেই জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে (৪) দোষী ব্যক্তি যাহাতে শাস্তি পায় অথচ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে যেন শাস্তি ভোগ না করিতে হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রকে ফৌজদারী বিধি (Criminal law) কার্য্যকরী করিতে হইবে এবং বিচারালয় গঠন করিতে হইবে। (৫) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এবং পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া দিতে হইবে। (৬) সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(খ) ইচ্ছামূলক বা উন্নতিবিধায়ক কার্য্যাবলী—*(Optional or Ministrant functions)*

এই কার্য্যগুলি সম্পাদন না করিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য এইগুলি সম্পাদন করা প্রয়োজন (১) রাষ্ট্রকে জন-স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সমাজের বক্তিগণ হীনস্বাস্থ্য সেই সমাজের পক্ষে উন্নতি সম্ভব হয় না ; (২) রাষ্ট্র জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য যেমন শারীরিক বলিষ্ঠতার পরিপোষক, শিক্ষা সেইরূপ মানসিক বলিষ্ঠতা ও তৎপরতার পরিপোষক। মানুষের উন্নতি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উভয়ই প্রয়োজন। (৩) রাষ্ট্র যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহন বা চলাচল ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া থাকে। নাগরিকগণ যাহাতে একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করিতে পারে—সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ডাক ও তার বিভাগ স্থাপন করে। তাহারা যাহাতে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে পারে—তাহার জন্য রাষ্ট্র রাস্তা, সেতু এবং রেলপথ নির্ম্মাণ করে। (৪) আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ শ্রমিক সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। জমিতে, খনিতে এবং কারখানাগুলিতে কাজ করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের কার্য্যকাল, বেতন, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টিত থাকে। (৫) প্রত্যেক রাষ্ট্র বিভিন্ন উপায়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে কারণ ইহাদের উন্নতি হইলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় এবং জনগণের চাকুরীর সংস্থান হয়। (৬) প্রত্যেক রাষ্ট্রই বহু পরিমাণে অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মুদ্রাপ্রচলন ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমদানী, রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া, ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া এমন কি সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া, দুষ্প্রাপ্যতার সময়ে বরাদ্দ প্রথা (rationing) প্রবর্ত্তন করিয়া এবং অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। (৭) অসহায়, অকর্ম্মণ্য ও বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সভ্য রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

Questions & Hints

1. "The sole duty of the Government is to protect the individual from violence and fraud. Discuss in the light of this statement the functions of the state. [অনু-২]

2. Indicate the changes that have taken place recently in our ideas about the nature and extent of the Government. (1940)

[অনু ৩ এর প্রথম ৮ পংক্তি ; অনু-৪]

3. Describe the functions of the state. "It is considered to be the duty of the state to concern itself with the well being of the entire body of its citizens and in every sphere of their activity. Is this view sound ? (1938)

[৪নং অনুচ্ছেদের (ক) ও (খ) এবং ৩নং অনুচ্ছেদের সমালোচনা]

4. "Not command but service is the prominent characteristic of the state." Discuss in the light of this statement the functions of the state. (1944)

[অনু-৪]

5. What are the functions of Governments ? Which of them do you regard as essential ? (1949)

[অনু-৪এর "জনসেবা সাধনকে রাষ্ট্রের" হইতে শেষ অবধি]

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকতা

Citizenship

(অণুচ্ছেদ-১) নাগরিক—*Citizen*

নাগরিক বলিয়া যাহারা গণ্য হয় তাহাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে (১) তাহারা রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত কোনো জনসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত। এই জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার মধ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য একটী শাসন প্রতিষ্ঠান থাকে। (২) তাহারা এই জনসমষ্টির সহিত বিবিধ কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্বের দ্বারা এবং পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা আবদ্ধ অর্থাৎ—এই জনসমষ্টির হিতার্থে তাহাদিগকে বিভিন্ন পর্য্যায়ের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় এবং উহার আদেশ-নির্দ্দেশ মান্য করিবার জন্য সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হয়। (৩) এই জনসমষ্টির অন্তর্ভূর্ক্ত থাকিবার নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধাও তাহারা ভোগ করে—এই জনসমষ্টির শাসন প্রতিষ্ঠান তাহাদের আনুগত্য লাভ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং নানাবিধ সুখ সুবিধা প্রদান করে। অতএব নাগরিক বলিতে বুঝায়—রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কোনো জনসমষ্টির অন্তর্ভূর্ক্ত এমন একজন ব্যক্তি যে ঐ জনসমষ্টির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের (allegience) দ্বারা উহার সহিত আবদ্ধ এবং যে ঐ জনসমষ্টির নিকট হইতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং নানাবিধ সুবিধা পাইবার অধিকারী। এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টি বলিতে বুঝায়—রাষ্ট্র, অতএব রাষ্ট্রের সদস্যপদ হইল নাগরিকতা (citizenship)।

(অণু-২) বিদেশী—*Aliens*

একটি রাষ্ট্রের মধ্যে অপর কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক বাস করিলে যে রাষ্ট্রে সে বাস করিতেছে সেই রাষ্ট্রের নিকট সে একজন বিদেশী। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিদেশী বলিতে বুঝায় সেই ব্যক্তিগণ যাহারা অপর কোনো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমষ্টির অন্তর্ভূর্ক্ত কিন্তু সাময়িকভাবে ঐ রাষ্ট্রে আসিয়াছে বা বসবাস করিতেছে।

বিদেশীগণ যে রাষ্ট্রে বসবাস করিতেছে সেই রাষ্ট্রের আইন কানুন মানিয়া চলিতে তাহারা বাধ্য এবং নাগরিকগণ যেরূপ রাষ্ট্রকে কর, খাজনা ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকে, বিদেশীগণও সেইরূপ যে রাষ্ট্রে তাহারা বসবাস করিতেছে সেই রাষ্ট্রকে কর খাজনা ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহার ব্যয়ভার বহনে সাহায্য করিবে। অপরদিকে নাগরিকগণ যেরূপ দাবী করিতে পারে যে রাষ্ট্র দুষ্কৃতকারীদের হস্ত হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিবে, সেইরূপ বিদেশীগণও ঐ রাষ্ট্রে যতদিন বাস করিবে ততদিন ঐ রাষ্ট্রের নিকট জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা ব্যবস্থার দাবী করিতে পারে।

কিন্তু যে রাষ্ট্রে বিদেশী বাস করিতেছে সেই রাষ্ট্রের সমষ্টিগত জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার দিক হইতে, তাহাদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অক্ষমতাও থাকে। (১) **বিদেশীর পক্ষে রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রসীমানায় সীমাবদ্ধ**—রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই নাগরিকগণ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাহার রাষ্ট্রের নিকট হইতে রক্ষণাবেক্ষণ পাইবে। নাগরিক তাহার রাষ্ট্রের বাহিরে অপর কোনো দেশে যাইলে সেখানেও তাহার স্বার্থের দিকে তাহার নিজ রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের পিছনে রাষ্ট্রের অদৃশ্য পতাকা ভ্রমণ করে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীগণ যতদিন ঐ রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করিবে শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্যই তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐ রাষ্ট্র চেষ্টা করিবে, কিন্তু বিদেশীগণ ঐ রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিলে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঐ রাষ্ট্র আর দায়ী থাকিবে না। ২) **বিদেশীদের রাজনৈতিক অধিকার নাই**—নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় জীবনে বিবিধ অধিকার ভোগ করে। কিন্তু এই অধিকারগুলির মধ্যে যেগুলি রাজনৈতিক অধিকার সেগুলি বিদেশীগণ ভোগ করিতে পারে না—তাহারা যে রাষ্ট্রে বাস করিতেছে তাহার রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

অপর পক্ষে একটী রাষ্ট্র নাগরিকের উপর যে দাবী করিতে পারে, উহা অপেক্ষা বিদেশীদিগের উপর তাহার দাবী অধিকতর সীমাবদ্ধ। এই পার্থক্য হইল **আনুগত্যের দিক হইতে**। রাষ্ট্রের প্রতি তাহার নাগরিকের পূর্ণ আনুগত্য বিদ্যমান এবং এই পূর্ণ আনুগত্যের বলে রাষ্ট্র তাহার স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্য তাহার নাগরিকের উপর যে কোনো দাবী করিতে পারে—এমন কি রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি লইতে তাহাকে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু ঐ রাষ্ট্রের প্রতি তথাকার বিদেশীদিগের পূর্ণ আনুগত্য নাই, বিদেশীর পূর্ণ আনুগত্য (allegiance আছে তাহার নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। অতএব রাষ্ট্র বিদেশীর সহিত যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে না।

(অণু-৩) নাগরিকতা প্রাপ্তির পদ্ধতি—*Methods of Acquiring Citizenship*

একজন ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে—(১) স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ জন্মের দ্বারা অথবা (২) কৃত্রিম ভাবে অর্থাৎ নাগরিককরণ কার্য্যের দ্বারা।

(১) **জন্মের দ্বারা**—(By birth) জন্মের দ্বারা নাগরিক হইবার দুই প্রকার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) কোনো কোনো রাষ্ট্রে (যথা আর্জ্জেন্টিনা) এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে যেকেহ ঐ রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে, (তাহার পিতামাতা যে রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউক না কেন) সেই ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ নিয়মকে জন্মস্থান নিয়ম (Jus soli) বলিয়া অভিহিত করা হয়। (খ) কোনো রাষ্ট্রে (যথা জার্ম্মাণী) নিয়ম আছে যে যেকেহ ঐ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাকেই উহার নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে না; যাহারা ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক আছে, কেবলমাত্র তাহাদিগের সন্তানগণই উহার নাগরিক হইতে পারিবে। ইহাদের জন্মস্থান ঐ রাষ্ট্রের মধ্যেও হইতে পারে, উহার বাহিরেও হইতে পারে। এই নিয়মের নাম রক্তসম্পর্ক নিয়ম (Jus sanguinis)।

গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় নিয়মই অনুসরণ করে।

(২) **নাগরিককরণ** (Naturalisation)—ইহার অর্থ হইল যে একটী রাষ্ট্র, স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ জন্মদ্বারা তাহার নাগরিক নহে, এরূপ ব্যক্তিকে কৃত্রিমভাবে নাগরিকতা অর্পণ করিয়া, তাহাকে উহার নাগরিক পর্য্যায়ভূক্ত করিয়া লইতে পারে। ইহার জন্য অবশ্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই দাবী করে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কতিপয় সর্ত্ত পূরণ করিবে, —অর্থাৎ এরূপ কোনো কার্য্য করিবে যাহাতে বুঝা যায় যে ঐ রাষ্ট্রের প্রতি তাহার আকর্ষণ জন্মিয়াছে। এইরূপ কার্য্য বিভিন্ন পর্য্যায়ের হইতে পারে: (ক) একজন ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সেই রাষ্ট্রের মধ্যে তাহাকে কিছুকাল বসবাস করিতে হইতে পারে। (খ) ঐ রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলে নাগরিককরণের প্রার্থনা বিবেচিত হইতে পারে। (গ) কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পত্তি ক্রয় করিলে উহার নাগরিক হইবার জন্য তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে পারে। (ঘ) অপর কোনো দেশের মহিলা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিলে তাহাকে তাহার স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি জন্মের দ্বারা, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে, কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক তাহাকে বলা হয় স্বাভাবিক নাগরিক (Natural citizen); অপর পক্ষে যে ব্যক্তি

নাগরিককরণ কার্য্যের দ্বারা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াছে, তাহাকে বলা হয় কৃত-নাগরিক (Naturalised citizen)।

(অণু-৪) নাগরিকতার বিলোপ—*Loss of Citizenship*

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক তাহার কার্য্যের দ্বারা নাগরিকতা হারাইয়া ফেলিতে পারে। (ক) কোনো ব্যক্তি তাঁহার রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক উহার নাগরিকতা ত্যাগ করিতে পারে। (খ) কোনো নাগরিক যদি এরূপ কোনো কার্য্য করে যাহাতে তাহার রাষ্ট্র মনে করিতে পারে যে উহার প্রতি ঐ নাগরিকের আকর্ষণ অপেক্ষা অপর কোনো রাষ্ট্রের প্রতি তাহার অধিক আকর্ষণ জন্মিয়াছে, তাহা হইলে রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। যে কার্য্যগুলির দ্বারা এইরূপ ঘটিতে পারে সেগুলি হইল, কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো রাষ্ট্রে যাইয়া অধিকদিন বসবাস করে, অথবা অপর রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহন করে, অথবা অপর রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করে অথবা অপর রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করে অথবা নাগরিককরণের দ্বারা অপর কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক শ্রেণীভূক্ত হয়।

(অণু-৫) নাগরিকদিগের অধিকার—*Rights of Citizens.*

মানুষের কতিপয় ক্ষমতা আছে যেগুলি কোনো কোনো ব্যক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু যেগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত নহে—যথা—চুরি করিবার ক্ষমতা। অপর পক্ষে গোটা কয়েক ক্ষমতা আছে যেগুলির ব্যবহার রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত এবং ঐ ক্ষমতা যে প্রয়োগ করিবে সে রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমর্থন পাইবে। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষমতা একজন ব্যক্তি প্রয়োগ করিতে থাকিলে অপর যদি কেহ তাহাতে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে রাষ্ট্র বাধাপ্রদানকারীকে বিরত বা শাস্তি প্রদান করিবে। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ক্ষমতার নাম অধিকার। **টমাস ব্যালের,** ভাষায় "রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রয়োজনবোধে বলবৎকৃত, দাবীর নাম অধিকার।" ["A right is a claim recognised and if necessary enforced by the state"]

অধিকারের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে, অধ্যাপক **ল্যাস্কি** অধিকারের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, "অধিকারসমূহ হইল সমাজ জীবনের সেই সুবিধাগুলি যাহার অভাবে কোনো ব্যক্তি তাহার সংবৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না।" ["Rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best."] ইহার অর্থ হইল যে জীবনের নানা-ক্ষেত্রের কোনো না কোনো কর্ম্মক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে ; প্রত্যেক

ব্যক্তির কর্ত্তব্য তাহার অন্তর্নিহিত এই কর্ম্মশক্তি বা সৎবৃত্তিকে বাঁচাইয়া রাখা এবং উহার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। ইহা সম্ভব করিতে হইলে আমাদের সমাজ জীবনে গোটাকয়েক সুযোগ সুবিধা ভোগ প্রয়োজন—এই সুযোগ সুবিধাগুলিই হইল নাগরিকদিগের অধিকার।

(অণু-৬) পৌর-অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার—*Civil Rights and Political Rights*

(ক) **পৌর অধিকার**—যে সকল অধিকার ভোগ সভ্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী এবং দৈনন্দিন জীবনে যেগুলি উপভোগের দ্বারা নাগরিকগণ তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করে এবং নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে সেইগুলিকে বলা হয় পৌর অধিকার (civil rights)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নিম্নরূপ পৌর অধিকার ভোগ করে :—

(১) **জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা**—জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে নাগরিকের পক্ষে তাহার নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা সম্ভব নহে। সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকের বাঁচিয়া থাকিবার এবং সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। কোনো ব্যক্তি অপরের প্রাণ লইতে বা সম্পত্তি লইতে উদ্যত হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার বা সম্পত্তি রক্ষার পূর্ণ অধিকার আছে এবং রাষ্ট্রও আক্রমণকারীকে বাধা দিবে ও শাস্তি দিবে। তবে ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে রাষ্ট্র গুরুতর অপরাধে অপরাধী নাগরিককে জীবনভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে এবং ইহাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করা যাইতেছে য সমগ্র জনসমষ্টির হিতার্থে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে যে কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করিতে পারে।

(২) **স্বাধীন গতিবিধির অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিক তাহার প্রয়োজন এবং ইচ্ছামত রাষ্ট্রের মধ্যে একস্থান হইতে অপর স্থানে বিনা বাধায় যাতায়াত করিতে পারে। কোনো নাগরিককে কেহই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করিয়া দেশের সরকারও কোনো নাগরিককে বন্দী করিয়া স্বাধীন গতিবিধির অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।

(৩) **ধর্ম্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা**—নাগরিকগণ বিভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করিতে ও বিভিন্ন ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারে—কেহই অপরের ধর্ম্মমতে আঘাত করিবে না, ধর্ম্মীয় রীতিনীতি পালনে বাধা দিবে না। আবার কেহ যদি কোনো ধর্ম্মেই

বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইবার অধিকারও তাহার আছে। কারণ ধর্ম্ম হইল বিবেকের অনুশাসন এবং বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকারের জন্যই যেরূপ স্বধর্ম্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত হয় সেইরূপ বিবেকের স্বাধীনতার জন্যই কোনো নাগরিকের কোনো ধর্ম্মেই বিশ্বাস না করিবার অধিকারও স্বীকৃত হওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) **চুক্তি সম্পাদনের অধিকার**—তাহাদের ব্যক্তিগত বা কর্ম্মজীবনে পরস্পরের মধ্যে নানা বধ চুক্তি সম্পাদনের অধিকার নাগরিকগণ ভোগ করে। অবশ্য রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে অহিতকর কোনো চুক্তি সম্পাদনের অধিকার স্বীকৃত হয় না।

(৫) **ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার**—একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপোষক ব্যক্তির বসবাস থাকিতে পারে ; এক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের আপন ভাষা শিক্ষার ও সংস্কৃতির অনুশীলনের অধিকার আছে। কারণ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের বিদ্যানুশীলন ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়।

(৬) **বাক্-স্বাধীনতা**—প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের দ্বারাই সমাজের উন্নতি সম্ভব হয় এবং ভাষা হইল এইরূপ ভাবের আদান প্রদানের উপায়। সমাজের অগ্রগতির জন্যই বাক্ স্বাধীনতা প্রয়োজন। উপরন্তু, শাসকবর্গের কার্য্যকলাপ যাহাতে জন-কল্যাণের দিকেই প্রবাহিত হয় তাহার জন্য তাহাদের কার্য্যকলাপের উপর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। তদুপরি, রাষ্ট্রের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিলে তবে নাগরিকের চিন্তা শক্তির উন্মেষ হইবে এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ সম্ভব হইবে। কিন্তু চিন্তা করিয়া যে ফলাফল পাওয়া যায় তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশের অধিকার না থাকিলে চিন্তাশক্তির অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। অবশ্য বাক্ স্বাধীনতার অন্তরালে অযথা গালিগালাজ, অবমাননাকর বা রাষ্ট্রদ্রোহিতাসূচক ভাষার প্রয়োগ কোনো রাষ্ট্রই করিতে দিবে না।

(৭) **সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা**—নাগরিকগণ যে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিবে অথবা শাসকবর্গের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা করিবে, উহার জন্য দেশের ভিতরে এবং বাহিরে কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে তাহা জানা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন। এই সকল ঘটনার যথাসম্ভব সত্য বা অবিকৃত বিবরণই জনগণের নিকট পৌছানো প্রয়োজন। সংবাদপত্রসমূহ জনসাধারণের নিকট এইরূপ বিবিধ ঘটনার বিবরণ পৌছাইয়া দেয় ; শুধু তাহাই নহে, এইগুলির উপর সংবাদ-পত্র মন্তব্য ও সমালোচনাও প্রকাশ করে। মোটকথা ইহা বর্ত্তমান জগতে জনমত

গঠন ও ব্যক্তকরণের একটী গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সুতরাং, যেহেতু গনতন্ত্রে জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, সেহেতু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় রাখা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদিগের অতি প্রয়োজনীয় অধিকার বলিয়া গণ্য হয়। তবে সংবাদপত্র যদি এই অধিকারের অপপ্রয়োগ করে—যথা সাম্প্রদায়িক বিরোধ উসকাইয়া দেওয়া অথবা অনিয়মতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ প্রচার করা,—তাহা হইলে সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উহার প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে জেনিভাতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষের দ্বারা উত্থাপিত এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ সরবরাহ বন্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার প্রত্যেক সরকারের আছে।

(৮) **সভানুষ্ঠান ও সমিতি গঠনের অধিকার**—দেশের সমস্যা সম্পর্কে সঠিকভাবে চিন্তা করিতে হইলে বা সেই চিন্তাধারা অনুযায়ী সংস্কার সাধনে প্রয়াস করিতে হইলে নাগরিকদিগের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা করা প্রয়োজন হয়। সভানুষ্ঠানের অধিকার নাগরিকদিগের অন্যতম পৌর অধিকার। উপরন্তু নাগরিকদিগের বিভিন্ন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠনেরও অধিকার আছে। মানুষের পরস্পরের সহিত মেলামেশা করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে যেরূপ রাষ্ট্রের উদ্ভব, সেই-রূপ বিভিন্ন সমিতি ও সঙ্ঘের উদ্ভব হয়। এই সঙ্ঘের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাহাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সাধন করে।

(খ) **রাজনৈতিক অধিকার**—নাগরিকদিগের হিতার্থেই রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য পরিচালিত হওয়া উচিত এবং কিভাবে পরিচালিত হইলে শাসন যন্ত্রের দ্বারা নাগরিক-দিগের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা নাগরিকদিগের দ্বারাই স্থির হওয়া বিধেয়; সেই জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, শাসন প্রতিষ্ঠান কি নীতি অনুযায়ী এবং কাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহা নাগরিকদিগের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের দ্বারা নাগরিকগণ শাসকবর্গকে মনোনয়ন, শাসননীতি নির্দ্ধারণ ও অন্য কোনোরূপে শাসনযন্ত্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে, সেইগুলির নাম হইল রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকারগুলি এইরূপ :—

(১) **ভোট প্রদানের অধিকার**—আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কাহারা নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা

ব্যবহার করিবে তাহা নাগারিকগণই স্থির করিয়া দেয়। প্রতিনিধি ঠিক করিয়া দিবার নাম নির্ব্বাচন এবং ভোটদানের দ্বারা এই নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানের ক্ষমতা একটি রাজনৈতিক অধিকার।

(২) **নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবার অধিকার**—প্রতিনিধি যাহাকে নির্ব্বাচিত করা হইবে সে কোনো বাহিরের লোক হইবে না। যাহারা নির্ব্বাচন করিবে তাহাদের মধ্য হইতেই যে কেহ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইতে পারিবে—ইহা নাগরিকদিগের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। কারণ গণতন্ত্রে কোনো স্বতন্ত্র শাসক-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না—গণতান্ত্রিক শাসনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। সেই কারণে, নাগরিকদিগের ভোটাধিকার থাকিবে কিন্তু নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবার অধিকার থাকিবে একটী বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার থাকে না—যেমন ছিল না পেরিক্লিসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন এথেন্সে বা যেমন নাই ভারতীয়দের বংশধর দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদিগের।

(৩) **রাষ্ট্র-কর্ম্মচারীর পদ পাইবার অধিকার**—রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শুধুই যে উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক কর্ম্মচারীগণ অর্থাৎ মন্ত্রীগণ থাকেন তাহাই নহে, উহার জন্য বহু সংখ্যক রাষ্ট্রকর্ম্মচারীও থাকেন। নাগরিকগণের মধ্যে কোনো-রূপ ভেদাভেদ না করিয়াই এই সকল পদে লোক নিয়োগ করা কর্ত্তব্য—অবশ্য যথাযথ যোগ্যতার পরিমাপ করিয়াই লোক নিয়োগ করিতে হইবে। নাগরিকগণ যদি দেখে যে এরূপ কতিপয় সরকারী পদ আছে যাহা যোগ্যতা থাকিলেও তাহারা পাইতে পারে না,—হয়তো বৈদেশিকগণ বা শাসকবর্গের পোষ্য এবং অনুগৃহীতগণই পাইয়া থাকে,—তাহা হইলে তাহাদের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারের অভাবই অনুভূত হইবে।

(৪) **আবেদনের অধিকার**—কোনো অন্যায় বা অবিচারের প্রতি শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং প্রতিবিধান প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রেরণের অধিকার নাগরিকদিগের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার।

(অনু-৭) **অধিকার ও কর্ত্তব্যের সম্পর্ক**—*Relation between Rights and Duties*

নাগরিকদিগের অধিকারের সহিত বিবিধ কর্ত্তব্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধিকার ভোগ করিতে হইলেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, নতুবা অধিকার ভোগ সম্ভব নহে। অপরদিকে অধিকার ভোগ না থাকিলে কর্ত্তব্য পালনের জন্যও নাগরিকদিগকে উদ্বুদ্ধ

করা সম্ভব নহে। অধিকার ও কর্ত্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। একাধিক দিক হইতে এই নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ করা চলে।

প্রথমতঃ, নাগরিকগণ যে অধিকার ভোগ করে সেই অধিকার ভোগ নির্ভর করে রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্রের দ্বারা সংরক্ষিত ও সমর্থিত বলিয়াই অধিকারগুলি নাগরিকগণ ভোগ করিতে সক্ষম হয়। একজন আর একজনের অধিকারে যে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকে, প্রত্যেকেই যে তাহার অধিকার সমভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার কারণ হইল যে রাষ্ট্র সর্ব্বসাধারণের অধিকার সমভাবে বণ্টন করিয়া দেয়। অতএব রাষ্ট্র যাহাতে শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করা নাগরিকদিগের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, অধিকার সমূহের রক্ষার জন্য সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলে না। নাগরিকগণ যদি এইরূপ চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয় যে কেহই সাধারণতঃ নিজে হইতে অপরের অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না,—অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া কার্য্য করিবে না, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের হস্ত প্রসারিত দেখিলে তবেই আপনাকে সংযত করিবে,—তাহা হইলেও সকলের অধিকার রক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে যদি এই মনোভাব প্রবেশ করে যে,—নেহাৎ যেখানে যতটুকু বাধ্য হইতে হইবে, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যতীত,—কেহই অপরের অধিকারে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, তাহা হইলে রাষ্ট্রের সাধ্যে কতটুকু কুলাইবে? রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, উহার ভিত্তি জনগণের সদিচ্ছার উপর। জনগণের অধিকাংশই যদি পরস্পরের অধিকার মানিয়া চলে, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় কতিপয় দুরভিসন্ধিপূর্ণ ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক অপরের অধিকার মানিতে বাধ্য করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের এই চেতনা লইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য যে তাহার অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে যেমন তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে, তেমনি সেও অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক অধিকারের ক্ষেত্রেই যাহা একজনের অধিকার তাহাই অপরের কর্ত্তব্য। অধিকার হইল এমন একটি দাবী যাহাতে দুই পক্ষ থাকে,—এক পক্ষ দাবী করে আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে দাবী করা হয়। যথা আমার অধিকার হইল নির্বিঘ্নে নিজ গৃহে বসবাস করা—ইহাতে অপর সকলের কর্ত্তব্য হইল আমার গৃহে অনধিকার প্রবেশ না করা। এই পারস্পরিক দাবীদাওয়ার চেতনা প্রত্যেককে বহন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, নাগরিকগণ এই অধিকারসমূহ দাবী করে, কারণ উহার দ্বারা তাহাদের মানসিক বিকাশ ও বৈষয়িক উন্নতিবিধান সম্ভব হয়। অতএব আমি অধিকার

দাবী করিলেই, উহার দ্বারা আমার আত্মোন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(অনু-৮) নাগরিকের কর্ত্তব্য—*Duties of a Citizen*

প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য রহিয়াছে (১) তাহার নিজের প্রতি (২) অপর নাগরিকের প্রতি এবং (৩) রাষ্ট্রের প্রতি।

(১) **নিজের প্রতি** -প্রত্যেক নাগরিকের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অধিকার ভোগের দ্বারা যাহাতে নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করা যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য। (২) **অপর নাগরিকের প্রতি**—একজন নাগরিকের যেরূপ অধিকার রহিয়াছে সেইরূপ অপর সকলেরও অধিকার রহিয়াছে। একজন ব্যক্তি তাহার অধিকার যদি এরূপভাবে ভোগ করিতে চাহে যাহাতে অপর নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে অধিকার ভোগ সম্ভব হইল বটে কিন্তু তাহার জন্য হয়তো একাধিক ব্যক্তিকেই অধিকার ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইল। অতএব অপর নাগরিকদিগের ন্যায্য অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় প্রত্যেক নাগরিকের সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। (৩) **রাষ্ট্রের প্রতি**—(ক) আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্র শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে ও তাহার কার্য্যাবলী পরিচালনা করে। আইন হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি; রাষ্ট্রের কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় জীবন বজায় রাখিবার জন্য এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নাগরিকদিগের কর্ত্তব্য হইল রাষ্ট্রের আইনসমূহ সঠিকভাবে মান্য করিয়া চলা। (খ) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য এবং জনকল্যাণজনক কার্য্যাবলীর জন্য প্রভূত অর্থব্যয় প্রয়োজন। নাগরিকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাষ্ট্র এই ব্যয়ভার বহন করে। রাষ্ট্রের কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য নিয়মিতভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে কর প্রদান করা নাগরিকদিগের কর্ত্তব্য। (গ) জনসাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে কোনো সরকারী পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে ঐ পদ গ্রহণ করা এবং ঐ পদের যাবতীয় কর্ত্তব্য বিশ্বস্তভাবে পালন করা উচিত। (ঘ) ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকদিগের একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কিন্তু নাগরিক এই অধিকার কিভাবে ব্যবহার করে তাহার উপরে রাষ্ট্রের সুশাসন নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য, অপর সকল- বিবেচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশের হিতসাধন করিতে পারে, কেবলমাত্র এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচিত করা। (ঙ) রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এই পূর্ণ আনুগত্যের

বলে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের বিপদের সময়ে স্বীয় জীবনের ঝুঁকি লইয়াও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে বাধ্য থাকে।

(অনু-৯) সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য—*Characteristics of Good Citizenship*

সুনাগরিক হইল সেই ব্যক্তি যে নাগরিকের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং অধিকার সংরক্ষণ ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সমভাবেই আগ্রহান্বিত। সুনাগরিক হইতে হইলে গোটাকয়েক গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথম হইল **বিচার বুদ্ধি**; নাগরিকগণ তাহাদের কর্ত্তব্য পালনের পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রকে উন্নত করিতে পারে অথবা উহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। ইহার জন্য নাগরিককে রাষ্ট্রের হিতাহিত বা স্বার্থ সম্যক বুঝিতে হইবে; ইহাতে নাগরিককে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হইবে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সদিচ্ছা থাকিলেও সৎ-কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন **আত্মসংযম**। রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর কোনো কার্য্য যদি নাগরিকের স্বার্থের সহিত সংঘাত করে তাহা হইলে নাগরিককে নিজ স্বার্থের আকর্ষণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির আত্মসংযম না থাকিলে তাহার বুদ্ধির অপপ্রয়োগ ঘটিবে মাত্র। সুনাগরিককে সমবেত ইচ্ছাকে নিজ ইচ্ছার উর্দ্ধে স্থান দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সুনাগরিকের পক্ষে **বিবেক সম্পন্ন** হওয়া প্রয়োজন। বিবেক মানুষকে কর্ত্তব্যে আহ্বান করে এবং কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করে।

'**ব্রাইস**' সুনাগরিক এবং যোগ্য নাগরিক একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং যোগ্য নাগরিকের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন: "জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় বিচার করিবার মতন তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকিবে, পদ অধিকারের জন্য ঠিক যোগ্য-ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিবার মতন সন্ধানী দৃষ্টি থাকিবে, সংখ্যাধিক্যের অভিমত গ্রহণের মত আত্মসংযম থাকিবে, সমষ্টির ব্যয়ে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা না করিয়া সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের মতন সাধুতা থাকিবে, সমষ্টির কল্যাণের জন্য ঝঞ্ঝাট বহন করিবার বা বিপদের সম্মুখীন হইবার মতন গণস্বার্থ চেতনা (public spirit) থাকিবে।"

(অনু-১০) সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক—*Hindrances to Good Citizenship*

সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সুনাগরিক হইবার কতিপয় গুরুতর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। এইগুলি হইল (১) ঔদাসীন্য (২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (২) দলীয় স্পৃহা।

(১) **ঔদাসীন্য**—সমষ্টিগত জীবনের ক্ষেত্রে নানা কারণে নাগরিকদিগের

ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। এই ঔদাসীন্যের জন্য নাগরিক তাহার কর্তব্য যথাযথ সম্পাদনে বিরত থাকে। তাহাদের ঔদাসীন্য এই বিষয়গুলির দ্বারা প্রকাশিত হয় : (ক) নাগরিকগণ সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রের যে সকল আভ্যন্তরীন শত্রু শাসনযন্ত্র ধ্বংস করিতে বা আইন অমান্য করিতে সচেষ্ট হয় তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। (খ) তাহারা ভোটদানে অবহেলা করে। যত সংখ্যক লোক নির্বাচক হইবার যোগ্য সমসংখ্যক ব্যক্তি সেই ভোট প্রদান করিতে যায় না—ইহাতে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি চক্রান্ত, দুর্নীতি এবং অন্যায় প্রভাবের দ্বারা শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করিতে সক্ষম হয়। (গ) অর্থোপার্জ্জনের দিক হইতে জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছে এরূপ বহু ব্যক্তি আমোদ প্রমোদ ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবসর বিনোদনে উদ্যমের অপচয় করে কিন্তু জনস্বার্থ সম্পর্কিত পদ অধিকারের জন্য আগাইয়া আসে না। (ঘ) সাধারণ ব্যক্তি সমষ্টিগত সমস্যাগুলি চিন্তাই করে না অথচ এইগুলি চিন্তা না করিয়াই যে ভোট প্রদান করা হয় তাহার মূল্য কতটুকু !

(২) **ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা**—ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা এবং উহার দ্বারা নিজ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ হইল সুনাগরিকতার পথে প্রকাণ্ড বাধা। গণতন্ত্রের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থপরতার দ্বারা নিজ কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে দেখিতে পাওয়া যায়। সমষ্টির কল্যাণের কথা না চিন্তা করিয়া তাহারা ব্যক্তিগত কল্যাণের ও লাভের পথ সন্ধান করে ; সমষ্টির কল্যাণ ও ব্যক্তিগত কল্যাণ পরস্পর বিরোধী মনে হইলে তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যক্তিগত কল্যাণের বেদীতে সমষ্টিগত কল্যাণকে বলিদান করে। স্বার্থান্ধ নাগরিকের এই উৎকট স্বার্থবোধ বিবিধ কার্য্যের মাধ্যমে প্রকটিত হয়। (ক) তাহারা অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয় বিক্রয় করে (খ) রাষ্ট্রের করভার যতটা সম্ভব পরিহার করিবার জন্য চেষ্টিত হয় (গ) কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের উন্নতির জন্য যাহাতে রাষ্ট্রের ব্যয় বরাদ্দ হয় তাহার জন্য স্থানীয় অধিবাসীগণ অশোভন আগ্রহ প্রকাশ করে—অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজন সমগ্র রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে অনুভব করে না ; (ঘ) রাষ্ট্রের কর্মচারীগণের মধ্যে বিশেষ কোনো একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীগুলির সহিত অথবা জনগণের সহিত তুলনায় তাহারা যে অধিক সুখ সুবিধা ভোগ করে তাহা বিবেচনা করে না—তাহাদের নিজেদের দাবী-দাওয়া লইয়া রাষ্ট্রকে তথা সমগ্র সমাজকে নিয়তই বিব্রত করিতে থাকে ; (ঙ) নেতৃপদ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রকে সাহায্য না করিয়া, ঐ দুঃখদুর্দ্দশাকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের কার্য্যে লাগায় এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক সমাজকে সঙ্কটের মুখে ঠেলিয়া দেয়।

(৩) **দলীয় স্পৃহা**—দল সংগঠন একাধিক ক্ষেত্রে সমষ্টির উন্নতি সাধন করে; কিন্তু নাগরিক যখন দলগত স্পৃহার দ্বারা অন্ধ হইয়া পড়ে, তখন সমাজের ক্ষতিকর কার্য্যই তাহার দ্বারা সাধিত হয়। দলীয় স্পৃহার দ্বারা অন্ধ নাগরিক **উদ্দেশ্য** (end) এবং **উপায়ের** (means) মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়া ফেলে। দলের অস্তিত্ব যে রাষ্ট্রের হিত সাধনের জন্য,—রাষ্ট্রের হিতই যে প্রকৃত **উদ্দেশ্য**, দল হইল ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির **উপায় মাত্র**, তাহা দলগত চেতনায় অন্ধ নাগরিক ভুলিয়া যায়। ইহা সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক কারণ ইহা নাগরিককে দলের স্বার্থের নিকট রাষ্ট্রের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে প্রলুব্ধ করে—অন্ততঃ ইহা দলের দ্বারা রাষ্ট্রকে আড়াল করিয়া ফেলে।

(অনু-১১) ভারতবর্ষে নাগরিক অধিকার—*Citizens' Rights in India.*

ব্রিটিশ শাসকবর্গের ন্যায়ের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার বণ্টনের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও (যথা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা) ভারতবাসীদিগকে নাগরিক অধিকারগুলি হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে কোনো ব্যক্তিকে সরকার বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিতেন অথবা কোনো বিশেষ এলাকায়, গ্রামে বা তাহার নিজ বাস গৃহেই যে কোনো ব্যক্তিকে অন্তরীণ রাখিতে পারিতেন। সরকারের কার্য্যের সমালোচককেই রাজ কোপে পড়িতে হইত। বিভিন্ন বাধা নিষেধের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ ছিল এবং যে কোনো সমিতির কার্য্য বিদেশী শাসকের নিকট অপরাধজনক বিবেচিত হইলেই উহার কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। সভানুষ্ঠানের দ্বারা রাজনীতি চর্চ্চার অধিকার বহু উপায়ে নষ্ট করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রের উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ সমূহ ইউরোপীয়দিগের জন্য সংরক্ষিত থাকিত। ধর্ম্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য করা হইত এবং জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল অলীক কল্পনা। ভোটদানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া অগণিত জনসাধারণকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে সেই দুঃখময় অতীতের কথার বিশদ আলোচনা নিরর্থক। এখন আশা ও আনন্দের সহিত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার সময় আসিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩১ সালের করাচী অধিবেশনে ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার বিবৃত করিয়া একটি প্রস্তাব করেন। দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধী সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেই সময়ে তিনি বলেন যে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল ভারতের অগণিত জনসাধারণকে স্বরাজের মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করা। বহু ঝড় ঝঞ্ঝা ও বেদনার

মধ্য দিয়া সেই স্বরাজ আসিয়াছে এবং জাতির পথ প্রদর্শক বিদায় লইয়াছেন। তাই নিজ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব আজ জনগণের উপর অর্পিত।

ভারতের গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহাতে জনগণের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে এই বিধান সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যে জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় অথবা নারী-পুরুষের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা চলিবে না। .প্রত্যেকেরই বিবেকের স্বাধীনতা থাকিবে, প্রত্যেকেই যেকোনো ধর্ম্ম-বিশ্বাস পোষণ করিতে পারিবে এবং আচার ও রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে পারিবে। স্বাধীন মতামত প্রকাশ, সভানুষ্ঠান এবং সমিতি গঠনের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে--তবে এই অধিকার যেন এরূপভাবে ব্যবহৃত না হয় যাহাতে সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন হইবে। প্রত্যেক নাগরিকের দেশাভ্যন্তরে অবাধ যাতায়াত, বসবাস স্থাপন, ও সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে এবং প্রত্যেকের পছন্দমত পেশায় ও ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিবার অধিকারও স্বীকার করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলিতে কেহ (এমন কি সরকারও) হস্তক্ষেপ করিলে জনগণ তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য নবগঠিত সুপ্রীম কোর্টে বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে; অর্থাৎ এই অধিকারগুলি শালিসযোগ্য (justiciable)। উপরন্তু "নির্দ্দেশ-নামার" মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছে, যে জনগণের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণে যাহাতে সুবিচার পাইতে পারে, রাষ্ট্রকে এইরূপ একটি সর্ব্বজন-হিতকর সমাজ ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালন করিতে হইবে।

(অনু-১২) ভারত ও পাকিস্থানের নাগরিকদিগের কর্ত্তব্য—*Duties of the Citizens of India and Pakistan.*

নবলব্ধ স্বাধীনতা সংরক্ষণের এবং পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে, ভারত ও পাকিস্থান, উভয় রাষ্ট্রের নাগরিকদিগের কতিপয় বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। **প্রথমতঃ**, দেশে খাদ্যাভাব অতি তীব্ররূপে অনুভূত হয়—সেহেতু প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য যাহার যেটুকু জমি আছে তাহা—এমন কি বসতবাটী সংলগ্ন অল্প পরিসরের জমিও,—যথাসম্ভব খাদ্য উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করা। প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দেশে বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের জমি নাই, সংস্থান নাই কিন্তু বুভুক্ষু উদর আছে। **দ্বিতীয়তঃ** রাজনৈতিক মতবাদগুলিকে আপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রকে প্রভাবান্বিত করিতে না দিয়া,—অর্থাৎ বিভিন্ন মতবাদ লইয়া মাতামাতি না করিয়া, প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য আপনাপন কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করা, যাহাতে জীবন

ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। জমিতে ও কারখানায়, প্রত্যেকের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত "অধিকতর উৎপাদন।" অভাবের মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ অলীক কল্পনা মাত্র। তৃতীয়ত, সমাজ জীবনের মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত করিবার জন্য নাগরিকের আপ্রাণ প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। চতুর্থতঃ, দেশ যখন বিভক্ত হইয়াছে,তখন অতীতের ভুল ভ্রান্তির স্মৃতি বহন না করিয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আপনাপন রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য আন্তরিকতার সহিত প্রদর্শন করা এবং নিজ রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করিবার চেষ্টা করা।

পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন প্রদেশপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে প্রধান করণীয় হইল যে আমাদের জাতীয় সরকারের কার্য্যের ভার যাহাতে ন্যূনতম হয়, সেই উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে আমাদিগকে ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতরূপ মহান যৌথ কারবারের প্রত্যেকে একজন প্রকৃত অংশীদারে পরিণত হইয়াছেন এবং এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে প্রত্যেককেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান বহন করিতে হইবে।" তাঁহার এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং ইহা স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্থানের নাগরিকদিগের পক্ষে সমভাবেই প্রযোজ্য। †

Questions & Hints

1. What are the characteristics of a citizen? Distinguish a citizen from an alien (1930) [অনুচ্ছেদ ১ এবং অনু-২]

2. Distinguish between a natural citizen and a naturalised citizen, What do you understand by the phrase freedom of speech and freedom of the press? (1933) [অনুচ্ছেদ ৩ ও অনুচ্ছেদ ৬এর পৌর অধিকার—(৬) ও (৭)]

3. Define citizenship. What are the main obstacles to the exercise of good citizenship? (1947) [অনু-১ ও অনু-১০]

4. Describe the various methods of the acquisition of citizenship. 1938) [অনু-৩]

5. How is citizenship acquired? What are rights and duties of citizens? (1943) [অনু-৪ ৩, ৬, ও ৮ সংক্ষিপ্ত করিয়া]

† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৮ সালের সমাবর্ত্তন উৎসবে মহামান্য চ্যান্সেলর বাহাদুরের ভাষণ

✓6. Define Rights. "Rights and duties are correlative." Explain and illustrate. (1948) [অণু-৫ ও অণু-৭]

7. Describe the rights and duties of citizenship. What according to you are the hindrance to good citizenship? (1944)

[অণু-৬ ও ৮ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে ; অণু-১০ সংক্ষিপ্তভাবে]

8. Write a short essay on the rights and duties of citizenship (1937)

[অণু-৫, ৬, ৭, ও ৮—সংক্ষিপ্তভাবে]

9. What are the fundamantal duties of a citizen in a modern state? (1950) [অণু-৮ ; অণু ১২]

অষ্টম অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

Law and Liberty

(অণুচ্ছেদ ১) আইনের অর্থ—*Meaning of Law*

আইন হইল রাষ্ট্রের ইচ্ছার অভিব্যক্তি—যে ইচ্ছার দ্বারা সরকার এবং নাগরিকদিগের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রের সমষ্টিগত ক্ষমতাকে সরকার কোন্ ক্ষেত্রে এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োগ করিবে, নাগরিকগণ তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোন্ কার্য্যগুলি করিবে এবং কোন্ কার্য্যগুলি করিবে না—তাহা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। বিখ্যাত ইংরাজ আইনবিদ্ 'হলাণ্ড' সাহেব আইনের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন: "Law is a general rule of external human action enforced by a sovereign political authority"—অর্থাৎ "আইন হইল কোনো সার্ব্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা বলবৎকৃত ও মানুষের বাহ্যিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কিত সাধারণ নিয়ম।"

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে আইনের তিনটী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে: (১) আইন হইল **সাধারণ** নিয়ম—ইহা কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রণীত নহে। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনগণের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা ইহার উদ্দেশ্য। অভিন্ন অবস্থায়, সকলের পক্ষে সমানভাবেই এই নিয়মসমূহ প্রযোজ্য—ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ বলিয়া আইনের চক্ষে কোনো ভেদাভেদ নাই। (২) এই নিয়মগুলি মানুষের কেবলমাত্র **বাহিরের কার্য্যকলাপ** নিয়ন্ত্রণ করে—তাহার মনের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে না। (৩) এই নিয়মগুলির পিছনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিদ্যমান; এই ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র ইহাদিগকে **বলবৎ করে**—অর্থাৎ যাহারা এই নিয়মগুলিকে অমান্য করিবে, রাষ্ট্র তাহার ক্ষমতা প্রয়োগে তাহাদিগকে উহা মান্য করিতে বাধ্য করিবে।

(অনু-২) আইনের উৎস—*Sources of Law*

একাধিক বিষয় হইতে আইনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইগুলি হইল: (১) **প্রথা** (Customs)—জনসাধারণ তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কিত একাধিক নিয়ম বহুকাল হইতেই মান্য করিতে অভ্যস্ত থাকে। এইগুলিকে বলা হয় প্রথা—অর্থাৎ প্রচলিত বা চিরাচরিত কার্য্যপদ্ধতি। এইগুলি তাঁহাদিগকে মান্য করিতে কেহই নির্দ্দেশ প্রদান করে নাই; জনগণ নিজেরাই ঐগুলি মান্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে,—এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যে ঐগুলি মান্য করা তাহাদের সামাজিক জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এইরূপ একাধিক প্রথাগত নিয়ম রাষ্ট্র ক্রমশঃ বলবৎ করিতে সুরু করে এবং তখন ইহা নিছক প্রথা হইতে আইনে রূপায়িত হয়। এইদিক হইতে বিচার করিয়া 'উড্র উইলসন' আইনের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে আইন হইল "সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা এবং অভ্যাসের অংশ" ("portion of the established thought and habit")। (২) **ধর্ম্ম**—(Religion)—প্রত্যেক ধর্ম্ম তাহার অনুসরণকারীদিগকে কোনো কোনো কাজ করিতে নিষেধ করে এবং কোনো কোনো কাজ করিতে নির্দ্দেশ দেয়। কালক্রমে লোকে ধর্ম্মের এই অনুশাসন এরূপভাবে মান্য করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয় যে উহার কোনো ব্যতিক্রম হইলেই যেন আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইল বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্র ক্রমশঃ এইগুলি স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য করে। আমাদের হিন্দু আইন ও মুসলমান আইনের বহু বিষয় ধর্ম্মীয় অনুশাসন হইতে উদ্ভুত। (৩ **আইন বিজ্ঞানীদিগের আলোচনা** (Scientific discussion)—বিভিন্ন দেশে আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ বা চিন্তানায়কগণ সমাজের হিতার্থে, ন্যায় ও সত্যের খাতিরে, কোন্ কোন্ বিষয়গুলি আইন হিসাবে মানিয়া চলা উচিত এসম্বন্ধে প্রবন্ধের মারফৎ সারগর্ভ আলোচনা করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধাবান ও আস্থাবান হওয়ায় তাঁহাদের মতামতগুলি তাহারা মান্য করিতে প্রণোদিত হয় এবং রাষ্ট্রও ইহাদের অনুমোদিত বহু ব্যবস্থা বলবৎ করে। আমাদের দেশে মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি চিন্তানায়কদের বহু নির্দ্দেশ হিন্দু আইনে গ্রথিত আছে। (৪) **বিচারকের সিদ্ধান্ত** (Judicial decisions)—বহুক্ষেত্রেই এরূপ ঘটে যে কোনো একটী মামলার বিচারকালে বিচারক দেখেন যে ঐ মামলায় প্রয়োগ-সাপেক্ষ আইনের মধ্যে অস্পষ্টতা রহিয়াছে—হয় উহার অর্থ পরিষ্কার নহে অথবা উহার একাধিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারক আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সেই অনুযায়ী মামলার নিষ্পত্তি করেন। পরে যখন অনুরূপ মামলা অন্যান্য আদালতে উপস্থিত হয়

তখন তথাকার বিচারকগণ পূর্ব্বেকার বিচারকের রায় অনুযায়ী তাঁহাদের মামলার বিচার করেন; এইরূপে বিচারকের অভিমত আইনে পরিণত হয়। (৫) **আইনসভা** (Legislature)—আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের প্রতিনিধিগণ আইন সভায় মিলিত হইয়া আলাপ আলোচনার দ্বারা নানারূপ বিধিব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইগুলি হইল সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারা এইগুলি বলবৎ থাকে। ইহাদিগকে বলা হয় পরিষদ বিধি (Statute Law); আধুনিক রাষ্ট্রে পরিষদ বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

(অনু-৩) আইন ও নীতি—*Law and Morality*

রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ শুধু আইন—অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বারা বলবৎকৃত নিয়ম, মানিয়া চলে তাহাই নহে, সমাজবদ্ধ মানুষ হিসাবে তাহারা বিবিধ নৈতিক নিয়মও মানিয়া চলে। আইন ও নীতির তুলনামূলক আলোচনা করিলে, আইনের বৈশিষ্ট্য অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

আইন ও নীতির মধ্যে সাদৃশ্য—(১) আইন ও নীতির উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন,—সমাজবদ্ধ মানুষের ক্রিয়াকলাপ সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করা। নৈতিক নিয়মগুলি যেমন, সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে কোন কার্য্য উচিত এবং কোন্ কার্য্য অনুচিত, তাহার বিধান দেয়,—আইনও সেইরূপ নির্দ্দেশ দেয় নাগরিকগণ কোন্ কার্য্য করিবে এবং কি ভাবে,—অথবা কোন্ কার্য্য তাহারা পরিহার করিবে। (২) রাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্ব্বেও মনুষ্যসমাজ ছিল। সেই সময়ে মানুষ কোনো না কোনো নিয়ম মান্য করিত, নচেৎ কেনোরূপ সঙ্ঘবদ্ধ জীবন সম্ভব হইত না। সেই নিয়মগুলি তখন কেবলমাত্র নীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল—হয় 'প্রথার' আকারে অথবা ধর্ম্মের অনুশাসনের আকারে। রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর, এই নৈতিক নিয়মগুলির মধ্য হইতে অনেকগুলিকে রাষ্ট্র তাহার কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করিল এবং উহার দ্বারা ঐ নৈতিক নিয়মসমূহ রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হইল। এইভাবে বহু আইন নীতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

অতএব আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে (১) উদ্দেশ্যের দিক হইতে এবং (২) উদ্ভবের দিক হইতে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ইহাদের মধ্যে একাধিক বৈসাদৃশ্যও বর্ত্তমান।

আইন ও নীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য—(১) আইনের পিছনে থাকিয়া জনগণকে আইন মান্য করিতে যাহা বাধ্য করে উহা হইল রাষ্ট্রীয় শক্তি কিন্তু নীতির পিছনে

থাকে কেবলমাত্র জনমতের শক্তি। আইন ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্রের নিকট হইতে শাস্তি পাইতে হইবে কিন্তু নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে, নিছক লোক নিন্দা ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। (২) অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম অস্পষ্ট এবং সেই তুলনায় আইন হইল স্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বলিতে বুঝাইতেছে মতদ্বৈধের অবকাশ। অবশ্য এরূপ নৈতিক নিয়ম আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কোনো মতদ্বৈধ বা অস্পষ্টতা নাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিতে পারে যে কোনো একটী কার্য্য জনগণের মধ্যে কাহারো নিকট নীতিবিগর্হিত বলিয়া মনে হয় আবার কাহারো নিকট নীতি সম্মত বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম কি তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নহে। কিন্তু আইন সম্পর্কে এইরূপ অস্পষ্টতার অবকাশ নাই—কারণ যে নিয়মই রাষ্ট্র তাহার শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বলবৎ রাখে, তাহাই আইন এবং যে নিয়মের পিছনে এরূপ রাষ্ট্রীয় শক্তির সমর্থন নাই তাহা আইন নহে। (৩) নীতি ব্যাপক এবং সে তুলনায় আইনের পরিধি সঙ্কীর্ণ। নীতি মানুষের জীবনেব সকল কার্য্যের সহিত সম্পর্কিত। তাহার কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, ভাবভঙ্গীতে,—বাহিরের ক্রিয়াকলাপে এবং আভ্যন্তরীণ চিন্তায়, সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়েই মানুষ নৈতিক নিয়মের পরিধির মধ্যে রহিয়াছে—কারণ মানুষের মূল বৈশিষ্ট্যই হইল তাহার নৈতিক জীবন। কিন্তু মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; আইন মানুষের মনের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে না আবার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সবগুলিও নিয়ন্ত্রণ করে না। আইন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সেই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপগুলি, যে গুলি কোনো সাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হওয়া সম্ভব। (৪) অনেক কার্য্য থাকিতে পারে যাহা নীতি-বিরোধী নহে—বরং নীতিসম্মতও হইতে পারে, কিন্তু আইন বিরোধী। যথা বুভুক্ষু ব্যক্তি খাদ্যান্বেষণে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলে অনধিকার প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত হইতে পারে। (৫) অনেক কার্য্য আছে যাহা অতিশয় নীতি বিগর্হিত, কিন্তু আইন বিগর্হিত নহে। যথা সন্তান উপযুক্ত হইবার পর বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য পিতামাতাকে ভরণপোষণ করিতে অস্বীকার করিলে, আইন তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করিবে না।

(অনু ৪) স্বাধীনতা কাহাকে বলে—*What Liberty means*

স্বাধীনতার শব্দ-গত অর্থ হইল স্ব-অধীনতা,—অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি অপর কাহারো অধীন নহে, সে তাহার নিজেরই ইচ্ছাধীন। ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য, তাহার জীবনের প্রতি কার্য্যে বাধানিষেধের অপসারণ প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি যদি তাহার জীবনের প্রতি কার্য্যে বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে যে

মুক্ত পরিবেশের মধ্যে নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধান সম্ভব, সেই পরিবেশ প্রাপ্তি তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। যে সমাজে এই মুক্ত আবহাওয়ার অভাবে জনগণের জীবনে উন্নতি ব্যাহত হয়, সেই সমাজ দুষিত, অনগ্রসর সমাজ হিসাবে থাকিয়া যায়। অতএব ব্যক্তির বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণের জন্য ব্যক্তির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণের অপসারণ প্রয়োজন ; এই দিক দিয়া বিচার করিলে, স্বাধীনতা হইল নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি,—এইরূপ প্রতিভাত হয়।

কিন্তু জনগণের উপর হইতে যদি সর্ব্ববিধ নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে সমাজের যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহা হইবে অসহনীয়। যাহারা প্রবল ও চতুর তাহারা দুর্ব্বল ও নিরীহ জনসাধারণের উপরে আধিপত্য করিবে এবং শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। সেক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার জন্য নিয়ন্ত্রণের অপসারণ প্রয়োজন মনে হয়, জনগণের সেই স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং, ব্যক্তির বিকাশের জন্য এবং সমাজ কল্যাণের জন্য যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন সেই পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণের অপসারণ সম্ভব।

স্বাধীনতার আরও একটী দিক আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, তাহার জীবনে যতটা উন্নতি সাধন সম্ভব, ততটা উন্নতি সাধনের যথাযথ সুযোগ না পাইলে, তাহার পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং জনগণের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে যে রাষ্ট্র ব্যক্তির উন্নতি বিধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাসমূহ —যথা শিক্ষা বিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি—প্রদান করিবে।

অতএব স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় (১) ব্যক্তির উন্নতি এবং সমাজ কল্যাণের জন্য যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন সেই পর্য্যন্ত ব্যক্তির জীবন হইতে নিয়ন্ত্রণের অপসারণ এবং (২) যে সুযোগ সুবিধাগুলি না থাকিলে ব্যক্তির জীবনে উন্নতি সাধন সম্ভব নহে, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সেই সুযোগ সুবিধাগুলি প্রদান ও রক্ষা।

(অনু-৫) স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ—*Different forms of Liberty*

ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। সেই ভিত্তিতে স্বাধীনতাকে নিম্নরূপ পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায় :—

(১) পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty)—পৌর স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নাগরিকদের পক্ষে জীবন ধারণ, সম্পত্তি ভোগ, বক্তব্য প্রকাশ—ইত্যাদি পৌর অধিকার সমূহ ভোগের পূর্ণ সুযোগ—অর্থাৎ যে অধিকারগুলি দৈনন্দিন জীবনে ভোগের দ্বারা

নাগরিকগণ তাহাদের সৎ বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের সুযোগ পায়। পৌর-স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, ব্যক্তির গোটাকয়েক অধিকারের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই সীমাবদ্ধতা দুই প্রকারে হইতে পারে; প্রথমতঃ, আইন তন্ত্রের (Rule of Law) দ্বারা,—অর্থাৎ আইনের চক্ষে সকলেই সমান, সে সাধারণ ব্যক্তিই হউক বা সরকারী কর্ম্মচারীই হউক; উচ্চ-নীচ সকলের পক্ষে সমানভাবেই আইন প্রযুক্ত হইবে। এক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারী কোনো ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত আধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে পৌর স্বাধীনতাসূচক অধিকার সমূহ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে এবং সরকার যাহাতে এই অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিধান থাকে।

(২) **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** (Political Liberty)—রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল যে জনসাধারণের হস্তেই রাষ্ট্রের শাসন কার্য্যনির্ব্বাহের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত। জনগণের পক্ষ হইতে কাহারা শাসন কার্য্য পরিচালিত করিবে—তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা যদি প্রত্যেক নাগরিকের থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। মোটকথা জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল লোকায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বা গণতন্ত্র।

(৩) **অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা** (Economic Liberty)—অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিবার মতন প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ পাইবে। বিনা দোষে কেহ বেকার থাকিলে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহার ও তাহার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইবে। উপরন্তু জীবিকা অর্জ্জনের জন্য একজন ব্যক্তিকে যে পরিশ্রম করিতে হইবে উহা এত অধিক হইতে পারিবে না যাহাতে তাহার জীবনে উন্নতি করিবার মতন সময় ও উৎসাহের অভাব ঘটে।

(৪) **জাতীয় স্বাধীনতা** (National Liberty)—জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় অপর কোনো জাতির নিয়ন্ত্রণ হইতে একটী জাতির মুক্তি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়া ভারতবাসী জাতীয় স্বাধীনতা পাইয়াছে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ হইল সার্ব্বভৌমত্ব।

(৫) **স্বাভাবিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty)—আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে যে স্বাধীনতা ভোগ করিত, উহাকে কোনো কোনো রাজনীতিবিদ স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিছক

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কোনোরূপ স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ কোনো সাধারণ শাসন কর্তৃপক্ষ বা আইন না থাকায় প্রত্যেকেই তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইত। সেই জন্য স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে অলীক কল্পনা বলা চলে।

(অণু-৬) আইন ও স্বাধীনতা—*Law and Liberty*

রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় আইনের মাধ্যমে। শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রণীত আইনের দ্বারা রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সার্ব্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ বলিতে বুঝায়, জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা আরোপ করা—আইনের মারফৎ রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। আইন জনগণের ব্যক্তিগত বা স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নাগরিকগণ তাহদের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী চলিতে পারে না, —আইনের দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সীমাবদ্ধ। অতএব আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে আইন হইল জনগণের স্বাধীনতার শত্রু; আইনের পিছনে যে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অস্তিত্ব রহিয়াছে উহার দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইন বা শাসন কর্ত্তৃপক্ষ যে স্বাধীনতার শত্রু—এই ধারণা ভ্রান্ত। স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়—সে সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে হয়। স্বাধীনতা বলিতে যদি ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা বুঝাইত তাহা হইলে অবশ্য আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলা যাইত, কারণ আইন ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করে। স্বাধীনতা বলিতে যদি সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বুঝাইত তাহা হইলে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত আইন স্বাধীনতা খর্ব্ব করে বলা চলিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা বুঝায় না,—সকল নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি ইহার তাৎপর্য্য নহে।

ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের উপর যদি কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে প্রবল এবং চতুরগণ দুর্ব্বল ও নিরীহদিগের উপরে অত্যাচারের সুযোগ পাইবে। এক্ষেত্রে অগণিত নিরীহ জনসাধারণ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে, তাহাদের জীবনের উন্নতি সাধনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। স্বাধীনতা থাকিবে কেবলমাত্র জনকয়েক শক্তিশালী চতুর ব্যক্তির জন্য। কিন্তু যে স্বাধীনতা জনকয়েক ব্যক্তিমাত্র ভোগ করিবার সুযোগ পায় তাহা স্বাধীনতার বিকৃতরূপ; প্রকৃত স্বাধীনতা হইল সেই স্বাধীনতা যাহা সকলেই সমানভাবে ভোগ করিবার সুযোগ পায়। সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত স্বাধীনতাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা।

কিন্তু স্বাধীনতা আপনা হইতেই সকলের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক সমাজেই চতুর ও দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে, যাহারা অপরের পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রী বলপূর্ব্বক ভোগ করিতে চাহিবে, অপরের উপর অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য চেষ্টিত হইবে। সকলের মধ্যে সমান ভাবে স্বাধীনতা বণ্টনের জন্য এই সকল ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক 'লীককের' ভাষায়, "সকলের পক্ষে সমভাবে ভোগ্য স্বাধীনতার প্রকৃতি এইরূপ যে ইহার দ্বারা প্রত্যেকের কার্য্যের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়ন্ত্রণ থাকিবে,—ইহাই বুঝায়। এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা এবং উহার দ্বারা স্বাধীনতা আনয়ন করা রাষ্ট্রের কার্য্য।" আইন প্রণয়ন করিয়া এবং বলবৎ করিয়া রাষ্ট্র এই কার্য্য সম্পন্ন করে। অতএব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের দ্বারাই স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্ভব হয় কারণ এইরূপ শাসন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত এবং সমর্থিত আইনই প্রকৃত স্বাধীনতাকে বাস্তবরূপ দান করে।

উপরন্তু শুধুমাত্র শান্তিরক্ষা করিলেই স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না। স্বাধীনতার আরও একটী দিক রহিয়াছে। স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় যে, যে সুযোগ সুবিধাগুলি না থাকিলে ব্যক্তির জীবনে উন্নতি সাধন সম্ভব নহে, রাষ্ট্র এই সুযোগ সুবিধাসমূহ প্রদান করিবে। রাষ্ট্র বিবিধ আইন প্রণয়ন করিয়া নাগরিকদিগের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে—যথা শিক্ষা বিস্তার করিয়া, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করিয়া এবং অনুরূপ নানা উপায়ে। এই আইনসমূহ জনগণের উন্নতির পক্ষে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা বর্দ্ধিত করে। অতএব শাসন কর্তৃপক্ষ এবং তাঁহার প্রণীত আইন শুধুই যে স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তাহাই নহে, উহা স্বাধীনতাকে বর্দ্ধিতও করে।

(অনু-৭) স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—*Safeguards of Liberty*

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদিগের স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। এইগুলিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া অভিহিত করা চলে—অর্থাৎ এই অবস্থাগুলির দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা হয়।

(১) **আইন-তন্ত্র** (Rule of Law)—আইনের আধিপত্য বা আইনতন্ত্র হইল ব্যক্তি স্বাধীনতার একটী প্রকৃষ্ট সহায়ক। আইনতন্ত্র বলিতে বুঝায় যে আইনের চক্ষে সকলেই সমান, ব্যক্তি অনুযায়ী আইনের প্রয়োগে তারতম্য ঘটে না; উচ্চ নীচ

বলিয়া আইনের নিকট কোনোই পার্থক্য নাই। অতএব কোনো ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করিলে, অন্যের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে, সে যতই অর্থবান বা প্রভাবশালী ব্যক্তিই হউক না কেন, তাহাকে আইনের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কোনো ব্যক্তি তাহার সরকারী পদ-মর্য্যাদার দরুণ অথবা সামাজিক প্রতিপত্তি বা প্রভাবের দরুণ যদি অপরের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া, অপর সাধারণ লোকে অনুরূপ কার্য্য করিলে যে শাস্তি পাইত, তাহা হইতে কম শাস্তি পায়, তাহা হইলে সাধারণের পক্ষে তাহাদের স্বাধীনতা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

(২) **বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা** (Independence of the Judiciary)—জনগণের স্বাধীনতার জন্য নিষ্কলুষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। বিচারক যদি শাসকের আদেশ বা নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা হইলে বিচার কার্য্য প্রহসনেই পরিণত হয়, কারণ সেক্ষেত্রে শাসক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। জনগণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায় বিচার অবশ্য প্রয়োজন এবং ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজন হইল যে, বিচারকের উপর রাজা বা মন্ত্রী কোনরূপ আদেশ বা নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন না বা কোনো বিচারকের বিচার তাঁহাদের মনঃপূত না হইলে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। ইহাকেই বলা হয়, বিচার ব্যবস্থার স্বাধানতা।

(৩) **শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights)—রাষ্ট্রের গঠন নির্দ্ধারণ করিয়া যে বিধানসমূহ থাকে সেইগুলিকে সমবেতভাবে বলা হয় শাসনতন্ত্র। কোনো কোনো রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র নির্দ্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকারসমূহ (যে অধিকার ভোগ করিলে একজন ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে) এই শাসনতন্ত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হয়; কেহ যেন অপরের এই অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ না করে শাসনতন্ত্রে সেইরূপ আদেশ প্রদান করে। এই অধিকারগুলিকে নালিস-যোগ্য (justiciable) করা হয়, অর্থাৎ কেহ অপরের এইরূপ কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা যাইবে—যে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিল সে সাধারণ ব্যক্তিই হউক অথবা স্বয়ং সরকারই হউন।

(৪) **ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান** (Separation of Power)—কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রদান করেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য,—আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, দৈনন্দিন শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ও বিচার করিবার ক্ষমতা,—শাসন প্রতিষ্ঠানের এই তিন প্রকার ক্ষমতাকে স্বতন্ত্র করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ কোনো

একজন ব্যক্তি বা একটী পরিষদ যেন এই তিন প্রকার ক্ষমতার মধ্যে একটীর অধিক ব্যবহার করিতে না পারে। একই ব্যক্তি বা একই পরিষদের হস্তে একাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে—তাহার পক্ষে জনগণের উপর অত্যাচার করা সহজ হয়। আধুনিক একাধিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বিধান কিছু পরিমাণে করা হইয়াছে যদিও সম্পূর্ণ নহে।

(৫) **জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা** (Spirit of Liberty)—জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সহায়ক হইল তাহাদের স্বাধীনতার স্পৃহা। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনগণের একান্ত আগ্রহ না থাকিলে কোনো আইনের বিধান বা শাসনতান্ত্রিক কৌশল সরকারের প্রবল ক্ষমতার হাত হইতে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। জনসাধারণকে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিয়তই সতর্ক থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনের আমলে গণতান্ত্রিক স্বৈর শাসন প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ না করিয়া ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বাধীনতা বিহীন ভারতবাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনো নির্দ্দিষ্ট রক্ষা কবচের অস্তিত্ব ছিল না বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ছিল না। কারণ বহু ক্ষেত্রে শাসক ও বিচারক ছিলেন একই ব্যক্তি। বড়লাট এবং গভর্ণরগণের প্রভূত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল এবং ১৮১৮ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করা যাইত। কিন্তু এই সকলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের সংস্পর্শের জন্য, আইন তন্ত্র, হেবিয়াস কর্পাস প্রভৃতির ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমশঃ স্বাধীনতার স্পৃহা জাগরূক হয়, কিন্তু তবুও অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচের যথেষ্ট অভাব ছিল—দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরেও সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যে সকল আইনের দ্বারা ভারতের অধিবাসীদিগের উপর অশেষ নিপীড়ন বর্ষণ করা হইয়াছিল,—যাঁহারা নিপীড়ন পাইয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার সেই আইনসমূহই (যথা ১৮১৮ সালের রেগুলেশান) ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে সেই নূতন শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহ নির্দ্দিষ্ট ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে এবং এইগুলিকে নালিসযোগ্য অধিকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। উপরন্তু শাসন তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত

নির্দ্দেশনামার মধ্যে জনগণের স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে সরকারকে গোটাকয়েক কার্য্য সম্পন্ন করিবার (যথা শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করা) নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Questions & Hints

1. Define Law. (1931) What are the sources of law ?
[অনুচ্ছেদ-১ এবং ২]

2. What do you mean by Civil and Political liberty and law ? (1928)
[৫নং অনুচ্ছেদের (১) ও (২) এবং অনু-১]

3. "Besides laws, there are many other rules enjoined upon us by society and its institutions," What are the rules referred to ? Discuss the relation between them and 'law', [অনু-৩]

4. Explain the term liberty (1926) "The true test of liberty lies in the extent to which the law of the land helps the citizen to develop all that is good in him." Discuss. Examine the relation between law and liberty (1939) [অনু-৪ ; অনু-৬]

5. Is liberty consistent with authority ? (1926) 'The recognition of political authority is the indispensable condition of liberty"—Explain fully (1929) [অনু ৬]

6. What are the safeguards of liberty in a modern democratic state ? To what extent, if at all, do they exist in India ? (1944) [অনু-৭]

7. "Civil liberty is not absence of restraint but an opportunity for self realisation." Explain [অনু-১ সংক্ষেপে ও অনু-৬]

8. Explain the term liberty and distinguish between civil liberty and political liberty. (1950) [অনু-৪ ; অনু-৫ এর (১) ও (২)]

নবম অধ্যায়

সাম্য

Equality

(অণুচ্ছেদ-১) সাম্যের তাৎপর্য্য—*Significance of Equality*

মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফূরণের জন্য—জনগণের নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য স্বাধীনতা ব্যতীত আরও একটী বিষয়ের প্রয়োজন হয়—উহা হইল সাম্য। স্বাধীনতা এবং সাম্য এই দুইটী হইল গণতন্ত্রের অবলম্বন স্তম্ভ। সাম্য শব্দটীর কোনো একটী সংজ্ঞা প্রদান করা চলে না। ইহার মধ্যে একাধিক ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যে যে ভাবের সংমিশ্রনে 'সাম্য' ভাবটী গঠিত, উহাদের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের দ্বারাই সাম্য বলিতে কি বুঝায় তাহা প্রণিধান করা সম্ভব হইবে।

সাধারণ লোকের মধ্যে একটী ধারণা আছে যে সাম্য বলিতে বুঝায় সমাজের সকল ব্যক্তিই সমান এবং সকলেই সকল বিষয়ে সমান ব্যবহার পাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সঠিক নহে। বুদ্ধি, বিদ্যা, চিন্তাশীলতা, কর্ম্মক্ষমতা—প্রভৃতি দিক হইতে একই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অসমতা বিদ্যমান। একই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা, ক্ষমতা ও কর্ম্মকুশলতার দিক হইতে অসমতা থাকিলে এইরূপ বলা চলে না যে প্রত্যেকেই অপরের সমান এবং সেহেতু প্রত্যেকেই সমাজের নিকট হইতে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সমান ব্যবহার পাইবে। অধিক বুদ্ধিমান ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণ চিরকালই সমাজের নিকট হইতে অধিক সম্মান ও সুবিধা লাভ করিবে।

সাম্যের তাৎপর্য্য হইল **প্রথমতঃ** রাষ্ট্রীয় জীবনে নাগরিক রূপে কেহই কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। নিছক নাগরিকরূপে একজন ব্যক্তি যে অধিকার ভোগ করিবে—সে অধিকার অপর সকলেই ভোগ করিতে পারিবে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা নির্দ্দিষ্ট করা থাকিবে না। জাতি, ধর্ম্ম, অর্থ, পদমর্য্যাদা ইত্যাদি কোনোরূপ বিবেচনা না করিয়া সকলেই নাগরিক

হিসাবে রাজনৈতিক ও পৌরঅধিকারগুলি ভোগ করিবে। বস্তুতঃপক্ষে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কতিপয় ব্যক্তির বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগের প্রতিবাদেই সাম্যের দাবী উত্থাপিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ** সকল নাগরিক যাহাতে তাহাদের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়, তাহার যথোপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাষ্ট্র তাহার কার্য্যের দ্বারা দেশের মধ্যে এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে যাহাতে প্রত্যেকেই তাহার জীবনে যে পরিমাণে উন্নতি বিধান সম্ভব, সেই পরিমাণে উন্নতি বিধান করিতে পারে। সকলেই হয়তো এই সুযোগ কাজে লাগাইবে না কিন্তু কেহ যেন এই অনুযোগ করিতে না পারে যে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। যথা একজন ব্যক্তি ধনীর সন্তান বলিয়া শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারিল এবং শিক্ষিত হইয়া সে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে আধিপত্য করিতে লাগিল—অপর একজন ব্যক্তি অর্থাভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারিল না এবং রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে কোনোই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিল না। যদি অশিক্ষিত ব্যক্তিকে বলা হয় যে উহা তাহার নিজস্ব দোষ তাহা হইলে সে উত্তর দিতে পারে যে ভাগ্যবিড়ম্বনায় কেবলমাত্র সমান সুযোগের অভাবেই তাহার সহিত শিক্ষিত ব্যক্তির অসমতা রহিয়া গেল। অশিক্ষিতের এই অভিযোগের যথাযথ উত্তর দিবার জন্য রাষ্ট্রকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সকল ব্যক্তির নিকট শিক্ষার সমান সুযোগ উপস্থিত থাকে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। সাম্যকে বাস্তবক্ষেত্রে উপলব্ধির জন্য সকলেই আত্মোন্নতির সমান সুযোগ পায় এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। **তৃতীয়তঃ** একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতায়, আর্থিক অবস্থায় বা পদমর্য্যাদায় সেই পার্থক্যগুলি থাকিতে পারে যাহার দ্বারা সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় এবং উহার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়। কেহ যদি অধিক ক্ষমতা বা অধিক বেতন ভোগ করে তাহা হইলে ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে যে উহার দ্বারা সমগ্র সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয়। যথা, একজন সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা জনসাধারণের দ্বারাই নির্ব্বাচিত মন্ত্রীর ক্ষমতা অধিক হইবে (ইহা রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্যই প্রয়োজনীয়) বা বিচারপতিদের বেতন অন্যান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে! ন্যায়-বিচারের জন্যই (বিচারকগণ যাহাতে উৎকোচে প্রলোভিত না হন) ইহা প্রয়োজন।

(অনু-২) স্বাধীনতা ও সাম্য—*Liberty and Equality*

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আত্মোন্নতি করিবার সুযোগের দাবীর উপরে স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা ভোগ না করিলে কাহারও পক্ষে

তাহার জীবনে উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় না। এই কারণে সভ্য মানুষ স্বাধীনতা সম্পর্কে এত সচেতন। কিন্তু যাহাতে এইরূপ উন্নতি সাধনের সুযোগ সমাজের জন-কয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, যাহাতে ঐ সুযোগ সমাজের সকলেই প্রাপ্ত হয় তাহার জন্যই প্রয়োজন যে সমাজের মধ্যে নিছক নাগরিকরূপে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এরূপ কেহ থাকিবে না, যদি কেহ বিশেষ সুবিধা ভোগ করে উহা সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্যই, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে এবং রাষ্ট্র সকলের আত্মোন্নতির সমান সুযোগের পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। অতএব স্বাধীনতার পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য সাম্যের অস্তিত্ব প্রয়োজন। "সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী নহে, উহা স্বাধীনতার পরিপোষক।"†

Questions and Hints

1. "Equality is not opposed to liberty but complementary to it"—Discuss. [অনু-২ ও ১]

2. Explain the meaning of Equality. [অনু-১]

† "Equality is not opposed to liberty but complementary to it"—LAHIRI AND BANERJEE, Introduction to Civics.

দশম অধ্যায়

শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ

Forms of Government

(অণুচ্ছেদ-১) শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার আইনসম্মত ক্ষমতা যাহার আছে এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী শাসন প্রতিষ্ঠানকে চারিটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায় (১) রাজতন্ত্র (২) অভিজাততন্ত্র (৩) গণতন্ত্র ও (৪) একনায়কতন্ত্র। এইগুলিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

(অণু-২) **রাজতন্ত্র**—*Monarchy*

রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার দায়িত্ব যখন একজন ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় রাজা এবং এইরূপ শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমিকভাবে সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটে— রাজার পুত্র রাজা হন।

রাজতন্ত্রের মধ্যে রাজা যদি জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকেন তাহা হইলে উহাকে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited monarchy) বলা হয় অর্থাৎ রাজার ক্ষমতা জনসাধারণের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে রাজা যখন অপর কাহারও মতানুযায়ী রাজ্যশাসন করিতে বাধ্য না থাকেন, নিজ ইচ্ছা প্রয়োগের দ্বারা রাজ্যশাসনের অবাধ ক্ষমতা রাখেন, তখন উহাকে বলা হয় অনিয়ন্ত্রিত বা স্বৈর রাজতন্ত্র (Unlimited or Absolute monarchy)। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রকৃত রাজতন্ত্র নহে, ইহা ছদ্মবেশী গণতন্ত্র; কারণ ইহাতে প্রজার ইচ্ছার দ্বারা রাজা পরিচালিত হন, রাজার ইচ্ছায় প্রজা নিয়ন্ত্রিত হয় না। রাজার অস্তিত্ব থাকে জাতীয় ঐক্য এবং ঐতিহ্য বজায় রাখিবার জন্য, শাসন পরিচালনার জন্য নহে। গ্রেট ব্রিটেনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। স্বৈর রাজতন্ত্রই হইল প্রকৃত রাজতন্ত্র কারণ ইহাতে রাজার

হস্তেই আইনতঃ এবং কার্য্যতঃ রাষ্ট্র শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে—তিনি স্বয়ং আইন প্রণয়ন করিবার, উহাকে কার্য্যকরী করিবার এবং বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। এইরূপ ব্যবস্থাতেই ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন, "রাষ্ট্র তো আমি স্বয়ং!"

রাজতন্ত্রের গুণ—রাজার ক্ষমতা অপ্রতিহত হওয়ায়, রাজার সুকার্য্যগুলিকে কেহই বাধা দান করিতে পারে না; সুতরাং রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্য্যাবলী অনতিবিলম্বেই তিনি সুসম্পন্ন করিতে পারেন। জনগণের পক্ষে অহিতকর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া এবং হিতকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া প্রজার দুঃখ মোচনে রাজা অক্লেশেই অগ্রণী হইতে পারেন—তাঁহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এইভাবে একাধিক দেশের একাধিক নৃপতি জনগণের হিতকারী বহুবিধ কার্য্যের দ্বারা ইতিহাসে অক্ষয় ও অমর স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং মানুষ সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁহাদের নাম আজিও স্মরণ করে।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ **হবস্** রাজতন্ত্রের গুণ বর্ণনায় বলিয়াছেন যে ইহাতে রাজা, প্রজার স্বার্থের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থের অভিন্নতা অনুভব করেন—কোনো পরিষদের দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা থাকিলে শাসকবৃন্দ তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত প্রজার স্বার্থের এইরূপ সমতা বোধ করিতেন না। কোনো পরিষদ অপেক্ষা রাজাই সকলের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে এবং উহা গোপন রাখিতে, অধিকতর সক্ষম। উপরন্তু **হবস্** বলেন যে রাজার কার্য্য অপেক্ষা কোনো পরিষদের কার্য্যের মধ্যে অধিক পরিমাণ অস্থিরচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ পরিষদের একাধিক সদস্যের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিতে পারে।

রাজতন্ত্রের অপগুণ—(১) সকল ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন হয় না, সকল নৃপতিও সেইরূপ সদ্‌গুণবিশিষ্ট হন না। রাজা সদ্‌ব্যক্তি হইলে যেরূপ বিভিন্ন মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন সেইরূপ গুণহীন ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতার বলে তিনি জনগণের উপর অশেষ অত্যাচার অনুষ্ঠান করিতেও পারেন। ইতিহাসে এইরূপ কুখ্যাত নরপতির একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (২) যেখানে দেশ শাসনের দায়িত্ব একজন মাত্র ব্যক্তির হস্তেই কেন্দ্রীভূত এবং শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষেত্রে জনগণের কিছুই বলিবার বা করিবার নাই, সেখানে জনগণ দেশের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিবার সুযোগ পায় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল যে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকে।

রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব জনগণের একটী গুরুতর অক্ষমতা এবং সমগ্র রাষ্ট্রের প্রকৃত হিতের পরিপন্থী।

(অনু-৩) অভিজাততন্ত্র—*Aristocracy*

গ্রীক্ ভাষায় Aristos-শব্দটীর অর্থ হইল "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে "এ্যারিস্টোক্রাসী" বলিতে বুঝাইত দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু একটী দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বহু হইতে পারে না; তজ্জন্য অভিজাততন্ত্র বলিতে কতিপয় ব্যক্তির শাসন বুঝাইত। কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা মাত্রই অভিজাততন্ত্র নামে অভিহিত হইতে থাকে। অভিজাততন্ত্রে গুণের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হইয়া থাকে এবং এইরূপে অল্প কয়েকজন ব্যক্তির উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা থাকে।

অভিজাততন্ত্রের গুণ—(১) অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের কোনো বিষয়েই দ্রুত পরিবর্ত্তন সমর্থন করে না; ইহা রক্ষণশীল নীতির অনুসরণ করে এবং সেহেতু সাময়িক উত্তেজনার বশে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব হয় না। অভিজাততন্ত্র যে সংস্কারবিমুখ তাহা নহে, ইহা সংস্কার সাধনও করিয়া থাকে তবে এই সকল সংস্কার করা হয় প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত যথাযথ সঙ্গতি বজায় রাখিয়া। অভিজাততন্ত্রের এই রক্ষণশীলতার দ্বারা প্রগতিও সম্ভব হয় অথচ সমাজ জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ফলাফল বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তবেই সংস্কার সাধন করা হইয়া থাকে; (২) 'জন ষ্টুয়ার্ট মিল' অভিজাততান্ত্রিক শাসকবৃন্দের এই বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন যে ইতিহাসে যে সকল শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ মানসিক ক্ষমতা এবং তেজস্বিতা বজায় রাখিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি সাধারণতঃ অভিজাততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। (৩) অভিজাততন্ত্র নিজের স্বার্থের জন্যই কঠোর হস্তে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং আইনের সংরক্ষণ করে। "বিশেষ-ভাবে অভিজাততান্ত্রিক একটী জাতির অর্থাৎ রোমকদিগের দ্বারাই যে আইনবিজ্ঞানের সর্ব্বাধিক বিকাশ সাধিত হইয়াছিল—ইহা কোনো দৈব ঘটনা নহে।" (ব্লাণ্টশলি)

অভিজাততন্ত্রের অপগুণ—(১) কোন্ ব্যক্তিদিগকে যোগ্যতম বলিয়া শাসনকার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া হইবে—তাহা সঠিক অন্বেষণ করা সম্ভব হয় না। শাসন কার্য্যের যোগ্যতার কোনো সঠিক মাপকাঠি নাই। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলে, বা যুদ্ধে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলে অথবা বিত্ত বা সম্পত্তিশালী হইলেই কোনো

একজন লোক রাষ্ট্রশাসনের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যোগ্যতার কোনো সঠিক নির্দ্ধারক না থাকায় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বহু অযোগ্য ব্যক্তির স্থানলাভ ঘটে। (২) অভিজাত শাসকবৃন্দ তাহাদের শাসন ক্ষমতা যাহাতে হস্তান্তরিত না হয় তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টিত থাকে। অভিজাততন্ত্র বাহিরের প্রভাব-বিমুখ (Exclusive)—সকল ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া অভিজাত শাসকবৃন্দ একটী স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্রচেতা উপদলে পরিণত হয়। (৩) এইরূপ শাসন পদ্ধতিতে জনসাধারণ শাসনকার্য্য পরিচালনায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং সেহেতু সাধারণ ব্যক্তি দেশের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করিবার বা জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন ও উৎসাহ বোধ করিবে না। এক্ষেত্রে কিছুকালের জন্য দক্ষশাসন সম্ভব হইতে পারে কিন্তু চিরকালের জন্য উহা সম্ভব নহে। শাসনকার্য্যের দক্ষতার পরিচায়ক হইল জনগণের হিতসাধন; কিন্তু জনসাধারণ যতদিন না নিজেদের সমস্যা সম্পূর্ণ নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, নিজেদের সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যতদিন না জনসাধারণ চেষ্টিত হয়—ততদিন স্থায়ী ভিত্তিতে জনগণের হিতসাধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

(অনু-৪) গণতন্ত্র—*Democracy*

রাষ্ট্র যদি এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান হইত যাহা একজন মাত্র ব্যক্তির অধিকারভুক্ত অথবা কতিপয় ব্যক্তির অধিকারভুক্ত, তাহা হইলে রাষ্ট্র শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা একজন অথবা কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে উহা কিছুই অসঙ্গত হইত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র তাহার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিষ্ঠান, অতএব যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে—সেই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী একজন মাত্র ব্যক্তি বা কয়েকজন মাত্র ব্যক্তি নহে; উহা ব্যবহার করিবার অধিকারী রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীগণ সমবেতভাবে। সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকার বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রশাসনের চূড়ান্ত অধিকার। জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিতে বুঝায় যে রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির দ্বারা পরিচালিত হইবে, বিশেষ কোনো একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নহে। ইহাই হইল গণতন্ত্র। প্রাচীন গ্রীক রাজনীতিবিদ্ 'হিরডোটাস' বলিয়াছিলেন যে গণতন্ত্র হইল সেইরূপ শাসনব্যবস্থা যাহাতে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা সমগ্র জনসমষ্টির উপর ন্যস্ত থাকে। 'এব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন্' এই বিষয়টী অধিকতর সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি বলেন, "গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন ব্যবস্থা যাহা জনগণের জন্যই

এবং জনগণের দ্বারাই [পরিচালিত হয়]" ।* এই সংজ্ঞায় **জনগণের** শব্দটীর দ্বারা বুঝায় যে শাসন প্রতিষ্ঠান হইল সর্ব্বসাধারণের অধিকারভুক্ত; **জন্যই** শব্দটীর অর্থ হইল কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির হিতসাধনই ইহার উদ্দেশ্য নহে, ইহার উদ্দেশ্য হইল জনকল্যাণ অর্থাৎ সমগ্র জনসমষ্টির হিতসাধন ; **দ্বারা** শব্দটীতে বুঝায় যে একজন বা কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত হইলে, প্রকৃত জনকল্যাণ সাধন সম্ভব হয় না ; জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পাদন তখনই সম্ভব হয় যখন নাকি রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য জনসাধারণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। কারণ তাহাদের জীবনের কি সমস্যা, কিসে তাহাদের সুখ বা দুঃখ, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা তাহা যথাযথ অনুভব করিতে পারে জনগণই এবং তাহাদের হিতার্থে প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিকতার সহিত সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। গণতন্ত্রের মূল কথাই হইল লোকায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা—যে শাসন ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে।

(অণু-৫) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র—*Direct and Indirect Democracy*

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের আয়তন যখন ছিল ক্ষুদ্র এবং লোক সংখ্যা ছিল অল্প, তখন রাষ্ট্রের সকল নাগরিক একত্র কোনো সভায় মিলিত হইতে পারিত ; এইভাবে একত্র মিলিত হইয়া সকল নাগরিক শাসন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি দৈনন্দিন শাসন পরিচালনা করিত—তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিত এবং সরাসরিভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া দিত ; উপরন্তু তাহারা শাসকবর্গের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধানও করিত। ইহা হইল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র—যে ব্যবস্থায় সকল নাগরিক সরাসরিভাবে এবং সমানভাবে শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন এথেন্সে এইরূপ গণতন্ত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তথায় "এক্লেসিয়া" নামক পৌরসভায় সকল নাগরিকের সভ্যপদ ছিল এবং এই সভা বা পরিষদ "আর্কন" বা কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে নির্ব্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করিত এবং ইহা ছিল রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিচালক ও নিয়ামক।

কিন্তু বিপুল সংখ্যক অধিবাসীপূর্ণ আধুনিক কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল। আধুনিক একটী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক কোনো একটী পরিষদে

---

*"Democracy is the Government of the people, for the people and by the people"—ABRAHAM LINCOLN.

সম্মিলিত হইবে ইহা অসম্ভব। সেইজন্য আধুনিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে কার্য্যকরী করা হয় পরোক্ষ-ভাবে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক নিজেরাই শাসন কার্য্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে অল্পসংখ্যক কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া দেয়। এই প্রতিনিধিগণ, জনসাধারণের পক্ষ হইতে, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্রশাসনের অপরাপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এইরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন একটী নির্দ্ধারিত সময় অন্তর হইয়া থাকে—অতএব কোনো একদল প্রতিনিধি পৃথক এবং স্থায়ী শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারে না। প্রতিনিধিগণের মধ্যে এই চেতনা থাকে যে তাহারা জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাহাদের অছি স্বরূপে শাসন ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিয়া থাকে। পরোক্ষ গণতন্ত্রের অপর একটী নাম হইল প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইরূপ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রই বিদ্যমান।

(অনু-৬) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রসূচক বিধিব্যবস্থা—*Elements of Direct Democracy*

পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যেও জনগণের যাহাতে শাসনে প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ থাকে তদুদ্দেশ্যে কোনো কোনো দেশে গোটাকয়েক বিশেষ শাসনতান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি হইল (১) জন নির্দ্দেশ (২) গণভোট (৩) প্রবর্ত্তনাধিকার ও (৪) পদত্যাগ দাবী।

(১) **জননির্দ্দেশ** (Referendum)—আইন পরিষদে প্রস্তাবিত কোনো আইন জনসাধারণের দ্বারা অনুমোদিত হয় কিনা তাহা জানিবার জন্য উহাকে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারে এবং জনগণ উহার উপর ভোট প্রদান করিয়া ঐ প্রস্তাবিত আইন তাহারা অনুমোদন করিল কিনা তাহা জানাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার নাম জননির্দ্দেশ। এই ব্যবস্থায় আইনের প্রস্তাব করেন জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইন পরিষদ; উহার উপর তাঁহাদের আলোচনা শেষ করিয়া জনগণের অনুমোদনযোগ্য কিনা তাহা জানিবার জন্য উহাকে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। জন-নির্দ্দেশ দুই প্রকারের হইতে পারে (ক) বাধ্যতামূলক (খ) ঐচ্ছিক। বাধ্যতামূলক জননির্দ্দেশ বলিতে বুঝায় যে শাসনতন্ত্রে গোটাকয়েক বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে এবং এইরূপ বিধান থাকে যে ঐ বিষয় সম্পর্কিত কোনো আইনের প্রস্তাবকে অবশ্যই জন-নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে। ঐচ্ছিক জননির্দ্দেশ বলিতে বুঝায় যে কিছু সংখ্যক নাগরিক আবেদন জানাইলে তবে

কোনো আইনের প্রস্তাব জনগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে। সুইজারল্যাণ্ডে জননির্দ্দেশের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে; ঐদেশে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনমূলক কোনো আইনের প্রস্তাবের উপরে জননির্দ্দেশ বাধ্যতামূলক এবং অন্যান্য আইনের পক্ষে উহা ঐচ্ছিক।

(২) **গণভোট** (Plebiscite)—শাসনতন্ত্রের বিধানের বাহিরে, জাতির ভাগ্যনির্দ্ধারক বা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে জনসাধারণের মতামত জানা প্রয়োজন হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে ভোট গ্রহণ করা হয়। ইহাকেই বলা হয় গণভোট। জননির্দ্দেশের সহিত ইহার পার্থক্য হইল যে জননির্দ্দেশ আইন প্রণয়নের সহিত সম্পর্কিত, অর্থাৎ আইনের প্রস্তাবের উপর জনগণের মতামত গ্রহণ; কিন্তু জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কার্য্য বা নীতি সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহণকে গণভোট বলা হয়। জননির্দ্দেশ হইল জনগণের দ্বারা আইন পরিষদের কর্য্যে হস্তক্ষেপ এবং গণভোট হইল জনগণের দ্বারা শাসন পরিষদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ। উভয়ক্ষেত্রে পদ্ধতি একই—জনসাধারণের দ্বারা ভোট প্রদান।

(৩) **প্রবর্ত্তনাধিকার** (Initiative)—প্রবর্ত্তনাধিকার বলিতে বুঝায় যে জনগণের কোনো অংশ কোনো একটী আইনের খসড়া নিজেরাই প্রণয়ন করে এবং আইন পরিষদে উহা প্রদান করিয়া উহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য করে। এই প্রস্তাব আইন পরিষদকে বিবেচনার পর জননির্দ্দেশের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। এক্ষেত্রে জনসাধারণই উদ্যোগ করিয়া আইন প্রণয়ন করিতেছে।

(৪) **পদত্যাগ দাবী** (Recall)—যদি কোনো প্রতিনিধির কার্য্যকলাপ জনগণের অনুমোদন যোগ্য না হয়, জনগণ যদি তাহাকে প্রতিনিধিত্ব পদ হইতে অপসারিত করিতে চাহে, তাহা হইলে কিছু সংখ্যক ভোটদাতা দাবী করিতে পারে যে ঐ ব্যক্তি প্রতিনিধি পদে থাকিবে কি না সে সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হউক। ইহাকে বলা হয় পদত্যাগ দাবী; ইহার দ্বারা জনগণ অযোগ্য প্রতিনিধিকে অপসারণ করিতে পারে।

(অনু-৭) গণতন্ত্রের গুণাপগুণ—*Merits and Demerits of Democracy*

গুণ—(১) ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের মধ্যে সকল ব্যক্তিই সমানভাবে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে

প্রত্যেক নাগরিক তাহার **স্বাধীনতা** সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা যদি কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির আয়ত্তে থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণ ইহাই অনুভব করে যে রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করে না, জন কয়েক ব্যক্তির দ্বারা শাসিত হয় মাত্র। অবশ্য স্বাধীনতা বলিতে সকল বাধানিষেধ হইতে মুক্তি বুঝায় না; অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও জনসাধারণের কার্য্যকলাপের উপর বিবিধ বাধানিষেধ থাকিবেই। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে এই সকল বাধানিষেধ জনগণের নিজেদের দ্বারাই সৃষ্ট। জনসাধারণ তাঁহাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন মনে করিয়া, নিজেদের কার্য্যকলাপ সুসংবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে সকল বাধানিষেধ নিজেদের উপরেই আরোপ করে, উহার দ্বারা তাহাদের সত্যকার স্বাধীনতা ভোগ ক্ষুণ্ণ হয় না বরং সম্ভব হয়। (২) একমাত্র গণতন্ত্রের মধ্যেই **সাম্যভাবকে** বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। গণতন্ত্র হইল একমাত্র শাসন ব্যবস্থা যাহা রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদ স্বীকার না করিয়া নাগরিকরূপে প্রত্যেককেই সমান মর্য্যাদা প্রদান করে। রাষ্ট্র যে, কোনো একজন ব্যক্তির বা কোনো একটী দলের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত প্রতিষ্ঠান নহে, তাহা একমাত্র গণতন্ত্রের মধ্যেই কার্য্যতঃ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। (৩) গণতন্ত্র মানুষের মধ্যে **ভ্রাতৃত্ববোধ** জাগরূক করে—কারণ গণতন্ত্রে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে যে অপর সকলের সুখ দুঃখের সহিত তাহার সুখ দুঃখ জড়িত এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সমস্যা সকলেরই অভিন্ন। এই উপলব্ধি হইতে জনগণের মধ্যে সহনশীলতা ও মমত্ববোধ জাগরূক হয়। (৪) গণতন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে **রাজনৈতিক শিক্ষার** বিস্তার করে,—অতএব ইহা শুধু যে স্বাধীনতা প্রদান করে তাহাই নহে, ইহা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও করে। শাসন কার্য্য পরিচালনায় সকল ব্যক্তিই যখন অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় তখন তাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং উহা করিতে উৎসাহিত হয়। ইহাতে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা সম্ভব হয়। এই রাজনৈতিক শিক্ষা হইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান সহায়ক কারণ ইহার দ্বারাই জনসাধারণ স্বাধীনতার প্রকৃতি ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং উহা রক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। (৫) গণতন্ত্রে জনসাধারণ রাষ্ট্রের শাসন প্রতিষ্ঠানকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করে। ইহাতে জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং **দেশপ্রেম** জাগরূক হয়; উপরন্তু হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সমাজ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সম্ভব হয়।

অপগুণ—(১) গণতন্ত্র ইহাই অনুমান করে যে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য সমভাবে উপযুক্ত কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। জনসাধারণের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। দেশের শাসন সমস্যাসমূহ প্রণিধান করিবার এবং উহার সমাধানের পথ সন্ধান করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। বর্ত্তমান যুগে এই প্রতিবন্ধক অধিকতর প্রকটিত, কারণ বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাসমূহ অতীব জটিল এবং সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র জনকয়েক তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিই এই সকল সমস্যা প্রণিধান ও তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্র সমগ্র জনসমষ্টির উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। (২) পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ যদি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ বা কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিত, তাহা হইলে গণতন্ত্রের উক্ত অপগুণ কিছু পরিমাণে দূরীভূত হইত। কিন্তু কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম বা দক্ষ তাহা জনসাধারণ অনুধাবন করিতে পারে না; অশিক্ষিত ও অজ্ঞ বলিয়া তাহারা চতুর ব্যক্তি বা সুবক্তাদিগের বাক্য-বিন্যাসে ভুলিয়া ভাবাবেগ বশতঃ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকেই ভোট দিয়া বসে। (৩) গণতন্ত্রে সরকার সকল ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকে কিন্তু সকল ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকায় বাস্তব-ক্ষেত্রে ইহা কাহারও নিকট দায়ী থাকে না। কারণ যাহা সকলের নিকটই দায়িত্ব তাহা কোনো ব্যক্তি বা কোনো একদল ব্যক্তি নির্দ্দিষ্টভাবে বলবৎ করে না। (৪) প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে হইলে যথেষ্ট সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হইয়াও যে সকল ব্যক্তি উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া কোনক্রমে আত্মীয় স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে এবং দুঃখে কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের এমন সময়, অর্থ বা উদ্যম থাকে না যাহাতে তাহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতে পারে। অতএব বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রত্যেক গণতন্ত্রই অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়। (৫) জনতার শাসনে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব হয় না। যুগ ধর্ম্ম হইতে আগাইয়া যে সকল ব্যক্তি চিন্তা করেন সেই সকল মনিষীর প্রগতিশীল ভাবধারা জনগণ প্রণিধান করিতে পারে না এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের নিকট বহু প্রতিভার বলিদান হয়।

(অনু-৮) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়—*Conditions essential for the success of Democracy*

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হইল যে জনসাধারণ গণতন্ত্র

বজায় রাখিবার জন্য একান্তভাবে ইচ্ছুক হইবে; অনিচ্ছুক জনসাধারণের উপরে গণতন্ত্র আরোপ করিয়া দেওয়া চলে না বা আরোপ করিলেও তাহা সাফল্যের সহিত কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় না। জনসাধারণ যে গণতন্ত্র কার্য্যকরী করিবার জন্য ইচ্ছুক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই তাহাদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হইবে। তাহাদিগের অধিকারের উপর যাহাতে কেহই অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তাহার জন্য জনগণকে সর্ব্বদাই সজাগ ও সন্ধানী দৃষ্টি রাখিতে হইবে কারণ ক্ষমতাভোগী শাসকগণ তাহাদের ক্ষমতা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অপপ্রয়োগ করিতে প্রণোদিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে জনসাধারণ নিজদিগকে গণতন্ত্রের পক্ষে যোগ্য করিয়া তুলিবে। এই যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য জনসাধারণকে তাহাদের পৌরজনোচিত কর্ত্তব্যসমূহ,—সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব,—নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে হইবে। উপরন্তু তাহাদিগকে পরমত সহিষ্ণুতারও পরিচয় দিতে হইবে। যে জনসমষ্টির সাধারণ ব্যক্তি অপরের স্বাধীন মত প্রকাশকে সহ্য করিতে পারে না, সে জনসমষ্টি গণতন্ত্রের পক্ষে অযোগ্য।

কিন্তু গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য জনসাধারণ যাহাতে ইচ্ছুক হয় এবং যোগ্য হয়, তাহার জন্য দুইটী বিষয়ের প্রয়োজন; (১) জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তি প্রয়োজন। শিক্ষাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট করে এবং তাহাদের মনকে উন্নত করিয়া উচ্চ আদর্শে গ্রথিত করিয়া দেয়। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তবেই সাধারণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের মূল্য উপলব্ধি করিবে এবং নিষ্ঠার সহিত পৌর কর্ত্তব্য পালনে প্রণোদিত হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিয়াই ইংলণ্ডে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের "সংস্কার আইন" বিধিবদ্ধ হইবার পরে তথাকার রাষ্ট্রনীতিক রবার্টলো বলিয়াছিলেন, "We must educate our new masters," অর্থাৎ "আমাদের নূতন মনিবদিগকে আমরা অবশ্যই শিক্ষিত করিব।" নূতন মনিব বলিতে তিনি নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনসাধারণকে বুঝিয়াছিলেন। (২) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনসাধারণ যাহাতে ইচ্ছুক ও যোগ্য হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হইল আর্থিক নিরাপত্তা; সকলেই যাহাতে উপার্জ্জনের সুযোগ পায় এবং উপার্জ্জনের দ্বারা যাহাতে তাহাদের অক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়—এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নচেৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য সাধারণ ব্যক্তি কোনোই উৎসাহ বোধ করিবে না।

(অনু-৯) গণতন্ত্র এবং আধুনিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি—*Democracy and modern Political Development*

বহুকাল হইতেই,—গণতন্ত্রের উদ্ভবের সময় হইতেই,—গণতন্ত্রের বিরোধিতা দেখিতে পাওয়া যায়; রাজনৈতিক চিন্তাজগতে একাধিক রাজনীতিবিদ তীব্র ভাষায় ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। আধুনিক কালে, বিশেষ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে জগতের সকল রাষ্ট্রেই, বিশেষভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। পার্লামেন্ট পরিচালিত (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক) শাসন ব্যবস্থা এই সকল জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আশু সমাধানের উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় নাই। আলোচনা দ্বারা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনে বহু বিলম্ব ঘটিত এবং দলীয় কলহে জাতির উদ্যমের অধিকাংশই অপব্যয়িত হইত। ফলে, ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র উৎখাত হয়, পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)।

একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের দরুণ রাজনৈতিক মতবাদের জগতে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আদৌ থাকিবে কি না এবং সর্ব্বত্রই একনায়কতন্ত্রের দ্বারা গণতন্ত্রের উচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে কি না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহাদের মধ্যে 'ক্যালভিন হুভার' তাহার "একনায়ক ও গণতন্ত্র' শীর্ষক পুস্তকে দুইটী প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং (২) শাসকবর্গের দৌর্ব্বল্য। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় থাকিবে কিনা তাহাও ঐ দুইটী বিষয়ের উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করে। তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক ও পার্লামেণ্ট সম্মত প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক মন্দার অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা তাহার উপরেই মুখ্যতঃ উহাদের স্থায়িত্ব ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে।" হুভার আরও বলিয়াছেন, "পার্লামেণ্ট সম্মত ব্যবস্থা নির্ভর করে উহার নেতৃবৃন্দের সাহসের উপরে।"

প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব করিতে পারে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার অনুসরণে অন্যান্য একাধিক রাষ্ট্র প্রদর্শন করিয়াছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা প্রকটিত হইয়াছে। অতএব গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইবার কারণ নাই। বিশেষ করিয়া, সাধারণ ব্যক্তির নিকট গণতন্ত্রের

বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে কারণ উহাই একমাত্র শাসন ব্যবস্থা যাহা শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং সকল ব্যক্তির আত্মোন্নতির সমান সুযোগ প্রদান করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে একাধিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(অনু-১০) **একনায়কতন্ত্র**—*Dictatorship*

একজন মাত্র রাষ্ট্রনায়কের অপ্রতিহত শাসনের নাম একনায়কতন্ত্র। ক্ষমতা-লাভের পর রাষ্ট্র-নায়ক জনসাধারণের সম্মতি বা অনুমোদন লইয়া শাসননীতি গ্রহণ করেন না; তিনি হন সত্যকার শাসক, তিনি আদেশ প্রদান করেন এবং জনগণ প্রদান করে আনুগত্য। একনায়কতন্ত্রের সহিত স্বৈর রাজতন্ত্রের পার্থক্য রহিয়াছে; রাজতন্ত্রে সাধারণতঃ বংশানুক্রমে সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটে, অন্ততঃ বিশেষ কোনো রাজকীয় পরিবারের মধ্যে সিংহাসন প্রাপ্তি নিবদ্ধ থাকে। একনায়কতন্ত্রে শাসন ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য ক্ষমতা নহে, উহা দেশের বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রাপ্তব্য ক্ষমতা। উপরন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়কের পিছনে একটী সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে।

বস্তুতঃপক্ষে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবেই একনায়ক রাষ্ট্রের সর্ব্বময় শাসন পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন। কোনো রাজনৈতিক দল অপরাপর দলসমূহকে নির্ব্বাচনে অথবা বিপ্লবের দ্বারা পরাজিত করিয়া শাসনযন্ত্র অধিকার করে এবং উহার নেতা তখন রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক পদ লাভ করেন। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই তখন তাঁহাকে মান্য করিতে বাধ্য থাকে। অতএব একনায়কের পিছনে জাতির একটী বৃহদংশের সমর্থন থাকে। 'ক্যালভিন হুভার'† সেই কারণে ইহাকে **Mass Dictatorship** বা "জনতা একনায়কতন্ত্র" নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদিও একনায়ক শাসিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধতা বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবুও একনায়কতন্ত্রের আদর্শ বা লক্ষ্য সম্পর্কে গোটাকয়েক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত একনায়কতন্ত্রের আদর্শ বা ভাবধারার বিরোধিতাও পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ একনায়কতন্ত্র কোনো একটী বিশেষ দলের স্বার্থের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং ব্যক্তির কল্যাণকে এই দলের কল্যাণের নিম্নে স্থান দেয়। রুশিয়াতে এই দল হইল মজুর শ্রেণী (Proletariat), ইটালিতে ইহা ছিল জাতি (Nation) এবং জার্ম্মানীতে ইহা ছিল কুল (Race)। এই দলের স্বার্থের সহিত

† CALVIN HOOVER—Dictators and Democracies

সমগ্র রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হয়—দলই যেন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র যেন শুধু ঐ দলের স্বার্থেরই পরিপোষক। দলের স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের সর্ব্বময় ক্ষমতা ব্যবহার করা হয় এবং ব্যক্তির কোনোরূপ অধিকার স্বীকার করা হয় না। রাষ্ট্রের তথা দলের উদ্দেশ্যে একনায়ক সকল ব্যক্তির সকল ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনোই অস্তিত্ব থাকে না। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সেইজন্য সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্র (Totalitarian State) নামেও অভিহিত করা হয়—অর্থাৎ যে রাষ্ট্র ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে—ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের তথা দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে—ব্যক্তির কল্যাণের জন্য বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। গণতন্ত্র অবশ্য সমষ্টিগত কল্যাণকে কাহারও ব্যক্তিগত কল্যাণের উর্দ্ধে স্থান দেয়,—সমষ্টিগত কল্যাণকেই তাহার আদর্শ বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বারা সমষ্টির কল্যাণ সাধনের সন্ধান করে। অতএব গণতন্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনের একটী পরিধি থাকে যেখানে রাষ্ট্র তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারিত করে না।

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রের লক্ষ্য হয় যে রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই একই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া একই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া একজন মাত্র নায়ককে অনুসরণ করিয়া চলিবে। একনায়কতন্ত্র জনসাধারণকে এক মতবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে চাহে; জনগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিলে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িবে—ইহাতে জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইবে এবং জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সেইজন্য একনায়ক-তন্ত্রী রাষ্ট্রে একনায়কের মতের কোনো বিরোধী মতকে সহ্য করা হয় না, এবং রাষ্ট্র-নায়ক যে দলের নেতা সেই দলটী ভিন্ন অপর সকল দলকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। গণতন্ত্র কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন চিন্তাধারা অনুসরণ করিতে উৎসাহ প্রদান করে কারণ গণতন্ত্র মনে করে বিবিধ চিন্তাধারা ও মতবাদে উৎসাহ প্রদান করিলে তবেই শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা বা কার্য্যপন্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ একনায়কতন্ত্র মনে করে যে জাতির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উহার সম্প্রসারণ প্রয়োজন—অর্থাৎ অপরাপর ভূখণ্ড জয় করিয়া তাহার আধিপত্য বিস্তার প্রয়োজন। অধ্যাপক হুভারের ভাষায় "সকল সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রসারণের প্রেরণা বর্ত্তমান এবং ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে শক্তিবাদের বিস্ফোরক উপাদান।" শুধু সম্প্রসারণের জন্যই নহে, একনায়কপন্থী ফ্যাসিবাদ (Fascism) মনে করিত যে নাগরিকদের বলবীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের সামরিক শিক্ষা

প্রয়োজন এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপও প্রয়োজন। একনায়কতন্ত্রের মধ্যে সেই জন্য জঙ্গীবাদের (Militarism) প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। গণতন্ত্র কিন্তু শান্তির মধ্য দিয়াই জাতির অগ্রগতি সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করে।

(অণু-১১) **একনায়কতন্ত্রের গুণাপগুণ**—*Merits and demerits of Dictatorship*

গুণ—(১) রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে না, সেই জন্য জাতীয় জীবনের কোনো সঙ্কট সময়ে আলাপ আলোচনায় বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের দ্বারা তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। (২) জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চস্তরের বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচিত হন বলিয়া তিনি তাঁহার বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের দ্বারা জাতির জটিল সমস্যা সমূহের যথাযথ এবং আশু সমাধান করিতে সক্ষম হন। (৩) যিনি রাষ্ট্রনায়ক হইবেন তাঁহাকে পূর্ব্বেই উহার যোগ্য বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে, কারণ রাষ্ট্রনায়ক হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার যোগ্যতার দ্বারা কোনো দলের নেতৃপদ লাভ করিতে হইবে। এই বিষয়ে রাজতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্রের অধিক গুণ বর্তমান কারণ রাজতন্ত্রের শাসক পদ লাভের জন্য রাজাকে যোগ্যতার কোনো পরিচয় দিতে হয় না। (৪) একনায়কতন্ত্রে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে পূরাপূরিভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়—কারণ সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার কালে আপাততঃ জনগণের যতই কষ্ট হউক, তাহারা ভোটের দ্বারা শাসকবর্গকে অপসারিত করিতে পারে না।

অপগুণ—(১) একনায়কতন্ত্রের প্রাধান অপগুণ হইল যে ইহা জনসাধারণকে ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে ও শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। সাধারণ লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা বা মত প্রকাশ করিতে পারে না; এক্ষেত্রে নাগরিক নিছক আজ্ঞাবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়। (২) রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধী দল না থাকায় একনায়কের শাসন নিছক স্বৈরশাসনের রূপ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রনায়কের ত্রুটিবিচ্যুতি প্রদর্শন করিবার মতন কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। রাষ্ট্রনায়ক বিরোধিতায় অনভ্যস্ত বলিয়া সামান্যতম বিরোধিতার আভাষ পাইলেই প্রতিশোধ ও অত্যাচারের প্লাবন প্রবাহিত করেন। নাগরিকগণ আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। ইহাতে তাহাদের মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিষ্পেষিত হয়। (৩) শাসনকার্য্য পরিচালনায় জনগণের কোনো অধিকার না থাকায় তাহারা প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকে।

(অণু-১২) **দুই প্রকার পরোক্ষ গণতন্ত্র**—*Two kinds of Indirect Democracy*

পরোক্ষ গণতন্ত্র, অর্থাৎ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র দুইভাবে গঠিত হইতে পারে। একটীকে বলা হয় সচিব-সঙ্ঘমূলক শাসন ব্যবস্থা ও অপরটীকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থা।

(ক) **সচিবসঙ্ঘমূলক শাসন ব্যবস্থা** (Cabinet Government)—সচিব-সঙ্ঘমূলক শাসন ব্যবস্থায়, আইনতঃ যিনি রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, কার্য্যতঃ তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা নহেন যথা ইংলণ্ডের রাজা বা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট্। রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা একদল মন্ত্রী বা সচিবের উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের আইন পরিষদে যে সকল ব্যক্তি জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই জনকয়েককে বাছিয়া লইয়া সচিব-পদে নিযুক্ত করা হয়। ইহারা যুক্তভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; ইহারা একই সঙ্গে রাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং আইন সভার সদস্য। অতএব এই ব্যবস্থায় শাসন পরিষদ (Executive) হইল আইন পরিষদেরই (Legislature) একটী অংশ। শাসন পরিষদ অর্থাৎ সচিবগণ তাঁহাদের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের জন্য সমগ্র আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। সেইজন্য এইরূপ শাসন ব্যবস্থার আর একটী নাম হইল **দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা** (Responsible Government)। কোনো একদল সচিব যতদিন আইন পরিষদেব আস্থাভাজন থাকিবেন ততদিন মাত্র তাঁহারা সচিবপদ অধিকার করিয়া থাকিবেন; কোনো সচিব সঙ্ঘের উপরে আইন পরিষদের সংখ্যাধিক সদস্যের আস্থা নষ্ট হইলে, তাহারা সচিবসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে এবং নূতন একদল ব্যক্তির দ্বারা (অবশ্য ইহারা আইন পরিষদেরই সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন) সচিবসঙ্ঘ পুনরায় গঠিত করিতে পারে। আইন পরিষদেরই ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ শাসনব্যবস্থার প্রথম প্রবর্ত্তন হয় এবং তথাকার আইন পরিষদের নাম পার্লামেণ্ট হওয়ায় সচিবসঙ্ঘমূলক শাসনব্যবস্থার আর একটী নাম হইল **পার্লামেণ্ট সম্মত শাসনব্যবস্থা** (Parliamentary Government)।

সচিবসঙ্ঘমূলক শাসনের গুণ—(১) সচিবসঙ্ঘমূলক শাসনে মন্ত্রীগণ একই সঙ্গে শাসন পরিচালক ও আইন সভার সভ্য। দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার কালে যে আইনগুলি তাঁহারা সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করেন সেই আইনের প্রস্তাব তাঁহারা আইন পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন এবং

আইন পরিষদকে উহা বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। (২) সচিবগণ আইন পরিষদে উপস্থিত থাকেন, যেহেতু আইন পরিষদের অপরাপর সদস্যগণ জনসাধারণের প্রতিনিধি-রূপে জনগণের অভাব অভিযোগ এবং ইচ্ছা মন্ত্রীগণকে জ্ঞাপন করিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে, মন্ত্রীগণ যাহাতে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন, সেই দিকেও আইন পরিষদের সদস্যগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। আইন পরিষদ ও সচিবসঙ্ঘের মধ্যে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দরুণ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়।

সচিবসঙ্ঘমূলক শাসনের অপগুণ—১) আইন পরিষদের নিকট সচিব-সঙ্ঘ দায়ী থাকেন—ইহার অর্থ হইল যে আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য যাঁহাদিগকে সমর্থন করেন, তাঁহারাই সচিবপদ অধিকার করেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাধিক সদস্য যখনই তাঁহাদের পছন্দ পরিবর্ত্তন করেন, তখনই সচিব সঙ্ঘের পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে প্রায়শঃই সচিবসঙ্ঘের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, রাষ্ট্রশাসনের নীতি ও কর্ম্মপন্থার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। নূতন সচিবসঙ্ঘ পুরাতন সচিবগণের নীতি ও কর্ম্মপন্থা পরিহার করিয়া নূতন নীতি গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু বারংবার এইরূপ দেশ শাসনের নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কোনো একটী নীতিকে পুরাপুরি কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় না; ইহা জনসাধারণের কল্যাণের পরিপন্থী। (২) দেশের শাসনকার্য্য যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি পরিচালনা করেন সেক্ষেত্রে আলোচনা ও তর্ক করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনেক সময় চলিয়া যায়; বহু ক্ষেত্রেই যথার্থ সময়ে যথাযোগ্য কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়া উঠে না। বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের কোনো সঙ্কট সময়ে, যথা যুদ্ধ, বিদ্রোহ বা দুর্ভিক্ষে, আশু প্রতীকারজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দৃঢ়হস্তে সেই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা সচিবসঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ আলাপ আলোচনার দ্বারা কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতেই সময় চলিয়া যায়,—উপরন্তু বিভিন্ন সচিব বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিতে এবং বিভিন্ন কর্ম্মপন্থার সমর্থক হইতে পারেন।

(খ) রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা*—(Presidential Government) —রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থায় আইনতঃ যিনি রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, কার্য্যতঃ

*রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম রাষ্ট্রপতি (President) হইতেই, দেশের শাসন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয় না। যথা ফ্রান্সের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম রাষ্ট্রপতি—কিন্তু ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা সচিবসঙ্ঘমূলক কারণ তথাকার রাষ্ট্রপতি কেবল নামে মাত্র প্রধান শাসনকর্ত্তা,—প্রকৃত শাসক হইল আইন পরিষদের নিকট দায়ী সচিবসঙ্ঘ।

তিনিই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। রাষ্ট্রশাসনে এই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম হইল প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি। সেই কারণে এইরূপ শাসন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন (Presidential Government) বলা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে, অর্থাৎ একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষে, সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্র শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না; সেই জন্য শাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি একাধিক সচিব নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি, এবং তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত সচিবগণ—কেহই আইন পরিষদের সদস্য নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ীও নহেন। একটী নির্দ্ধারিত কালের জন্য রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদ অধিকার করিয়া থাকেন—ঐ নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে পুনরায় নির্ব্বাচন হয়। অতএব নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে, আইন পরিষদের সদস্যগণের আস্থা অনাস্থা দ্বারা রাষ্ট্রপতির পরিবর্ত্তন হয় না অন্যান্য সচিবগণের কার্য্যকালও আইন পরিষদের সদস্যগণের মতামতের উপর নির্ভর করে না,—তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি ও সচিবগণ আইন পরিষদের নিকট দায়ী না হওয়ায়, কেহ কেহ ইহাকে দায়িত্ববিহীন শাসন ব্যবস্থা (Non-responsible Government) বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু উহার দ্বারা, দেশের সরকার কাহারও নিকট দায়ী নহেন, এইরূপ বুঝায় না। রাষ্ট্রপতি জনসাধারণেরই প্রতিনিধি, ঠিক যেরূপ আইন পরিষদের সদস্যগণ জনসাধারণের প্রতিনিধি। কয়েক বৎসর অন্তরই রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্ব্বাচন হয়—রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রতিনিধিরূপেই শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন এবং তাঁহার মধ্যে জনগণের প্রতি দায়িত্বের অনুভূতি থাকে। ইহাকে **প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা** (Representative Government) বা Reman & Transfer. বলা হয়।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থার গুণ—(১) আইন পরিষদের আস্থার উপর রাষ্ট্রপতির কার্য্যকাল নির্ভর করে না, উহা শাসনতন্ত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্ধারিত। সুতরাং কিছুকালের জন্য স্থায়ী শাসন কার্য্য সম্ভব হয়। রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার সচিববর্গ দেশ শাসনের নির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই নীতি কার্য্যকরী করিতে পারেন। (২) রাষ্ট্রপতির হস্তেই চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায়, কোনো বিষয় সম্পর্কে সচিবসঙ্ঘের মধ্যে মতদ্বৈধে বা কলহে, কার্য্য পণ্ড হইবার আশঙ্কা কম। রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এবং রাষ্ট্রের কোনো জরুরী অবস্থায় তিনি আশু—প্রতিকারজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ও কার্য্যকরী করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থার অপগুণ—(১) রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য,—এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে অপসারিত করিবার কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নাই। একমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া অপসারণ করা চলে, কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং সচরাচর ইহা প্রয়োগ করাও সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করিবার কোনো সহজ নিয়মতান্ত্রিক পথ নাই। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুশাসনে অক্ষম হইলে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল অতিবাহিত না হওয়া অবধি জাতিকে শাসকের অক্ষমতার ফলাফল বহন করিতেই হইবে। (২) রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সভ্য নহেন এবং আইন পরিষদের নিকট দায়ীও নহেন। অতএব আইন পরিষদ এবং শাসন পরিষদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিলে কেহই অপরকে নিজ মতে আনিতে পারিবেন না। ইহা রাষ্ট্রের সুশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর।

Questions & Hints

1. Discuss briefly the different forms of Gevernment and their respective merits and demerits. (1936)—

[রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র এই চারিপ্রকার শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং প্রত্যেকের গুণাপগুণ সংক্ষেপে লিখিতে হইবে। অনুচ্ছেদ,২, ৩, ৪, ৭ ১০ এবং ১১।]

2. "Democracy may be classified broadly under two distinct divisions —direct and representative"—Explain and Illustrate (1935) [অনু-৫]

3. Distinguish between direct and indirect democracy. What are the conditions for the success of modern democracy ? (1945)

[৫নং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু আরও সংক্ষেপে দেওয়া চলিবে এবং অনু-৮ সম্পূর্ণ]

4. Discuss the merits and demerits of the democratic form of Govern. ment (1937) [অনু-৭]

5. Indicate the merits and demerits of democratic form of Government. In the light of modern political development do you think Democracy will survive ?

[এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে, অনু-৭ সংক্ষিপ্ত-ভাবে, অতঃপর অনু-৯ সম্পূর্ণ]

6. What are the aims and objects of Totalitarian States ? How do they differ from the ideals of Democratic States ? (1942) [অনু-১০]

7. Distinguish between the Cabinet form of Government and Presidential form of Government. Discuss their respective merits and demerits (1946) [অনু:১২]

8. Write notes on :—Referendum, Initiative, Plebiscite and Recall. (1948) [অনু-৬]

9. Discuss the advantages and disadvantages of representative Government. (1950) [অনু .২(খ)

একাদশ অধ্যায়

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা

Unitary and Federal Governments

(অণুচ্ছেদ-১) সংখ্যা ও সম্পর্ক—*Number and relation*

শাসন ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই বিভাগের ভিত্তি হইল শাসন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

(অণু-২) এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা—*Unitary Government*

রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা একটী মাত্র শাসন প্রতিষ্ঠানের মারফতে ব্যবহৃত হইলে, শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় এককেন্দ্রিক। একটী মাত্র শাসন প্রতিষ্ঠানের উপরে সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন কর্ত্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থা এইরূপ এককেন্দ্রিক—তথায়, লণ্ডনে যে শাসন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে, উহাই সমগ্র রাষ্ট্রের চূড়ান্ত শাসন কর্ত্তৃপক্ষ। অবশ্য এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাতেও শাসন কর্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রটীকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ স্বতন্ত্র এলাকায় স্বতন্ত্র বা স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকে না, কেন্দ্রীয় বা চূড়ান্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেই তাহাদের ক্ষমতা উদ্ভূত। ইহারা কেন্দ্রীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করে মাত্র। ১৯৩৫এর ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে একাধিক শাসন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সত্বেও এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, কারণ যদিও সমগ্র ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল তবুও দিল্লীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ভারত সরকারই ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের চূড়ান্ত

শাসন কর্ত্তৃপক্ষ এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহ নিছক ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাই ব্যবহার করিতেন।

গুণ—(১) রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব যেখানে অভিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠানের হস্তে কেন্দ্রীভূত, সেখানে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আইনের বা শাসনের সঙ্গতি থাকে। একই বিষয় সম্পর্কে একই রাষ্ট্রের মধ্যে একটী অঞ্চলে এক প্রকার আইন এবং অপর এক অঞ্চলে ভিন্ন প্রকার আইন, এইরূপ ঘটে না। এইরূপ ঘটিলে বহু বিষয়ে নাগরিকদিগের বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইত। (২) সকল বিষয়েই রাষ্ট্রশাসনের একই নীতি অনুসৃত হয়—বিভিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠানের পৃথক নীতির সংঘাত হয় না। সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে একই নীতি অনুসৃত হওয়ায় সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের চেষ্টা সম্ভব হয়; অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (৩) রাষ্ট্রের সকল এলাকাতেই একই আইন কানুন, অতএব রাষ্ট্রের আইনকানুন বুঝিতে এবং মান্য করিয়া চলিতে নাগরিকদিগের অসুবিধা হয় না। (৪) দুইটী ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিলে সুফল পাওয়া যায়; প্রথম, একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তাকে একত্রিত করিবার জন্য একটিমাত্র শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অস্তিত্ব প্রয়োজন হয়; দ্বিতীয়, যে দেশের অধিবাসীরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে যোগ্য হইয়া উঠে নাই, সে দেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

অপগুণ—(১) আধুনিক কালে রাষ্ট্রের দ্বারা করণীয় কার্য্যের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একটী মাত্র শাসন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার একটী মাত্র শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত থাকিলে, উহার পক্ষে সকল বিষয়ে সমান নজর দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। (২) একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা থাকিতে পারে। অতএব বিভিন্ন এলাকার উপর একই প্রকার আইন প্রয়োগ সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয় না। উপরন্তু কেন্দ্রে অবস্থিত একটীমাত্র সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা সম্ভব হয় না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যাহত হয়।

(অনুঃ৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা—*Federal Government*

যে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা একটীর অধিক শাসন প্রতিষ্ঠানের মারফতে ব্যবহৃত হয়, সেই রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল পৃথক করা থাকে—এইরূপ এক একটী অঞ্চলকে প্রদেশ বলা যাইতে পারে। এই সকল প্রদেশগুলিকে লইয়া যে বৃহৎ এবং সমগ্র রাষ্ট্র সেই সমগ্র রাষ্ট্রটীর জন্য একটী শাসন প্রতিষ্ঠান থাকে। এই শাসন প্রতিষ্ঠান যেন সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল, সেইজন্য ইহাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় সরকার বা শাসন প্রতিষ্ঠান (Central Government); কিন্তু এই কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠানই সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র শাসন প্রতিষ্ঠান নহে। সমগ্র রাষ্ট্রটী যে সকল পৃথক পৃথক প্রদেশ লইয়া গঠিত ঐ প্রদেশগুলির প্রত্যেকটীতে একটী করিয়া শাসন প্রতিষ্ঠান থাকে। এইগুলিকে প্রাদেশিক সরকার বা শাসন প্রতিষ্ঠান (Provincial Government) বলা হয়। কিন্তু এই সকল প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বা শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মাত্র নহে; প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে। প্রাদেশিক সরকারগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। একই বিষয় হইতে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদিগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; ঐ বিষয়টী হইল শাসনতন্ত্র (Constitution)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বর্ত্তমান। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে সমগ্র ভারতের জন্য ভারত সরকার রহিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার আর নিছক ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে রহিলেন না। তাঁহাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইল; কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহ,—সকল সরকারই তাঁহাদের ক্ষমতা লাভ করিলেন শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে।

(অনু-৪) যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ—*Characteristics of a Federation*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি সঠিক অনুধাবনের জন্য উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা লাভজনক হইবে। (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই দফা শাসন প্রতিষ্ঠান থাকে—সমগ্র রাষ্ট্রটীর জন্য একটী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠান এবং যে সকল ক্ষুদ্র এলাকা বা প্রদেশগুলি* লইয়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রটী গঠিত—তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যে একটী করিয়া পৃথক শাসন প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রদেশে (যথা আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ইত্যাদি) একটী করিয়া প্রদেশিক সরকার আছেন উপরন্তু

* এই পৃথক অঞ্চল বা প্রদেশগুলিকেও State বা রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়ার প্রচলন আছে—অবশ্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দিক হইতে এইগুলিকে রাষ্ট্র বলা যায় না। ভারতের শাসনতন্ত্রেও প্রদেশগুলিকে State নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সমগ্র দেশের জন্য দিল্লীতে ভারত সরকারও আছেন। পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে (যথা পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ইত্যাদি) একটী করিয়া প্রাদেশিক সরকার রহিয়াছেন, উপরন্তু সমগ্র পাকিস্থানের জন্য করাচীতে পাকিস্থান-সরকার রহিয়াছেন। (২) একটী রাষ্ট্র যে সকল বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে এবং শাসন ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সেই বিষয়গুলিকে শাসনের বিষয় বলিয়া অভিহিত করা যায়। একটী রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ শাসনের বিষয় আছে বহু—যথা দেশরক্ষা, মুদ্রা প্রচলন, পররাষ্ট্রসম্পর্ক পরিচালন, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি ইত্যাদি। এই শাসন বিষয়গুলির মধ্যে অনেকগুলি আছে, যেগুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমস্যা ও প্রয়োজন পৃথক থাকে, যথা—জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; এই বিষয়গুলি সম্পর্কে একই আইন প্রয়োগ করা হইলে, একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে, সকল প্রদেশের অধিবাসীগণ সমানভাবে উপকৃত হইবে না। অপর পক্ষে কিন্তু অনেকগুলি শাসনের বিষয় আছে যেগুলির সম্পর্কে সমগ্র রাষ্ট্রের, অর্থাৎ সকল প্রদেশের সমস্যা ও প্রয়োজন অভিন্ন যথা—দেশরক্ষা, মুদ্রা প্রচলন, রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির সহিত সকল প্রদেশের স্বার্থ সমভাবেই জড়িত, ইহাদের সম্পর্কে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই অভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর; এবং যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে প্রাদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর। (৩) প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে একটী **লিপিবদ্ধ** এবং **অনমনীয়** (Rigid) শাসনতন্ত্র থাকে, যাহা শাসনের বিষয়গুলিকে দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া দুই দফা শাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। এই শাসনতন্ত্রে লিখিত ভাবে বলিয়া দেওয়া হয়, শাসনের কোন্ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, এবং কোন্ বিষয়গুলি থাকিবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্ত্তন করা যাইবে না (অনমনীয়) কারণ শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্ত্তনযোগ্য হইলে, শাসনের বিষয় সমূহের সুক্ষ্ম পার্থক্য এবং দুই দফা শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার মধ্যে সীমারেখা বিদূরিত হইবার আশঙ্কা থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার, উভয়েই শাসনতন্ত্র হইতেই তাহাদের ক্ষমতা লাভ করে। (৪) একই রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত একাধিক সরকারের মধ্যে যদি মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঐ মতদ্বৈধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন

হইতে হয়, তবে কোনো সাধারণ আদালতের নহে। সরকারগুলির মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির জন্য একটী বিশেষ আদালত গঠিত থাকে ; ইহার নাম যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court); কোনো. কোনো যুক্তরাষ্ট্রে ইহার নাম থাকে সর্ব্বোচ্চ আদালত (Supreme Court)। (৫) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদিগের দুই দফা আনুগত্য থাকে। প্রত্যেক নাগরিক, সে যে প্রদেশের অধিবাসী সেই প্রদেশের সরকারের প্রতি অনুগত থাকে, উপরন্তু সমগ্র রাষ্ট্রটীর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তাহার আনুগত্য থাকে।

(অনু-৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণাপগুণ—*Merits and Demerits of Federation.*

গুণ—(১) যে সকল এলাকা সংযুক্ত করিয়া একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, সেই এলাকাগুলির প্রত্যেকটীই যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে অবস্থান করিত তাহা হইলে প্রত্যেকেই থাকিত একটী ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল রাষ্ট্ররূপে। এইরূপ ক্ষুদ্র এলাকা সমূহ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটী শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিলে, প্রত্যেকেই সেই শক্তির সমান অংশীদার হইয়া থাকিতে পারিবে। একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাহাদের সংহতির দ্বারা শক্তির অধিকারী হইতে পারে এবং সেই সংহতি-জাত শক্তির দ্বারা প্রত্যেকেই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির লোভাতুর দৃষ্টি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিবে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সাম্রাজ্য স্থাপনের অনুপ্রেরণা যদি না থাকিত, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল রাষ্ট্রসমূহকে শোষণ ও পদানত করিবার প্রতিযোগিতা হইতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যদি বিরত থাকিত, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে কোনোরূপ সংহতি না করিয়াই, স্ব স্ব সার্ব্বভৌমত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের গতি ও ফলাফল হইতে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। শুধু তাহাই নহে, অপরের সাহায্য লইয়াও, বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়া উঠে না,—কারণ সাম্রাজ্যলিপ্সু বৃহৎ শক্তি কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে অপর বৃহৎ শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা বা উদ্ধার করিলেও তাহাকে নিজ প্রভাবের আওতার মধ্যে রাখিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হয় যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকা রাখিয়াছে গ্রীসকে, রাশিয়া রাখিয়াছে চেকোশ্লোভাকিয়াকে। অতএব একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিতে পারে। সেই কারণে যুদ্ধ চলিবার কালেই ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যুদ্ধোত্তর যুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের

দ্বারা একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও কুলোদ্ভূত জনসমষ্টির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা সংহতি বিধান করা অবশ্য প্রয়োজনীয়; অন্যথায় পররাজ্যলিপ্সু বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হইতে কোনো প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য বা জনসমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। (২) কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটী রাষ্ট্র গঠন করিলেও স্বতন্ত্র এলাকাগুলি অর্থাৎ মূল রাষ্ট্রগুলি (যেগুলির সংযোগে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়) তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেয় না—প্রত্যেক এলাকার মধ্যেই পৃথক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে। প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র, অর্থাৎ প্রদেশই, স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে—একটী প্রদেশের জনগণ তাহাদের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রাদেশিক জীবনের বিশেষ বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অতএব বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংযোগের দ্বারা একটী শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন এবং প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে স্বাধীনতা—কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বারাই এই দুইটীর একত্রীকরণ সম্ভব হয়। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে অভিন্ন বিষয়গুলি লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র না থাকিলে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইত—যথা দেশরক্ষা, বিদেশে দূতাবাস স্থাপন ইত্যাদি। ইহাতে প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের অর্থব্যয় হইত অধিক। অতএব যুক্তরাষ্ট্র গঠন ব্যয়সঙ্কোচজনক। (৪) প্রত্যেক এলাকার মধ্যে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা থাকার দরুণ, প্রত্যেক এলাকার জনসাধারণ কোনো না কোনো শাসন প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবান্বিত করিবার সুযোগ পায়—সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য কেন্দ্রে একটী মাত্র শাসন প্রতিষ্ঠান থাকিলে সে সুযোগ তাহাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হইত না। ইহার দরুণ তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার হয়; কারণ শাসন প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবান্বিত করিয়া উহাকে দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য জনগণ যদি সচেষ্ট হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহাদিগকে দেশের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সামাধান করা হইবে, দেশের এইরূপ নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার নামই রাজনৈতিক শিক্ষা।

অপগুণ—(১) যুক্তরাষ্ট্রের দোষস্বরূপ বলা হয় যে কোনো কার্য্যের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া গেলে ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; শাসনের দায়িত্ব দুই দফা শাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভক্ত থাকায় শাসন কার্য্য পরিচালনায় যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য পরিলক্ষিত

হয়। (২) যুক্তরাষ্ট্রের দোষ হইল যে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিসমূহ সম্পাদন করে বা যে নীতি অনুসরণ করে প্রাদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ উহা অপছন্দ করিলে ভিতরে ভিতরে উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারে; সেক্ষেত্রে তেজস্বিতার সহিত পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা সম্ভব হয় না। উপরন্তু যেক্ষেত্রে একাধিক জাতীয়তার (Nationality) সংমিশ্রণে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মধ্যকার বিভিন্ন জাতীয়তার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিবে ইহা বিবেচনা করিয়া সন্দেহাকুলচিত্তেই অধিকাংশক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করিতে হয়। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক মূলরাষ্ট্র বা প্রদেশ নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া একত্রিত হইতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য বা অপর কোনো কারণে গৃহযুদ্ধ বাধাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের পক্ষে এইরূপ কার্য্য করিবার বিশেষ সুযোগ থাকে কারণ প্রত্যেক প্রদেশ একটী করিয়া স্বতন্ত্র শাসনযন্ত্রের অধিকারী থাকে।

(অণু-৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও বিশ্বরাষ্ট্র—*Federation and the World·State*

বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা—পৃথিবীতে গোটাকয়েক স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার দরুণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায়শঃই সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার সার্ব্বভৌমত্বের দরুণ অপর যে কোনো রাষ্ট্রের সম্পর্কে যে কোনো মনোভাব বা কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিতে পারে। তাহার সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারেই প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারে। ইহা বিশ্বশান্তি তথা মানবসভ্যতার পরিপন্থী। উপরন্তু, বিবিধ বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ উপকৃত হইবে, বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধিত হইবে, মনুষ্য সভ্যতার প্রভূত প্রগতি সম্ভব হইবে। এই সকল কারণে,—সংগ্রামের সম্ভাবনা লুপ্ত করিবার জন্য এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা সুদৃঢ় করিবার জন্য, একাধিক চিন্তানায়ক বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে একত্রিত করিবার উপায় সম্পর্কে বহুকাল হইতে চিন্তা করিয়াছেন।

বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রতিবন্ধক—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতি সঙ্ঘ (League of Nations) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (United Nations Organisation) স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে,

কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের সার্ব্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছে এবং তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা এযাবৎ সৃষ্ট কোনো বিশ্বসঙ্ঘের হয় নাই। চিন্তানায়কগণ মনে করেন যে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী একটী বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইবে এরূপ আশা করাও যায় না। অতএব বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন হইল যে একদিকে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রগুলির উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পন্ন একটী রাষ্ট্র গঠিত হইবে, অপরদিকে অধুনা বর্ত্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য কিছু পরিমাণে বজায় রাখিবে; যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই ইহা সম্ভব। উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক গুণ বর্ত্তমান—যাহার জন্য পৃথক রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় যোগদান করিতে প্রণোদিত হইতে পারে বলিয়া রাজনীতিবিদগণ আশা করেন। (যুক্তরাষ্ট্রের গুণ দ্রষ্টব্য)

Questions & Hints

1. What is meant by federal Government? What are its merits? (1935)

[অণু-৩ ; ৫নং অণুচ্ছেদের গুণ]

2. What are the main features of a federal Government? Discuss its strength and weakness (1949)

[অণু-৪, আরও সংক্ষেপে লিখিতে পারা যাইবে ; অণু-৫]

3. "The greatest lesson of this war is that federation is the only means of saving the sovereignty of small nations, and this principle applies to India with redoubled force". Discuss this statement. Indicate the merits of the federal form of Governments (1942)

[অণু ৫এর গুণ]

4. "Many political thinkers look upon Federation as the key to the organisation of the World State," Discuss this statement (1943)

[অণু-৬ ; অণু-৫এর গুণ-বন্ধনীর মধ্যে যে পংক্তিগুলি রহিয়াছে সেগুলি বাদ দেওয়া যাইবে]

5. Compare the advantages and disadvantages of a Unitary State with those of a Federal State (1945)

[অণু-২-এর গুণ, অপগুণ ; অণু-৫। এইগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন]

দ্বাদশ অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

Constitutions

(অনুচ্ছেদ-১) **শাসনতন্ত্র—ইহার অর্থ** -*Constitution,—its meaning*

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই, উহার কাঠামো নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এবং সুসংবদ্ধভাবে উহার কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার জন্য, গোটাকয়েক নিয়ম ও নীতির অস্তিত্ব থাকে। রাষ্ট্র কিভাবে সংগঠিত থাকিবে,—উহার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কতগুলি বিভাগ থাকিবে এবং সেগুলি কিভাবে গঠিত হইবে,—কোন্ বিভাগের দ্বারা কি পরিমাণে উহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে, কি নীতি অনুযায়ী উহা প্রযুক্ত হইবে, শাসনকর্তৃপক্ষের ক্রিয়া পরিসর কতদূর বিস্তৃত হইতে পারিবে, জনগণের সহিত শাসন কর্তৃপক্ষের কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে—প্রভৃতি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় ঐ সকল নিয়ম ও নীতি। এই নিয়ম ও নীতিসমূহের সমষ্টি হইল রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র। "কোন্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, কিভাবে তাহাদের ক্ষমতা ব্যবহৃত হইবে এবং কিভাবে নাগরিকগণ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হইতে রক্ষিত হইবে,—এই সকল বিষয় যে নিয়মসমূহ নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় তাহাদের সমষ্টিকে বলা হয় শাসনতন্ত্র।" (টমাস্ র‍্যালে)

(অনু-২) **লিপিবদ্ধ ও অলিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র**—*Written and Unwritten Constitution*

লিপিবদ্ধতার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রকে কখনো কখনো দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র এবং (২) অলিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র।

শাসনতন্ত্রের নিয়ম ও নীতিসমূহ যখন নির্দ্দিষ্টরূপে কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে তখন ঐ শাসনতন্ত্রকে লিপিবদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক নিয়মসমূহ একটী দলিলে নির্দ্দিষ্টভাবে লিখিত হইয়াছিল, সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্ররূপে অভিহত করা হয়। অপর পক্ষে যে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত নিয়মসমূহ কোনো দলিলে নির্দ্দিষ্টরূপে লিখিত থাকে না সে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অলিপিবদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এইরূপ দেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবং এরূপ গোটাকয়েক নীতি অনুযায়ী যাহা সকলেই জানে কিন্তু কোনো লিখিত দলিলে গ্রথিত হয় নাই। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে এইরূপ অলিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লিপিবদ্ধতার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রকে এইরূপ দুইটী স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নাই যাহার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ - অর্থাৎ যাহার শাসনতান্ত্রিক নিয়ম ও নীতিসমূহ কোনো দলিলে নির্দ্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে লিপিবদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয় বটে কিন্তু ঐ রাষ্ট্রেও লিখিত শাসনতন্ত্রের বাহিরে বহু অলিখিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে দেখা যায়। অপর পক্ষে এমন কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাই যাহার শাসনতান্ত্রিক নীতি ও নিয়মসমূহের কোনো অংশই লিখিত অবস্থায় নাই। গ্রেট ব্রিটেনে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ 'ম্যাগনা কার্টা', 'বিল অফ রাইটস্', 'এ্যাক্ট অফ সেটেলমেণ্ট' প্রভৃতি দলিলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—যদিও শাসনতান্ত্রিক বিধির অধিকাংশই লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাই। অধ্যাপক 'লীকক্' বলেন, "লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র বিশিষ্ট এবং অলিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র বিশিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হইল অলীক।"

(অণু-৩) নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র—*Flexible and Rigid Constitutions*

'লর্ড ব্রাইস' শাসনতন্ত্রকে নমনীয় (Flexible) এবং অনমনীয় (Rigid) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সাধারণ আইন এবং সাধারণ আইন প্রণয়নকারী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শাসনতন্ত্রের সম্পর্ক কিরূপ তাহাই হইল এই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য নির্ভর করে, শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার পদ্ধতির উপরে। অনেক সময়ে রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয়; এইরূপ পরিবর্ত্তনকে বলা হয় সংশোধন (Amendment)। কোনো কোনো রাষ্ট্রে যে কর্ত্তৃপক্ষ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধারণ যে কোনো আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করিবার অধিকারী থাকেন, সেই কর্ত্তৃপক্ষই সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্রের যে কোনো নিয়ম সংশোধন

করিবারও ক্ষমতা রাখেন। এইরূপ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজ পরিবর্তন যোগ্য। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র এইরূপ 'নমনীয়' শ্রেণীর। এক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইনের সহিত সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন।

অপর পক্ষে এরূপ অনেক রাষ্ট্র আছে যে স্থানে যে কর্তৃপক্ষ সাধারণ আইন প্রণয়ন করে অথবা সংশোধন করে নিছক সেই কর্তৃপক্ষই শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে পারে না ; অথবা একই কর্তৃপক্ষ শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে কিন্তু সেই প্রস্তাবকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয় বা অপর কোনো কর্তৃপক্ষেরও সেই প্রস্তাবে সম্মতি প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধনের এইরূপ পদ্ধতি। ঐ দেশে আইন পরিষদের যে দুইটী কক্ষ আছে উহাদের উভয়ের অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারে। অতঃপর ঐ সংশোধনের প্রস্তাবটী যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রসমূহের আইন পরিষদগুলির নিকট প্রেরিত হইবে। ঐ আইন পরিষদগুলির দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যক আইন পরিষদ এইরূপ সংশোধন অনুমোদন করিলে তবেই উহা গৃহীত হইল বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন দুরূহ - শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইনের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে।

গ্রেট ব্রিটেন - গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট হইল আইন পরিষদ। পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন করে সংখ্যাধিক ভোটের দ্বারা। কোনো মন্ত্রী অথবা পার্লামেণ্টের অপর কোনো সদস্য কোনো আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন ; সেই প্রস্তাবের উপরে আলোচনা হয় এবং উহার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। সংখ্যাধিক্য সদস্য উহার পক্ষে ভোট দিলে ঐ প্রস্তাব আইন রূপে বিধিবদ্ধ হয়। সংখ্যাধিক্যে কোনো ন্যূনতম পরিমাণ নাই,—নিছক সংখ্যাধিক ভোটের দ্বারাই (অর্থাৎ শতকরা ৫১ ভাগ হইলেই) আইন প্রণীত হয়। শাসনতান্ত্রিক কোনো আইনের সংশোধনও পার্লামেণ্টই করে এবং ঠিক এই পদ্ধতিতেই। অতএব তথাকার শাসনতন্ত্র নমনীয়।

ভারতবর্ষ—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদকে দু একটী সামান্য বিষয়ে সংশোধন সুপারিশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র—সংশোধন সাধন করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দ্বারাই রক্ষিত ছিল। ডমিনিয়ন অবস্থায় ভারতের গণপরিষদ ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং

শাসনবিধি রচনাকারী পরিষদ, উভয়রূপেই কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু ঐ দুই প্রকার কার্য্য করিবার সময়ে তাঁহাদের পৃথক অধিবেশন হইয়াছে এবং পৃথক সভাপতির সভাপতিত্বে; অর্থাৎ গণপরিষদ একটী বিশেষ শাসনবিধি রচয়িতা পরিষদরূপেই শাসনতন্ত্র রচনা ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত। ভারত প্রজাতন্ত্রের নূতন শাসনবিধিও অনমনীয়। নূতন শাসনতন্ত্রে বিধান দেওয়া হইয়াছে যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টের যে কোনো কক্ষে করা যাইতে পারিবে কিন্তু এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইতে হইবে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাধিক ভোটে। উপরন্তু কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সংশোধনের প্রস্তাব শুধুমাত্র পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হইলেই হইবে না—উহা যতগুলি উপরাষ্ট্র (প্রদেশ) আছে তাহাদের অন্ততঃ অর্দ্ধ সংখ্যক আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

(অণু-৪) **নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাপগুণ**—*Merits and Demerits of flexible and rigid Constitutions*

নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ—(১) নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ হইল যে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে সহজেই খাপ খাওয়াইয়া লওয়া চলে। কোনোরূপ দুরূহ পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া নূতন উদ্ভূত অবস্থার সহিত ইহাকে মিলাইয়া লওয়া চলে। প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরণের শাসনতন্ত্র বিশেষভাবে উপকারী। (২) জনসাধারণ শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বলিয়া বোধ করে সেই পরিবর্ত্তনসাধন সহজ বলিয়া হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন হয়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারাবাহিকতা এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে গৃহযুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহার পর এই তিনশত বৎসরের মধ্যে তথাকার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কতই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে কিন্তু উহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঠিকই আছে অথচ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে প্রগতি হইয়াছে প্রভৃত।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের অপগুণ বা অনমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ—অনমনীয় শাসনতন্ত্রের তুলনায় নমনীয় শাসনতন্ত্রের গোটাকয়েক ক্রটি পরিলক্ষিত হয়; (১) নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্ত্তনযোগ্য বলিয়া কোনো বিষয়ে সাময়িক উত্তেজনার বশে আইন পরিষদের উপর শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য চাপ পড়িতে পারে এবং উহার দ্বারা যে কোনো সময়ে যে কোনো শাসনতান্ত্রিক বিধি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহাতে শাসনতান্ত্রিক নিয়মের কোনো স্থায়িত্ব থাকে না এবং যখন তখন জনসাধারণের খেয়াল-

খুশীমত অবিবেচনাপ্রসূত সংশোধন সাধিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় শাসনতন্ত্রের নমনীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষা উৎকর্ষ রহিয়াছে। অনমনীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন সহজসাধ্য নহে বলিয়া কোনো প্রস্তাবিত সংশোধন সম্পর্কে দেশের মধ্যে বহু আলাপ, আলোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে; এবং যে সংশোধনগুলি সাধিত হয় সেগুলি ভবিষ্যতের দিক হইতে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ইহা নির্দ্দিষ্টভাবে বুঝিয়া তবেই করা হইয়া থাকে। (২) নমনীয় শাসনতন্ত্রকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থ বা সুবিধামত পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টিত হয়। যে দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তখন সে দল নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে. কিন্তু যে শাসনতন্ত্র সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি তাহা রাজনৈতিক দলসমূহের ক্রীড়নকে পরিণত হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গলের পক্ষে উহা ক্ষতিকর হয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য দুরূহ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন বলিয়া শাসনতন্ত্রকে রাজনৈতিক দলগুলির ক্রীড়নকে পরিণত করা সহজ হয় না।

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের অপগুণ—(১) অনমনীয় শাসনতন্ত্রের যথাসময়ে পরিবর্ত্তন সাধন দুরূহ বলিয়া বহুক্ষেত্রে বিপ্লব বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। জনগণের মধ্যে অধিকাংশের যদি দৃঢ় ধারণা থাকে যে শাসনতন্ত্রের কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ঐ পরিবর্ত্তন সাধনের যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে তাহা হইলে জনগণের অসন্তোষ ও অধৈর্য্য বিদ্রোহে রূপায়িত হইতে পারে। (২) কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজনৈতিক জীবনের মূল নীতিগুলি চূড়ান্তভাবে কোনো দলিলে গ্রথিত করা সম্ভব হয় না; অনমনীয় শাসনতন্ত্র ইহারই চেষ্টা করে। অনমনীয় শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া, ভবিষ্যৎ নাগরীকদিগের পক্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামো অবাধে নিয়ন্ত্রণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

Questions & Hints.

1. What is meant by the 'Constitution of a State'? Distinguish between "Rigid" and 'Flexible' constitutions and compare their merits and demerits (1945) [অনু-১ ; অনু-৩ "সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে" পর্য্যন্ত ; অনু-৪]

2. Distinguish between rigid and flexible constitutions. How can the constitutions of (a) Great Britain, (b) India, be amended ? (1939) [অনু-৩]

3. What is meant by the 'Constitutions of a State'? Distinguish between rigid and flexible constitutions. Give illustrations. (1948) [অনু-১ : অনু-৩]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শাসন প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সমূহ

Organs of Government

(অণুচ্ছেদ-১) শাসন প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সমূহ—*Organs of Government*

প্রত্যেক শাসন প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি তিন পর্য্যায়ের কার্য্য থাকে এবং এই তিন পর্য্যায়ের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক শাসন প্রতিষ্ঠানের তিন প্রকার ব্যবস্থা বা আয়োজন করিতে হয়। প্রথমতঃ, শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। আইনের মাধ্যমেই শাসন প্রতিষ্ঠান তাহার নিজের কার্য্যকলাপ পরিচালিত করে এবং জনহিতকর কার্য্য যাহা কিছু সম্পন্ন করা হয় তাহাও যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা হইয়া থাকে। শাসন প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন করিয়া তাহার নিজ কর্ম্মচারীদিগকে কোনো কার্য্য করিতে অথবা কোনো কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে নির্দ্দেশ দেয়। আইনের মাধ্যমে নাগরীকদিগের কর্ত্তব্য, দায়িত্ব এবং অধিকার নির্দ্ধারিত করা হয়—অর্থাৎ নাগরিকদিগের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত এবং সুসংবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল আইন কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। এইগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মানিয়া চলিতেছে কিনা,—আইন অনুসারে যথারীতি কার্য্য হইতেছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। যদি কেহ আইন মান্য না করে তাহা হইলে আইন মান্য করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করাইতে হইবে। কারণ, আইন যথাযথভাবে মান্য করা না হইলে উহা প্রণয়ন করা নিরর্থক। তৃতীয়তঃ, শাসন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যথাযথ আইনের বিধান অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে নাই বা ইচ্ছাপূর্ব্বক আইন অমান্য করিয়াছে এরূপ অভিযোগ কাহারও বিরুদ্ধে আসিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করা উচিত নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির আইন মান্য না করিবার অপরাধ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ

প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী শাস্তির বিধান করা প্রয়োজন। অপরাধের গুরুত্বের সহিত শাস্তির কঠোরতার যাহাতে সমতা থাকে তাহা দেখিতে হইবে। অধিকন্তু কোনো নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে যাহাতে অপরাধী হিসাবে শাস্তি পাইতে না হয় তাহার জন্যও ন্যায় বিচারের প্রয়োজন।

প্রত্যেক আধুনিক রাষ্ট্রে তিন প্রকারের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনটী বিভাগ গঠিত থাকে। আইন প্রণয়ন করিবার জন্য গঠিত হয় আইন পরিষদ (Legislature), আইন কার্য্যকরী করে যে বিভাগ উহার নাম শাসন পরিষদ (Executive) এবং ন্যায় বিচারের জন্য থাকে বিচার ব্যবস্থা (Judiciary)। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট হইল আইনপরিষদ, মন্ত্রীগণ (সরকারী কর্ম্মচারীগণ সমেত) শাসন পরিষদ রূপে পরিচিত এবং বিচারকগণ যুক্তভাবে বিচার ব্যবস্থা বা বিচারকমণ্ডলী (Judiciary) রূপে গণ্য হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস হইল আইন পরিষদ, রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার সচিববর্গ (তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারী সমেত) হইলেন শাসনপরিষদ এবং সুপ্রীম কোর্ট, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সমূহ লইয়া বিচারব্যবস্থা সংগঠিত। ভারতবর্ষের পার্লামেণ্ট হইলেন আইনপরিষদ, রাষ্ট্রপতি এবং তাঁহার মন্ত্রীপরিষদ (তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারী সমেত) হইলেন শাসন পরিষদ এবং সুপ্রীম কোর্ট, উচ্চ আদালতসমূহ ইত্যাদি লইয়া বিচার ব্যবস্থা গঠিত।

(অনু-২) **ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের মতবাদ**—*Theory of Separation of Power*

রাষ্ট্র সংগঠনের প্রথম আমলে, রাষ্ট্রনেতা বা শাসক যিনি থাকিতেন তিনি স্বয়ং তিন প্রকার ক্ষমতাই ব্যবহার করিতেন। শাসক ছিলেন একাধারেই শাসন-তত্ত্বাবধায়ক, আইন প্রণেতা ও বিচারক। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে এই তিনপ্রকার ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিলে তাঁহার পক্ষে ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠান করা অতি সহজ হয়; ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যেখানে সহজ, প্রলোভনও সেখানে অধিক।

সেই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের কেহ কেহ, আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা, শাসনক্ষমতা, এবং বিচারক্ষমতা, এই তিনপ্রকার ক্ষমতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হউক বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছেন। ইহার নাম ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধানের মতবাদ (Doctrine of Separation of Powers)। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে কোনো একজন ব্যক্তি ঐ ক্ষমতা তিনটীর একটীই মাত্র ব্যবহার করিবে; একটীর অধিক ক্ষমতা একজন

ব্যক্তির নিকট বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থাকিবেনা এবং একটী ক্ষমতার অধিকারী অপর ক্ষমতার অধিকারীর অধীনস্থ হইবে না। প্রত্যেকেই তাহার নিজ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া নিজ কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ফরাসী মনীষী **মণ্টেস্কুই** (Montesquieu) ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের মতবাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত পরিপোষক ছিলেন। মণ্টেস্কুই তাঁহার রচিত "স্পিরিট অফ দি লজ" (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) নামক পুস্তকে, এই মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যখন আইন প্রণয়নের এবং শাসনের ক্ষমতা একই ব্যক্তির বা কর্ম্মাধ্যক্ষসঙ্ঘের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ উহার দ্বারা এই ভীতির উদ্রেক হইতে পারে যে শাসক বা পরিষদ অত্যাচার-সূচক আইন প্রণয়ন করিবেন এবং নিপীড়নের সহিতই সেগুলিকে কার্য্যকরী করিবেন। আবার তখনও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না যখন নাকি বিচারকের ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা হইতে স্বতন্ত্র করা না হইবে।" ইংরাজ আইনবিদ 'ব্ল্যাক্‌ষ্টোন' অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত বলিয়া অভিমত প্রদান করেন।

সমালোচনা—আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের মতবাদের বিবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে (১) শাসন প্রতিষ্ঠানের তিনটী ক্ষমতার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রস্তাব বাস্তবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে। শাসন প্রতিষ্ঠানের তিনটী বিভাগ যদি পরস্পরের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া, সহযোগিতা করিয়া, একে অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া না থাকে—তাহা হইলে শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। শাসন প্রতিষ্ঠান যেন একটী প্রাণীদেহ; প্রাণীদেহের সকল ইন্দ্রিয় যেমন পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীল থাকিয়া ও সহযোগিতা করিয়া না চলিলে, সমগ্র দেহের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না, সেইরূপ শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত না করিলে বা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা পরায়ণ না হইলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান বাস্তবক্ষেত্রে কাম্য হইতে পারে না। (২) এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবিধান বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে। শাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে এই ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা এবং বিভিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনটী বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভবই নহে। দায়িত্বশীল শাসন-

ব্যবস্থায় (যথা গ্রেট ব্রিটেনে) শাসন পরিষদ (Executive) আইন পরিষদ বা পার্লামেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; এইরূপ দেশে শাসন পরিষদকে আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করা সম্ভব নহে। আবার আইন পরিষদের অধিবেশন যে সময়ে না হইতেছে, ঠিক সেই সময়েই জনগণের স্বার্থের জন্য যদি কোনো জরুরী আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শাসন কার্য্যে রত শাসন পরিষদকে ঐ জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া দিতে হয়—ইহা ভিন্ন উপায় থাকে না। এইরূপ একাধিক বিষয়ে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। (৩) এই মতবাদের প্রচারকগণ ইহার যৌক্তিকতা স্বরূপ বলিয়াছেন যে ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য এইরূপ স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির স্বাধীনতা কোনো শাসন-তান্ত্রিক কৌশলের উপর যতটা না নির্ভর করে ততটা নির্ভর করে রাষ্ট্রের নাগরিক-দিগের স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ বা স্বাধীনতা স্পৃহার (Spirit of liberty) উপর। (৪) ইহা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার পক্ষে হানিকরই হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটাকয়েক মূলরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে বিচারক জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, শাসকবর্গের দ্বারা মনোনীত হইবেন না। ফলে বিচারক নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে যে দলীয় কলহ, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহা বিচার ব্যবস্থাকে কলুষিত করে। ন্যায় বিচারের জন্য স্থাপিত বিচার ব্যবস্থা কলুষিত হইলে সাধারণ ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা খর্ব্ব করাই হয়। (৫) প্রত্যেক রাষ্ট্রেই, জনগণের সমবেত ইচ্ছার আধাররূপে আইনপরিষদকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদরূপে থাকিতেই হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আইন পরিষদ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারীরূপে থাকে—আর কিছুর জন্য না হউক অন্ততঃ এই কারণে যে আইন পরিষদই রাষ্ট্রের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার চূড়ান্ত অধিকারী। অপর দুইটী পরিষদ আইন পরিষদের সহিত সমান ক্ষমতা ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে না।

(**অনু-৩**) **আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য-বিধান** - *Separation in Modern States*

(১) **গ্রেট ব্রিটেন** (Great Britain)—গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট হইলেন আইন পরিষদ, যাঁহাদের কার্য্য হইল আইন প্রণয়ন করা, মন্ত্রীপরিষদ হইলেন শাসন পরিষদ যাঁহাদের কার্য্য হইল আইন সমূহ কার্য্যকরী করা এবং রাষ্ট্রের বিচারকদিগকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় বিচার ব্যবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে ঐ তিন প্রকার ক্ষমতা স্বতন্ত্র

হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্বাতন্ত্র্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। কারণ, মন্ত্রীসভা তাঁহাদের কার্য্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী এবং পার্লামেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; উপরন্তু মন্ত্রীগণ পার্লামেণ্টেরই সদস্য। যিনি মন্ত্রী তিনি একাধারেই শাসন পরিষদের সদস্য আবার আইন পরিষদের মধ্যেও অন্তর্ভূক্ত। মন্ত্রীগণ সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders in Council) নামক জরুরী আইন জারী করিয়া থাকেন—অর্থাৎ পার্লামেণ্টই একমাত্র আইন প্রণয়নকারী পরিষদ নহে। আইন পরিষদের উর্দ্ধতন সভা, অর্থাৎ লর্ড সভা, বিচার কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদালত এবং একজন মন্ত্রী অর্থাৎ লর্ড চ্যান্সেলর সমগ্র বিচার ব্যবস্থার প্রধান। তবে গ্রেট ব্রিটেনে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

(২) **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**—(U. S. A) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যাহাতে আইন পরিষদ, শাসন পরিষদ এবং বিচারকমণ্ডলী পৃথক ভাবেই থাকে। কার্য্যতঃ কিন্তু একাধিক বিষয়ে একটী বিভাগ অপর বিভাগের কার্য্য প্রভাবান্বিত করিতে বা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বোচ্চ আদালত আইন পরিষদের কোনো কোনো আইন বা শাসন পরিষদের কোনো কোনো কার্য্যকে ক্ষমতা বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদের আইন প্রণয়নের কার্য্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। সিনেট অর্থাৎ আইন পরিষদের উর্দ্ধকক্ষ শাসন পরিষদের বিভিন্ন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে।

(৩) **ভারতবর্ষ**—(India) ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীয় শাসন এবং প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে আইন পরিষদ, শাসন পরিষদ ও বিচার ব্যবস্থা এই তিন বিভাগ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু ইহাদের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিধান নাই। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপালের হস্তে এবং প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশ পালের হস্তে (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে) তিন বিভাগের ক্ষমতাই বহু পরিমাণে ন্যস্ত ছিল; তাঁহারা আইন জারী করিতে পারিতেন, ঐ আইন বলবৎ করিবার দায়িত্বও ছিল তাঁহাদের এবং যে কোনো ব্যক্তিকে তাঁহারা অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতির এবং প্রদেশপালের ক্ষমতা বহু পরিমাণে আইন পরিষদ এবং মন্ত্রীপরিষদ প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু এখনও শাসন পরিষদের (গভর্ণর এবং মন্ত্রীপরিষদ) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে এবং বিচার ব্যবস্থার উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা আছে। তদ্ভিন্ন, মন্ত্রীপরিষদ আইন পরিষদের

অংশবিশেষ এবং তাঁহাদের নিকট দায়ী। অবশ্য নূতন শাসনতন্ত্রে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে পার্থক্য বিধানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

(অনু-৪) শাসন-পরিষদ, ইহার কার্য্যাবলী ও গঠনপদ্ধতি—
Executive, its functions and organisation

কার্য্যাবলী—(Functions)—শাসনপ্রতিষ্ঠানের সেই বিভাগটী হইল শাসনপরিষদ যাহার কর্ত্তব্য হইল আইন সমূহকে কার্য্যকরী করা এবং দৈনন্দিন শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করা। ইহার ক্রিয়াকলাপ বিভিন্নমুখী। (১) রাষ্ট্রকে কোনো বৈদেশিক শক্তি যাহাতে আক্রমণ করিয়া পদানত করিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা শাসন পরিষদের কার্য্য। উহার জন্য শাসন পরিষদ সৈন্যবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী গঠন করে এবং ঐ সকল বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচালনা সম্পর্কে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। (২) আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ কার্য্য যাহাতে কেহ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ইহা পুলিশ বাহিনী এবং গুপ্তচর বাহিনী গঠন ও তত্ত্বাবধান করে। (৩) অপর রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়াকলাপের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রগুলিতে দূত এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং তাহাদের দূত ও প্রতিনিধিকে স্থান দেয়। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই কার্য্য শাসন পরিষদই করিয়া থাকে। উপরন্তু, অপর কোনো রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো চুক্তি সম্পাদন করিতে হইলে তাহা শাসন পরিষদই করিয়া থাকে। (৪) বহু রাষ্ট্রে শাসন পরিষদ আইন পরিষদের কার্য্য কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু পরিমাণে আইন প্রণয়নও করিয়া থাকে। এই সকল রাষ্ট্রে মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার মারফৎ আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন বা স্থগিত রাখেন ; এমন কি আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের দ্বারা নূতন আইন পরিষদ গঠনেরও নির্দ্দেশ দিতে পারেন। (৫) বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও শাসন পরিষদের করণীয় কার্য্য থাকে। একাধিক রাষ্ট্রে বিচারকগণ শাসনপরিষদের দ্বারাই নিযুক্ত হন এবং অনেক সময়ে বিচারকগণ যাহাকে শাস্তি দিলেন শাসন পরিষদ তাহার শাস্তি মকুব করিয়া দিতে পারেন।

গঠন পদ্ধতি (Organisation)—রাষ্ট্রের যিনি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তিনিই শাসন পরিষদের প্রধান বলিয়া গণ্য। এই প্রধান শাসকের অধীনে একাধিক মন্ত্রী বা সচিব নিযুক্ত থাকেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্ম্মচারী নহেন, তাঁহারা রাজনৈতিক অস্থায়ী কর্ম্মচারী। ইহারা একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন

দপ্তর (Departments) পরিচালনা করেন। ইঁহাদের অধীনে প্রত্যেক দপ্তরের জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী থাকেন—তাঁহারা রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্ম্মচারী এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কশূন্য। যে দলের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নিযুক্ত হউন না কেন সকল মন্ত্রীর অধীনেই ইঁহারা সমান আনুগত্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

মোটামুটি সকল রাষ্ট্রেই শাসন-প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহক অংশের এইরূপ গঠন পদ্ধতি হইলেও বিস্তারিত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ** রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্তার সম্পর্কে পার্থক্য বিদ্যমান। **বংশানুক্রমে** রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্তার পদ অলঙ্কৃত হইতে পারে যথা ইংলণ্ড বা জাপানের রাজা। তবে আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় এইরূপ প্রধান কর্ম্মকর্তার পদ ক্ষমতাশূন্য,—নাম আছে মান আছে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা নাই। অথবা **নির্ব্বাচনের** দ্বারা প্রধান কর্ম্মকর্তার পদ পূরিত হইতে পারে। তবে এই নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন হইতে পারে যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল-রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন অথবা পরোক্ষ নির্ব্বাচন হইতে পারে—যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন। **দ্বিতীয়তঃ** মন্ত্রীপরিষদের নিয়োগ এবং উহার সহিত আইন পরিষদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সচিবসঙ্ঘমূলক শাসনব্যবস্থায় (Cabinet Government) সচিবগণ আইনপরিষদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা আইন পরিষদের নিকট দায়ী। কিন্তু রাষ্ট্রপতিমূলক শাসনব্যবস্থায় (Presidential Government) সচিবগণ আইন পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন না এবং তাঁহারা কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন।

(অনু-৫) বিচার-ব্যবস্থা—ইহার কার্য্যাবলী ও গঠন পদ্ধতি—

Judiciary, its functions and organisations

কার্য্যাবলী—জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়; এই ন্যায় বিচারের জন্যই আদালত গঠিত হয় এবং বিচারপতি নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রের মধ্যে যত বিচারালয় আছে সেইগুলিকে এবং তাহাদের বিচারপতিগণকে যুক্তভাবে বিচারব্যবস্থা (Judiciary) বলা হইয়া থাকে। বিচারকদিগের কার্য্য হইল (১) যাহারা রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে নাই অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাদিগের বিচার করা—অর্থাৎ তাহারা সত্যই আইন অমান্য করিয়াছে কিনা তাহা বিশ্লেষণ করা, করিয়া থাকিলে আইনের বিধানমত তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা অথবা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া

দেওয়া। এক্ষেত্রে বিচারক রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনকে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন বলা চলে—প্রচলিত আইনের মাপকাঠির দ্বারা বিশেষ ব্যক্তির কোনো বিশেষ কার্য্যকে বিচারক পরিমাপ করেন এবং উহার ফলাফল বণ্টন করিয়া দেন। (২) বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার সময়ে বিচারপতিকে অনেক ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হয়। আইনের ভাষায় কখনও কখনও অস্পষ্টতা থাকিতে পারে অথবা একই শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে। এক্ষেত্রে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত—উভয়েই স্বপক্ষের সুবিধা হয় এরূপ ভাবেই ঐ আইনের অর্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। তখন বিচারক তাঁহার নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সেই অনুযায়ী মামলার বিচার করেন। বিচারকের দ্বারা আইনের ভাষার ব্যাখ্যা প্রদান আপাত দৃষ্টিতে সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বিচারক নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে পারেন। একজন বিচারক কোনো আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন পরবর্ত্তী সময়ে অন্যান্য বিচারকগণের নিকট অনুরূপ মামলা উপস্থিত হইলে তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী মামলার বিচার করেন। এইভাবে একজন বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যা অন্যান্য বিচারপতিদের দ্বারা অনুসৃত হইয়া আইনে পরিণত হয়। (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ আদালত শাসনতন্ত্রের রক্ষকরূপে অবস্থান করে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া যাহাতে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই দিকে ইহা দৃষ্টি রাখে এবং উহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি করে। (৪) কোনো কোনো রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ আদালত আইন সংক্রান্ত বিষয়ে শাসকবর্গকে পরামর্শ দানের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। ভারতবর্ষে সুপ্রীম কোর্ট এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া বিধান আছে।

গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের বিচার ব্যবস্থার গঠনপদ্ধতিতে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবে উহাদের মধ্যে গোটাকয়েক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ আদালত সমূহকে উচ্চতর এবং নিম্নতর আদালতরূপে ক্রমোন্নত স্তরে গঠন করা হয়। নিম্নতর আদালত হইতে উচ্চতর আদালতে আপীল করিবার আয়োজন থাকে এবং চূড়ান্ত আপীলের জন্য একটী সর্ব্বোচ্চ আদালত গঠিত থাকে। দ্বিতীয়ত. আদালত সমূহকে সাধারণতঃ একাধিক পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয় এবং এইরূপ বিভাগের, সাধারণ রূপ হইল : দেওয়ানী এবং ফৌজদারী। চুরি, ডাকাতি, হিংসাত্মক কার্য্য প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার ফৌজদারী আদালতে হইয়া থাকে এবং দেওয়ানী আদালতে

ঋণ, সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত মামলার বিচার হয়। তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দুই শ্রেণীর আদালত থাকিতে পারে—প্রাদেশিক আদালত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। অবশ্য প্রাদেশিক আদালতের বিচারপতিগণকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োজন মত প্রয়োগ করিতে হয় এবং প্রাদেশিক আইনের উর্দ্ধে উহাকে প্রাধান্য দান করিতে হয়।

বিচারক নিয়োগেব তিন প্রকার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়: (১) জনসাধারণ বিচারককে নির্ব্বাচিত করিতে পারেন যেরূপ আইন পরিষদের সদস্যগণকে নির্ব্বাচিত করা হয়। বিচারক নিয়োগের এই পদ্ধতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মূলরাষ্ট্রগুলিতে প্রচলিত। (২) আইন পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা বিচারক নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতিগণ উক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। (৩) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত পদ্ধতি হইল শাসন পরিষদের দ্বারা বিচারক মনোনয়ন। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইহা আপত্তিকর মনে হইতে পারে এই হিসাবে যে ইহার দ্বারা বিচারকমণ্ডলী শাসনপরিষদের তাঁবেদারে পরিণত হইতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ঘটে না কারণ শাসন পরিষদ বিচারক নিয়োগ করিবেন কিন্তু বিচারককে নিজ ইচ্ছামত পদচ্যুত করিতে পারিবেন না—এইরূপ নিয়ম সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত। নির্ব্বাচন অপেক্ষা এই পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর তাহার কারণ হইল: প্রথমতঃ নির্ব্বাচন জনপ্রিয়তার পরিমাপক হইতে পারে কিন্তু জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিমাপক হইবে, এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাচনে বিচারপতির স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ব্যাহত হয়, কারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে হইলে নির্ভয়ে এবং পক্ষপাতিত্বশূন্যভাবে কার্য্য করা চলে না।

(অনু-৬) আইন-পরিষদ,—ইহার কার্য্যাবলী ও গঠনপদ্ধতি—
Legislature, its Functions and Organisation

কার্য্যাবলী—প্রত্যেক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিভাগগুলির মধ্যে আইন পরিষদই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী পরিষদ বলিয়া গণ্য হয়। এই পরিষদের কার্য্য হইল নাগরিকদিগের এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। আইন পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়া এবং বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে প্রস্তাবগুলি অধিকসংখ্যক সদস্যের ভোট পায় সেইগুলি আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়। সচিবসঙ্ঘমূলক শাসনব্যবস্থায় আইনের প্রস্তাব সাধারণতঃ কেনো মন্ত্রী উত্থাপন

করিয়া থাকেন, যদিও সাধারণ সদস্যগণও আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতিচালিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্য নহেন, অতএব আইনের প্রস্তাব সাধারণ সদস্যের দ্বারাই উত্থাপিত হয়। তবে উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে তবেই উহা আইনরূপে কার্য্যকরী হয়। (২) সচিবসঙ্ঘমূলক শাসন ব্যবস্থায় আইনপরিষদ শাসন পরিষদকে অর্থাৎ মন্ত্রীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মন্ত্রীগণ তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী—আইন পরিষদের সংখ্যাধিক সদস্যের আস্থাভাজন থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইবে। (৩) আইন পরিষদ রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং উহার জন্য কত অর্থ রাষ্ট্রের নাগরীকদিগের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে, তাহা আইন পরিষদই নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। প্রতি বৎসরের প্রথমে শাসন পরিষদ আইন পরিষদের নিকটে সারা বৎসরের জন্য কত অর্থ ব্যয় এবং আয় প্রয়োজন তাহার একটী আনুমাণিক হিসাব (ইহার নাম বাজেট) দাখিল করেন। আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ঐ হিসাব অনুমোদন করিলে তবেই তদনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা সম্ভব। (৪) রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার অথবা বিচার করিবার ক্ষমতা আইন পরিষদ ব্যবহার করে। তদ্ভিন্নও ইংলণ্ডের লর্ড সভাকে তথাকার সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালতরূপে আমরা দেখিতে পাই। (৫) কোনো রাষ্ট্রে আইন পরিষদ কিছু কিছু শাসন ক্ষমতাও ব্যবহার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট রাষ্ট্রের উচ্চপদে কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বৈদেশিক চুক্তি অনুমোদন করিবার অধিকারী। বহু রাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতির নির্দ্ধারণে আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপ্ত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

গঠন পদ্ধতি একটী মাত্র সভায় বা পরিষদে আইন পরিষদ গঠিত থাকিতে পারে অথবা দুইটী পরিষদ লইয়া ইহা গঠিত হইতে পারে। যেখানে একটীমাত্র পরিষদ বর্ত্তমান সেখানে আইন পরিষদকে এক-কক্ষ (Unicameral) নামে অভিহিত করা হয় এবং দুইটী পরিষদ লইয়া আইন পরিষদ গঠিত হইলে উহাকে বলা হয় দ্বি-কক্ষ (Bicameral) আইন পরিষদ। এক-কক্ষ আইন পরিষদে, একটী মাত্র কক্ষই আইন পরিষদের সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে—যথা—আইন প্রণয়ন, মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। দ্বি-কক্ষ পরিষদ থাকিলে দুইটী পরিষদ যুক্তভাবে আইন পরিষদের কার্য্য নিষ্পন্ন করে যদিও দুইটী পরিষদের মধ্যে একাধিক বিষয়ে ক্ষমতার পার্থক্য থাকে।

দ্বি-কক্ষ আইন পরিষদে জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিষদটী নিম্ন-কক্ষ (Lower-House) নামে অভিহিত হয় এবং অপর পরিষদটী উর্দ্ধ-কক্ষ (Upper House) অথবা দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(ক) **নিম্নকক্ষ**—নিম্ন পরিষদের সদস্যগণ, যতদূর সম্ভব ব্যাপক ভোটদান ক্ষমতার (Franchise) ভিত্তিতে, জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা জনসাধারণের সত্যকার প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হন। সেই কারণে নিম্ন কক্ষের ক্ষমতা উর্দ্ধ কক্ষের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিকতর হইয়া থাকে। সাধারণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতাই থাকে কিন্তু মন্ত্রীসভার কার্য্য-নিয়ন্ত্রণে অথবা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে নিম্ন-কক্ষের ক্ষমতা সাধারণতঃ অধিক থাকে কারণ নিম্নকক্ষ সাধারণ লোকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কিন্তু উর্দ্ধ-কক্ষ গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের (অর্থাৎ ধনিকশ্রেণী এবং সমাজের উর্দ্ধস্তরের ব্যক্তিদের) লইয়া।

(খ) **উর্দ্ধকক্ষ**—বিশেষ ব্যক্তিদিগকে লইয়া উর্দ্ধকক্ষ গঠিত হয় বটে কিন্তু এই-রূপ ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া লইবার পদ্ধতি সকল রাষ্ট্রেই এক নহে,—উর্দ্ধকক্ষের গঠন পদ্ধতির মধ্যে নানা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে উহা গঠিত হইতে পারে—যথা ইংলণ্ডের লর্ড সভা। শাসন পরিষদ উর্দ্ধকক্ষের সদস্যগণকে মনোনীত করিতে পারেন যথা ক্যানাডার পদ্ধতি। অথবা কতিপয় বাছাই করা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা উর্দ্ধকক্ষের সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, যথা ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রাদেশিক আইন সভার উর্দ্ধকক্ষ।

(অণু ৭) উর্দ্ধকক্ষের যৌক্তিকতা—*Justification of the Upper House*

বিপক্ষে—দ্বিকক্ষ আইন পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত কি না, অর্থাৎ আইন-পরিষদের দ্বিতীয় বা উর্দ্ধ কক্ষ থাকা সঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে একাধিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটী মাত্র পরিষদই যথেষ্ট ; বাছাই করা অপর কতিপয় ব্যক্তি লইয়া গঠিত অপর একটী পরিষদের অস্তিত্বের পক্ষে কোনো যৌক্তিকতা নাই ; (১) বিখ্যাত ফরাসী লেখক **এ্যাবী সাইয়েম্‌** বলেন যে উর্দ্ধকক্ষ নিম্নকক্ষের সহিত এক মত হইলে উর্দ্ধ-কক্ষের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন এবং বাহুল্য মাত্র,—অর্থাৎ প্রতিনিধি-পরিষদ যাহা করিতেছে উর্দ্ধ-কক্ষ তাহাতেই সম্মতি দিয়া যাইতেছে এইরূপ ঘটিলে উর্দ্ধকক্ষের কোনো

প্রয়োজনই নাই ; উপরন্তু উর্দ্ধকক্ষ যদি নিম্ন কক্ষের কার্য্যে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে উর্দ্ধকক্ষের দ্বারা এইরূপ বাধা প্রদান রাষ্ট্রের পক্ষে অনিষ্টকর,—কারণ নিম্নকক্ষের কার্য্যে বাধা প্রদানের অর্থ হইল জনসাধারণের ইচ্ছাকে বাধা প্রদান করা (যেহেতু নিম্নকক্ষ জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত)। জনগণ যাহা চাহে তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করা সম্ভব নহে,—সম্ভব হইলেও উচিত নহে। (২) উর্দ্ধকক্ষের বিরুদ্ধবাদীরা আরও বলেন যে দুইটী কক্ষের মধ্যে কলহ বা মতবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে—সেক্ষেত্রে আইন পরিষদের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব উপস্থিত হইবে। (৩· অধিকন্তু উর্দ্ধকক্ষটী কায়েমী স্বার্থবাদীদিগের দ্বারা পূরিত হয়। ইহারা শ্রেণীগত স্বার্থ চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইহাদের কার্য্যের দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রের অপকার সাধিত হয়।

স্বপক্ষে—দ্বিকক্ষ পরিষদের সমর্থকগণ বলেন উর্দ্ধ কক্ষের অস্তিত্ব বিবিধ কারণে প্রয়োজনীয়। (১) অনেক সময়ে জনগণের মধ্যে কোনো একটী বিষয় লইয়া আকস্মিক আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং এই সাময়িক উত্তেজনার বশে জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত নিম্নকক্ষ ধীর স্থিরভাবে সকল দিক বিবেচনা না করিয়াই আইন প্রণয়ন করিয়া ফেলিতে পারে। সাময়িক উত্তেজনার বশে আইন প্রণয়ন এইরূপ ত্বরান্বিত করা ভবিষ্যতের দিক হইতে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। উর্দ্ধকক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে আইন প্রণয়নের কার্য্যে উহারও সম্মতি প্রয়োজন হয় এবং প্রত্যেক আইনের প্রস্তাব উভয় কক্ষের দ্বারাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কোনো আইনের প্রস্তাবকে দ্রুতগতিতে আইনে পরিণত করা সম্ভব হয় না—উহা সময়সাপেক্ষ। এই সময়ের মধ্যে জনগণের সাময়িক উত্তেজনা বা ভাবাবেগ প্রশমিত হইতে পারে এবং জাতি ধীর স্থির ভাবে সকল দিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয়। (২) নিম্নকক্ষ যে আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, উর্দ্ধকক্ষ সেইগুলিকে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া যতটা সম্ভব দোষত্রুটিমুক্ত করিয়া দিতে পারে। (৩) প্রতিনিধি-পরিষদের কার্য্যের পরিমাণ এতই অধিক এবং সময় এত অল্প যে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যত বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন সেরূপ বিস্তারিত আলোচনা করা উহার পক্ষে সম্ভব হয় না। উর্দ্ধকক্ষে ঐগুলির বিশদ আলোচনা হইয়া গেলে নিম্নকক্ষের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে সুসমঞ্জস এবং উৎকৃষ্ট আইন প্রণয়ন করা সম্ভব বা সহজ হয়। কোনো কোনো বিষয় থাকিতে পারে যাহা বিতর্কমূলক নহে—উহাদের সম্পর্কে উর্দ্ধকক্ষে সামান্য যাহা আলোচনা প্রয়োজন তাহা হইয়া গেলে

নিম্নকক্ষ নামমাত্র আলোচনা করিয়াই ঐ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (৪) জনগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দিতে হইলে একটী কক্ষের মধ্যে উহা করা সম্ভব হয় না উহার জন্য দুইটী পৃথক পরিষদ প্রয়োজন। কারণ একটী পরিষদের মধ্যে সকল শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করিলে উহা এতই বৃহৎ হইবে যে উহার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে আইন পরিষদরূপে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইবে না। (৫) একটী মাত্র পরিষদ থাকিলে উহা অপ্রতিহত ক্ষমতার বলে যদৃচ্ছ আচরণ করিতে পারে। এক কক্ষ-পরিষদ দায়িত্বহীন স্বৈর শাসকে পরিণত হয়। একটী মাত্র কক্ষের স্বৈর শাসন প্রতিরোধ করিবার জন্য দ্বিকক্ষ পরিষদের প্রয়োজন। (৬, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ যে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটী উর্দ্ধ-কক্ষ গঠন করা প্রয়োজন বলিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রদান করেন। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের উর্দ্ধকক্ষ অর্থাৎ সিনেট এইরূপ ভিত্তিতে গঠিত।

তবে উর্দ্ধকক্ষ এরূপ ভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাহাতে ইহা নিম্নকক্ষের কার্য্য-কলাপে অযথা বাধা সৃষ্টি করিতে প্রণোদিত না হয় অথচ নিম্নকক্ষের কার্য্য পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া উহা দোষত্রুটিমুক্ত করিতে পারে এবং উহার কার্য্যের গুরুদায়িত্ব লাঘব করিতে পারে। উপরন্তু ইহার গঠনপদ্ধতি এরূপ হওয়া বিধেয় যাহাতে উহা নিছক জমিদার ও ধনী ব্যবসাদার রূপ কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারাই পূর্ণ না থাকে এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে।

Questions & Hints

1. 'The business of a modern Government divides itself into three main parts—legislative, judicial and executive". Illustrate (1935) [অনু-১

2. What are the principal organs of Government and what are their respective functions ? (1937)

[অনু-১ এর শেষ কয় পংক্তি "প্রত্যেক আধুনিক রাষ্ট্রে"......"বিচার ব্যবস্থা গঠিত।"

[৪,৫ এবং ৬নং অনুচ্ছেদের কার্য্যাবলী]

3. State and criticize the theory of Separation of Powers (1948) [অনু ২]

4. Describe the functions of the different organs of a modern Government. Is it desirable in the interest of political liberty to have an absolute Separation of Powers ? (1941)

[৪, ৫, এবং ৬ নং অণুচ্ছেদের কার্য্যাবলী। ২ নং অণুচ্ছেদের সমালোচনার মধ্যে, (১), (৩), (৪)। উপরন্তু গ্রেট ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত—[অণু-৩, (১)]

5. How are the Powers of the modern State distributed ? (1938)

[অণু-১। অতঃপর ২ নং অণুচ্ছেদের "রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে কেহ কেহ" হইতে "নিজ কার্য্য সম্পাদন করিবে," এই কয় পংক্তি দিতে হইবে ; এবং বলিতে হইবে বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্রে এইরূপ সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হয় না এবং উহার উদাহরণ দিতে হইবে ৪, ৫ ও ৬ নং অণুচ্ছেদের কার্য্যাবলী হইতে।]

6. "The function of the Legislature is not merely the making of laws." What other functions does the Legislature in a democratic country discharge ? (1942) [অণু-৬ এর কর্য্যাবলী]

7. Discuss the reasons for the existence of the bicameral system of legislature. (1944) [অণু-৭]

8. Explain the doctrine of separation of powers. What are its limitations ? (1946) [অণু-২]

9. How far has Separation of Powers been carried out in (a) Great Britain, (b) U, S. A and (c) India ? [অণু-৩]

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

নির্ব্বাচকমণ্ডলী

The Electorate

(অণুচ্ছেদ-১) নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অর্থ—*Meaning of Elcctorate*

একটি রাষ্ট্রের যে সকল অধিবাসী ভোট প্রদান করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী, তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় নির্ব্বাচক মণ্ডলী। জনগণের পক্ষ হইতে কাহারা রাষ্ট্রের শাসন নির্ব্বাহ করিবে, আধুনিক গণতন্ত্রে, অর্থাৎ পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই কার্য্য সম্পন্ন করে। উপরন্তু কোন্ নীতি অনুযায়ী দেশ শাসন করা হইবে তাহাও নির্ব্বাচকমণ্ডলী স্থির করিয়া দেয়। আধুনিক সময়ে সুস্পষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে—উহা যে পরিমাণে ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নীতির সংঘাত। নির্ব্বাচকমণ্ডলী যে দলের সদস্যকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, সেই দলের নীতি ও কার্য্যক্রম দেশ শাসনে অনুসৃত হউক, ইহাই নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অভিপ্রেত বলিয়া গণ্য করা হয়। অতএব নির্ব্বাচকমণ্ডলী (১) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে এবং (২) রাষ্ট্র শাসনের নীতি নির্দ্ধারণ করে।

(অণু-২) নির্ব্বাচকমণ্ডলীর আয়তন—*Extent of the Electorate*

একটী রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই ভোটদানের অধিকারী হয় না,—অর্থাৎ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকে লইয়া গঠিত হয় না। আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই, এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে যে নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হওয়া উচিত কাহাদিগকে লইয়া,—রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ভোটদানের অধিকার থাকিবে, না, উহা থাকিবে নাগরিকদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তির মাত্র! অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা নাবালক, উন্মাদ অথবা গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত, তাহাদের এই অধিকার থাকিতে পারে না, কারণ তাহারা উহা যথোপযুক্ত

ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহাদের বাদ দিয়াও, কাহাদিগের উপর ভোটাধিকার (Franchise) অর্পিত হওয়া উচিত এ সম্পর্কে রাজনীতিবিদগণ বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। ভোটাধিকারের ভিত্তির উপরেই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিস্তৃতি নির্ভর করে।

(অণু-৩) ভোটাধিকারের ভিত্তি—*Basis of franchise*

ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একাধিক বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই অভিমত প্রদান করেন যে কোনোরূপ বাদ-বিচার না করিয়া সকল ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রদান করা চলে না; ভোটদানের সুযোগ প্রাপ্তি কোনো অধিকার বলিয়া বিবেচ্য নহে—ইহা নাগরিকদিগের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে যোগ্যতা বিচার করা প্রয়োজন। অপর পক্ষে লোকায়ত্ত সার্ব্বভৌমত্বের যাঁহারা পরিপোষক তাঁহারা বলেন যে ভোটদানের সুযোগ প্রাপ্তি হইল একটী অধিকার এবং প্রত্যেক নাগরিকের অন্যান্য অধিকারের সহিত এই অধিকারও বিদ্যমান। ইহাদের অভিমত অনুযায়ী, নাগরিক দিগের রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ভোটাধিকারকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার—মিল, লেকী প্রমুখ কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভোটদানের সুযোগকে নাগরিকদিগের একটী গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য গণ্য করিয়া ভোটাধিকারকে সীমাবদ্ধ করিবার পক্ষে অভিমত দিয়াছেন। তাঁহারা দুইটী বিষয়ের দ্বারা ভোটদানের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। ইহাদের মধ্যে একটী হইল (ক) শিক্ষা এবং অপরটী হইল (খ) সম্পত্তি।

(ক) **শিক্ষা**—ভোটদান ক্ষমতা 'শিক্ষার' দ্বারা সীমাবদ্ধ করার স্বপক্ষে তাঁহারা বলেন, যে অশিক্ষিত ব্যক্তি রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিতে অক্ষম। দেশের সমস্যা অনুধাবন করিতে তাহারা সমর্থ নহে এবং তাহারা যে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, এইরূপ আশা করাও বৃথা। **জন ষ্টুয়ার্ট মিল** বলেন যে যেসকল ব্যক্তি লিখিতে পড়িতে এবং পাটীগণিতের সাধারণ অঙ্ক কষিতে সক্ষম নহে এইরূপ ব্যক্তিদিগকে ভোটাধিকার প্রদান স্বীকার করা চলে না।

[অবশ্য মিল একথা বলেন নাই যে সমাজ সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোনো প্রয়াস করিবে না, কেবলমাত্র প্রচলিত অবস্থার মধ্যে যাহারা নিজ প্রচেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারাই ভোটাধিকার পাইবে এবং রাষ্ট্রীয়

জীবনে একটী স্বতন্ত্র ও বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে অবস্থান করিবে। 'মিল' বলেন "Universal teaching must precede universal enfranchisement,"—অর্থাৎ "সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের পূর্ব্বে সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রদান অবশ্য প্রয়োজনীয়।" ইহার দ্বারা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে সমাজের পক্ষ হইতে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস করিতে হইবে। ইহার কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে যাহাদের শিক্ষা নাই তাহারা নিজেদের সম্বন্ধেই যথাযথ যত্ন লইবার মতন সাধারণ কিন্তু প্রয়োজনীয় গুণ হইতে বঞ্চিত, সেহেতু সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে আধিপত্য করিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে দেওয়া চলে না। শিক্ষার দ্বারা ভোট প্রদানের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য মিল যে অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিনা প্রচেষ্টায় নিজেদের উদ্যোগেই যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে সেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ থাকিবে—মিল এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভোটদান ক্ষমতা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে বিস্তৃত করিবার পক্ষে আধুনিক সময়ে যে সকল যুক্তিতর্ক প্রদান করা হয়, সেগুলির অধিকাংশই 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের' নিকট হইতে গ্রহণ করা। 'মিলই' বলিয়াছিলেন যে, কোনো একজন সরকারী কর্ম্মচারীর খেয়াল খুশীমত কাহাকেও ভোটাধিকার প্রদান করা হইবে এবং কাহাকেও উহা প্রদান করা হইবে না, ইহা অপেক্ষা সকল ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে ভোটাধিকার প্রদান করা শ্রেয়ঃ।

'মিল' ন্যায়ের দাবীতেই ইহা দাবী করিয়াছিলেন যে জনগণ অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারী হইবে। সমাজের উপরেই তিনি শিক্ষাবিস্তারের ভার অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন,—হয় সম্পূর্ণভাবে না হয় আংশিকভাবেও ("either gratuitously, or at an expense not exceeding what the poorest who earn their living, can afford"); এবং এইরূপ ঘটিলে, যদি কেহ অশিক্ষিত বলিয়া ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে তবে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনগণের শিক্ষা-প্রাপ্তি যে অবশ্য প্রয়োজনীয় ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 'মিল' যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানে সমগ্র সভ্যজগতের দ্বারা স্বীকৃত। সেই কারণে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সরকার উদ্যোগী হন। আমাদের দেশেও সরকার এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন।

তবে শিক্ষার উপর ভোটাধিকার নির্ভরশীল হইবার পক্ষে 'মিল যে যুক্তি দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের সহিত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণ একমত

হইতে পারেন না। মিল বলিয়াছিলেন যে সমাজ যদি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না করে তাহা হইলেও সমাজের ত্রুটির দোহাই দিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোট-ক্ষমতা প্রদান করা চলেনা। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্ব্বে অবশ্যই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে—ইহাই ছিল 'মিলের' অভিমত। কিন্তু মিলের আলোচনার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর নাই যে শাসকবৃন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক জনগণকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিলে, তাহাদের পাপের ফল জনগণ কতদিন বহন করিবে, উহা হইতে জনগণের পক্ষে পরিত্রাণের কি উপায়?—একমাত্র উপায় বিপ্লব—কিন্তু যে ব্যবস্থার অবসানের জন্য বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী তাহা নিশ্চয় ত্রুটিপূর্ণ। অতএব জনগণের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া প্রথমে সকলকেই ভোটাধিকার প্রদান করা বিধেয়। পরে জনসাধারণের তাগিদেই লোকায়াত্ত সরকার তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে আন্তরিক প্রয়াস করিবে। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, 'মিলের' নিজ রাষ্ট্র ইংলণ্ডেও, ইহাই হইল ইতিহাস—প্রথমে জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়াছে, অতঃপর তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে একই সাথে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে।]

(খ) **সম্পত্তি** ভোটপ্রদানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা ভোটদাতার যোগ্যতার আরও একটী পরিমাপক নির্ণয় করেন—উহা হইল সম্পত্তি। যাহাদের সম্পত্তি আছে কেবলমাত্র তাহাদেরই ভোটদানের ক্ষমতা থাকা উচিত, সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নহে। ইহার কারণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও মঙ্গলের সহিত সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত, অতএব ভোটপ্রদানের সময়ে ইহারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে কাহাকে ভোট প্রদান করিলে রাষ্ট্র সুশাসিত হইবে এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধিত হইবে। সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে এই মনস্তত্ব ক্রিয়া করিবে না। অধিকন্তু, কেবল সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রকে কর (Taxes) প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে; সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে যাহারা কর প্রদান করে না সেই সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তিরা যদি ভোটাধিকার পায় তাহা হইলে যাহারা কর প্রদান করে না তাহারা রাষ্ট্রের ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার অধিকারী হইবে। ফলে, ব্যয়বাহুল্য ও অপচয়ের প্রেরণাই থাকিবে, ব্যয় সঙ্কোচের কোনো প্রেরণাই থাকিবে না।

(অনু-৪) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার—*Adult Suffrage*

বর্ত্তমান যুগের বহু চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্রনীতিক ভোটদান ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে শিক্ষা বা সম্পত্তির ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে ভোটাধিকার বণ্টন করা যায় না—যাহাদের শিক্ষা বা সম্পত্তি নাই তাহাদিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোনো যুক্তির দ্বারা সম্ভবও নহে উচিতও নহে। শিক্ষা ও সম্পত্তির দ্বারা ভোটদান ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত—এই অভিমতের ইঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন; এবং জনগণের সকলেরই ভোটাধিকার থাকা কর্ত্তব্য, এই অভিমত তাঁহারা যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থন করেন।

(ক) **ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করণের বিরুদ্ধ-সমালোচনা**—তাঁহারা বলেন যে (১) **শিক্ষার** দ্বারা ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করা চলে না; তাহার কারণ, যে-কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা এতই জটিল যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মাত্রই এই সকল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি সঠিক প্রণিধান করিতে পারে। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে যাহারা সামান্য কিছু লেখা পড়া জানে এবং যাহারা উহা জানেনা তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া বিশেষ কোনই লাভ হয় না—কিন্তু ক্ষতি হয় অধিক, কারণ আগত জনসাধারণের শাসনপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে; ভোটবঞ্চিত জনগণ শাসন প্রতিষ্ঠানকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হয় না। অধিকন্তু শাসকবর্গের কার্য্যের দ্বারা জনগণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখভোগ করিতেছে না দুঃখভোগ করিতেছে—তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ে তাহারা সুবিধা বোধ করে, না অসুবিধা বোধ করে, ইহা অনুভব করিবার ক্ষমতা সকল ব্যক্তিরই আছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের এই অভিজ্ঞতা হইতেই জনসাধারণ শাসকবর্গের যোগ্যতা সম্পর্কে এবং তাঁহাদের নীতির উপযোগিতা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারে; ইহাই যথেষ্ট। (২) **সম্পত্তি** সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে কেবলমাত্র সম্পত্তিশালী ব্যক্তির স্বার্থ রহিয়াছে ইহা মনে করা ভুল; রাষ্ট্রের সুশাসন ও স্থায়িত্বের সহিত সকল নাগরিকের স্বার্থই জড়িত। যে উহা মনে না করে সে নিছক রাষ্ট্রদ্রোহী। অধিকন্তু, রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণের সকল শ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায় হইয়া থাকে। অতএব জনগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইলে সাধারণ ব্যক্তি যে অপরের দ্বারা প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করিতেছে এই ধারণা অমূলক। আরও বিবেচনা করিতে হইবে যে সম্পত্তি থাকা সম্পত্তিশালী ব্যক্তির নিজস্ব কোনো গুণের পরিচায়ক হইবে,—এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই।

(খ) জনগণের সকলকেই ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে যুক্তি— (১) রাষ্ট্র হইল উহার সকল নাগরিকের প্রতিষ্ঠান,—উহা কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের প্রতিষ্ঠান নহে। অতএব রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সকল নাগরিকের উপরেই বর্ত্তায়; সেই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত—অর্থাৎ কি নীতি অনুযায়ী এবং কোন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে, উহা নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা থাকিবে সমগ্র জনসমষ্টির। সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের দাবী গণতন্ত্র হইতেই উদ্ভূত। (২) সাম্যের দিক হইতেও এই দাবী করা হইয়া থাকে। সাম্যের একটী অর্থ হইল যে নাগরিক হিসাবে যে অধিকার একজন ভোগ করিবে সে অধিকার ভোগ করিবে সকল নাগরিক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিকেই যদি ভোটদান ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তাহারা সে অধিকার ভোগের কি কারণ দেখাইবে? উহার কারণ যদি হয় যে তাহারা নাগরিক, তাহা হইলে উত্তর হইবে যে নাগরিকরূপে কেহই কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। (৩) রাষ্ট্রের মধ্যে যাহাদের ভোটাধিকার থাকেনা তাহারা অধিকারবিহীন ক্রীতদাসের ন্যায় বসবাস করিতে বাধ্য হয়। যাহাদের ভোট দিবার ক্ষমতা নাই, দেশের শাসকবৃন্দ তাহাদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করেন না। মন্ত্রী এবং প্রতিনিধিবর্গ সেই সকল ব্যক্তির সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন যাহাদের ভোটের উপর তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব বা প্রতিনিধিত্ব নির্ভর করিতেছে। ইহাতে ভোটবিহীন ব্যক্তিদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়। (৪) বহুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজা 'প্রথম এড্ওয়ার্ড' বলিয়াছিলেন, "যাহা সকলের সহিতই সম্পর্কিত তাহা সকলেরই মতসাপেক্ষ হওয়া উচিত।" এই কথাগুলি বর্ত্তমান যুগেও সমভাবেই প্রযোজ্য। শাসনকার্য্য কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং কিরূপ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহার উপর রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সুখ দুঃখ ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা উচিত কারণ ভোটদান ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া, শাসনকার্য্য কাহারা এবং কি নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করিবে, তাহা জনগণ স্থির করিয়া দেয়। (৫) কোনো বাদ বিচার না করিয়া সমগ্র জনসমষ্টিকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে জনগণের ব্যাপক সম্মতির উপরে শাসন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহাতে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং শাসকবর্গকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপসারণ করিবার সহজ পদ্ধতি বর্ত্তমান থাকায়, জনগণ সহসা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয় না।

এই সকল কারণে আধুনিক যুগের চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনীতিকগণ শিক্ষা বা সম্পত্তির

কোনো বাদবিচার না করিয়া জনসমষ্টির সকলকেই ভোটক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী। ইহা হইল সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Suffrage) ; তবে ইহারা সকলেই স্বীকার করেন যে একটী নির্দ্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত না হইলে কাহাকেও ভোট-ক্ষমতা প্রদান করা চলে না। [নাবালকগণ ভোটক্ষমতা পাইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন—ভোটাধিকার থাকিবে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদিগের (Adults) ; সেই ভোটাধিকার বণ্টনের এই ভিত্তিকে বলা হয় সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Suffrage) অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার (Adult suffrage) অথবা সার্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার (Universal adult suffrage)] উপরন্তু তাঁহারা স্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের অধিবাসীমাত্রেই ভোটাধিকার পাইতে পারে না, ভোটাধিকার থাকিবে কেবলমাত্র নাগরিকদের। বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া এবং ঘোরতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তদেরও ভোটাধিকার থাকিতে পারে না। অতএব ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত (১) নাগরিকতা (২) নির্দ্দিষ্ট বয়োপ্রাপ্তি (৩) সুস্থ মস্তিষ্কতা এবং (৪) নৈতিক অসাধুতা বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান না করিবার দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের পক্ষে উপরে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ প্রযোজ্য। সেই কারণে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে সার্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(অণু-৫) স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার—*Female Suffrage*

ভোটাধিকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কিনা, এ সম্পর্কে রাজনীতিবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। একাধিক রাজনীতিবিদ স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে অভিমত পোষণ করেন। তাঁহাদিগের মতে গৃহ সংসারই হইল স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র— তাহাদের পক্ষে বহির্জ্জগতের ব্যাপক ক্ষেত্রে বাস্তব রাজনীতির সংঘাতের মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন নহে। রাজনৈতিক জীবনে তাহারা জড়িত হইয়া পড়িলে পারিবারিক জীবন অবহেলিত হইবে এবং যে মৌলিক শ্রম বিভাগের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হইয়াছে তাহা বিলুপ্ত হইবে। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের রাজনৈতিক মতামতের জন্য তাহারা তাহাদের পিতা অথবা স্বামী অথবা অপর কোনো পুরুষ আত্মীয়ের উপর নির্ভরশীল হইবেই, সুতরাং তাহাদিগকে ভোটাধিকার প্রদান করা নিরর্থক। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদে পার্থক্য থাকিলে সাংসারিক অশান্তিরও সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে নিম্নরূপ যুক্তিপ্রদর্শন করা যাইতে পারে : (১) উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে নারীও পুরুষের ন্যায়ই জীবনের নানাক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বল হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে তাহারা পুরুষ অপেক্ষা হীন নহে। অতএব রাষ্ট্রীয় জীবনে উহাদিগকে অধিকার-বঞ্চিত করিয়া রাখা সঙ্গত নহে। (২) সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যদি সমগ্র জনসমষ্টির উপর বর্ত্তায় তাহা হইলে নারীও জনসমষ্টির একাংশ বিধায় সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার হইবার অধিকারী। অতএব সেই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্দ্ধারণে নারীরও অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। (৩) রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের দ্বারা নারীদের জীবনও প্রভাবান্বিত। সেইজন্য রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় নারীর বক্তব্য থাকা উচিত। বস্তুতপক্ষে নারী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সহিত, দক্ষ শাসন কার্য্যের সহিত, তাহাদের স্বার্থ অধিকতর জড়িত। রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য দক্ষভাবে পরিচালিত হইবার সহিত তাহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত, সুতরাং তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা সঙ্গত নহে। (৪) ভোটাধিকার পাইলে নারীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইবে এবং প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে পুরুষ ও নারী সকলেই রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিবে। ইহাতে সমগ্র সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিবে।

অধিকন্তু নারীর ভোটাধিকারের স্বপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করা চলে যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকিবার দরুণ সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়মকানুন পুরুষের দ্বারাই প্রণীত হইয়াছে, নারীর মতামতের ছাপ তাহারা বহন করে না। এই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য নারীর ভোটাধিকার প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মানী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

(অনু-৬) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্ব্বাচন—*Direct and Indirect Election*

নির্ব্বাচনের দুইপ্রকার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়—প্রত্যক্ষ (Direct) এবং পরোক্ষ (Indirect). প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকগণ তাহাদের নিজস্ব ভোটের দ্বারাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। একবার মাত্র নির্ব্বাচন হয়, উহাই চূড়ান্ত নির্ব্বাচন এবং উহার দ্বারাই জনসাধারণ সরাসরিভাবে তাহাদের প্রতিনিধি কে হইবে, তাহা স্থির করিয়া দেয়। অপরপক্ষে পরোক্ষ নির্ব্বাচনে সাধারণ নির্ব্বাচকগণ তাহাদের নিজস্ব

ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে না, তাহারা তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে অপর একদল লোকের মাধ্যমে। এই অপর লোকগুলিকে একত্রিত-ভাবে মাধ্যমিক নির্ব্বাচকসঙ্ঘ (Electoral College) বলা হইয়া থাকে। পরোক্ষ নির্ব্বাচনে দুইবার নির্ব্বাচন হইয়া থাকে—প্রাথমিক ও চূড়ান্ত। প্রথমে, সাধারণ নির্ব্বাচকগণ সকলেই ভোট প্রদান করিয়া জনকয়েক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া দেয় (প্রাথমিক নির্ব্বাচন); পরে এই জনকয়েক ব্যক্তি (ইহারা হইল মাধ্যমিক নির্ব্বাচকসঙ্ঘ) আর একটী নির্ব্বাচনের দ্বারা, জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্থির করিয়া দেয় কাহারা জনগণের প্রতিনিধি হইবে (চূড়ান্ত নির্ব্বাচন)। অর্থাৎ

জনসাধারণ —নির্ব্বাচন করিল→ অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে —ইহারা নির্ব্বাচন করিল→ প্রতিনিধিদিগকে

(মাধ্যমিক নির্ব্বাচক সঙ্ঘ)

কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে :—

জনসাধারণ —নিজস্ব ভোটের দ্বারাই সরাসরিভাবে নির্ব্বাচন করিল→ প্রতিনিধিদিগকে

প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের গুণ—(১) প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন প্রার্থীগণ জনগণের ভোটের দ্বারা সরাসরি ভাবে নির্ব্বাচিত হন বলিয়া তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হন এবং সাধারণের নিকটে রাষ্ট্রীয় সমস্যার বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করেন। জনসাধারণের ভোটের উপরেই যখন তাঁহাদের নির্ব্বাচনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে তখন তাঁহারা জনসাধারণের নিকট নিজ নিজ নীতি এবং কার্য্যতালিকা ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেকে নিজস্ব অভিমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অপরের অভিমতের সমালোচনাও করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যাখ্যা এবং বাক্‌বিতণ্ডা হইতে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। (২) জনসাধারণ নিজস্ব ভোটের দ্বারা সরাসরি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে বলিয়া, জনগণ এবং প্রতিনিধির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভূত হয়। জনগণ প্রতিনিধিদিগকে তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি বলিয়া আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং সেহেতু এই প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা পরিচালিত শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের স্বতস্ফূর্ত্ত আনুগত্য থাকে। প্রতিনিধিগণও সরাসরিভাবে জনসাধারণের নিকট দায়িত্ববোধ করেন এবং সেহেতু সাধারণ ব্যক্তির কল্যাণকে আদর্শরূপে গণ্য করিতে ও জনমত অনুযায়ী কার্য্য করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। (৩) প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতি সাধারণ ব্যক্তিকে আত্মমর্য্যাদা প্রদান করে। সাধারণ

ব্যক্তি যখন মনে করে যে তাহার ভোটের এরূপ দাম যে উহার দ্বারা আইনপরিষদের সদস্য বা রাষ্ট্রের শাসক নির্ব্বাচন করা চলে তখন তাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজেদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ইহা তাহাদিগের আত্মসম্মানবোধ জাগরূক করে এবং তাহাদিগকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলে। সাধারণ ব্যক্তির এই দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মচেতনাই গণতন্ত্রের ভিত্তি।

প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের অপগুণ এবং পরোক্ষ নির্ব্বাচনের গুণ–(১) জনসাধারণ বিভিন্ন নির্ব্বাচন-প্রার্থীর নীতি ও কর্ম্মতালিকার, এবং তাহাদের যোগ্যতার যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম নহে। তাহারা নির্ব্বাচন প্রার্থীদের বাক্য বিন্যাসে প্রলুব্ধ হইয়াই ভোট প্রদান করিতে পারে; সেই কারণে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে অযোগ্য ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন—এইরূপ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পরোক্ষ নির্ব্বাচনে সাধারণ অপেক্ষা অধিক উচ্চস্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তির হস্তেই চূড়ান্ত নির্ব্বাচনের ভার থাকায়, নির্ব্বাচন প্রার্থীদের যোগ্যতার বিচার বিশ্লেষণ করিয়াই নির্ব্বাচন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। (২) সাধারণ ব্যক্তি শুধুই যে অপরের যোগ্যতা পরিমাপ করিতে অক্ষম তাহাই নহে, তাহারা অত্যধিক ভাবপ্রবণ এবং সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে; অতএব তাহাদের নির্ব্বাচন হইবে অবিবেচনা প্রসূত—উহাতে যথার্থ জনমতের প্রতিফলন হইবে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি জনতার উত্তেজনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে। বিশেষ করিয়া পরোক্ষ নির্ব্বাচনে দুইবার নির্ব্বাচন হয় এবং এই দুইবার নির্ব্বাচনের মধ্যে কিছু না কিছু সময়ের ব্যবধান থাকায় সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হইবার অবকাশ পায়। (৩) প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে দলগত কলহ সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এবং শুধু রাজনৈতিক জীবনই নহে সামাজিক জীবনের পরিবেশকেও দূষিত করিয়া তুলে। পরোক্ষ নির্ব্বাচনের মধ্যে এই দলগত কলহ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। কারণ পরোক্ষ নির্ব্বাচনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের চূড়ান্ত ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে না থাকায় বিভিন্ন দলগুলি মাধ্যমিক নির্ব্বাচকসঙ্ঘের উপরেই মাত্র প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক দলাদলি ঘটিবার অবকাশ থাকে অল্প।

পরোক্ষ নির্ব্বাচনের অপগুণ—(১) পরোক্ষ নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে জনসাধারণকে ভোটাধিকার প্রদানের একটি প্রধান সুফল নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দ্বারা সাধারণ ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সম্ভব হইয়া উঠে না। (২) এই পদ্ধতি অসঙ্গতিপূর্ণ; কারণ চূড়ান্তভাবে কে তাহাদের প্রতিনিধি হইবে তাহা নির্দ্ধারণে যদি

জনসাধারণের অংশগ্রহণ করিবার অধিকার না থাকে তাহা হইলে জনসাধারণ মাধ্যমিক নির্ব্বাচকদিগকে নির্ব্বাচিত করিতে আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করিবে কেন? এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া মাধ্যমিক নির্ব্বাচকদিগকে যদি তাহারা নির্ব্বাচিত করিবার যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে তাহারা অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে কিভাবে? (৩) এই পদ্ধতি নিষ্প্রয়োজন। কোনো ভোটদাতা নিজ বিচার বিবেচনা অপেক্ষা অপর কাহারো বুদ্ধি বিবেচনার উপরে যদি অধিক আস্থা রাখে, তাহা হইলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়ে সে অক্লেশেই ঐ অপর ব্যক্তির পরামর্শ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিতে পারে। তাহার জন্য শাসনতান্ত্রিকভাবে দুইবার ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন। (৪) আধুনিক রাষ্ট্রে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকার দরুণ, প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে যে ফলাফল হয়, পরোক্ষ নির্ব্বাচনেও সেই একই ফলাফল ঘটে। (৫) প্রতিনিধিব সহিত জনগণের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে না—ইহা গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী। (৬) পরোক্ষ নির্ব্বাচন দুর্নীতির পরিপোষক। ইহাতে উৎকোচদানের মত নীতিবিগর্হিত কার্য্যাবলীর সুযোগ থাকে, কারণ এক্ষেত্রে যাঁহাদের ভোটের উপর কোনো প্রার্থীর সাফল্য নির্ভর করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা অল্প। অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিকে উৎকোচ দিয়া বা তাহাদের উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বশীভূত করা সহজ।

এই সকল কারণে, 'জনষ্টুয়ার্ট মিল' বলেন, "যে মুহূর্ত্তে দুই স্তরের নির্ব্বাচন প্রথার কোনো ফলাফল ঘটিবে, তখনই ইহার কুফলই ফলিতে সুরু হইবে।" ["The moment the double stage of election begin to have any effect, it would begin to have bad effect"—MILL]

(অণু-৭) **প্রকাশ্য ও গোপন ভোটদান**—*Open and Secret Voting*

ভোটদানের প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে প্রকাশ্যেই ভোটদান করা হইত। নির্ব্বাচকগণ তাহাদের মনোনীত প্রার্থীর নাম প্রকাশ্যেই জ্ঞাপন করিত—তাহারা একে একে তাহাদের মনোনীত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করিত অথবা নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হইলে, নির্ব্বাচকগণ তাহাদের পছন্দমত ব্যক্তির পক্ষে হাত উত্তোলন করিত। **মণ্টেস্কুই, মিল** প্রমুখ একাধিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইরূপ প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। **মিল** বলেন যে ভোট প্রদান হইল প্রত্যেক ভোটদাতার একটী পবিত্র কর্ত্তব্য এবং "অপর যে কোনো জনস্বার্থ সম্পর্কিত কর্ত্তব্যের ন্যায়, ভোট-প্রদানের কার্য্যও জনগণের চক্ষের সম্মুখেই এবং সমালোচনার মধ্যেই, সম্পন্ন করা উচিত।"

কিন্তু প্রকাশ্য ভোটদান প্রথার মধ্যে বহু বাস্তব অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছিল। নির্ব্বাচকের কার্য্য হইল যে কাহারও ভয়ে ভীত না হইয়া বা অনুরোধে বিচলিত না হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া যাহাকে সে বিবেচনা করে তাহাকেই সে ভোট দিবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় নির্ব্বাচকদিগের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় না; কারণ সমাজের প্রতিপত্তিশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রভাবের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত লোকদের অনুরোধ বা ভীতিপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোটদান করাইতে পারিতেন, অথবা নিজেরাই প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়া উহাদের ভোট গ্রহণ করিতেন।

সেই কারণে আধুনিক রাজনীতিতে প্রকাশ্য ভোট পদ্ধতি সমর্থিত হয় না; পরিবর্ত্তে গোপন ভোটদান পদ্ধতিই সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছে। গোপন ভোটদান প্রথায় প্রত্যেক নির্ব্বাচককে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম সমন্বিত একটী কাগজখণ্ড দেওয়া হয়; ইহার নাম ব্যালট (Ballot)। নির্ব্বাচক যাঁহাকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহার নামের পার্শ্বে একটী টিক ("×") চিহ্ন আঁকিয়া দেয় এবং একটী নির্দ্ধারিত বাক্সের মধ্যে ইহা ফেলিয়া দেয়। সকলের ভোট প্রদান সমাপ্ত হইলে, বাক্স খুলিয়া ব্যালট্ গণনা করা হয় এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

এই পদ্ধতিতে কে কাহাকে ভোট দিল তাহা জানিতে পারা যায় না—অতএব প্রত্যেকেই নির্ভাবনায় ভোট প্রদান করিতে পারে। তবে গোপন ভোট প্রথা ত্রুটিশূন্য নহে। ইহা মিথ্যাচারের প্রশ্রয় দিতে পারে—একজন প্রার্থীকে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভিন্ন কোনো প্রার্থীকে অক্লেশে ভোটদান করা সম্ভব। উপরন্তু কেহ যদি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করে, তাহা হইলেও কে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিয়াছে তাহা জানিবার উপায় থাকে না। তবে ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আধুনিক সকল রাষ্ট্রেই গোপন ভোট-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

(অনু-৮) সংখ্যালঘুদিগের প্রতিনিধিত্ব—*Representation of Minorities*

রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই একমতাবলম্বী হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। একই রাষ্ট্রের নাগরিকদিগের মধ্যে সংখ্যাগুরু (Majority) ও সংখ্যালঘু (Minority)—এইরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে। সাধারণতঃ যে উপায়ে নির্ব্বাচন হইয়া থাকে তাহাতে

আইন পরিষদে সকল আসনগুলিই সংখ্যাগুরু ব্যক্তিগণ তাহাদের অধিকাংশ ভোটের জোরে দখল করিয়া লয়—সংখ্যালঘু ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের শাসন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কোন প্রতিনিধি পাঠাইতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু আইন পরিষদে সংখ্যালঘুদিগেরও যাহাতে প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া একাধিক রাজনীতিবিদ্ অভিমত প্রদান করেন। সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার স্বপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে:—রাষ্ট্রের আইন-সভায় যদি কেবলমাত্র একপক্ষের প্রতিনিধিত্বই থাকে এবং জনগণের অপর কোনো অংশের প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহা হইলে যাহাদের প্রতিনিধিত্ব নাই তাহাদের পক্ষ হইতে শাসন কার্য্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কেহই থাকিবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য কেহই থাকিবে না এবং তাহাদের স্বার্থকে সংখ্যাগুরুর স্বার্থের নিকট বলিদান করা হইবে। সংখ্যালঘু ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরুর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে বাধ্য থাকিবে। ইহা নিতান্তই অন্যায় এবং অযৌক্তিক, কারণ ইহা গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী। রাষ্ট্র যদি সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সকল ব্যক্তিরই প্রতিষ্ঠান হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের শাসন-কার্য্য কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এ-বিষয়ে সকলেরই বক্তব্য থাকা প্রয়োজন।

মিল বলেন যে গণতন্ত্র বলিতে অবশ্য বুঝায় যে সংখ্যাধিক ব্যক্তির অভিমত অনুযায়ী শাসন কায্য নির্ব্বাহ হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে সংখ্যাল্প ব্যক্তি-বর্গের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না—তাহাদের বক্তব্য শুনিবার কোনোই ব্যবস্থা থাকিবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব হইল গণতন্ত্রের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। সত্যকার সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে জনগণের প্রত্যেক অংশেরই প্রতিনিধিত্ব থাকিবে এবং উহা থাকিবে সংখ্যা নিরপেক্ষভাবে নহে,—ঠিক সংখ্যার অনুপাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়ই সংখ্যালঘিষ্ঠেরও পূর্ণরূপ প্রতিনিধিত্ব থাকিবে, অন্যথায় শাসন প্রতিষ্ঠান হইবে অসাম্য ও বিশেষ সুবিধাভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে ইহার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্যবোধ অত্যধিক জাগরূক হয়, সমগ্র জনসমষ্টি নিজেদের মধ্যে যে ঐক্য অনুভব করিবে, তাহা ব্যাহত হয়। জনগণের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কেই চিন্তা করিতে থাকে, সমগ্র জাতির কল্যাণ বা স্বার্থ চিন্তা করিবার জন্য কেহ থাকে না। আইন পরিষদের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব থাকে এবং প্রত্যেক দল তাহার বিশেষ সুবিধা ও স্বার্থের দিক হইতেই শাসন কার্য্যের সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করে; সুতরাং সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনায় অনুপ্রাণিত শাসন কার্য্য সম্ভব হয় না।

(অণু-৯) সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি—*Methods of Minority Representation*

সংখ্যালঘুগণ যাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গোটাকয়েক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

(১) **সীমাবদ্ধ ভোট**—(Limited vote)—এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যতগুলি প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে, প্রত্যেক ভোটদাতার উহা অপেক্ষা কিছু কম সংখ্যক ভোট দিবার ক্ষমতা থাকে। একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যদি চারজন প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ভোটদাতা চারিটির কম,—ধরা যাক্ তিনটি, ভোট প্রদান করিতে পারে এবং কোনো ভোটদাতা একই ব্যক্তিকে একটীর অধিক ভোট প্রদান করিতে পারে না। এক্ষেত্রে একজন ভোটদাতা তিনটি ভোট তো আর চারিজনকে দিতে সক্ষম নহে। এতদ্ভিন্ন নির্ব্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা চারিজনের অধিকই হইবে। অতএব সংখ্যাগুরু ভোটদাতার ভোট বিভিন্ন নির্ব্বাচন প্রার্থীর মধ্যে বন্টিত হইবে কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই তিনজনের অধিক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে না (কারণ তাহাদের ভোটই আছে মাত্র তিনটী) সুতরাং সংখ্যালঘুগণ একজন মাত্র ব্যক্তিকেই সকলে মিলিয়া ভোট দিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে।

(২) **একত্রিত ভোট** (Cumulative vote)—এই পদ্ধতি অনুযায়ী, একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যতগুলি প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা থাকে, প্রত্যেক ভোটদাতার সমসংখ্যক ভোট দিবার অধিকার থাকে। একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যদি চারিটী আসন পূরণ করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক ভোটদাতার চারিটী করিয়া ভোট দানের অধিকার থাকে। প্রত্যেক ভোটদাতা তাহার ভোটগুলিকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই প্রদান করিতে পারে—এমন কি সকল ভোটগুলিকে একত্রিত করিয়া একজন মাত্র প্রার্থীকে প্রদান করিতেও পারে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের সকল ভোট একজনকে প্রদান করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সক্ষম হইতে পারে।

(৩) **সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব** (Proportional Representation)—এই পদ্ধতি অনুযায়ী সংখালঘু শ্রেণী তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে, প্রত্যেক ভোটদাতার হস্তে সকল নির্ব্বাচন প্রার্থীর নাম লিখিত একটী তালিকা দেওয়া হয়। ভোটদাতাকে বলা হয় যে তালিকার মধ্যে নির্ব্বাচন

প্রার্থীর নাম যে ভাবেই থাকুক না কেন, উহাদের মধ্যে যে প্রার্থীকে ভোটদাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে, তাহার নামের পার্শ্বে ১ সংখ্যাটী লিখিয়া দিবে। ইহা হইল ভোটদাতার প্রথম পছন্দ। ইহার পর ভোটদাতা যাহাকে পছন্দ করে তাহার নামের পার্শ্বে '২' সংখ্যাটী লিখিয়া দিবে—ইহা হইল তাহার দ্বিতীয় পছন্দ। এইভাবে ভোটদাতা সকল নির্ব্বাচন প্রার্থীর নামের পার্শ্বে তাহার পছন্দ অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা দিয়া যাইবে।

একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যতগুলি লোক ভোট দিয়াছে সেই সংখ্যাকে, ঐ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যতগুলি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন (অর্থাৎ ঐ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের যতগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট আছে) সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হইবে। ভাগফল হইল নির্দ্ধারিত সংখ্যা (Quota)। অতঃপর নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের ভোট গণনা করা হইবে—তবে প্রথম পছন্দ হইতে সুরু করিয়া,—এবং যে ব্যক্তিই নির্দ্ধারিত সংখ্যক ভোট পাইবে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি যদি "কোটার" অধিক ভোট পান, তাহা হইলে তাঁহার অতিরিক্ত ভোটগুলি তাঁহার পরেই যিনি অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। তদ্দ্বারা তিনি যদি কোটার সমান ভোট পান, তিনিও নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহার যদি অতিরিক্ত ভোট থাকে, উহা তাঁহার নীচেই যিনি আছেন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এইরূপে প্রথম পছন্দ হইতে সুরু করিয়া গণনা করিয়া যাওয়া হইবে যতক্ষণ না সকল আসনগুলি পূরণ হইয়া যায়। যতগুলি আসন আছে সবগুলি পূরণ হইয়া গেলে আর ভোট গণনা হইবে না।

এই ভোটদান পদ্ধতিতে, একজন ভোটদাতা বিভিন্ন পছন্দ লিখিয়া দিলেও ভোট প্রদান করিতেছে মাত্র একটী অথচ যাহাকে সে ভোট প্রদান করিতেছে তাহার অতিরিক্ত ভোটগুলি অপর প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরিত করা হইবে। সেইজন্য ইহার নাম হইল একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি (Single transferable vote)।

দৃষ্টান্তঃ—ধরা যাউক একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ১০০ জন ভোটদাতা এবং চারিটি আসন আছে। এক্ষেত্রে "কোটা" হইবে $\frac{১০০}{৪}$=২৫। ধরা যাউক,—**ক, খ, গ, ঘ, ঙ**, এই পাঁচজন নির্ব্বাচন প্রার্থী আছেন—ইহাদের প্রত্যেকেই কিছু প্রথম পছন্দ, কিছু দ্বিতীয় পছন্দ, কিছু তৃতীয় পছন্দ এইরূপ পাইয়াছেন। প্রথমে গণনা করা হইবে কে কয়টী প্রথম পছন্দ পাইয়াছেন—তাহাতে এইরূপ দেখা গেল ঃ ক—২৭, খ—২৯, গ—১৪, ঘ—১৭, এবং ঙ—১৩। ইহাদের মধ্যে **খ** (২৯) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রথম পছন্দ পাইয়াছেন এবং উহার সংখ্যা হইল কোটার অধিক ; অতএব '**খ**'কে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। **খ**-এর পর অধিক প্রথম পছন্দ পাইয়াছেন **ক** (২৭) ; **খ** কোটার

অতিরিক্ত যে চারিটী ভোট পাইয়াছেন তাহা ক-কে দেওয়া হইল। ক-এর প্রথম পছন্দমত ভোট সংখ্যা দাঁড়াইল (২৭+৪= ৩১)—অর্থাৎ কোটার অধিক। ক নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহার অতিরিক্ত ভোট (৩১ − ২৫)=৬টী। ঘ (১৭) পাইলেন। ঘ-এর ভোট সংখ্যা দাঁড়াইল (১৭+৬)=২৩টী; উহা কোটার কম, অতএব ঘ প্রথম পছন্দ গণনায় নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। খ-এর নীচে যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও তদবস্থা। প্রথম পছন্দ হইতে দুইটী আসন পূরণ হইল। এইবার দ্বিতীয় পছন্দ গণনা করা হইবে—এইভাবে গণনা করা চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না সকল আসনগুলি পূরণ হইয়া যায়।

(অণু-১০) সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন—*Communal Representation*

ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংখ্যায় অধিক হিন্দুগণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং মুসলমান, ইঙ্গভারতীয়, শিখ ও ভারতীয় খৃষ্টান—ইহারা হইলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিভক্ত এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। ইহারই নাম সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের দুইটী পদ্ধতি আছে—(১) মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা এবং (২) পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা।

(ক) **মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলী** (Joint Electorate)—এইরূপ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের অর্থ হইল যে আইন পরিষদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কতজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পৃথক করা হয় না; একজন ভোটদাতা অপর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনেও ভোট দিতে পারিবে।

দৃষ্টান্তঃ—একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্রে (Constituency) ৩০০ জন ক সম্প্রদায়ের ভোটদাতা এবং ১০০ জন খ সম্প্রদায়ের ভোটদাতা আছে; শাসনতন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করা রহিয়াছে ঐ নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে ক সম্প্রদায়ের তিনজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে এবং খ সম্প্রদায়ের জন্য একজন প্রতিনিধির আসন থাকিবে। কিন্তু কোন্ তিনজন ব্যক্তি ক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে আইন পরিষদে যাইবে তাহার নির্ব্বাচনে, ক এবং খ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ভোট প্রদান করিবে; সেইরূপ খ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কোন্

একজন ব্যক্তি আইন পরিষদে যাইবে তাহা নির্দ্ধারণে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ভোট দিবে।

(খ) **পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলী** (Separate Electorate)—এই পদ্ধতিতে নির্ব্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আইন পরিষদে পৃথক আসন সংরক্ষিত থাকে এবং ব্যবস্থা থাকে যে একটী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই ভোট প্রদান করিবে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এইরূপ নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত। আইন পরিষদে হিন্দু, মুসলমান, ইঙ্গ-ভারতীয়, ভারতীয় খৃষ্টান এবং (কেবলমাত্র পাঞ্জাবে) শিখ,—এই সম্প্রদায়গুলির জন্য পৃথক আসন রক্ষিত আছে। এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি অপর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে না এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—যথা হিন্দুগণ মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবেন না এবং মুসলমানগণও হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট প্রদান করিবেন না।

সমালোচনা :—মিশ্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচনে, কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভোট-দাতাগণের অধিক ভোট থাকে ; সেহেতু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ কার্য্যতঃ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই দিক হইতে বিচার করিলে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সেই সম্প্রদায়ের সত্যকার প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হয়।

কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিরুদ্ধবাদীগণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একাধিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ইহাতে প্রত্যেক প্রতিনিধি মনে করেন যে তিনি শুধু তাঁহার সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থই বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং সকল বিষয়ই তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতেই বিচার বিবেচনা করিয়া থাকেন। সরকার কোনো আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইলে বা শাসন-বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলে,—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ইহাই বিচার করেন যে উহার দ্বারা তাঁহার সম্প্রদায়ের কতখানি সুবিধা বা অসুবিধা ঘটিবে ; উহা সমগ্র রাষ্ট্রের বা জাতির পক্ষে কতখানি কল্যাণকর তাহা চিন্তা করিবার মত কেহই থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য বিধান করিলে বিভিন্ন ধর্ম্মের পার্থক্যগুলিই বড় হইয়া দেখা দেয়—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে। ইহাতে

ধর্ম্মান্ধতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—ব্যাপকভাবে ধর্ম্মোন্মাদনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ধর্ম্মগত পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া যে জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে সে সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি মনে করিবে যে আইনপরিষদে যখন তাহাদের বিশেষ প্রতিনিধি রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য সকল প্রকার উন্নতির পথ সুগম হইয়া যাইবে। এই নিরাপত্তার মনোভাব পোষণ করিয়া তাহারা আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় না। অপরপক্ষে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদিগের জন্য আত্মত্যাগ করিতে অনুপ্রাণিত হয় না।

এই সকল কারণেই আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চেতনার প্রসার লাভ হইয়াছিল যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিভিন্ন এমন কি বহুক্ষেত্রে উহাদের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একজাতীয়তার ভাব গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা এই কারণেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে অনেকেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন আবার অনেকেই যাঁহারা প্রধান দুইটী সম্প্রদায়কে পৃথক জাতিভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা ইহার মধ্যে অনুশোচনার কোনোই কারণ দেখেন নাই। মতের পার্থক্য যাহাই থাকুক উপসংহার একই থাকে; পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ভারতের সমগ্র জনসমষ্টিকে লইয়া এক-জাতি গঠনের প্রয়াস শুধু ব্যাহতই নয়, ব্যর্থ করিয়াছে।

সেই কারণে স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে; শুধুমাত্র অনুন্নত সম্প্রদায় এবং তপশীলী উপজাতিদিগের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে—তাহাও অবশ্য সাময়িকভাবে—মাত্র ১০ বৎসরের জন্য।

(অনু-১১) নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ—*Control of the Electorate over the Representatives*

নির্ব্বাচনের পরে প্রতিনিধিগণ কিভাবে নির্ব্বাচকদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারেন তাহা একটী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। কারণ প্রতিনিধিদিগের উপরে নির্ব্বাচক-দিগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উপরে গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

প্রতিনিধিদিগের উপরে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের প্রথম উপায় হইল জনমত গঠন করা ও প্রকাশ করা। নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদিগের কার্য্য সম্পর্কে সভাসমিতি, পত্রিকা ইত্যাদির মারফতে জনমতের সংগঠন এবং প্রকাশ করিতে পারে। প্রতিনিধিগণ জনমতের চাপে, এবং নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন। আর একটী

উপায় হইল রাজনৈতিক দল। নির্ব্বাচকগণ, তাহারা যে দলের সভ্য সেই দলের মারফৎ, প্রতিনিধিদিগকে বা মন্ত্রীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই উপায় দুইটী—জনমত ও রাজনৈতিক দল—পরোক্ষ উপায় মাত্র। কারণ প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীদিগকে জনমত অনুযায়ী চলিতে, অথবা দলের সাধারণ সভ্যদের অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার মতন কোনো আইনের বিধান নাই।

সেই কারণে কখনও কখনও কতিপয় বিশেষ শাসনতান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটী হইল অল্পকাল অন্তর নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা। প্রতিনিধিগণ একবার নির্ব্বাচিত হইবার পর যত দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিনিধি থাকিতে পারিবেন ততই তাঁহারা জনমত অগ্রাহ্য করিতে অধিক সাহসী হইবেন। অতএব অল্পকাল অন্তর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলে প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা অমান্য করিতে সাহসী হইবেন না।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ উপায় হইল জননির্দ্দেশ (Referendum), গণভোট (Plebiscite), প্রবর্ত্তনাধিকার (Initiative) এবং পদত্যাগ দাবী (Recall)। (সপ্তম অধ্যায়ের অণুচ্ছেদ-৬ দ্রষ্টব্য)

Questions and Hints

1. What, in your opinion, should be the true basis of franchise ? (1950) What, in your opinion, should be the qualifications for the exercise of franchise ? Do you advocate universal suffrage ? (1939) Write a short essay on Manhood Suffrage applicable to India (1933). Examine the arguments for and against universal adult Suffrage (1947). State the arguments for and against adult Suffrage in India (1949).

[৩ নং অণুচ্ছেদের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার—"মিল লেকী প্রমুখ" হইতে "একটী হইল শিক্ষা এবং অপরটী হইল সম্পত্তি"। অণু-৪ সম্পূর্ণ]

2. Is education the sole qualification for citizenship or are other qualifications necessary ? If so, what are they ? (1930)

[অণু-৩ এর সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার (ক) শিক্ষা—(বন্ধনীর মধ্যেকার পংক্তিগুলি বাদে) এবং (খ) সম্পত্তি। অণু-৪ এর (ক) .."না করিবার দৃষ্টান্ত" পর্য্যন্ত]

3. Distinguish between direct and indirect election. What are their merits and demerits (1939) [অণু-৬]

4. Discuss the merits and demerits of direct and indirect elections respectively. (1936, 1942, 1946)

[অনু-৬ প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের গুণ হইতে সম্পূর্ণ]

5. Describe the expedients that have been suggested for the representation of minorities in the legislature (1944) [[অনু-৯]

6. "The introduction of separate electorate is impeding the growth of Indian nationalism". Do you accept this proposition? Give reasons for your answer (1949)

[অনু-১০ এর সমালোচনা]

7. Write short notes on—Joint Electorate & Indirect election (1948).

[অনু-১০ (ক)। অনু-৬ "পরোক্ষ নির্ব্বাচনে সাধারণ"..."প্রতিনিধি হইবে (চূড়ান্তনির্ব্বাচন)"]

8. "Universal teaching must precede universal enfranchisement" Discuss. (1936)

[অনু-৩ এর সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার (ক) শিক্ষা—বন্ধনীর মধ্যেকার বাক্যগুলি দিতে হইবে,—বন্ধনী উঠাইয়া দিতে হইবে]

পঞ্চদশ অধ্যায়

জনমত ও রাজনৈতিক দল

Public opinion and Political Parties

(অণুচ্ছেদ-১) জনমত কাহাকে বলে—*What Public Opinion is*

সাধারণভাবে বলিতে গেলে জনমত বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যা এবং ঐগুলি সমাধানের উপায় সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত। সমষ্টিগত জীবনের যে সকল বিষয়ে জনগণ আগ্রহান্বিত বা যে সকল বিষয়ের দ্বারা তাহারা প্রভাবান্বিত সেই সকল বিষয় সম্পর্কে মানুষ চিন্তা করে এবং কোনো না কোনো মত পোষণ করে। এই সকল মতের অভিব্যক্তি হইতেই জনমতের উদ্ভব হয়। কিন্তু একটী জন-সমষ্টির সকলেই তাহাদের সমষ্টিগত জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে একই মতামত পোষণ করিবে ও ব্যক্ত করিবে তাহার কোনোই নিশ্চয়তা নাই বরং মতের পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন শ্রেণী, দল ও উপদল—ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন, চিন্তাশক্তি অসমান, হয়তো স্বার্থও পৃথক। প্রশ্ন হইল, জনগণের কোন্ অংশের মতকে জনমত বলা হইবে?

সমষ্টিগত জীবনের কোনো বিষয় সম্পর্কিত কোনো মতকে জনমত আখ্যা দিতে হইলে তাহার দুইটী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সকল জন সমষ্টির ঐক্য-মতের দ্বারা জনমত উদ্ভূত হইবে এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই বটে কিন্তু সেই মতটী জনমত হইবে যাহা জনসাধারণের অধিকাংশই পোষণ করিবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে সংখ্যাধিকের যদি নির্দ্দিষ্ট কোনো মতামত না থাকে তাহা হইলে সংখ্যাল্পের মতামতও জনমত আখ্যা পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ঐ মত অনুযায়ী কার্য্য করিলে জনকল্যাণ সাধিত হইবে, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ঐ মতটী পরিপোষণ করা হইয়া থাকে, এইরূপ হইতে হইবে। সংখ্যাল্প ব্যক্তিগণ, যাহারা ঐ মত সমর্থন করে না তাহারা যেন মনে না করে যে কোনো একটী দলের স্বার্থের জন্য তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের

উপরে উহা আরোপ করা হইতেছে। ঐমত জনকল্যাণ সাধনের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই অধিকাংশ ব্যক্তি উহা পোষণ করে, ইহা যদি প্রতিপন্ন হয়,—তাহা হইলে সংখ্যালঘুগণ ঐ মতকে নিজেদের বলিয়া আপাততঃ স্বীকার না করিলেও অন্ততঃ শ্রদ্ধা করিবে; এবং কালক্রমে উহাকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিতেও পারে। অতএব জনমত বলিতে বুঝায়, জনকল্যাণ সাধনের সহায়করূপে, সমষ্টিগত জীবনের কোনো বিষয় সম্পর্কে যে মতামত রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যক্তি পোষণ ও সমর্থন করে।

(অনু-২) দক্ষ শাসন ও জনমত—*Efficient Administration and Public Opinion*

দক্ষ শাসন নির্ভর করে জনকল্যাণ সাধনের সফলতার উপরে; অর্থাৎ শাসন-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা বিচার করিতে হইলে উহার দ্বারা জনগণের কতখানি কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহাই বিচার করিতে হইবে। যে শাসন-ব্যবস্থা জনকল্যাণ সাধনে অক্ষম, তাহা দক্ষ এবং সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া গণ্য নহে। ইহাই গণতন্ত্রের আদর্শ।

দেশের শাসকবর্গ যদি জনসাধারণ কি চাহে তাহা বিবেচনা না করেন এবং সেই অনুযায়ী যদি কার্য্য না করেন তাহা হইলে জনসাধারণের হিতসাধন করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন না। সেইজন্য গণতন্ত্রের বিধান হইল যে জনসাধারণই শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিবে। কিন্তু আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র মাত্রই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—অর্থাৎ জনসাধারণ শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির মারফৎ। কিন্তু এই প্রতিনিধিগণও যদি জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা অনুধাবন করিতে না পারেন, অথবা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াও উহা উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উপর শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহা ব্যর্থ হইবে। লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থার বা গণতন্ত্রের মূল কথাই হইল জনমত অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা।

অতএব সুশাসনের জন্য, জনমতের গুরুত্ব প্রভূত। জনগণ কি চাহে বা কি তাহাদের দ্বারা প্রার্থিত হওয়া উচিত, উহা যদি তাহারা স্থির করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনা করা যে সম্ভব নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ীই শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিবেন—উহা জনগণের ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা বিচার করিবার উপায়ও থাকিবে না, অনুপ্রেরণাও থাকিবে না। অতএব গণতান্ত্রিক শাসন-

ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য, অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় হইল যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে জনসাধারণ কি চাহে তাহা তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ জনমতের গঠন এবং অভিব্যক্তি প্রয়োজন। [এই জনমতের দুইটী বৈশিষ্ট্য থাকাও অপরিহার্য্য। প্রথমতঃ, সকল দিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া, বিশেষ বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি প্রয়োগের দ্বারাই জনগণকে স্থির করিতে হইবে তাহারা কি চাহে। জনসাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ না করিয়া এবং সকল বিষয় বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া যদি তাহাদের মত গঠন করে তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই মত অনুযায়ী সম্পাদিত কার্য্যের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা জনমত গঠন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, জনমত এরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হইবে যাহাতে কোনোক্রমেই শাসকবর্গ উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে না পারেন। জনমতকে সকল সময়েই সতর্ক বা হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে। যে ব্যাপারেই জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত আছে সেই ব্যাপারেই জনমত গঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং শাসকবর্গের বিন্দুমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিলেই যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবল জনমতের আলোড়ন হইয়া শাসকবর্গের উপর নৈতিক চাপ পড়ে—জনমতকে এইরূপ সজাগ হইতে হইবে। অতএব আধুনিক রাষ্ট্রে দক্ষ শাসনের জন্য—গণতান্ত্রিক আদর্শ উপলব্ধির জন্য,—বিশেষ সতর্ক (Alert) এবং বিজ্ঞতা প্রসূত (Intelligent) জনমত অপরিহার্য্য।]

(অনু-৩) **জনমত গঠন ও অভিব্যক্তির উপায়**—*Agencies for Moulding and Expressing Public Opinion*

যে বিষয়গুলির দ্বারা জনমত গঠিত ও অভিব্যক্ত হয় সেগুলি হইল (১) শিক্ষায়তন (২) সংবাদপত্র ও পুস্তক (৩) সভাসমিতি (৪) বেতার (৫) ছায়াচিত্র (৬) আইন পরিষদ। (৭) রাজনৈকিক দল। রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের এবং ব্যক্তকরণের বিশেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

(১) **শিক্ষায়তন**—শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্ররা যে ভাবধারা ও চিন্তাজগতের সহিত পরিচিত হয় উহার ছাপ তাহাদের সমস্ত জীবনের উপর থাকিয়া যায়। এই ছাত্রগণই ভবিষ্যত নাগরিক। সুতরাং নাগরিকদিগের চিন্তাপদ্ধতি এবং কর্ম্ম-পদ্ধতি অনেকাংশেই, তাহারা যে শিক্ষালাভ করে, তাহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। সমষ্টিগত জীবনের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহারা শিক্ষায়তন সমূহে লাভ করে উত্তরকালে সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাহাদের মতামত নির্দ্ধারণে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে ; উপরন্তু সমাজের

বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরূপে ছাত্রগণ শিক্ষায়তনে সমান মর্য্যাদায় মিলিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারাও ভবিষ্যত নাগরিকদিগের মতামত গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। (২) **সংবাদপত্র ও পুস্তক**—জনমত গঠনের জন্য কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার বিবরণ জানা প্রয়োজন। সংবাদ জানা না থাকিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে যথাযথ মতামত গঠন করা সম্ভব হয় না। সংবাদপত্র জনসাধারণের নিকটে দেশের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের নানাবিধ ঘটনার সংবাদ বহন করিয়া আনে। শুধু তাহাই নহে; সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিত হয়। এইগুলি পাঠ করিয়া জনসাধারণ বিভিন্ন সমস্যার গূঢ়ার্থ ও প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে এবং অনেক সময়ে সংবাদপত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয় জনসাধারণেও সেই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। উপরন্তু, কোনো বিষয়ে জনমত গঠিত হইলে সংবাদপত্র উহা প্রকাশ করে এবং সেই মত অনুযায়ী যাহাতে দেশের শাসন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে শাসকবর্গের উপর নৈতিক চাপ দেয়। পুস্তিকা প্রচারের দ্বারাও ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হইয়া থাকে। চিন্তানায়কগণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করেন; ইহাতে জনমত গঠনে ও প্রকাশে সহায়তা করা হয়। (৩) **সভা সমিতি**—সভা অনুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের ও চিন্তানায়কদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করে; এই সকল বক্তৃতার মধ্য দিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দেশের ঘটনাবলী ও সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া দেন। সমিতি স্থাপনার মারফতে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে এবং পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করিতে পারে। ইহাতে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহারা ধারণা লাভ করে এবং কিসে জনকল্যাণ সাধিত হইতে পারে সে সম্পর্কে মতামত গঠন করিতে ও ব্যক্ত করিতে পারে। (৪) **বেতার**—বেতারের মারফতে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় এবং দেশের ও দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু, যে বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট জনমত গড়িয়া উঠিতেছে তাহাও বেতার মারফৎ প্রকাশ পায়। (৫) **ছায়াচিত্র**—ছায়াচিত্র, কাহিনীর মারফতে বাস্তব জীবনের ছবি অঙ্কিত করে এবং জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করে। দর্শকদের মনে ইহার গভীর রেখাপাত হয়। কাহিনীর মধ্য দিয়া দেশের সমস্যাসমূহ মূর্ত্ত করিয়া দর্শকদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয় এবং জনগণের চিন্তাধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহাও প্রদর্শিত হয়। (৬) **আইন পরিষদ**—আইন পরিষদ যে স্থলে জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত, সে স্থানে জনমত প্রকাশ

করিবে এবং জনমত অনুযায়ী কার্য্য করিবে, এইরূপ ব্যক্তিদিগকেই জনগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া প্রেরণ করে। আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দের আলোচনা হইতে, কোন্ বিষয়ে কি জনমত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু আইন পরিষদের সদস্যগণের আলোচনা জনগণকে তাহাদের মতামত গঠনে সহায়তাও করে। (৭) **রাজনৈতিক দল**—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনসাধারণের নিকট তাহাদের আপনাপন নীতি ও কর্ম্মসূচী উপস্থাপিত করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। দলগুলির আলোচনা ও প্রচারকার্য্য হইতে সাধারণ ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যা সমূহের সহিত পরিচিত হইবার এবং উহাদের নানাদিক বিচার বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পায়; এই সুযোগ প্রাপ্তি দ্বারা জনগণ তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, জনমত গঠনের অন্যান্য যে সকল উপায় আছে তাহাদের অনেকগুলিই রাজনৈতিক দল-সমূহের দ্বারা ব্যবহৃত হয় - যথা সংবাদপত্র, পুস্তিকা, সভা-সমিতি ও শিক্ষায়তন। এই কারণে, আধুনিক কালে রাজনৈতিক দলসমূহ জনমত গঠনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বলা চলে। শুধু জনমত গঠনেই নহে, ইহার ব্যক্ত করণেও রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। আইন পরিষদে যে দলটী সংখ্যাধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়, সেই দলের মারফতেই যথার্থ জনমত অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়; সেইকারণেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এইরূপ সংখ্যাধিক দলের হস্তেই শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

(অনু-৪) রাজনৈতিকদল—ইহার প্রকৃতি—*Political Party, its Nature*

জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে দেখা যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধবাদী মতগুলির ধারক ও পরিপোষকরূপে আবির্ভূত হন এবং অতঃপর সাধারণ ব্যক্তিগণ ইঁহাদের কাহারও সহিত সমমতাবলম্বী হইয়া ইঁহাদের সমর্থক হয়। তাহাদের অভিমত যাহাতে অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রহণ করে এবং তাহাদের মতামতকে যাহাতে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হয়। এইরূপ এক একটী সংগঠনের নাম হইল রাজনৈতিক দল। প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিক ও বাগ্মী বার্ক রাজনৈতিক দলের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, "একাধিক মানুষের সমষ্টি, যাহারা জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে কোনো বিষয়ে একমত হইয়া, উহাকে যুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা কার্য্যকরী করিবার জন্য সচেষ্ট হয়।" ["A body of men united for promoting by

their joint endeavours the national interest upon some point in which they are all agreed".] অতএব দলের প্রকৃতি বিশ্লেষণে উহার মোটামুটি তিনটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, দলমাত্রই একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি হইবে। কোনো একজন মাত্র ব্যক্তি তিনি যতই প্রতিভাবান ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হউন না কেন, দল নামে অভিহিত হইতে পারেন না—তাঁহার পিছনে সমর্থকবৃন্দকে থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যক্তিগণ যে বিষয়ে একমত হইবে উহা হইবে জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয়—তাহারা যে অভিমত পোষণ করে তাহার উদ্দেশ্য থাকে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণসাধনের পন্থা সম্পর্কে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত পোষণ করে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল উহার অভিমতকে কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টিত থাকে অর্থাৎ উহার অভিমত অনুযায়ীই যাহাতে শাসনকার্য্য পরিচালিত হয় তাহার জন্য প্রয়াস করে।

(অনু-৫) রাজনৈতিক দলের কার্য্যসমূহ—*Functions of Political Parties*

রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ হইতে উহার কার্য্যাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়। প্রথমতঃ, দলের সভ্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা সমগ্র দলের পক্ষ হইতে একটী নীতি নির্দ্ধারণ করে ও কার্য্যতালিকা গ্রহণ করে। অতঃপর প্রত্যেক দল, তাহার নীতি ও কার্য্যতালিকাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উহার মধ্য দিয়াই যে রাষ্ট্রের ও সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা জনগণকে বুঝাইবার জন্য নানাপ্রকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সংবাদপত্র, পুস্তিকা, সভা সমিতি প্রভৃতি এইরূপ প্রচার কার্য্যের মাধ্যম। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি জনমত সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ, নির্ব্বাচনের সময়ে প্রত্যেক দল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; অর্থাৎ প্রত্যেক দল চেষ্টা করে যাহাতে রাষ্ট্রের আইন পরিষদে উহার সদস্যগণই জনসাধারণের দ্বারা অধিকসংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইতে পারে। নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য প্রত্যেক দল একটী নির্ব্বাচনী ঘোষণাপত্র (Election manifesto) জারী করে। এই ঘোষণাপত্রে দলের গৃহীত নীতি ও কার্য্যতালিকার বিশদ ব্যাখ্যা থাকে এবং এই প্রতিশ্রুতি থাকে যে জনসাধারণ যদি ঐ দলের সভ্যদের মধ্য হইতেই আইনপরিষদে সংখ্যাধিক সদস্য প্রেরণ করে (এবং সেহেতু ঐ দলের সদস্যদের মধ্য হইতেই যদি মন্ত্রী নিযুক্ত হন) তাহা হইলে ঐ নীতি ও কার্য্যতালিকা অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা হইবে।

অতঃপর প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ঐ দলের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী দাঁড় করানো হয় এবং তাহার পক্ষ হইতে প্রচার কার্য্য চালানো হয়।

তৃতীয়তঃ, নির্ব্বাচনের পর যে দলের সভ্যগণ আইন পরিষদে সংখ্যাধিক আসন লাভ করিয়াছেন দেখা যায় সেই দলের দ্বারাই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ঐ দলকে তখন বলা হয় সরকার পক্ষীয় দল (Government Party); সংখ্যাল্প দল তখন বিরুদ্ধবাদী দল (Opp›sition Party) রূপে অবস্থান করে।

(অনু-৬) **দল ব্যবস্থার গুণাপগুণ**—*Merits and Demerits of Party System*

গুণ—(১) রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন দল থাকার দরুণ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার হয়। আধুনিক বিরাট রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই তাহার জীবিকা অর্জ্জনের উপায় সন্ধানে ব্যস্ত, উপরন্তু বিবিধ বিষয়ের দ্বারা তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এমতাবস্থায়, জনসাধারণের নিকট জনস্বার্থসম্পর্কিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিবার জন্য, এই বিষয়গুলির যথার্থ তাৎপর্য্য তাহাদিগের নিকট ব্যাখ্যা কবিবার জন্য, কোনো একটী সাধারণ উপায় থাকা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল সমূহই হইল এই উপায়; বিভিন্ন দল তাহাদের নিজ নিজ নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিয়া থাকে। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় অথবা পৌর-সমস্যা সমূহ কি প্রকৃতির এবং উহাদের সমাধানের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, এ সম্পর্কে প্রত্যেক দল উহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জনগণের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করে। এই সকল আলোচনা হইতে সাধারণ ব্যক্তি জনস্বার্থসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সহিত পরিচিত হয়। (২) রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে কাহারা যোগ্যতম ব্যক্তি তাহা সাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না, এক্ষেত্রে জনসাধারণের পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা দুরূহ হইয়া উঠে। রাজনৈতিক দলসমূহ নির্ব্বাচনপ্রার্থী (Candidate) মনোনয়ন করিয়া দেয়—ইহাতে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কার্য্য সহজ হয়। (৩) দলের অস্তিত্বের দরুণ, শাসকবর্গ শাসনকার্য্যে কোনোরূপ ত্রুটি, বিচ্যুতি বা অবিচার যাহাতে না ঘটে, তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য থাকেন। ইহার কারণ হইল যে আইন পরিষদের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী দল অবস্থান করে এবং শাসকবর্গের কার্য্যের উপরে ইহা সকল সময়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সরকার পক্ষীয় দল কিছুমাত্র অন্যায় বা ত্রুটি করিলে বিরুদ্ধবাদী দল উহা জনসমক্ষে বিস্তারিতভাবে প্রচার করিয়া সরকারপক্ষকে জনসাধারণের নিকট

অপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করে। (৪) রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্বের দরুণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন সহজ ও সম্ভব হয়। গণতন্ত্র বলে যে, শাসনকার্য্য জনগণের মতানুযায়ী পরিচালিত হইবে, কিন্তু জনগণ তো সকলেই একমত হইবে না, অতএব বাস্তবক্ষেত্রে 'জনগণের মতানুযায়ী' বলিতে 'সংখ্যাধিকের মতানুযায়ী' বুঝায়। কাহারা দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির প্রতিনিধি তাহা রাজনৈতিক দল থাকে বলিয়া সহজেই বুঝা যায় কারণ সামান্য দুই একজন বাদে, আইন পরিষদের সদস্যগণ কোনো না কোনো দলের পক্ষ হইতেই নির্ব্বাচিত হন। অতএব আইন পরিষদের মধ্যে অধিকাংশ যে দলের সভ্য সেই দলটী দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করুক—ইহাই যে জনসাধারণের অধিকাংশের অভিমত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

অপগুণ—(১) দেশের মধ্যে বুদ্ধিমান ও কর্ম্মকুশল যে সকল ব্যক্তি থাকেন তাঁহারা সকলেই একটী মাত্র দলের সভ্য হন না; সুতরাং যখন একটী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনা করে তখন অপর দলভুক্ত বুদ্ধিমান ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণ শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন না, শুধু সরকার পক্ষের সমালোচনা করেন মাত্র। অতএব কোন এক সময়ে দেশের সকল দক্ষ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একত্রিত হন না। (২) ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে— "The first casualty of war is truth.", অর্থাৎ "যুদ্ধের সময়ে সর্ব্বপ্রথম নিহত হয়—সত্য।" এই প্রবাদ নির্ব্বাচনযুদ্ধের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। নির্ব্বাচনের সময়ে জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট-আদায় করিবার জন্য প্রত্যেক দল অপর দলের সৎকার্য্যগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং নিজেদের নিকৃষ্ট কার্য্যগুলিকেও উৎকৃষ্ট প্রমাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হয় এবং সেই কারণে দেশের সমস্যাগুলিকে বিকৃত করিয়া জনসাধারণের নিকটে উপস্থাপিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না; ইহাতে জনসাধারণকে বিপথে চালিত করা হয়। (৩) ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের স্বাধীন মত প্রকাশ প্রতিরোধ করে এবং ব্যক্তিত্ব দমন করে। দল ব্যবস্থা থাকার দরুণ, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে, তিনি যতই বুদ্ধিমান বা গুণবান হউন না কেন, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে হইলে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হইতেই হইবে। কিন্তু দলের সভ্য মাত্রই তাহার নিজস্ব মতামত বিসর্জ্জন দিয়া দলীয় মতামত গ্রহণ করিতে এবং উহা সকল সময়ে মানিয়া চলিতে বাধ্য। (৪) সাধারণ লোকে বিভিন্ন দলের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার দরুণ, রাজনৈতিক বিরোধ ও কলহ জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক সময়ে শান্তিপূর্ণ পৌরজীবন ব্যাহত হয়। (৫) রাষ্ট্রের হিতসাধন অপেক্ষা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করা এবং কোনো

না কোনো উপায়ে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা,—এই কার্য্যের উপরেই প্রত্যেক দল অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। দলের উন্নতিকে রাষ্ট্রের হিত বা কল্যাণের ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের সঙ্কট সময়ে একাধিক রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রকে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া, কিভাবে সেই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিকে কার্য্যে লাগাইয়া নিজের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টিত হয়। ইহা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী।

(অণু-৭) দুই-দল ও বহুদল ব্যবস্থা—*Two Party and Multiple Party-Systems*

কোনো কোনো দেশে দুইটীমাত্র দলের অস্তিত্ব থাকে, কোথাও বা দুইটীর অধিক দলের অস্তিত্ব থাকে। ইংলণ্ডে "শ্রমিক দল" গঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুকাল যাবৎ দুইটী মাত্র দল বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে তথায় তিনটী দল থাকিলেও কার্য্যতঃ দুই দলই প্রাধান্য ভোগ করে কারণ তথাকার "উদারনৈতিক দল" বর্ত্তমানে ভাঙ্গনমুখী। উহার সদস্যগণের অধিকাংশই হয় "রক্ষণশীল দল" অথবা "শ্রমিকদল" এই দুইটীর যে কোনো একটীতে যোগদান করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রধাণতঃ দুইটী দলই আছে—যথা "গণতান্ত্রিক দল" ও "প্রজাতন্ত্রীদল"। অপর পক্ষে ইউরোপীয় কণ্টিনেণ্টের একাধিক রাষ্ট্রে বহুদলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়; ফ্রান্স বহুদল্ ব্যবস্থার চরম নিদর্শন।

দুইদল ব্যবস্থার গুণ—(১) যে স্থানে দুইটী মাত্র দল বিদ্যমান, সেস্থানে নির্ব্বাচকগণ বিভিন্ন দলের পরস্পর বিরুদ্ধ বিভিন্ন মতের সম্মুখীন হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এবং রাষ্ট্র যে নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দুইটী মাত্র দল দুই প্রকার বিবরণ প্রচার করে। এই দুইটীর মধ্যে কোনো একটীকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না। সেইরূপ, অনেকগুলি দলের পক্ষ হইতে অনেকগুলি নির্ব্বাচন প্রার্থী দাঁড় করানো হয় না বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে প্রতিনিধি বাছাই করা সহজ হয়। (২) নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইবার পর, আইন পরিষদের সংখ্যাধিক আসন কাহারা লাভ করিল, তাহা নির্দ্ধারণ করাও সহজ হয়; কারণ আইন পরিষদের সদস্যগণ দুইটী দলের মধ্যে বিভক্ত থাকে এবং কোন্ দলের পক্ষ হইতে কতজন সদস্য রহিয়াছেন তাহা গণনা করিলেই বুঝা যাইবে কোন্ দলটী সংখ্যাগরিষ্ঠ; তখন সেই দল শাসনযন্ত্র পরিচালনার অধিকারী হয়।

দুইদল ব্যবস্থার অপগুণ বা বহুদল ব্যবস্থার গুণ—কিন্তু দুইদল ব্যবস্থার একাধিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়; সেই কারণে কেহ কেহ বহুদল ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

(বহু দল ব্যবস্থার গুণ হইল যে উহাতে দুইদল প্রথার ত্রুটিগুলি নাই।) বহুদল প্রথার সমর্থনকারীরা বলেন : (১) দুইটী মাত্র দল থাকিলে জনসাধারণের রাজনৈতিক মতবাদ সঠিকভাবে ব্যক্ত নাও হইতে পারে ; কারণ দুইটী দল যে নীতি ও কার্য্যতালিকা গ্রহণ করে, এরূপ হইতে পারে যে জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই উহার বাহিরেও অপর কোনো নীতি বা কার্য্যতালিকা গ্রহণের পক্ষপাতী। জনসাধারণের চিন্তাধারা বা অভিমতের বহু স্তর থাকিতে পারে। দুইটী মাত্র দল এইরূপ সকল স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে না। অতএব দুইটীমাত্র দলের মারফতে জনসাধারণের অভিমত সঠিক ভাবে ব্যক্ত হয় না ; উহার জন্য দুইটীর অধিক দল, অর্থাৎ বহুদল গঠন প্রয়োজন। বহুদল ব্যবস্থার ইহাই গুণ যে বহু দলের মধ্য দিয়া জনসাধারণের বহুবিধ মতামত সঠিকভাবে ব্যক্ত হইবার সুযোগ পাইবে ; (২) দুইটী মাত্র দল থাকিলে, আইন পরিষদে একটীমাত্র দলের সদস্যগণই সংখ্যাধিক হন এবং তাহাদের হস্তে শাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। ইহার কুফল হইল যে ঐ দলের সদস্যের পক্ষে যাহারা ভোট প্রদান করে নাই তাহারা শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া মনে করে। কিন্তু আইন পরিষদের মধ্যে যদি একাধিক দলের প্রতিনিধি থাকে, তাহা হইলে ঐ পরিষদের মধ্যে কোনো একটী মাত্র দলের সদস্যগণ সম্পূর্ণরূপে সংখ্যাধিক নাও হইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য দুই তিনটী দলকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে। যথা আইন পরিষদে "ক" দলের সদস্য সংখ্যা হয়তো ৫০ জন, "খ" দলের ৩০ জন এবং "গ" দলের ২০ জন। এক্ষেত্রে "ক" দল সংখ্যাধিক কিন্তু সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক নহে কারণ "খ" ও "গ" মিলিতভাবে "ক" এর সমান। এরূপ ব্যবস্থায় "ক" কে হয় "খ" না হয় "গ" এর সহিত সংযুক্ত হইতেই হইবে। ইহার সুফল হইল যে একাধিক দল সংযুক্ত ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবে এবং জনসাধারণ বুঝিবে যে তাহারা একটী মাত্র দলের দ্বারা শাসিত হইতেছে না।

বহুদল ব্যবস্থার অপগুণ—(১) দেশের মধ্যে অনেকগুলি দল থাকিলে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ মত ও কার্য্য তালিকা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া নিজ নিজ গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিবে। এই বহুবিধ গুণকীর্ত্তনের আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া সাধারণ ব্যক্তি কোন্ দলের সদস্যকে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্ম্মপন্থার মধ্যে যথাযথ তুলনা ও বিশ্লেষণ করিয়া ঐগুলির সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভব করা এবং তাহাদের গুণাপগুণ বিচার করা—সাধারণ লোকের নিকট আশা করা যায় না। (২) আইন পরিষদের মধ্যেকার একাধিক দল সংযুক্তভাবে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিলেও

তাহাদের স্থায়ী সংযোগ হয় না। সংযুক্ত দলগুলির মধ্যে সামান্য বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলেই, কোনো কোনো দল বিরুদ্ধবাদী দলের সহিত যোগদান করে এবং মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে কয়েক মাস অন্তরই শাসকবর্গের পরিবর্ত্তন ঘটে। ফ্রান্সে গড়পড়তা ছয়মাস অন্তরই মন্ত্রীসভার পতন ঘটে—কখনও কখনও দুই চারদিন অন্তর মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ শাসকবর্গের পরিবর্ত্তন দক্ষ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর।

(অণু-৮) দলীয় শাসন—*Party Government*

প্রত্যেক নির্ব্বাচনের পর গণনা করিয়া দেখা হয় কোন্ দলের কতগুলি সভ্য আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে দলের সদস্যগণ আইন পরিষদে সংখ্যায় অধিক আছেন দেখা যাইবে সেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। যে দলের সদস্যগণ আইন পরিষদে সংখ্যাল্প, সেই দল বিরুদ্ধবাদী দলরূপে আইন পরিষদে থাকে এবং অপর দলের অর্থাৎ সরকার পক্ষের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করে। উপরন্তু বর্ত্তমানের সংখ্যাল্প দল ভবিষ্যতে সংখ্যাধিক হইবার জন্য সচেষ্ট থাকে। উহা যদি অধিক সমর্থক সংগ্রহ করিয়া সংখ্যাধিক দলে পরিণত হইতে পারে তাহা হইলে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার উহাই অধিকারী হইবে। ইহারই নাম দলীয় শাসন ব্যবস্থা।

(অণু-৯) ভারতবর্ষে দলসমূহ—*Parties in India*

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" প্রতিষ্ঠা হয়। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিই কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারে। অনেককাল অবধি ভারতে একমাত্র দল হিসাবেই ইহার অস্তিত্ব ছিল। কালক্রমে কয়েকজন মুসলমান কংগ্রেসের অস্তিত্বে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া "মুসলীম লীগ" নামক একটী স্বতন্ত্র দল গঠন করেন—ইহার উদ্দেশ্য শুধু মুসলমানদিগের স্বার্থ রক্ষা এবং ইহার সভ্য পদ শুধু মুসলমানদিগের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ একটী দল গঠিত হয়, ইহার নাম হিন্দুমহাসভা—কেবলই হিন্দুরাই ইহার সভ্য হইতে পারিতেন এবং হিন্দুদিগের বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করাই ছিল ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। শিখ সম্প্রদায়ও তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য একটী পৃথক দল গঠন করেন,—উহার নাম "আকালী দল।" এই দলসমূহ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত। যদিও অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের ভিত্তিতে গোটাকয়েক দল গঠিত হইয়াছিল, যথা কম্যুনিষ্ট দল,

সমাজতান্ত্রিক দল, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক দল—তবুও যে কোনো কারণেই হউক জনসাধারণের মধ্যে এইগুলির ততটা প্রসার লাভ ঘটে নাই।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দল গঠন নানা দিক দিয়া কুফলপ্রসূ। বিভিন্ন ধর্ম্ম অনুসরণকারী নাগরিকদিগকে লইয়া যে একজাতীয়তার ভাব গড়িয়া উঠিবে, তাহা ইহার জন্য সম্ভব হইয়া উঠে না। প্রত্যেক সম্প্রদায় শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় তাহাদের ধর্ম্মের দিক হইতে বিবেচনা করে। ইহাতে ধর্ম্মান্ধতা বৃদ্ধি পায়। ধর্ম্ম হইল অন্তরের জিনিষ—আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। রাষ্ট্রের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৈষয়িক ও পার্থিব কল্যাণ সাধন; অতএব রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি ধর্ম্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা ভ্রমাত্মক কার্য্য। ধর্ম্মের ভিত্তিতে দলের পার্থক্য থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বিশেষ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের হিতই প্রধানতঃ সন্ধান করিবে - সমগ্র রাষ্ট্রের ব্যাপক হিত উপলব্ধির মতন উদার দৃষ্টিভঙ্গী লোপ পাইবে। রাজনৈতিক দলসমূহ শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করিবার জন্য পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে; পরস্পরকে হেয় করিবার এই প্রতিযোগিতা যদি ধর্ম্মের ভিত্তিতে ঘটে, তাহা হইলে উহার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর—বিশেষ করিয়া যে দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু ধর্ম্ম ভিন্ন অপর কোনো ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হইলে বর্ত্তমানের সংখ্যাল্প দল ভবিষ্যতে সংখ্যাগুরু দল হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে এইরূপ সম্ভব হয় না। ইহার কুফল হইল যে যে দল স্থায়ীভাবে সংখ্যাগরিষ্ট থাকিবে বলিয়া নিশ্চিত সে দলের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ঘটে, অপর পক্ষে যে দলের পক্ষে কোনো দিন সংখ্যাগুরু হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া জানা আছে তাহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরূক হয় অত্যধিক।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে দল গঠনের সমর্থকরা বলিতে পারেন যে মানুষের নৈতিক উন্নতি বিধানও রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্ম যেহেতু নৈতিক জীবনের সহায়ক সেহেতু ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কোন ধর্ম্ম অনুসরণ না করিলেও মানুষ নীতিসম্মত জীবন যাপন করিতে পারে এবং ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীকে সমভাবে নীতিসম্মত জীবন যাপন করাইতে সক্ষম। সেই কারণে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে, ভারতকে একটী ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

Questions & Hints

1. Explain clearly what is meant by Public Opinion (1948, 1950), How is Public Opinion moulded in modern times? (1948) [অনু-১ ও অনু-৩]

2. "Successful administration in a modern state depends largely upon the way in which public opinion is formed and expressed." Explain. (1938)

[২ নং অনুচ্ছেদ,—প্রথম বন্ধনীর মধ্যেকার পংক্তিগুলি বাদে, এবং অনু-৩]

3. What part does public opinion play in a modern State? (1950) "An alert and intelligent public opinion is the first essential of Democracy." Discuss. (1936)

[অনু-২ সম্পূর্ণ,—বন্ধনীর মধ্যেকার পংক্তিগুলি সমেত, তবে বন্ধনী তুলিয়া দিতে হইবে]

4. Describe the essential functions of political parties in a Democracy? (1935)

[ইংরাজী functions শব্দটী "ক্রিয়াকলাপ" এবং "কার্য্যকারিতা" উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়; এখানে উভয় অর্থই ধরিতে হইবে। অনু-৫ এবং অনু ৬ এর গুণ]

5. Discuss the merits and demerits of government by parties. (1940)

[অনু-৬]

6 What are the merits and demerits of party government? Discuss the soundness of forming political parties on the basis of religion. Illustrate your answer from the present political condition of India. (1942)—

[অনু-৬ সংক্ষেপে ও অনু-৯]

7. Discuss the respective merits and demerits of two party and multiple party systems. [অনু-৭]

ষোড়শ অধ্যায়

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

Local Government

(অনুচ্ছেদ-১) স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা,—ইহার অর্থ—*Local Government,—its meaning*

আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ এবং জনসংখ্যা বিপুল, সেই কারণে একটী সমগ্র রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রাষ্ট্রের সকল ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনের কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় না। সেইজন্য গ্রাম বা সহরের নিছক স্থানীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে (অর্থাৎ যে বিষয়গুলির সহিত অপর এলাকার অধিবাসীগণ সম্পর্কিত নহে) স্থানীয় অধিবাসীদিগের দ্বারাই যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য, প্রত্যেক স্থানীয় এলাকায়,—অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামে এবং সহরে (কখনও কখনও একটীর অধিক গ্রাম সংযুক্ত করিয়া একটী স্থানীয় এলাকা গঠন করা হয়) একটী করিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ইহাকে বলা হয় স্থানীয় শাসন (Local Government), কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বলিয়া উল্লেখ করা হইত বলিয়া, আমাদের দেশে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন (Local Self-Government)। ভারতবর্ষে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জিলাবোর্ড, লোকাল-বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ—এইগুলি হইল স্থানীয় (স্বায়ত্ত) শাসন প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ডে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এলাকাগুলিকে বলা হয় কাউন্টি (County), বারো (Borough) বা প্যারিস্ (Parish)। মার্কিনদেশে ঐরূপ এলাকা কাউন্টি (County) বা টাউনশিপ্ (Town-ship) নামে অভিহিত হয়।

(অনু-২) কার্য্যকলাপ—*Functions*

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্যগুলি হইল নিজস্ব এলাকার জনস্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তা নির্ম্মাণ ও রক্ষা, রাস্তা আলোকিত করা, জল-সরবরাহ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

সহর এলাকার স্থানীয় শাসনের অতিরিক্ত কতিপয় কার্য্য থাকে যথা—পার্ক ও ক্রীড়া-ভূমি নির্ম্মাণ, বস্তি পরিষ্কার, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি।

(অনু-৩) স্থানীয় শাসনের প্রকার—*Types of Local Government*

এক-পর্য্যায়ের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং এই দায়িত্ব পালনের কার্য্যে তাহাদিগকে প্রভূত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। গ্রেট-ব্রিটেনে কাউন্টি, বারো এবং প্যারিস্ পরিষদগুলি এই পর্য্যায়ের—ইহাদিগকে বহু প্রকার কার্য্যের ভার অর্পণ করা হয় এবং ঐগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক তাহাদিগকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সুইজারল্যাণ্ডে এই প্রকারের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। অপর এক পর্য্যায়ের স্থানীয় শাসন দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিছক কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ এবং প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানরূপেই অবস্থান করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের কার্য্যে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করেন। ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইটালিতে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(অনু ৪) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উপকারিতা—*Benefits of Local Self-Government.*

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার দ্বারা বিবিধ উপকার সাধিত হয়। (১) আধুনিক রাষ্ট্র এত বৃহৎ এবং তাহার কার্য্য সংখ্যায় এতই অধিক ও প্রকৃতিতে এতই জটিল যে একটী মাত্র কেন্দ্রীয়-শাসন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। সমগ্র রাষ্ট্রের বৃহৎ সমস্যাগুলি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবার প্রত্যেক সহর ও গ্রামের স্থানীয় বিষয়গুলি তত্ত্বাবধান করা এইরূপ বহুমুখী কার্য্য একটী মাত্র কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সুসম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। যদি কোনো কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠান এইরূপ বহু ক্ষেত্রব্যাপী কার্য্য করিতে প্রয়াস করে তাহা হইলে কোনো কার্য্যই দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা হইবে না। সেইজন্যই স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের আয়োজন থাকিলে উহা কেন্দ্রীয় শাসকবর্গকে ভারমুক্ত করে এবং সমগ্র রাষ্ট্রের দক্ষ শাসনের সহায়তা করে। (২) কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত থাকে তাঁহারা সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকিতে পারেন না। প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় অধিবাসীগণ তাহাদের গ্রামের বা সহরের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে

তাহাদের কি অভাব, অভিযোগ এবং কিভাবে সেগুলির যথোপযুক্ত প্রতীকার হইতে পারে, তাহা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিবারও সুযোগ পায়। সুতরাং গ্রাম বা সহরের স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব যদি স্থানীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উপর (যথা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলাবোর্ড ইত্যাদি) অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে স্থানীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। (৩) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা জনগণকে স্বায়ত্ত শাসনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং গণতন্ত্রের সাফল্যে সহায়তা করে। গণতন্ত্রের একটী ত্রুটির উল্লেখে বলা হইয়া থাকে এই, যে শাসনকার্য্য পরিচালনার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা জনসাধারণের নাই। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের এই ত্রুটি দূর করে; এই ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ লোকে গ্রাম বা সহরের সমষ্টিগত জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া,—অল্প পরিসরের মধ্যে এবং ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে হইলেও কিছু পরিমাণে শাসনকার্য্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। উপরন্তু গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য পৌর চেতনার উন্মেষ ও প্রচার প্রয়োজন। সকল লোকের সমষ্টিগত স্বার্থ ও কল্যাণের মধ্যেই প্রত্যেকের সত্যকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত, এই চেতনার নাম পৌর চেতনা। পরস্পরের সহিত মিলিতভাবে জনকল্যাণকর কার্য্যে অগ্রসর হইলে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থ যে অভিন্ন তাহা প্রতীয়মান হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এইভাবে পৌরচেতনার উন্মেষ করিয়াও গণতন্ত্রের সাফল্যে সহায়তা করে; সেই কারণে প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র বিজ্ঞানবিদ্ 'ব্রাইস্' বলিয়াছেন, "The best school of Democracy and the best guarantee for its success is the practice of local self government,"—"স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন পরিচালনার অভ্যাসই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন এবং উহার সাফল্য সুনিশ্চিত করণের শ্রেষ্ঠ উপায়।"

Questions & Hints

What are the advantages of local Self-Government? (1949)

[অণু-৪]

সপ্তদশ অধ্যায়

পৌর-আদর্শ

Civic Ideals

(অনুচ্ছেদ-১) পৌর-আদর্শ সমূহ—*The Civic Ideals*

পৌর জীবন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নাগরিকদিগকে তাহাদের সম্মুখে কতিপয় আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। নাগরিকদিগের দ্বারা অনুসরণযোগ্য পৌর জীবনের এই আদর্শ সমূহ পৌর আদর্শ নামে অভিহিত হয়। নিছক জীবন ধারণের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানুষের সৎ জীবন যাপনের সহায়তা করিবার জন্য। সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে, সৎ জীবন যাপনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই হইল পৌর আদর্শ। এই প্রচেষ্টা বিভিন্ন পর্য্যায়ের।

(১) সমষ্টির কল্যাণের জন্য ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করা একটী পৌর আদর্শ। প্রাচীন ভারতের মনীষীগণ অপরের কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ব্রতকে মহান আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। ত্যাগের স্পৃহা মানুষকে সমগ্র সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতে অনুপ্রাণিত করে।

(২) প্রত্যেক নাগরিককে গণ-চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবার আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে চেতনা হইল গণ-চেতনা (Public Spirit) প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে যে, সে প্রকাণ্ড জনসমষ্টির একটী অংশ,—জনগণের কল্যাণের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় নাগরিকগণ তাহাদের কর্ত্তব্য অপেক্ষা অধিকারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। গণচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার অধিকার অপেক্ষা কর্ত্তব্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। প্রত্যেকে যদি তাহার কর্ত্তব্য সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকে তাহা হইলে আপনা হইতেই সকলের অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্রের বা সমগ্র মানব সমাজের হিতসাধনের বহু পদ্ধতি আছে। কিন্তু যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হউক না কেন, উহার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের শারীরিক যোগ্যতা বা স্বাস্থ্য থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য না থাকিলে কোনো ব্যক্তিই জনকল্যাণকর কার্য্যের গুরুদায়িত্ব বহন করিতে পারিবে না। অতএব নিজ স্বাস্থ্য বজায় রাখা নাগরিকের শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনরূপেই গণ্য নহে—সমগ্র সমাজের দিক হইতে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে উহা আদর্শরূপে গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) আদর্শের দিক হইতে **অধ্যাপক ল্যাস্কি** নাগরিকতার এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, "Citizenship is the contribution of one's instructed judgement to the public good."—অর্থাৎ "শিক্ষা হইতে উদ্ভূত বিচার বিবেচনাকে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োগ করাই হইল নাগরিকতা।" **ল্যাস্কি** প্রদত্ত নাগরিকের এই সংজ্ঞার মধ্যে এই আদর্শের ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে যে জনকল্যাণের উপযুক্ত মানসিক যোগ্যতা প্রত্যেক নাগরিককে অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহাকে শিক্ষিত হইতে হইবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ত্তমান জগতের ঘটনাবলীর সহিত পরিচয় থাকিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; নাগরিককে জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল বস্তু আহরণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সহিত যে নাগরিকের পরিচয় নাই, তাহার দ্বারা জাতীয় কল্যাণের প্রয়াস নিরর্থক।

(৫) জাতির ও জগতের অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হইল মানুষের মানসিক সঙ্কীর্ণতা। পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যেক নাগরিক তাহার মানসিক সঙ্কীর্ণতা পরিহারের আদর্শ গ্রহণ করিবে। যাহা অতীত, শুধু তাহার দিকে তাকাইলেই চলিবে না, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকেও তাকাইতে হইবে। প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিতে হইলে, অতীতের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ হইতে যে সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি উদ্ভূত হয় উহা পরিহার করিবার আদর্শ প্রত্যেক নাগরিককে গ্রহণ করিতে হইবে।

(অনু-২) পৌর-আদর্শ উপলব্ধির জন্য আবশ্যক বিষয়—*Conditions for the realisation of civic ideals*

পৌর আদর্শগুলি নাগরিকদিগের দ্বারা উপলব্ধ এবং কার্য্যকরী হইবার জন্য, গোটাকয়েক বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রয়োজন। (১) **শিক্ষা**—শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত না হইলে কোনো নাগরিক তাহার কি আদর্শ ও কিভাবে সেগুলি কার্য্যকরী করা

যায় তাহা অনুধাবন করিতে পারিবে না এবং জনকল্যাণের চেষ্টায় শিক্ষা হইতে উদ্ভূত বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করাও তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। অধিকন্তু অশিক্ষিতের পক্ষে গোঁড়ামি বা মানসিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করাও সহজ হয় না। (২) **স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন**—পৌর আদর্শ উপলব্ধি করা ও কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না, যদি সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংগঠিত না হয়। যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে সক্ষম হয় না এবং সেহেতু নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পরিপোষক পরিবেশ অনুভব করিতে পারে না,—যে সমাজ ব্যবস্থায় সকলকে সমভাবে আত্মোন্নতির সুযোগ প্রদান করা হয় না, কতিপয় ব্যক্তিমাত্র উহা ভোগ করে, সেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় আমরা আশা করিতে পারি না যে সাধারণ নাগরিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া জনস্বার্থ চেতনা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জনকল্যাণ সাধনকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে। (৩) **অর্থনৈতিক সাম্য**—যে অর্থনৈতিক অবস্থায় জনগণের একাংশ প্রাচুর্য্য এবং অপর ও বৃহদংশ দারিদ্র্য ও নিয়ত অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে, সেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পৌর আদর্শ উপলব্ধি সম্ভব হয় না। নিত্যকার দারিদ্র্য ও অভাব জনগণের সৎ ও মহান প্রবৃত্তি ধ্বংস করিয়া দেয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ সাধারণ লোককে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে বাধা দেয়।

Questions & Hints

1. What are civic ideals? Explain the conditions necessary for the realisation of these ideals. [অনু-১ ও অনু-২]

ভারতের শাসন ব্যবস্থা

ভারতের শাসন ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

Evolution of the Indian Constitution

(অণু-১) দেওয়ানী হইতে কোম্পানী শাসনের অবসান পর্য্যন্ত—*From the Dewani to the abolition of Company Administration*

বিখ্যাত ইংরাজ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ভারতে ইংরাজ আমলের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট শাহ্ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করিতে বাধ্য হইলে কোম্পানী এই সকল এলাকার রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত মুর্শিদাবাদের নবাবের নামে কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা কোম্পানীরই কুক্ষিগত ছিল। ইহাতে শাসনকার্য্যে বিশেষ অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কারণ শাসনক্ষমতা কোম্পানীর হস্তগত থাকিলেও আইনতঃ শাসনের দায়িত্ব উহার ছিল না। শাসনকার্য্যের এই অব্যবস্থা রহিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট **১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট** নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। ইহার দ্বারা মোটামুটি তিনটি কার্য্য করা হয়। (১) বিভিন্ন প্রদেশের শাসনব্যবস্থা তদারকের জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট নিযুক্ত করা হয়—ইঁহার নাম ছিল বাঙ্গলার বড়লাট। বাঙ্গলার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ইঁহার হাতে ছিল, উপরন্তু ইনি মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর (এই দুইটি প্রদেশও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছিল) শাসনব্যবস্থাও তদারক করিবার ক্ষমতা পাইলেন। (২) বড়লাটকে সহায়তা করিবার জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি শাসন পরিষদ (Executive Council) গঠিত হইল। বড়লাটকে এই শাসনপরিষদের সহিত পরামর্শ করিতে হইত এবং ইহার অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে হইত। (৩) কলিকাতায় একটি সর্ব্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত

হইল এবং বড়লাটের কোন কার্য্য বা আদেশ বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতাও ইহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু অচিরেই নানা ত্রুটি দেখা যাওয়াতে **১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ভারত আইন** (**Pitt's India Act**) নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহার দ্বারা (১) সপরিষদ বড়লাটকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর গভর্ণমেণ্টগুলির উপর ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়, (২) কোন জরুরী অবস্থায় পরিষদের অধিক-সংখ্যক সদস্যের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও বড়লাটকে দেওয়া হইল, (৩) ভারতের ইংরাজ অধিকৃত এলাকার শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিবার জন্য লণ্ডনে একটি নিয়ন্ত্রণ সংসদ (Board of Control) স্থাপিত হয়। সংসদে একজন সভাপতি এবং ছয়জন কমিশনার ছিলেন, কালক্রমে কমিশনারগণ সংসদের কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে বিরত হন এবং সংসদের সকল কার্য্যের দায়িত্ব সভাপতির হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়।

ইহার পর **১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যে সনদ আইন (চার্টার এ্যাক্ট)** বিধিবদ্ধ হয় তাহার দ্বারা (১) কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লোপ করিয়া দেওয়া হয় এবং কোম্পানীকে একটী অবিমিশ্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়, (২) বাঙ্গলার বড়লাটকে এক্ষণে ভারতের বড়লাট বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ভারতের সামরিক ও বেসামরিক সকলপ্রকার শাসন কার্য্যের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সপরিষদ বড়লাটের হস্তে অর্পিত হয়, (৩) তাঁহার শাসন পরিষদে আইন-সদস্য নামে আরও একজন সদস্যের পদ যোগ করা হয়।

বিশ বৎসর অন্তর কোম্পানীর সনদ নূতনভাবে বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইত। অতএব **১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় একটী সনদ আইন** বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা (১) বড়লাটকে বাঙ্গলা প্রদেশ শাসনের সরাসরি দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলাদেশের জন্য একজন লেফ্‌টনেণ্ট্‌ গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়, (২) ভারতে সর্ব্বপ্রথম একটী আইন পারিষদ গঠিত হয়। বারজন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠন করা হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ভারতীয় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়—ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে কারণ ইংরাজদের অধীনস্থ সিপাহীদের দ্বারাই এই বিদ্রোহ সুরু করা হয়। ইংরাজসৈন্য এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হন বটে কিন্তু ইহার ফল স্বরূপ **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।** ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে একটী ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়।

ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সংসদের প্রেসিডেণ্টের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ভারতসচিব (Secretary of State for India) নামক একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করা হয়। ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তিকে লইয়া একটী ভারতীয় পরিষদ (Council of India) গঠিত হয়। ভারতের মধ্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা সপরিষদ বড়লাটের দ্বারাই হইবার ব্যবস্থা থাকে—তবে এক্ষণে বড়লাট রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হিসাবেও গণ্য হন।

(অণু-২) আইন পরিষদের সম্প্রসারণ—*Expansion of the Legislative Council*

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের শাসনকর্তৃত্ব গৃহীত হইবার অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা ভারতীয় আইন পরিষদের সম্প্রসারণের দিকে নজর দেন। **১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "ভারতীয় পরিষদ আইন"** (India Council Act) বিধিবদ্ধ করা হয়। (১) ১৮৫৩ সালে যে আইন পরিষদ স্থাপিত হয়, এক্ষণে উহাতে আরও অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আইন পরিষদে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক বারজন সদস্য নিয়োগ করিবার ক্ষমতা বড়লাটকে দেওয়া হয় ; ইহা ছাড়া বড়লাট ও তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণ আইন পরিষদের সদস্য তো থাকিতেনই। বড়লাট যাঁহাদের নিয়োগ করিতেন তাঁহাদেব মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক থাকিতেন বেসরকারী সদস্য (অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারী নহেন) ইহারা দুই বৎসরের জন্য সদস্য থাকিতেন। (২) অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও একটী করিয়া আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে গভর্ণরের দ্বারা মনোনীত চারিজন হইতে আটজন সদস্য থাকিতেন এবং ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক হইতেন বেসরকারী। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদ-গুলির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। যে সকল বিষয়গুলি সরকার ইঁহাদের কাছে উপস্থাপিত করিতেন শুধু সেই বিষয়গুলি ইঁহারা আলোচনা করিতে পারিতেন। (৩) এই আইনের দ্বারা বড়লাটকে জরুরী অবস্থায় অর্ডিনান্স জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ছয়মাসের জন্য এইরূপ অর্ডিনান্স বলবৎ থাকিতে পারিত।

ইহার পর ভারতে শিক্ষা বিস্তারের সহিত রাজনৈতিক চেতনা প্রসার লাভ করে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের শাসন সম্পর্কীয় অগ্রগতির প্রয়োজন বোধ করেন। **১৮৯১ সালে আরও একটি "পরিষদ আইন"** বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহার দ্বারা ভারতের আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হয়। বড়লাটকে সর্বোচ্চসংখ্যক ষোলজন সদস্য নিয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় ; পূর্ব্বে তাঁহার সর্বোচ্চসংখ্যক

বারজন সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা ছিল। মনোনয়নের পদ্ধতিরও কিছুটা পরিবর্ত্তন করা হয় ;—বাণিজ্য সংসদ (Chamber of Commerce), জিলাবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় —ইহাদের পরামর্শমত মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিরও সদস্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদিগকে বার্ষিক বাজেট আলোচনা করিবার এবং প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোন ভোট দিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু পরিষদগুলিতে সরকারী সদস্যদিগেরই সংখ্যাধিক্য থাকিয়া গেল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আর একটী "ভারতীয় পরিষদ আইন" বিধিবদ্ধ হয়। তদানীন্তন ভারতসচিব মর্লি সাহেব ও বড়লাট মিণ্টো সাহেবের নাম অনুসারে ইহাকে মর্লিমিণ্টো শাসন সংস্কার নামেও অভিহিত করা হয়। (১) ইহার দ্বারা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে অতিরিক্ত ৬০ জন সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় ; ইঁহাদের মধ্যে ২৮ জনের অধিক সরকারী সদস্য হইতে পারিতেন না। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মধ্যে কোন কোন আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৫০ এবং কোন কোন আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৩০ ধার্য্য করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য রহিয়া গেল কিন্তু প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য হইল। (২) ইহাতে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইল, মুসলমান-দিগের জন্য পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করা হইল। (৩) আইন পরিষদের ক্ষমতাও ইহার দ্বারা কিছুটা বর্দ্ধিত করা হইল। সাধারণ কোন বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব অনুমোদন করিবার এবং বাজেট সম্পর্কে ভোট দিবার ক্ষমতা ইহাকে দেওয়া হইল। (৪) বড়লাটের শাসন পরিষদে এবং বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক শাসনপরিষদে একজন করিয়া ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা হইল।

(অণু-৩) মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার (১৯১৯) *(Montagu Chelmsford Reforms, 1919)*

ভারতের শিক্ষিত সমাজ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার জন্য দাবী করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিলে ভারতবাসীরা গ্রেট ব্রিটেনকে যে সাহায্য প্রদান করেন এবং মহাযুদ্ধের সময়ে চারিদিকেই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনের যে দাবী উত্থিত হয়—তাহার দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতের দাবী আংশিকভাবে পূরণ করিতে প্রণোদিত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু কমন্স সভায় ব্রিটিশ সরকারের নীতি এইভাবে ঘোষণা করেন :—"শাসনকার্য্যের সকল বিভাগের

সহিত ভারতীয়দের উত্তরোত্তর সংযোগ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণ—ইহাই হইল ব্রিটিশ সরকারের নীতি এবং ইহার সহিত ভারত সরকারও সম্পূর্ণ একমত।" (The policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire.)

ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এই ঘোষণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কারণ ভারতের অধিবাসীদের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি এই ঘোষণার দ্বারা দেওয়া হইয়াছিল। এই নীতিকে আংশিকভাবে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের দ্বারা একটী ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের দ্বারা শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হয়। ইহা মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কাররূপে পরিচিত।

(১) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে দ্বিকক্ষ পরিষদে পরিণত করা হইল। উর্দ্ধকক্ষ রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) নামে অভিহিত হইল এবং নিম্ন কক্ষ অভিহিত হইল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ (Indian Legislative Assembly) নামে। উর্দ্ধকক্ষে ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন এবং নিম্নকক্ষে ১৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০৪ জন নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইল। ইহার দ্বারা উভয় কক্ষেই নির্ব্বাচিত সদস্যগণই মোট সদস্যগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক হইলেন। তবে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মারফৎ যে নির্ব্বাচনের পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তাহা থাকিয়া গেল। উর্দ্ধকক্ষ ৫ বৎসর এবং নিম্নকক্ষ ৩ বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল।

আইন পরিষদের ক্ষমতাও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা হইল। উভয়কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন বিলই আইনে পরিণত হইতে পারিত না। গোটাকয়েক ভোটবর্জ্জিত বিষয় বাদে অন্যান্য সকল ব্যয় প্রস্তাবে এই পরিষদ ভোট দিতে পারিত এবং বাজেট আলোচনা করিতে পারিত। প্রকৃতপক্ষে আইন পরিষদের এই সকল ক্ষমতা অনেকাংশে অলীকই ছিল। কারণ আইন পরিষদকে উপেক্ষা বা ব্যাহত করিবার মত প্রচুর ক্ষমতা বড়লাটকে দেওয়া হইল।

(২) বড়লাটের শাসন পরিষদেও গোটাকয়েক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহাতে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয়দের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) এই আইনটীর দ্বারা ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়।

(৪) শাসনের বিষয়গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সমগ্র ভারতবর্ষে একইরূপ আইন দ্বারা একই শাসনব্যবস্থা রক্ষা করা কর্ত্তব্য সেগুলি ভারত সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে রাখা হইল; এইগুলিকে বলা হইল কেন্দ্রীয় বিষয় সমূহ যথা—দেশরক্ষা, মুদ্রা প্রচলন, ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি। এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। অপরপক্ষে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এক একটী প্রদেশে এক এক প্রকার আইন ও ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় সেইগুলি প্রাদেশিক সরকার সমূহের নিকট দেওয়া হইল যাহাতে প্রাদেশিক সরকার সমূহ তাহাদের অবস্থা ও ইচ্ছানুযায়ী এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এইগুলিকে বলা হয় প্রাদেশিক বিষয়—যথা ভূমি রাজস্ব, জলসেচ, বন, কৃষি, পুলিশ, জেল, বিচার, অর্থ, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি। এইগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। অবশ্য প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের ক্ষমতা লাভ করিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতেই।

(৫) যেগুলি কেন্দ্রীয় বিষয় সেগুলি বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদের সাহায্যে শাসন করিবেন। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এইগুলি সম্পর্কে একই আইন ও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। প্রাদেশিক বিষয়গুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে গোটা কয়েক বিষয় (এইগুলিকে বলা হইল **সংরক্ষিত** বিষয়) প্রাদেশিক গভর্ণর তাঁহাদের শাসন পরিষদের সাহায্যে শাসন করিবেন। অন্যান্য গোটাকয়েক বিষয় (এইগুলিকে বলা হইল **হস্তান্তরিত** বিষয়) গভর্ণর জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুযায়ী শাসন করিবেন; অর্থাৎ প্রাদেশিক বিষয়গুলি দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, সংরক্ষিত বিষয় (Reserved Subjects) ও হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects)। পুলিশ, জেল, অর্থ ইত্যাদি সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল, এবং কৃষি, শিল্প, জলসেচ ইত্যাদি বিষয়গুলি হস্তান্তরিত বিষয় হইল। উভয় পর্য্যায়ের বিষয়সমূহ গভর্ণরই শাসন করিবেন তবে সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গভর্ণর তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যদের পরামর্শে ও সাহায্যে শাসন করিবেন। শাসন পরিষদের সদস্যের সংখ্যা দুই হইতে চার—

ইঁহারা ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং প্রদেশের মধ্যে যে আইন পরিষদ ছিল তাহার নিকট দায়ী নহেন। অপরপক্ষে হস্তান্তরিত বিষয়গুলি গভর্ণর শাসন করিবেন—জন কয়েক মন্ত্রীর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ. করিয়া। প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের মধ্য হইতে গভর্ণর জনকয়েককে মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন। এক একজন মন্ত্রী একটী বা কয়েকটী বিভাগ পরিচালনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মন্ত্রীরা তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকিতেন। আইন পরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রীদের উপর আস্থা হারাইলে মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে হইত এবং নূতন একদল মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন। তবে অনেক সময়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও গভর্ণরের ছিল।

প্রদেশগুলির এইরূপ শাসন ব্যবস্থাকে **দ্বৈত শাসন (Dy-archy)** বলা হইত।

(৬) প্রত্যেক প্রদেশেই একটী করিয়া প্রাদেশিক আইন পরিষদ ছিল—একটীমাত্র কক্ষ লইয়াই এই পরিষদ গঠিত। গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদে সভ্য হইতেন তবে আইন পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যদিগেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। নির্ব্বাচন অবশ্য পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা হইত যথা মুসলমানদের প্রতিনিধি কেবলমাত্র মুসলমানদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, শিখ এবং খ্রীষ্টানদের পক্ষেও ঐ একই ব্যবস্থা। প্রাদেশিক আইন পরিষদের কার্য্যকাল তিন বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল, অবশ্য গভর্ণর ইচ্ছা করিলে উহার কার্য্যকাল তিন বৎসরেব পূর্ব্বে শেষ করিতে পারিতেন বা তিনবৎসরের পরেও বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন। প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন এবং প্রদেশের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আইন পরিষদের ছিল তবে এই ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ অনেকগুলি বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে গভর্ণরের পূর্ব্ব অনুমতি (অর্থাৎ ঐ আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি) লইতে হইত। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে অনেক বিলের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন এবং গভর্ণরের সম্মতি না পাইলে কোন বিলই আইনে পরিণত হইতে পারিত না। মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার অনেকখানি ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন পরিষদের ছিল। আইন পরিষদের আস্থা হারাইলে মন্ত্রীগণকে পদত্যাগ করিতে হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন

Government of India Act, 1935

(অণুচ্ছেদ-১) ১৯১৯ সালে ভারত শাসনের যে ব্যবস্থা করা হইল, ভারতবর্ষের জনমত তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। শাসন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য ভারত-বাসীদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন হয়। অবশেষে কতকাংশে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি নূতন ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই নূতন শাসন বিধির দ্বারা, ভারতের শাসন ব্যবস্থায় নিম্নরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

(অণু-২) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন (*Provincial Autonomy*)—নূতন শাসনবিধির দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্ত্তন করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বলিতে মোটামুটি দুইটি জিনিষ বুঝায়। **প্রথমতঃ** যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন বলিয়া ধার্য্য করা হয় সেই সকল বিষয়ের শাসনে প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বা অপর কোন বৈদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবেন না। প্রদেশিক বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—তাহা যদি অপর কোন সরকার যথা—কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন বৈদেশিক সরকার, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন থাকে না। **দ্বিতীয়তঃ** প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের জনগণের ইচ্ছা ও মত অনুযায়ী শাসনকার্য্য চালাইবেন; কারণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলিতে প্রদেশের সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন বুঝায় না—উহার দ্বারা বুঝায় সেই শাসন ব্যবস্থা যাহা প্রদেশের জনগণের আয়ত্তাধীনে।

দ্বৈতশাসনের (*Dyarchy*) ব্যবস্থায় এইরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল না কারণ যদিও জনকয়েক মন্ত্রী ছিলেন, যাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলেও সকল বিষয় সম্পর্কে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা কেবলমাত্র

হস্তান্তরিত বিষয়গুলি সম্পর্কেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। সংরক্ষিত বিষয়-সমূহের উপর তাঁহাদের কোনই হাত ছিল না।

১৯৩৫ সালের নূতন শাসন বিধির দ্বারা এই দ্বৈতশাসন উঠাইয়া দেওয়া হইল অর্থাৎ প্রাদেশিক বিষয়সমূহের মধ্যে 'সংরক্ষিত' এবং 'হস্তান্তরিত' এইরূপ কোনই প্রভেদ রহিল না। সবই হস্তান্তরিত হইল। সকল বিষয়গুলি সম্পর্কেই প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী, এইরূপ মন্ত্রীগণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। অবশ্য সব কিছুই গভর্ণরের মারফৎ করা হইবে। তবে এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত ছিলনা, ইহার মধ্যে অনেক গলদ ছিল; প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন কেবলমাত্র আংশিকভাবেই প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল বলা চলে।

(অণু-৩) সর্ব্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (*All India Federation*)—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ একটী **একক (unitary) রাষ্ট্র ছিল**। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া সরকার ছিল তাহা হইলেও প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল; কারণ সপরিষদ বড়লাট সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন। ১৯৩৫ এর শাসনবিধির দ্বারা ভারতবর্ষকে একটী **যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যবস্থা** করা হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকিবে ব্রিটিশভারতের গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলি এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চাহে, সেইগুলি।

শাসনের বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া তিনটী তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা হইল; প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা—দ্বিতীয়, প্রাদেশিক তালিকা—তৃতীয়, যুগ্মাধিকারভুক্ত তালিকা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইল সেইগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার শাসন করিবেন এবং সেইগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করিবেন। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইন পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে না বা প্রাদেশিক সরকারের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এই বিষয়গুলি কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে এবং এইগুলি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং যে আইন প্রণয়ন করা হইবে, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের সকল প্রদেশগুলির উপরে এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে, তাহাদিগের উপরে প্রযোজ্য হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত এই বিষয়গুলি হইল :—দেশ রক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, যাজকীয় ব্যাপার, মুদ্রা প্রচলন, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ,

টেলিফোন, বেতার সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, সমুদ্রগামী জাহাজ ও প্রধান বন্দর সমূহ, আমদানী ও রপ্তানী বিভাগ, সাগর ও আকাশপথে যাত্রী ও মাল চলাচল, অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য, আফিং, পেট্রল ও লবণ, ব্যাঙ্ক ও বীমা, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, কৃষিগত আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর, বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী ইউরোপীয় পাগলা গারদ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় চাকুরী কমিশন, গ্রন্থস্বত্ব ও ট্রেডমার্ক ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি ছাড়াও যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহারাও থাকিবে। এইরূপ দেশীয় রাজ্যের নৃপতি একটী অধিরোহন পত্রে (Instrument of Accession) স্বাক্ষর করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবার চুক্তি করিবেন; তবে ইঁহাদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত সকল বিষয়গুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, অর্থাৎ ভারত সরকার, আইন প্রণয়ন করিতে বা শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন না। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ তাঁহাদের অধিরোহণ পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া দিবেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভূক্ত কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব মানিতে প্রস্তুত; এবং সে কর্ত্তৃত্বের সীমা কতখানি হইবে তাহাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তবে অধিরোহন পত্রে একবার স্বাক্ষর করিবার পর কোন দেশীয় রাজ্য আর যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয় একবার মানিয়া লইলে, তাহার সীমা হ্রাস করা চলিবে না। দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ অধিরোহণ পত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া বিষয়গুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রজা বলিয়া গণ্য হইবেন। শাসনবিধিতে আরও উল্লেখ ছিল যে সমগ্র ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের যত লোকসংখ্যা, যতগুলি দেশীয়রাজ্য মিলিত হইয়া তাহার অর্দ্ধেক লোকসংখ্যার সমান হইবে, অন্তত ততগুলি দেশীয়রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে তবেই যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হইবে।

এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হইবে? উহা ভারতের গভর্ণর-জেনারেল বা বড়লাটের দ্বারা পরিচালিত হইবে। বড়লাটকে সাহায্য করিবার জন্য একটী মন্ত্রী-পরিষদ গঠিত হইবে। বড়লাট স্বয়ং মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রীগণ বড়লাটের অভিরুচি অনুযায়ী কার্য্যে বহাল থাকিবেন। বড়লাট ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। এই মন্ত্রীপরিষদের কার্য্য হইবে যুক্তরাষ্ট্র তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার কার্য্যে বড়লাটকে সাহায্য

ও পরামর্শ দান। ইহার অর্থ অবশ্য এই যে মন্ত্রীগণই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন তবে বড়লাটের তদারকী থাকিবে। কিন্তু চারিটী বিষয় ছিল, যেগুলি মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাহিরে অর্থাৎ যেগুলির শাসনকার্য্য সম্পর্কে বড়লাট তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। এইগুলি হইল (১) দেশরক্ষা (২) বৈদেশিক ব্যাপার সমূহ, (৩) যাজকীয় ব্যাপার এবং (৪) উপজাতি এলাকা। এই চারিটী বিভাগের শাসনকার্য্যে মন্ত্রীগণের কোন হাত থাকিবে না। এইগুলি **সংরক্ষিত বিষয়**। এইগুলির শাসনকার্য্য বড়লাট স্বয়ং পরিচালনা করিবেন তবে এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তিনজন পরামর্শদাতা (Counsellor) নিযুক্ত করিবেন। এই চারিটি বিষয় ভিন্ন অন্যান্য বিষয়গুলি মন্ত্রীদিগের নিকট হস্তান্তরিত। অতএব দেখা যায় ১৯১৯ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী সেই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে উহা প্রবর্ত্তন করা হয়।

যে সকল বিষয় মন্ত্রীপরিষদের কাছে হস্তান্তরিত করা হইল ইহাদের সকল বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রীগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন কি? অর্থাৎ সমস্ত হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কেই মন্ত্রীগণের পরামর্শ মতই বড়লাট কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন কি?

ইহার উত্তর হইল—"না।" হস্তান্তরিত বিষয়গুলির শাসনের ব্যাপারেও বড়লাট বহুক্ষেত্রে মন্ত্রীদের উপদেশ অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করিতে পারিবেন। শাসনবিধিতে গোটাকয়েক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলা হইল যে ঐগুলি **বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব** (Special responsibilities)। সে কার্য্যগুলি সম্পর্কে বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব রহিল, সেই কার্য্যগুলি সম্পর্কে বড়লাটকে অবশ্য মন্ত্রীদের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রীদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা উচিত তাহা হইলে তিনি মন্ত্রীদের দেওয়া পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া নিজের ব্যক্তিগত বিচার (Individual judgement) মাফিক কার্য্য করিতে পারিবেন। বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া ছিল ভারতবর্ষের কোন অংশে শান্তিভঙ্গ হইলে তাহার প্রতিকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক স্থিরতা ও রাজার সম্ভ্রম বজায় রাখা প্রভৃতি কতিপয় বিষয় সম্পর্কে।

ব্যক্তিগত বিচারমত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছাড়া আরও গোটাকয়েক বিষয় উল্লেখ

করা হইল সেগুলি সম্পর্কে বড়লাট তাঁহার **"বিবেচনা মাফিক"** (Power to act in his discretion) কার্য্য করিতে পারিবেন। তাঁহার বিবেচনা মাফিক ক্ষমতা ছিল মোটামুটি তিন প্রকারের, (ক) **আইনপ্রণয়ন সম্পর্কীয় ক্ষমতা** (খ) **অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা এবং** (গ) **জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য ক্ষমতা**। যে সকল ক্ষেত্রে বড়লাট এই সকল "বিবেচনা মাফিক কার্য্য" করিবেন সেই সকল ক্ষেত্রে বড়লাটকে পরামর্শ দিবার কোন ক্ষমতা মন্ত্রীদের নাই। বড়লাট ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ শুনিতে পারেন বা নাও শুনিতে পারেন। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিশেষ দায়িত্বের ক্ষেত্রে, বড়লাট তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচার মত" (according to individual judgement) কার্য্য করিবেন সে সকল বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ শুনিতে বাধ্য; অর্থাৎ মন্ত্রীদের অধিকার আছে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার; তবে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ-মত কাজ নাও করিতে পারেন। অতএব ব্যাপারটী এইরূপ দাঁড়াইল:—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে—দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার সমূহ, যাজকীয় ব্যাপার ও উপজাতি এলাকা এই চারিটী বিষয় অনধিক তিনজন পরামর্শদাতার সাহায্যে বড়লাট স্বয়ং শাসন করিবেন। এইগুলি সংরক্ষিত বিষয়, ইহাদের শাসনে মন্ত্রীদের কোনই হাত নাই। ইহা ভিন্ন বড়লাটের "বিবেচনা মাফিক" গোটাকয়েক কার্য্য আছে যেগুলির ক্ষেত্রে বড়লাটকে পরামর্শ দিবার কোন অধিকারই মন্ত্রীদের নাই। শাসনের অন্যান্য সকল ব্যাপারে বড়লাটকে পরামর্শ দিবার অধিকার মন্ত্রীদের থাকিবে, এবং সাধারণতঃ বড়লাট মন্ত্রীদের পরামর্শমত কার্য্য করিবেন। কিন্তু আবার যে সকল বিষয়ে তাঁহার উপরে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে সেই সকল বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ শুনিবার পর তাঁহাদের মত অনুযায়ী কার্য্য নাও করিতে পারেন (কিন্তু পরামর্শ শুনিতে তিনি বাধ্য) কারণ বিশেষ দায়িত্বের ক্ষেত্রে "ব্যক্তিগত বিচার মত" কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

বড়লাটকে সাহায্য করিবার জন্য যে **মন্ত্রীপরিষদ** (Council of Ministers) গঠিত হইবে তাহাতে দশ জনের অধিক মন্ত্রী থাকিবেন না। বড়লাটই তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবেন; তাঁহারা বড়লাটের অভিরুচি অনুযায়ী মন্ত্রীত্ব পদে বহাল থাকিবেন। আইন পরিষদে যে দলের সংখ্যাধিক্য থাকিবে সেই দলের নেতাকে বড়লাট প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিবেন এবং এই প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ যাহাতে মন্ত্রীপরিষদের অন্তর্ভুক্ত হন তাহা বড়লাট দেখিবেন। বড়লাটের

সভাপতিত্বে মন্ত্রীপরিষদের অধিবেশন বসিবে এবং মন্ত্রীদের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা ও যৌথ দায়িত্ববোধ জাগরূক হয় তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট হইবেন। মন্ত্রীগণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিকক্ষ আইন পরিষদের যে কোন কক্ষের অধিবেশনে যোগদান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুসৃত কার্য্যধারা ও নীতি ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতে পারেন। আইন-পরিষদের কাছে তাঁহারা দায়ী থাকিবেন এবং আইন পরিষদের আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ (Federal Legislature) দ্বিকক্ষ ; উচ্চকক্ষের নাম (১) রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) এবং নিম্ন পরিষদ হইল (২) গণকক্ষ (House of Assembly)। বড়লাটও আইন পরিষদের অংশ। ২৬০ জন সদস্য লইয়া **রাষ্ট্রীয় পরিষদ** গঠিত হইবে। উহার মধ্যে ব্রিটিশ ভারত হইতে নির্ব্বাচকদের দ্বারা সরাসরিভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন ১৫০ জন ; দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের দ্বারা মনোনীত হইবেন ১০৪ জন এবং ৬ জন মনোনীত হইবেন বড়লাটের দ্বারা, এই পরিষদ স্থায়ীভাবে থাকিবে তবে প্রতি তিন বৎসর অন্তর সদস্যদের একতৃতীয়াংশের কার্য্যকাল শেষ হইবে এবং এই একতৃতীয়াংশের জন্য তিনবৎসর অন্তর নূতন নির্ব্বাচন হইবে। **গনকক্ষ** গঠিত হইবে ৩৭৫ জন সদস্য লইয়া ; ইহার মধ্যে ২৫০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন ব্রিটিশ ভারত হইতে এবং ১২৫ জন আসিবেন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয়রাজ্য-সমূহ হইতে। গণকক্ষের কার্য্যকাল ৫ বৎসর হইবে। ৫ বৎসর অন্তর নূতন করিয়া গণকক্ষ গঠিত হইবে। উভয় কক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারিবে না।

(অনু ৪) বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি—***The Governor-General and the Viceroy***

নূতন শাসনবিধির দ্বারা বড়লাট ও ভাইসরয় এই দুইটি পদকে পৃথক্ করা হইল। এতদিন একা বড়লাটের দুইপ্রকার দায়িত্ব ছিল প্রথম, ভারতসরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা-রূপে ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়, ভাইসরয়রূপে দেশীয়রাজ্যসমূহের নৃপতিগণের সহিত ইংলণ্ডের রাজার যোগসূত্র রক্ষা করা, তাঁহাদের কার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং জটিল সমস্যা দেখা দিলে সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। এতদিন বড়লাট একলাই এই দ্বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এক্ষণে এই দুইপ্রকার কার্য্য পৃথক করিয়া দেওয়া হইল এবং রাজা ইচ্ছা করিলে এই দ্বিবিধ কার্য্যের জন্য দুইজন পৃথক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল ;

একজন হইবেন বড়লাট ও একজন হইবেন ভাইসরয়। তবে রাজা ইচ্ছা করিলে একই ব্যক্তিকে দুই দফা কার্য্যের ভারও অর্পণ করিতে পারেন।

(অনু ৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত—*Federal Court*

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত—১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসনবিধির দ্বারা একটী যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত না হইলেও এই আদালত গঠন করা হয় এবং ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ইহা কার্য্য করিতে থাকে।

(অনু ৬) যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা – *Opposition to Federation*

নূতন শাসনবিধিতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ভারতের জনমত তাহার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠে। ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল এবং সকল রাজনৈতিক দলগুলি ১৯৩৫ এর শাসনবিধি প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অবশ্য ভারতীয় জনমত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী ছিল না, নূতন শাসনবিধি অনুযায়ী যে বিশেষ ধরণের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ভারতীয় জনমত তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার কারণ ছিল প্রধানতঃ এইগুলি—(১) কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিকভাবে শাসিত ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির সহিত স্বেচ্ছাচারী নৃপতি দ্বারা শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির সংযোগ শুভফলপ্রদ হইতে পারে না; (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের জনগণের কোনই প্রভাব থাকিবে না। কারণ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ সকল রাজ্যের রাজাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন, জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন না; (৩) ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা দেশীয়রাজ্যে জনসংখ্যা যদিও কম তবুও আইন পরিষদের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে দেশীয় রাজ্যের অনেক বেশী প্রতিনিধি থাকিবে। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীগণ, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের গণকক্ষে শতকরা ৩৩ ভাগ ও ঊর্দ্ধকক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ আসন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। (৪) যে সকল এলাকা লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, তাহাদের সকলের উপর যুক্তরাষ্ট্রের সমান ক্ষমতা থাকিবে না। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি অপেক্ষা, দেশীয় রাজ্যগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা জগতের কোন দেশেই নাই।

ভারতীয় জনগণের বিরোধিতার দরুণ নূতন শাসনবিধি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে নূতন শাসনতন্ত্র চালু

করা হয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার গঠন করা হয় নাই। ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে ঐ তারিখ হইতে নূতন শাসনবিধির কিছু অংশ কার্য্যকরী করা হয় এবং কিছু অংশ কার্য্যকরী করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার গঠন করা ছাড়া আর সকল অংশই কার্য্যকরী করা হয়। তবে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন উঠাইয়া দিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করা হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালে যে শাসনব্যবস্থা ছিল তাহাই চলিতে থাকে। তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের দরুণ উহাতে কিছু অদল-বদল করা হয়। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে চলিতে থাকে (অর্থাৎ ১৯১৯ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাহাতে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করা) তাহাকে বলা হইল পরিবর্ত্তনকালীন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা (Central Government during transition)। ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল যে শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তখন এইরূপ পরিবর্ত্তনকালীন ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে নূতন শাসনবিধিতে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোনদিনই প্রবর্ত্তিত হইল না এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট অবধি—অর্থাৎ যেদিন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইল,—ঐ পরিবর্ত্তনকালীন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাই চালু থাকিল।

Questions and Hints

1. What are the main features of Federation as proposed in the Government of India Act 1935? (1946, 1948) [অণুচ্ছেদ—৩, ৫ ও ৬]

2. Describe the nature and functions of the Federal Executive as contemplated by the Government of India Act 1935. (1944) [অণুচ্ছেদ—৩]

তৃতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

Central Government

(অণুচ্ছেদ-১) ভারতবর্ষের বড়লাট—*The Governor General of India.*

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক ও পরিচালক ছিলেন বড়লাট বা গভর্ণর জেনারেল। ইঁহার কার্য্যকাল ছিল ৫ বৎসর। ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক ইনি নিযুক্ত হইতেন। ইঁহার কোন কার্য্য ভারতবর্ষের কোন বিচারালয়ের দ্বারা বিচার যোগ্য ছিল না, অর্থাৎ বড়লাট যাহাই করুন না কেন উহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালত তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারিত না। বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা ছিল তাঁহার বেতন এবং এই টাকা ভারতের রাজস্ব তহ্‌বিল হইতেই দেওয়া হইত। একটী শাসন পরিষদের সহায়তায় বড়লাট তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালন করিতেন। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার দায়িত্ব সপরিষদ বড়লাটের (Governor General in Council) উপরেই ন্যস্ত ছিল।

সপরিষদ বড়লাটের কার্য্য ছিল ভারতবর্ষে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুশাসন বজায় রাখা। তাঁহার কার্য্যকলাপের জন্য বড়লাট ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার অন্তর্ভূক্ত ভারত সচিবের (Secretary of State for India) নিকট দায়ী ছিলেন। বড়লাট ও তাঁহার শাসন পরিষদ ভারতীয় আইন পরিষদের কাছে (অর্থাৎ ভারতের জনগণের প্রতিনিধির নিকটে) দায়ী ছিলেন না। তাঁহারা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী ছিলেন; কারণ, বড়লাট দায়ী ছিলেন ভারত সচিবের নিকট এবং ভারত সচিব ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার অন্তর্ভূক্ত হিসাবে পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী ছিলেন।

যদিও বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদের সহিত যুক্তভাবে ভারত শাসন করিতেন তাহা হইলেও শাসন ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত নিজস্ব ক্ষমতা রহিয়া গিয়াছিল। এই ক্ষমতাগুলি মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা (Executive powers)—বড়লাট কতিপয় পদে লোক নিয়োগ করিতে পারিতেন। যথা, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয়

এ্যাডভোকেট জেনারেল, উচ্চ আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সামরিক প্রধান বিচারপতি, উচ্চ আদালতের অস্থায়ী ও অতিরিক্ত বিচারপতিগণ ইত্যাদি। শাসন-পরিষদের অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করিতেন এবং যদিও শাসনপরিষদের সংখ্যাধিক সদস্যের মত অনুযায়ীই সাধারণতঃ তিনি কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন, তবুও ভারতের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি শাসন-পরিষদের সংখ্যাধিক সদস্যের মতামত অগ্রাহ্য করিতেও পারিতেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপরেই "রাজনৈতিক" ও "বহির্ব্যাপার" দপ্তর ন্যস্ত ছিল। দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জ্জনা দান করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দেশরক্ষা সম্পর্কে সকল ব্যাপারের উপর তাঁহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

(খ) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা** (Legislative powers)—বড়লাট কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিবার, বা মুলতুবী রাখিবার, অথবা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের যে কোন কক্ষে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিতেন। আইন পরিষদ নূতন করিয়া গঠনের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দানের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। সরকারী ঋণ বা রাজস্বের সহিত অথবা জনগণের ধর্ম্মের সহিত এবং আরো কয়েকপ্রকার বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আইনের প্রস্তাব তাঁহার পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতীত উত্থাপিত হইতেই পারিত না। আইনপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত যে কোন বিল তিনি বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর ব্যতীত কোন বিলই আইনে পরিণত হইতে পারিত না। যদি কোনো আইনের প্রস্তাব আইন পরিষদ বিধিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতেন, কিন্তু বড়লাট যদি ভারতের স্বার্থ, নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য ঐ প্রস্তাবকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি ঐ প্রস্তাবকে আইন-সভার মতের বিরুদ্ধেও আইনে পরিণত করিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি প্রয়োজন মনে করিলে অর্ডিনান্স নামক জরুরী আইন জারী করিতে পারিতেন। এইরূপ অর্ডিনান্সের ছয়মাস যাবৎ আয়ু থাকিত। পরে একটি সংশোধনের দ্বারা বড়লাট কর্ত্তৃক জারীকৃত অর্ডিনান্সের আয়ু অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত থাকিবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) অর্থসম্পর্কীয় ক্ষমতা—(Financial powers) কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যয়ের উপরেও বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সরকারের প্রয়োজনে রাজস্ব আদায় করিবার অথবা অর্থ ব্যয় করিবার কোন প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপন করিবার

অনুমতি দানের ক্ষমতা বড়লাট ভিন্ন আর কাহারো ছিল না। গোটাকয়েক ব্যয়ের খাত ছিল যেগুলি আইন সভার ভোট সাপেক্ষ নহে—অর্থাৎ সেই ব্যয়গুলি করা হইবে কিনা এ সম্বন্ধে আইন সভার মতামত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল না। দেশরক্ষা, বহির্ব্যাপার যাজকীয় ব্যাপার, সরকারী ঋণের সুদ ইত্যাদি বাবদ খরচা সমূহ ছিল এইরূপ ভোট নিরপেক্ষ। এই ভোট নিরপেক্ষ ব্যয়ের খাতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার দায়িত্ব ছিল বড়লাটের, অবশ্য ইহাতে তিনি শাসন পরিষদের অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। যে সকল ব্যয় ভোট সাপেক্ষ ছিল অর্থাৎ যে সকল ব্যয়ের জন্য আইন পরিষদের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন ছিল, সেই সকল খাতের কোন ব্যয় যদি আইন পরিষদ নামঞ্জুর করিতেন অথবা কমাইয়া দিতেন তাহা হইলে বড়লাট তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করিলে, ঐ প্রত্যাখ্যাত বা হ্রাসকৃত ব্যয় পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন। অর্থাৎ আইন পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি প্রস্তাবিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। যে কোন অর্থসংক্রান্ত বিলই তিনি আইন পরিষদের মতের বিরুদ্ধে আইনে পরিণত করিতে পারিতেন; অতএব আইন পরিষদের মতের বিরুদ্ধেও তিনি কর ধার্য্য করিতে পারিতেন। জরুরী অবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের নিরাপত্তার জন্য তিনি যে কোন ব্যয়ের হুকুম দিতে পারিতেন।

(ঘ) প্রাদেশিক সরকারের উপর ক্ষমতা—(Powers over provincial Governments) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও বড়লাটের ছিল। প্রাদেশিক শাসনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন প্রাদেশিক গভর্ণর। কোনো কোনো অবস্থায় গভর্ণরগণ বড়লাটের অধীন ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে (১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী) গভর্ণরগণ সাধারণতঃ মন্ত্রীদিগের পরামর্শমত চলিলেও বহুক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের "ব্যক্তিগত-বিচার" (Individual judgement) এবং "বিবেচনা মাফিক ক্ষমতা" (Discretionary powers) প্রয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু এইরূপ "ব্যক্তিগত বিচার" বা "বিবেচনা মাফিক ক্ষমতা" প্রয়োগ করিবার সময়ে গভর্ণরগণ বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিতে এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও ব্রিটিশ ভারতের যে কোন অংশে গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে উহা নিবারণের জন্য বড়লাট গভর্ণরগণকে যে কোনো আদেশ দিতে পারিতেন।

(অনু-২) শাসন পরিষদ—*Executive Council*

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে একটি শাসন পরিষদের

সাহায্যে বড়লাট ভারত শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। শাসন পরিষদে কয়জন সদস্য থাকিবেন তাহা ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইত; যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ আটজন থাকিতেন কিন্তু যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুণ সদস্য সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। জঙ্গীলাটও (Commander-in-chief) শাসন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজাই সদস্যদিগকে নিয়োগ করিতেন, এবং নিয়ম ছিল যে সদস্যদিগের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন এমন ব্যক্তি থাকিবেন যাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে অন্ততঃ ১০ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন এবং একজন এমন ব্যক্তি থাকিবেন যাঁহার আইন সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান আছে। প্রত্যেক সদস্য ৫ বৎসরের জন্য স্বপদে বাহাল থাকিতেন।

সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার করিয়া পরিষদের অধিবেশন বসিত। বড়লাটই পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এবং অপর সদস্যদিগের মধ্যে প্রবীনতম ব্যক্তিকে সহ সভাপতি নিযুক্ত করিতেন। সভাপতি হিসাবে বড়লাটের কাষ্টিং ভোট ছিল। অর্থাৎ কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হইলে, সভাপতির ভোটের দ্বারা উহার মীমাংসা হইত। সাধারণতঃ পরিষদ সদস্যদিগের সংখ্যাধিক ব্যক্তির যাহা অভিমত তাহাই কার্য্যকরী করা হইত, তবে ব্রিটিশ ভারতের স্বার্থ, নিরাপত্তা বা শান্তির জন্য প্রয়োজন বোধ করিলে বড়লাট সংখ্যাধিকের অভিমত অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন।

এক একজন সদস্য একটি বা গোটাকয়েক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রত্যেক সদস্য তাঁহার দপ্তরের সাধারণ বা মামুলি বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন এবং সেইমত কার্য্য করিতেন। কিন্তু কোন সদস্যের দপ্তর সম্বন্ধে এমন যদি কোন বিষয় থাকিত যাহা কোন না কোন কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা অন্য কোনো দপ্তরেব কার্য্যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইলে ঐ বিষয়টী সমগ্র পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইত। সমগ্র পরিষদের মত অনুযায়ী ঐ বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হইত। শাসন পরিষদের প্রত্যেক সদস্য আইন সভার দুইটি কক্ষের যে কোন একটির সভ্য মনোনীত হইতেন—তবে প্রত্যেকে যে কোনো কক্ষের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন এবং যে কোনো কক্ষের সম্মুখেই বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কিন্তু যিনি যে কক্ষের সভ্য, শুধু মাত্র সেই কক্ষেই ভোট দিতে পারিতেন।

প্রত্যেক সদস্য তাঁহার দপ্তর সংক্রান্ত বিল সমূহ আইন সভায় উত্থাপন করিতেন ও বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে পরিচালন করিতেন। সদস্যগণ আইন পরিষদে তাঁহাদের দপ্তর সংক্রান্ত প্রশ্নাদির উত্তর দিতেন। কিন্তু আইন পরিষদের নিকট তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল না—অর্থাৎ আইন পরিষদের আস্থাভাজন না হইলেও তাঁহারা চাকুরীতে

বাহাল থাকিতেন। তাঁহারা বড়লাটের নিকট এবং তাঁহার মারফৎ ভারতসচিবের নিকট দায়ী ছিলেন।

(অনু-৩) ভারতসরকারের দপ্তর সমূহ *(Departments of the Government of India)*—

ভারতসরকারের যে বিভিন্ন দপ্তরসমূহ শাসন পরিষদের সদস্যগণ পরিচালন করিতেন সেইগুলি এইরূপ :—

(১) রাজনৈতিক ও বহির্ব্যাপার দপ্তর—ভারতের দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়-সমূহ রাজনৈতিক দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দের উপরে ইংলণ্ডেশ্বরের যে চরম কর্তৃত্ব (Paramount power) ক্ষমতা ছিল ইনি সেই ক্ষমতা রক্ষা ও প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষের সহিত উহার সন্নিহিত দেশগুলির (যথা আফগানিস্থান, নেপাল, পারস্য ইত্যাদি) সম্পর্কের দিকে নজর রাখা ছিল বহির্ব্যাপার দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত কার্য্য। এই দপ্তরটি বড়লাটের আয়ত্ত্বাধীন।

(২) দেশরক্ষা দপ্তর—স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা এই দপ্তরের কাজ। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজকীয় বিষয় পরিচালনার ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত ছিল। জঙ্গীলাট বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত।

(৩) স্বরাষ্ট্র দপ্তর—দেশের অভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্পর্কে ও শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্পর্কেই ইহার কার্য্য। পুলিশ ও জেল বিভাগ তাদারক করা, আইন প্রয়োগ করা, সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শাসন করা—এই সকল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কার্য্য ছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব ইহার ভারপ্রাপ্ত।

(৪) অর্থদপ্তর—রাজস্ব আদায় এবং সরকারের ব্যয় নির্বাহ করা এই দপ্তরের কার্য্য। এই দপ্তর বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্যও দায়ী। যে কোন বিভাগের দ্বারা নির্ব্বাহযোগ্য যে কোন ব্যয়, অর্থবিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষ। ইহা সরকারের আয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক।

(৫) রেল ও যোগাযোগ বিভাগ—রেলওয়ে, রাস্তা, ডাক ও তার, অসামরিক বিমান চলাচল এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। চলাচলের ভারপ্রাপ্ত সচিবের উপর এই সহরের তত্ত্বাবধান ন্যস্ত ছিল।

(৬) আইন সম্পর্কীয় বিভাগ—আইনের প্রভাব সমূহ মুশাবিদা করা ও পরীক্ষা করা এই বিভাগের কার্য্য। এই বিভাগটি আইন সচিবের অধীনে; সরকারকে আইন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পরামর্শ দান করাও তাঁহার কর্ত্তব্য।

(৭) শ্রম দপ্তর—শ্রমিকদিগের সম্পর্কে সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার এই দপ্তরটির। শ্রমিক আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়াও এই দপ্তরের কার্য্য।

(৮) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর—ব্যবসা, বাণিজ্য ষ্ট্যাটষ্টিক্স্ ইত্যাদির সহিত এই দপ্তর সংশ্লিষ্ট। শুল্কনীতি নির্দ্ধারণ ও অন্যান্য দেশের সহিত কোন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনও এই দপ্তরের কার্য্য।

(৯) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তর—কৃষি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে গবেষণা করা, জমি জরিফ করা ইত্যাদির সহিত এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, কৃষিকার্য্য, ভূমিরাজস্ব, বনবিভাগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এই দপ্তরের কার্য্য।

(১০) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর—যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও সাধারণ উন্নয়নের ব্যবস্থা করার জন্য এই দপ্তর সৃষ্ট হয়।

(১১) খাদ্য বিভাগ—দেশে খাদ্যসঙ্কট উপস্থিত হইলে এই বিভাগ সৃষ্টি হয়। খাদ্য বস্তু সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ও অধিক পরিমাণে খাদ্যবস্তু উৎপাদনে সহায়তা করিবার জন্য এই দপ্তরের সৃষ্টি হয়।

(১২) সরবরাহ বিভাগ—সমর সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ এই দপ্তরের কার্য্য ছিল। যুদ্ধোত্তরকালে এই বিভাগটি সঞ্চিত সামরিক সামগ্রীর বিলি ব্যবস্থার কার্য্যে রত হয়।

(১৩) রাষ্ট্র সমবায় সম্পর্ক নির্দ্ধারণ বিভাগ—ভারতীয়দিগের বহির্গমনের প্রতি এবং অন্যান্য ডোমিনিয়ন ও কলোনীতে বসবাসকারী ভারতীয়দিগের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এই দপ্তরের কার্য্য।

(অনু-৪) গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা (ক্ষমতা হস্তান্তরের পর)—
Governor General's power (after Transfer of Power.)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন; ভারত ঐ দিন হইতে "ডমিনিয়ন" মর্য্যাদা লাভ করিল। ডমিনিয়ন অবস্থাতেও ভারতশাসনের শীর্ষদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে একজন গভর্ণর জেনারেল অবস্থান করিলেন। কিন্তু ইঁহার ক্ষমতা পূর্ব্বের ন্যায় আর রহিল না। এখন গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা হইল এইরূপ:

(ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক ক্ষমতা *(Executive Powers)*—বড়লাট রাষ্ট্রের প্রধান রূপেই রহিলেন এবং শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকিল তাঁহার নামেই। কিন্তু এখন তিনি শাসন পরিচালনা করিতে থাকিলেন একটি মন্ত্রী পরিষদের সাহায্য লইয়া; যে মন্ত্রীপরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট (কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম হইল ডমিনিয়ন পার্লামেণ্ট) দায়ী থাকিয়া কার্য্য করিতেন। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীপরিষদই শাসন পরিচালনা করিতেন গভর্ণর জেনারেলের নামে। গভর্ণর জেনারেলের হাতে কোন দপ্তরের শাসন-ভার রহিল না। কতিপয় উচ্চপদে লোক নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহার রহিল এবং দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জ্জনা দিবারও তিনি অধিকারী থাকিলেন। কিন্তু এই সকল ক্ষমতাও তিনি মন্ত্রীদিগের পরামর্শ মতন প্রয়োগ করিতেন—তাহার নিজস্ব শাসনক্ষমতা বলিয়া কিছুই রহিল না। রহিল শুধু পদগৌরব ও সম্মান।

(খ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers)—পূর্ব্বে বড়লাটের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যে সকল ক্ষমতা ছিল উহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইল। ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের (ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভা) অধিবেশন আহ্বান বা মুলতুবী রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল পার্লামেণ্টের সভাপতির উপর—বড়লাটের উপর নহে। কেন্দ্রীয় আইন সভা ভাঙ্গিয়া দিবাব ক্ষমতা বড়লাটের রহিল না। কোনরূপ আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য আর বড়লাটের পূর্ব্ব-অনুমতি প্রয়োজন হইল না,—আইন সভায় আলোচনা বন্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিল না। তবে ব্যবস্থা থাকিল যে বড়লাট কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভাষণ প্রদান করিতে বা বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত সকল আইনের প্রস্তাব তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে। এই অনুমোদন তিনি প্রদান করিতেও পারিতেন বা প্রত্যাখ্যান করিতেও পারিতেন। এইগুলি মামুলী ক্ষমতা মাত্র—আইনসভার কার্য্য নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার আর রহিল না। পূর্ব্বে বড়লাট যে সার্টিফিকেশন ক্ষমতার দ্বারা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন, সে ক্ষমতাও আর রহিল না। তবে কোন জরুরী অবস্থায় অর্ডিনান্স জারী করিবার ক্ষমতা বড়লাটের ছিল—কিন্তু এইরূপ অর্ডিনান্স মাত্র ছয়মাসের জন্য বলবৎ থাকিত এবং আইনসভা আইন করিয়া এইরূপ যে কোন অর্ডিনান্স বাতিল বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত।

(গ) অর্থ-সম্পর্কীয় ক্ষমতা *(Financial Power)*—কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের সহিত বড়লাটের সম্পর্ক বজায় রহিল—যদিও পরিবর্ত্তিত ভাবে। পূর্ব্বে প্রত্যেক রাজস্ব বৎসরের প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব বড়লাট

আইনসভার নিকট উপস্থাপিত করিতেন। বড়লাটের সুপারিশ ব্যতীত আইন সভার মধ্যে কোনরূপ করধার্য্যের প্রস্তাব অথবা কোন সরকারী অর্থ ব্যয় করিবার প্রস্তাব করা যাইত না। পূর্ব্বে বড়লাট তাঁহার সার্টিফিকেশন ক্ষমতার বলে, আইন সভার মতের বিরুদ্ধে যে কোন কর আদায় এবং যে কোন ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন; এক্ষণে তাহার সেই কু-খ্যাত সার্টিফিকেশন ক্ষমতা আর রহিল না।

(অণু-৫) [শাসন পরিষদের পরিবর্ত্তে] মন্ত্রীপরিষদ—*Council of Ministers* [*in Place of the Executive Council*]

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে পূর্ব্বেকার শাসন পরিষদ উঠিয়া গেল। উহার স্থলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইল। শাসন পরিষদ ও মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হইল এই যে শাসন পরিষদ গঠিত হইত বিদেশী শাসকের ইচ্ছামত ব্যক্তি লইয়া কিন্তু মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইল দেশবাসীর প্রতিনিধি লইয়া।

বড়লাটের সহিত সম্পর্ক—নূতন ব্যবস্থায় বলা হইল যে বড়লাটের কার্য্য সম্পাদনে পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইবে। পরামর্শ ও সাহায্য শব্দগুলি আনুষ্ঠানিক মাত্র,—প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীগণই দেশশাসন করিবেন—অবশ্য বড়লাটের নামে। বড়লাটই মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিবেন এবং তিনি মন্ত্রীগণকে পদচ্যুতও করিতে পারিতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি যে কাহাকেও মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে অথবা যে কোন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিতে পারিতেন না। ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দলের নেতাকে তিনি প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রীগণ যতদিন পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকিতেন ততদিন তাঁহারা কার্য্যে বাহাল থাকিতেন। বড়লাটের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা বাস্তবক্ষেত্রে মন্ত্রীগণই প্রয়োগ করিতেন—বড়লাট মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শমত কার্য্য করিতেন।

পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্ক—পার্লামেণ্টের যাঁহারা সদস্য তাঁহাদিগের মধ্যে হইতেই মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন। পার্লামেণ্টের সদস্য নহেন এরূপ কোন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারিতেন তবে ছয়মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ সংগ্রহ করিতে হইত অথবা পদত্যাগ করিতে হইত। মন্ত্রী পরিষদ শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য যৌথভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন—যৌথভাবে শব্দের অর্থ হইল যে প্রত্যেক মন্ত্রী অপর সকল মন্ত্রীর কার্য্যের দায়িত্ব বহন করিতেন। পার্লামেণ্টের

ইচ্ছানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইত, যতদিন তাঁহারা পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক সদস্যের আস্থাভাজন থাকিতেন, কেবলমাত্র ততদিন তাঁহারা মন্ত্রীত্ব করিতে পারিতেন। ইঁহারা পার্লামেন্টের সদস্যগণ শাসন সম্পর্কে যে সকল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার জবাব দিতেন, ও তাঁহাদিগের অনুসৃত নীতি পার্লামেন্টের মধ্যে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতেন। পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের কার্য্যে মন্ত্রীগণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন। ইঁহারা আইনের খসড়া লিখিয়া সেইগুলি আইনের প্রস্তাব রূপে পার্লামেন্টে উত্থাপন করিতেন। পার্লামেন্ট যাহাতে ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে আলোচনার মধ্যদিয়া ঐ আইনের প্রস্তাব সমূহকে মন্ত্রীগণ পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতেন। পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রীপরিষদের ঘনিষ্ট এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ছিল। এই ভাবে সর্ব্বপ্রথম ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে (in the Central Government) দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) প্রতিষ্ঠিত হইল। কারণ সরকার হইলেন "মন্ত্রীপরিষদ" এবং এই মন্ত্রীপরিষদ জাতির প্রতিনিধি "পার্লামেন্টের" নিকট দায়ী থাকিয়া শাসন পরিচালনা করিতে বাধ্য হইলেন।

(অণু-৬) নূতন শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার—*Central Government under the New Constitution.*

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা ছিল একটি ডমিনিয়নের মর্য্যাদা "(Dominion Status)।" তখন কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালিত হইত একজন গভর্ণরজেনারেল এবং তাঁহার মন্ত্রীপরিষদের দ্বারা,—উপরে যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইল।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত ডোমিনিয়ন মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র (Republic) বলিয়া ঘোষণা করিল*। ঐ দিন হইতে গভর্ণর জেনারেলের পদ বিলুপ্ত হইল এবং ভারতরাষ্ট্রের প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন একজন রাষ্ট্রপতি (President)। নূতন শাসনতন্ত্রে বিধান দেওয়া হইল যে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করিবেন একজন রাষ্ট্রপতি—অবশ্য একটি মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া।

* ভারতের একটি বিশেষ পরিষদ গণপরিষদ (Constituent Assembly) ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছিল। এই নূতন শাসনতন্ত্র ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হইল।

(অণু-৭) রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা ও ক্ষমতা—***Position and Powers of the President***

রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং সমগ্র রাষ্ট্রের প্রধান। ভারতের পার্লামেণ্টে এবং বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রসমূহের আইনসভাগুলিতে যত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, তাঁহারা সকলে ভোট দিয়া রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করিবেন। রাষ্ট্রপতি হইতে গেলে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এবং ভারতের নাগরিক হইতে হইবে। পাঁচ বৎসর অন্তর নূতন রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন হইবে ; অবশ্য যিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি নূতন নির্ব্বাচনেও দাঁড়াইতে পারিবেন। শাসনতন্ত্র অমান্য করিলে তাঁহাকে অপসারণ করা যাইবে। এই অপসারণ কার্য্য সম্পাদিত হইবে পার্লামেণ্টের মধ্যে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অথবা অন্য কোন আইন সভার সদস্য থাকিবেন না।

রাষ্ট্রপতিকে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে সেগুলি এইরূপ :—

(ক) **শাসন সংক্রান্ত বা কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা** (Executive Powers) —তিনি স্বয়ং অথবা কোন অধস্তন কর্ম্মচারীর মারফৎ কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। ভারতের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে যে কয়টী কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকা (Centrally administered areas) আছে সেগুলির শাসন পরিচালনার জন্য তিনিই দায়ী। সমগ্র দেশরক্ষা বাহিনীর তিনিই সর্ব্বাধিনায়ক। বিদেশে দূত প্রেরণ এবং বিদেশ হইতে দূত গ্রহণ তাঁহার কার্য্য। অপরাধীকে মার্জ্জনা প্রদান বা তাহার শাস্তি বিলম্বিত করা বা উহার মেয়াদ কমাইয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের ক্ষমতাও তিনি ব্যবহার করিবেন।

(খ) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা** (Legislative powers)—রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা বা স্থগিত রাখা তাঁহার ক্ষমতাধীন। পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদ অর্থাৎ "লোক সভাকে" (House of People) উহার নির্দ্ধারিত কার্য্যকালের পূর্ব্বেই তিনি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। পার্লামেণ্টে বাণী প্রেরণ বা অভিভাষণ প্রদান করিতেও তিনি পারেন। পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত প্রত্যেক বিল (Bill) অর্থাৎ আইনের প্রস্তাব তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষ।

পার্লামেণ্টের যখন অধিবেশন চলিতেছে না, তখন যদি কোন আইনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট ঐরূপ আইন জারী করিতে পারিবেন; এইরূপ আইনের

নাম অর্ডিনান্স। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে এইরূপ অর্ডিনান্সের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

(গ) **অর্থসম্পর্কীয় ক্ষমতা** (Financial powers)—রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক রাজস্ব বৎসরের প্রথমে পার্লামেণ্টের নিকট বাজেট (সরকারের আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব) পেশ করিবেন। তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত কোন ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব বা কোন কর ধার্য্যের প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না। রাষ্ট্রপতি একটী "রাজস্ব কমিশন" গঠন করিয়া দিবেন, ইহার কার্য্য হইবে, কতিপয় কর হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে উহা কেন্দ্রীয় সরকার ও মূলরাষ্ট্রীয় (প্রাদেশিক) সরকারের মধ্যে কিভাবে ভাগাভাগি হইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া। যতদিন ঐ কমিশন গঠিত না হইতেছে ততদিন ঐ ভাগাভাগি রাষ্ট্রপতিই করিয়া দিবেন। ইহা ভিন্ন, ভারতের আর্থিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করিতে পারিবেন।

(ঘ) **জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য ক্ষমতা** (Emergency Powers)—সমগ্র ভারতের, অথবা ভারতের যে কোন অংশের, নিরাপত্তা যদি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ অথবা বৈদেশিক আক্রমণের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করিতে পারেন।*

এই সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলিয়া বিবৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে এইগুলি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মতন প্রয়োগ করিবেন। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, এই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদই প্রয়োগ করিবেন—অবশ্য রাষ্ট্রপতির নামে। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায়, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান, কেবল নামে ও মর্য্যাদায়,—ক্ষমতায় নহে।

(**অণু-৮**) **মন্ত্রীপরিষদ** (**নূতন শাসনতন্ত্রে**)—*Council of Ministers (under the New Constitution)*

নূতন শাসনতন্ত্রে একটী মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট ভাবে শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে। কতজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইবে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে প্রথমে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছামত অন্যান্য মন্ত্রীদের তিনি নিয়োগ করিবেন। পার্লামেণ্টের নিম্ন কক্ষে যে দল সংখ্যাধিক থাকিবে

* এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করা হইলে ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ অর্থাৎ পার্লামেণ্ট যে কোন মূলরাষ্ট্রে (প্রদেশে) প্রয়োগ হইবে এইরূপ যে কোন আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার পাইবেন।

সেই দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ সেই দলের মধ্য হইতে, অথবা সেই দলের দ্বারা সমর্থিত হইয়া, নিযুক্ত হইবেন,—ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।

রাষ্ট্রপতির সহিত সম্পর্ক—রাষ্ট্রপতির দ্বারাই মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইবে। তিনি প্রথমে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে তিনি নিয়োগ করিবেন। তিনিই মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করাইবেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর (অর্থাৎ কে কোন বিভাগ দেখিবেন) বণ্টন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রীদিগের "সাহায্য ও পরামর্শ" লইয়া রাষ্ট্রপতি শাসন পরিচালনা করিবেন। প্রকৃত পক্ষে "সাহায্য ও পরামর্শ" শব্দ নিছক আনুষ্ঠানিক আইনের ভাষা। মন্ত্রী পরিষদই শাসন পরিচালনা করিবেন, রাষ্ট্রপতির নামে। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির অভিরুচি অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকিবেন এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ যতদিন পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকিবেন ততদিন তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। তবে কোন মন্ত্রী যদি সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের সহিত অথবা প্রধান মন্ত্রীর সহিত মানাইয়া চলিতে না পারেন অথচ পদত্যাগও না করেন, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধক্রমে রাষ্ট্রপতি ঐ মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্ক—পার্লামেণ্টের সহিত মন্ত্রী পরিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়াই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হইবে।

(ক) **মন্ত্রীপরিষদ কিভাবে পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল**—পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রেণীর মধ্য হইতেই মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হইবেন। পার্লামেণ্টের সদস্য নহেন এরূপ ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন ; তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে সদস্যপদ সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্যথায় পদত্যাগ করিতে হইবে। সমগ্র মন্ত্রীপরিষদ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। পার্লামেণ্টের আস্থা যতদিন একটী মন্ত্রীপরিষদের উপর থাকিবে ততদিন ঐ মন্ত্রীপরিষদ বহাল থাকিবেন। ঐ আস্থা হারাইলে মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করিবেন।

(খ) **পার্লামেণ্ট কিভাবে মন্ত্রীপরিষদের উপর নির্ভরশীল**—মন্ত্রী পরিষদই, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করিতে পারিবেন। যদিও পার্লামেণ্টই আইন প্রণয়ন করিবে তবুও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিবেন মন্ত্রী পরিষদ। তাঁহারা আইনের খসড়া তৈয়ারী করিবেন এবং উহা পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিয়া উহাকে পার্লামেণ্টের আলোচনার মধ্য দিয়া পরিচালনা করিবেন।

পার্লামেন্টের সহিত মতবিরোধ হইলে মন্ত্রী পরিষদ, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে, পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোক সভাকে (House of the People) ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ; উদ্দেশ্য হইবে পরখ করিয়া দেখা, জাতি কাহাকে সমর্থন করে,—মন্ত্রী পরিষদকে না পার্লামেন্টকে ?

Questions and Hints

1. Describe the powers of the Governor General of India to-day over (a) legislation and (b) finance. (1945) [অণুচ্ছেদ ১ (খ) ও (গ)] অথবা [অণু ৪, (খ) ও (গ)]

2. What were the powers of the Governor General of India under the Government of India Act, 1935 ? (1950) [অণু—১]

3. What were the powers of the Governor General after the Transfer of Power (i. e. from August, 15, 1947) ? [অণু—৪]

4. Describe the composition and functions of the Governor General's Executive Council. (1935) [অণু—২]

5. Discuss the position of the Council of Ministers of the Central Government under the Government of India Act 1935, as amended in 1947. [অণু—৫]

6. Describe the position and powers of the President of India, under the New Constitution. [অণু—৭]

7. Discuss the position and powers of the Council of Ministers of the Central Government to-day. [অণু—৮]

চতুর্থ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ

Central Lagislature

(অণুচ্ছেদ ১) ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ— *Central Legislature before Tansfer of Power*

১৯১৯ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ বলিতে বুঝাইত বড়লাট এবং আইন পরিষদের দুইটী কক্ষ—একটীর নাম রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) অপরটীর নাম ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এই আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহার গঠনপদ্ধতি ও কার্য্যবিধি মূলতঃ ১৯১৯এর শাসনবিধিদ্বারাই নির্দ্ধারিত ছিল, তবে ১৯৩৫এর শাসনবিধিতে বলা হয় যে, যে পর্য্যন্ত না যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত ১৯১৯ এর শাসনবিধি দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ সেই বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ১৯৩৫ এর শাসনবিধি অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। অতএব ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের গঠনপদ্ধতি ছিল মূলতঃ ১৯১৯এর শাসনবিধি অনুযায়ী নির্দ্ধারিত এবং উহার কার্য্যকলাপ ছিল প্রধানতঃ ১৯৩৫এর শাসনবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(ক) **রাষ্ট্রীয় পরিষদ** (Council of State)—রাষ্ট্রীয় পরিষদ ছিল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের উর্দ্ধকক্ষ। ৫৮ জন সভ্য লইয়া ইহা গঠিত ছিল। এই ৫৮ জন সভ্যের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন ধর্ম্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত; এই নির্ব্বাচনে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। অবশিষ্ট ২৬ জন সদস্য বড়লাটের দ্বারা মনোনীত হইতেন। এই ২৬ জনের মধ্যে সরকরী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের লোকই থাকিতেন তবে সরকারী লোকদের সংখ্যাই হইত অধিক। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতিও মনোনীত হইতেন বড়লাটের দ্বারাই। ইহার আয়ু ছিল ৫ বৎসর, তবে ইচ্ছা করিলে বড়লাট উহার পূর্ব্বেই ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন; অথবা ঐ সময়ের উপরেও ইহার আয়ুষ্কাল বাড়াইতে পারিতেন।

(খ) **ব্যবস্থা পরিষদ** (Legislative Assembly)—জনসাধারণের প্রতিনিধি

লইয়া এই পরিষদ গঠিত ছিল। ইহার ক্ষেত্রে উর্দ্ধ কক্ষ অপেক্ষা সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দাতাদিগের সংখ্যা ছিল অধিক। ১৪৫ জন সভ্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত ছিল এবং ইহার মধ্যে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা ছিল ১০৪। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নির্দ্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী এই পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেন—এবং নির্ব্বাচনও হইত পৃথক নির্ব্বাচন প্রথায়। ৪১ জন সদস্য বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। ইহাদের মধ্যে ২৬ জন হইতেন সরকারী চাকুরীয়া ও ১৫ জন হইতেন বেসরকারী। ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণই ইহার সভাপতি নির্ব্বাচন করিতেন অবশ্য এই নির্ব্বাচনে বড়লাটের সম্মতি প্রয়োজন হইত। এই পরিষদের আয়ুষ্কাল ছিল তিন বৎসর এবং প্রয়োজন হইলে গভর্ণর জেনারেল এই আয়ুষ্কাল বাড়াইয়া দিতে পারিতেন।

(অনু-২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ— (*Powers and functions of Central Legislature*)—

১৯৩৫ সালের শাসনবিধিতে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ছিল। ১৯৩৫-এর শাসনবিধিতে কেন্দ্রীয় তালিকা ভিন্ন আরও দুইটী তালিকা ছিল; একটী যুগ্মাধিকারভুক্ত তালিকা, ও আর একটী প্রাদেশিক তালিকা। যুগ্মাধিকারভুক্ত তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির উপরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন পরিষদই আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। প্রাদেশিক তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলির উপরে সাধারণতঃ কেবলমাত্র প্রাদেশিক আইন পরিষদই আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। কিন্তু দুইটী বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপরেও আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। প্রথমতঃ, একটী বা একটীর অধিক সংশ্লিষ্ট প্রদেশ যদি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে এইরূপ অনুরোধ করিত; এবং দ্বিতীয়তঃ, বড়লাট যদি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা জারী করিতেন।

এই সকল বিষয়সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের **আইন প্রণয়নের** ক্ষমতা কিন্তু অবাধ ছিল না। বড়লাটের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষমতার দ্বারা আইন পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। পার্লামেন্টের দ্বারা বিধিবদ্ধ কোন আইনের সহিত সংশ্লিষ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আইনের প্রস্তাব বড়লাটের পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতীত আইন পরিষদে উত্থাপন করাই চলিত না। ইহা ভিন্ন গোটা কয়েক বিষয় ছিল যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আইনের প্রস্তাব কোনক্রমেই আইন পরিষদে উত্থাপন করা চলিত না; এই বিষয়গুলি হইল ইংলণ্ডেশ্বর ও তাঁহার

পরিবারের সহিত সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজসিংহাসন প্রাপ্তি সম্পর্কিত কোন বিষয়, স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী সম্পার্কিত কোন বিষয়। আইন পরিষদের মধ্যে যে কোন বিল বা সংশোধন প্রস্তাবের আলোচনা বড়লাট বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। আইন পরিষদের উভয় কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত কোন বিল বড়লাট বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন অথবা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ফিরৎ পাঠাইতে পারিতেন। যে কোন কক্ষের দ্বারা অথবা উভয় কক্ষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কোন বিল তিনি নিজের ইচ্ছামত আইনে পরিণত করিতে পারিতেন। অথবা সম্রাটের অনুমোদনের জন্য কোন বিলকে তিনি স্থগিত রাখিতে পারিতেন। উপরন্তু যে কোন রূপ অর্ডিনান্স্ বড়লাট যে কোন সময়ে জারী করিতে পারিতেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন আইনই বড়লাটের স্বাক্ষর ব্যতীত বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না। অতএব আইন পরিষদ একদিকে বড়লাটের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারিত অপরদিকে পরিষদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত উহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আইন-প্রণেতারূপে রহিয়াছিলেন,—স্বয়ং বড়লাট।

রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের উপরেও আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। কর ধার্য্য সম্পর্কিত এবং রাজস্ব হইতে ব্যয় সম্পর্কিত সমস্ত প্রস্তাব আইন পরিষদের নিকট পেশ করিতে হইত এবং উহাতে আইন পরিষদের অনুমোদন লইতে হইত। তবে আইন পরিষদের এই ক্ষমতার অনেকগুলি ব্যতিক্রম বা বাধা ছিল। কতকগুলি ব্যয়ের খাত ছিল সেগুলি আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল না। এইগুলি ভোট বহির্ভূত ব্যয়খাত। আইন পরিষদের কোনরূপ অনুমোদন না লইয়াই এই ব্যয়গুলি করা যাইতে পারিত—যথা বড়লাট ও তাঁহার সহচরদিগের মাহিনা, সরকারী ঋণের সুদ ও সিঙ্কিং ফাণ্ড (sinking fund) বাবদ ব্যয়, দেশরক্ষা, বহির্ব্ব্যাপার, যাজকীয় ব্যাপার ও উপজাতি অঞ্চল সম্পর্কিত ব্যয় ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ব্যয়ের প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপিত করিতে হইত সেইগুলির মধ্যে কোন প্রস্তাবিত ব্যয় পরিষদ ইচ্ছা করিলে বাতিল করিয়া দিতে বা কমাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু বড়লাট যদি মনে করিতেন যে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য বাতিল করিয়া দেওয়া বা কমাইয়া দেওয়া কোন ব্যয়ের প্রস্তাব পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন—তাহা হইলে প্রারম্ভে যে পরিমাণের ব্যয় প্রস্তাব করা হইয়াছিল, আইন পরিষদের মতের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁহার সার্টিফিকেশন ক্ষমতার দ্বারা সেইরূপ ব্যয়ের হুকুম দিতে পারিতেন। জরুরী

অবস্থার উদ্ভব হইলে আইন পরিষদের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার হুকুমও বড়লাট দিতে পারিতেন।

পার্লামেন্ট-সম্মত শাসনতন্ত্রে—অর্থাৎ দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়, আইন পরিষদ শাসন পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কর্ম্মপরিষদকে অর্থাৎ সপরিষদ বড়লাটকে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল যে আইন পরিষদের উপরেও উহা (executive) অক্লেশে প্রভুত্ব করিতে পারিত। ভারতীয় সরকার আইন পরিষদের কাছে কোন অংশেই দায়ী ছিলেন না এবং আইন পরিষদের আস্থাভাজন হইবার জন্য তাঁহাদের উপর কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না।

(অণু-৩) আইন পরিষদের দুইটী কক্ষের সম্পর্ক—*Relation between the two Houses of Legislature*

আইন পরিষদের যেটুকু ক্ষমতা ছিল, আইন পরিষদের উভয় কক্ষই সেই ক্ষমতার সমান অংশীদার ছিল। প্রত্যেক আইনের প্রস্তাব উভয় কক্ষের দ্বারাই অনুমোদিত হইতে হইত। তবে ইহার একটী ব্যতিক্রম ছিল। ব্যয় মঞ্জুর সম্পর্কিত সমস্ত প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম নিম্নকক্ষে উত্থাপন করিতে হইত এবং ব্যয় মঞ্জুর দাবীর উপর ভোটদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র নিম্ন কক্ষেরই ছিল। (ইহা অবশ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণের প্রচেষ্টা—কারণ গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কেবলমাত্র নিম্ন কক্ষই জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়) যদি কোন বিষয়ে আইন পরিষদের দুইটী কক্ষ একমত হইতে না পারিত তাহা হইলে এই মতভেদ ঘটিবার ছয়মাস পরে, বড়লাট দুইটী কক্ষের একটী যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিতেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে উভয় কক্ষের সকল সদস্যগণের মধ্যে সংখ্যাধিক সদস্যের মত অনুযায়ী প্রস্তাবটী গৃহীত অথবা প্রত্যাখ্যাত হইত।

(অণু-৪) আইন প্রণয়নের কর্ম্মপদ্ধতি—*Lagislative Procedure*

আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হইল যে আইন পরিষদের মধ্যে প্রথমে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ আইনের প্রস্তাবকে বলা হয় বিল (Bill)। যিনি বিল উত্থাপন করিবেন তিনিই বিলের খসড়া তৈয়ারী করিয়া আইন পরিষদকে দিবেন। পরিষদের মধ্যে, সরকারের পক্ষ হইতে বিল উত্থাপন করা যায় আবার যে কোন বেসরকারী সদস্যও বিল উত্থাপন করিতে পারেন। সরকারের পক্ষ হইতে বিল উত্থাপন করেন কোন একজন মন্ত্রী।

কোন বেসরকারী সদস্য কোন বিল উত্থাপন করিতে চাহিলে তাঁহাকে এক মাসের নোটিশ দিতে হইত এবং উহার সহিত বিলটীর একটী অনুলিপি পাঠাইতে হইত। বিলটী উত্থাপনের জন্য পরিষদের অনুমতি চাওয়া হইত, পরিষদ এই অনুমতি প্রদান করিলে তবেই বিল উত্থাপন করা চলিত।

মন্ত্রীর দ্বারা সরকার পক্ষের কোন বিল উত্থাপনে এইরূপ নোটিশ প্রদান বা পূর্ব্ব-অনুমতি প্রয়োজন হইত না। সরকারী বিল গেজেটে প্রকাশিত হইত, অতঃপর পরিষদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা চলিত।

বিলের উত্থাপক প্রস্তাব করেন যে বিলটী প্রথমবারের জন্য পাঠ করা (First Reading) হউক। পরিষদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে বিলের উত্থাপক প্রস্তাব করেন যে বিলটী দ্বিতীয় বারের জন্য পাঠ করা হউক অথবা সিলেক্ট্ কমিটিতে প্রেরিত হউক অথবা জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে উহাকে প্রচার করা হউক। এই সময়ে কেবলমাত্র বিলের সাধারণ নীতি সম্পর্কেই আলোচনা হইবে—উহার বিস্তারিত ধারা উপধারার উপর কোনপ্রকার আলোচনা হইবে না। জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচারিত হইলেও উহার পর বিলটীকে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে। যে পরিষদে বিলটী বিবেচিত হইতেছে সেই পরিষদের কয়েকজন সদস্য লইয়া সিলেক্ট্ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি বিলটীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের বিবরণী পেশ করেন। অতঃপর বিলের উত্থাপক কমিটির এই বিবরণী পরিষদের নিকট পেশ করেন। ইহার পর উত্থাপক প্রস্তাব করেন বিলটী দ্বিতীয় বারের জন্য পাঠ করা হউক (Second Reading)। এক্ষণে বিলটীর বিধান সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং উহার প্রত্যেক ধারা অনুযায়ী উহাকে ভোটে দেওয়া হয়; যে কোন সদস্য যে কোন ধারার সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। সংখ্যাধিক ভোটে উহা অনুমোদিত হইলে, বিলের উত্থাপক প্রস্তাব করেন যে উহা তৃতীয় বারের জন্য পাঠ করা হউক (Third Reading)। এই সময়ে কেবলমাত্র মৌখিক সংশোধনের প্রস্তাব চলিবে। পুনরায় বিলের উপর ভোট গৃহীত হইবে এবং সংখ্যাধিক সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হইলে উহা অপর কক্ষে পাঠানো হইবে এবং ঐ অপর কক্ষেও অনুরূপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিলটীকে পরিচালনা করা হইবে। বিলটী ঐ কক্ষেরও অনুমোদন লাভ করিলে উহাকে বড়লাটের নিকট প্রেরণ করা হইত। বড়লাট তাঁহার সম্মতি প্রদান করিলে বিলটী (Bill) আইনে বা বিধিতে (Act) পরিণত হইত। বড়লাট তাঁহার সম্মতি নাও দিতে পারিতেন অথবা রাজসম্মতির জন্য উহাকে স্থগিত রাখিতে

পারিতেন। অথবা আইন সভার নিকট পুনর্ব্বিবেচনার জন্য উহাকে ফেরৎ পাঠাইতে পারিতেন।

আইন পরিষদের দুইটী কক্ষ যদি কোন বিল সম্পর্কে একমত হইতে না পারিত তাহা হইলে ছয় মাস অপেক্ষা করিয়া বড়লাট উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন (joint sitting) আহ্বান করিতে পারিতেন। এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক সদস্যের দ্বারা বিলটী অনুমোদিত হইলে উভয় পরিষদের দ্বারাই উহা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত।

(অণু-৫) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ—*Central Legislature after Transfer of Power*

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বেই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশ বিভাগের দরুণ সেই গণপরিষদের গঠনে কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইল এবং ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্য ছাড়াও, ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ রূপে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ইহার উপর অর্পণ করা হইল। আইন পরিষদরূপে যখন ইহা কার্য্য করিত, তখন ইহার নাম হইত ডমিনিয়ন পার্লামেণ্ট। অতএব ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন হইতে (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭) পূর্ব্বেকার আইন পরিষদ—রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদ,—উঠিয়া গেল এবং "ডমিনিয়ন পার্লামেণ্ট" নামে নূতন কেন্দ্রীয় আইন সভা সৃষ্ট হইল।

(অণু-৬) ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের গঠন—*Composition of the Dominion Parliament*

ডমিনিয়ন পার্লামেণ্ট ছিল এক কক্ষ বিশিষ্ট (Unicameral)। ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১০। ইহার মধ্যে গভর্ণর শাসিত প্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন ২৫৫ জন, দেশীয়রাজ্য-ইউনিয়ন ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি ছিলেন ৫১ জন—এবং চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন ৫ জন। দেশীয় রাজ্য প্রতিনিধিদিগের মধ্যে কাশ্মীরের ৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন। গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি ছিল যুক্তপ্রদেশের,—৫৬ জন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-সংখ্যক প্রতিনিধি আসামের,—৯ জন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল ২২।

পার্লামেণ্টের একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটিস্পীকার ছিলেন।

(অণু-৭) ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ—*Powers and Functions of the Dominion Parliament*

(ক) **আইন প্রণয়ন**—১৯৩৫ সালের শাসনবিধিতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের

উপর যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল ডমিনিয়ন পার্লামেন্টেরও সেই সেই বিষয়গুলি সম্পর্কেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিল।

পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যে বিভিন্ন অক্ষমতা ছিল ডমিনিয়ন পার্লামেন্টের সেই সকল অক্ষমতা আর বিশেষ কিছুই রহিল না। পূর্ব্বে অনেকগুলি বিষয় ছিল যাহার উপর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করিতে পারিতই না; কিন্তু এক্ষণে একটীমাত্র বিষয় ব্যতীত যে কোন বিষয়ের উপরেই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের অধিকার পাইল। তবে দুই একটী বিষয় রহিল যে সম্পর্কে আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য বড়লাটের পূর্ব্ব-সম্মতি প্রয়োজন হইত। ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা বড়লাটের আর রহিল না বলা চলে। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিবার ও স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল পার্লামেণ্টের সভাপতিকে (স্পীকার)—বড়লাটকে নহে। বড়লাট পার্লামেণ্টে ভাষণ প্রদান করিতে বা বাণী প্রেরণ করিতে পারিতেন। পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত প্রত্যেক বিল বড়লাটের সম্মতি-সাপেক্ষ ছিল। তিনি সম্মতি দিতেও পারিতেন, না দিতেও পারিতেন। কিন্তু বড়লাটের এই সম্মতি প্রদান নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত কোন বিলে, ইংলণ্ডের রাজার ন্যায়, ভারতের বড়লাট সম্মতি না দিয়া পারিতেন না। পূর্ব্বে ইংলণ্ডরাজের সম্মতির জন্য বড়লাট যে কোন বিল রাখিয়া দিতে পারিতেন, সে ক্ষমতা আর তাঁহার রহিল না।

(খ) **রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ**—রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে বড়লাট পার্লামেণ্টের নিকট আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করিতেন। পার্লামেণ্ট কর ধার্য্যের প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি দিলে তবেই ঐ কর আদায় করিয়া সরকার আয় করিতে পারিতেন। ব্যয়ের প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য কতকগুলি ব্যয়ের খাত ছিল যেগুলি পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইত বটে কিন্তু পার্লামেণ্টের অনুমোদন গ্রহণ করা হইত না; এইগুলি ছিল অবশ্য নির্ব্বাহযোগ্য ব্যয়। অবশ্য এইগুলি সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আলোচনা করিতে পারিত। এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যয়ের প্রস্তাবে পার্লামেণ্টের অনুমোদন অপরিহার্য্য ছিল। পার্লামেণ্ট যদি কোন কর ধার্য্যের বা ব্যয় নির্ব্বাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতেন তাহা হইলে উহা পুনরুদ্ধার করিয়া লইবার ক্ষমতা বড়লাটের ছিল না।

(গ) **মন্ত্রীপরিষদ নিয়ন্ত্রণ**—পার্লামেণ্ট মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ছিল না। এক্ষণে কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ হইলেন শাসকবর্গ এবং ইঁহারা পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী হইলেন। মন্ত্রীগণ ছিলেন পার্লামেণ্টের সদস্য এবং তাঁহাদিগের উপর পার্লামেণ্টের আস্থা যতদিন থাকিত, ততদিন মাত্র তাঁহারা মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন।

(অণু-৮) ভারত প্রজাতন্ত্রের পার্লামেণ্ট (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০)—*Parliament of Republican India (January, 26, 1950.)*

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নূতন শাসনতন্ত্রে নূতন ধরণের কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ গঠনের বিধান দেওয়া হইল। ডমিনিয়ন পার্লামেণ্ট উঠিয়া গিয়া নূতন আইন পরিষদ গঠিত হইল; ইহার নাম পার্লামেণ্ট।

(১) **প্রজাতন্ত্রের পার্লামেণ্টের গঠন পদ্ধতি**—নূতন পার্লামেণ্ট হইবে **দ্বিকক্ষ** (Bicameral); দুইটী পরিষদ লইয়া ইহা গঠিত হইবে। উর্দ্ধকক্ষের নাম রাষ্ট্রপরিষদ (Council of States) এবং নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা (House of the People)।

রাষ্ট্র পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইল ২৫০। ইহার মধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হইবেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, কলা, সমাজ সেবা প্রভৃতি গণজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁহারা পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে এইরূপ মনোনয়ন করা হইবে। অবশ্য সদস্যগণ বিভিন্ন মূলরাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের জনগণ নহে,—প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের যে আইন পরিষদ থাকিবে সেই আইন পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ ঐ মূলরাষ্ট্রের তরফ হইতে রাষ্ট্র পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। ভারতের সহরাষ্ট্রপতি এই পরিষদের সভাপতিত্ব করিবেন। রাষ্ট্রপরিষদ কখনও একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না।

লোকসভার সদস্য সংখ্যা হইবে ৫০০। ইঁহারা সকলেই জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের পদ্ধতিতে। তবে ইহার মধ্যে দুইটী আসন রাষ্ট্রপতি ইঙ্গভারতীয় প্রতিনিধির দ্বারা পূরণ করিতে পারিবেন। কিছুসংখ্যক আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ও কিছুসংখ্যক থাকিবে তপশীলী উপজাতিসমূহের জন্য। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নামে যথাক্রমে এই পরিষদের একজন সভাপতি ও

সহ-সভাপতি থাকিবেন—লোকসভাই ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিবেন। এই পরিষদের কার্য্যকাল হইবে ৫ বৎসর তবে প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্রপতি ইহাকে ৫ বৎসরের পূর্ব্বেও ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) **প্রজাতন্ত্রের পার্লামেণ্টের কার্য্যকলাপ**

(ক) **আইন প্রণয়ন**—ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের অনুরূপ। বড়লাটের স্থান অধিকার করিবেন রাষ্ট্রপতি।

(খ) **রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ**—ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের অনুরূপ। বড়লাটের স্থান অধিকার করিবেন রাষ্ট্রপতি।

(গ) **মন্ত্রী-নিয়ন্ত্রণ**—ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের অনুরূপ।

Questions & Hints

1 Describe the Constitution of the Central Legislature in India. (1936)
[অণু—১,৫,৬,] অথবা [অণু—৮ (১)]

2. Give an account of the composition and functions of the Central Legislature in British India. (1937) [অণু—১,৫,৬ এবং অনু—২,৭]

3. Trace the evolution of the Central Legislature in India. (1944)
[প্রথম অধ্যায়ের অণুচ্ছেদ—২ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের অণুচ্ছেদ—১,৫,৬,৮, (১)

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

Provincial Government

(অণুচ্ছেদ-১) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা (১৯৩৫ এর শাসনবিধি অনুযায়ী)—*Provincial Government (according to the Act of 1935)*

১৯৩৫ সালের ভারত শাসনবিধি অনুসারে পূর্ব্বেকার দ্বৈতশাসন (Dyarchy) উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রদেশের শাসনভার গভর্ণর ও একটী মন্ত্রীপরিষদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। ব্যবস্থা থাকিল যে, প্রদেশের আইন পরিষদ ১৯৩৫ এর শাসনবিধি অনুসারে যে সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে (প্রাদেশিক তালিকায় এই বিষয়গুলি উল্লিখিত রহিল) সেই সকল বিষয় সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার (গভর্ণর এবং মন্ত্রীপরিষদ) নিজ প্রদেশের মধ্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

(অণু-২) প্রাদেশিক গভর্ণর—*The Provincial Governor*

ইংলণ্ডেশ্বর প্রাদেশিক গভর্ণরদিগকে নিয়োগ করিতেন। একজন গভর্ণরের কার্য্যকাল ছিল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় তিনিই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহার নামেই করা হইত। তবে শাসনকার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য ও মন্ত্রণা দিবার জন্য তিনি একটী মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ করিতেন। গভর্ণর কিভাবে কার্য্য করিবেন সে সম্বন্ধে, তাঁহাকে নিয়োগ করিবার সময়ই, ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে একটী উপদেশপত্র প্রদান করিতেন।

গভর্ণর প্রাদেশিক আইন পরিষদের মধ্য হইতে জন কয়েক সদস্যকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিয়া একটী মন্ত্রীপরিষদ গঠন করিতেন। আইন পরিষদে যে দলের সংখ্যাধিক্য থাকিত সেই দলের নেতাকে তিনি মন্ত্রীপরিষদ গঠনে সাহায্য করিতে বলিতেন। অর্থাৎ ঐ নেতাকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রীদিগের কার্য্যকাল গভর্ণরের মর্জ্জির উপরে নির্ভর করিত (আবার আইন পরিষদের সদস্যদিগের আস্থার উপরেও নির্ভর করিত)।

কিন্তু ইহার মধ্যে দুইটী ব্যতিক্রমও করা হইল। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগতভাবে গভর্ণরকে অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার "বিবেচনা অনুযায়ী" (according to discretion) কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই বিবেচনা অনুযায়ী করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে গভর্ণর মন্ত্রীপরিষদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও বাধ্য নহেন। এইগুলি সম্পর্কে গভর্ণরকে মন্ত্রনা দিবার কোন অধিকারই মন্ত্রীদের নাই; গভর্ণর ইচ্ছা করিলে অবশ্য এই বিষয়গুলি সম্পর্কে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ চাহিতে পারেন—উহাতে কোন নিয়মতান্ত্রিক বাধা নাই; তবে এইরূপ করিবার কোন বাধ্য বাধকতাও তাঁহার নাই। দ্বিতীয়তঃ, গোটাকয়েক বিষয় শাসনবিধিতে উল্লেখ করিয়া দিয়া বলা হইয়াছিল যে ঐগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব (special responsibilities)। এই 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের ক্ষেত্রে গভর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ শুনিতে বাধ্য তবে এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে, তিনি তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচার" (individual judgement) অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—মন্ত্রীদিগের পরামর্শমত কার্য্য নাও করিতে পারেন। অর্থাৎ যে সকল স্পষ্টোল্লিখিত বিষয়ে গভর্ণরের "বিশেষ দায়িত্ব" ছিল সেই সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার অধিকার মন্ত্রীদিগের ছিল তবে গভর্ণর মন্ত্রীদিগের পরামর্শমত কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন না।

(অণু-৩) গভর্ণরের বিবেচনা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতা—*Discretionary powers of the Governor*

গভর্ণরের বিবেচনা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতা ছিল প্রভূত। এইগুলিকে মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়। (ক) কার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতা, (খ) আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা, (গ) অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা, (ঘ) জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা।

(ক) **কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা**—কোন কোন প্রদেশের গোটাকয়েক এলাকাকে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া শাসনবিধিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এই সকল এলাকায় সাধারণতঃ শিক্ষা ও সভ্যতার দিক হইতে অনগ্রসর জনসমষ্টির বাস। একমাত্র গভর্ণরের উপরেই এই সকল বহির্ভূত এলাকার শাসনের ভার অর্পিত ছিল। উপরন্তু গভর্ণর তাঁহার বিবেচনামত মন্ত্রী নিয়োগ করিতে ও তাঁহাদিগকে পদচ্যুতও করিতে পারিতেন। "সরকারী চাকুরী কমিশনের" সদস্যগণকে নিয়োগের ক্ষমতাও তাঁহার 'বিবেচনা প্রযোজ্য' ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত ছিল। উপরন্তু এই ক্ষমতার বলে তিনি এমন নিয়ম করিতে পারিতেন যাহাতে সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কি সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা—তাঁহার অনুমোদিত ব্যক্তি নহেন,—এরূপ কাহাকেও যেন জানানো

না হয়। অর্থাৎ এই ক্ষমতার বলে ইচ্ছা করিলে গভর্ণর মন্ত্রীদিগকেও গুপ্তচর বিভাগের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগে বাধা দিতে পারিতেন।

(খ) **আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা**—একমাত্র গভর্ণরই প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে বা স্থগিত রাখিতে নির্দ্দেশ দিতে পারিতেন এবং উহার নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ফুরাইবার পূর্ব্বেই উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। গভর্ণরের দ্বারা প্রণীত কোন আইন বা অর্ডিনান্স বাতিল বা সংশোধন, ভূসম্পত্তির জাতীয়-করণ এইরূপ কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আইনের প্রস্তাব গভর্ণরের পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতীত প্রাদেশিক আইন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারিত না। প্রদেশের শান্তি ও নিরপত্তা সম্পর্কে শাসনবিধির দ্বারা তাঁহার উপর যে বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিল অথবা সংশোধন প্রস্তাবের আলোচনা প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলিতে থাকিলে, উহা তিনি ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। প্রাদেশিক আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত কোন বিল তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত আইনে পরিণত হইতেই পারিত না। তিনি ইচ্ছা করিলে এইরূপ স্বাক্ষর নাও দিতে পারিতেন। পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত কোন বিল তিনি পুনর্ব্বিবেচনার জন্য পরিষদের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারিতেন অথবা বড়লাটের অনুমোদন-সাপেক্ষভাবে উহাকে স্থগিত রাখিতে পারিতেন। উপরন্তু যে সকল বিষয়ে তাঁহার উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল সেই সকল বিষয় সম্পর্কে "গভর্ণরের এ্যাক্ট" নামে বিশেষ ধরণের আইন প্রণয়নও তিনি করিতে পারিতেন। ইহা পরিষদকৃত আইনের মতই কার্য্যকরী ও স্থায়ী হইত। কোন জরুরী অবস্থায় তিনি "অর্ডিনান্স" নামক আইন জারী করিতে পারিতেন; কোন কোন অর্ডিনান্স তিনি মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণা অনুযায়ী জারী করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্ডিনান্স তিনি নিজ উদ্যোগে ও দায়িত্বেই জারী করিতে পারিতেন। অর্ডিনান্সগুলি ছয়মাসের জন্য বলবৎ থাকিত তবে ইহাদের মেয়াদ বর্দ্ধিত করা যাইত।

(গ) **অর্থবিষয়ক ক্ষমতা**—আর্থিক ব্যাপারেও গভর্ণরের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অনুমোদনক্রমেই প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব আইন পরিষদের কাছে উপস্থাপিত করা হইত। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয় মঞ্জুরের দাবী অথবা অর্থবিষয়ক কোনো আইনের প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপিত হইতেই পারিত না। প্রাদেশিক রাজস্ব তহবিল হইতে অবশ্য-দেয় ব্যয় কত হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করাও গভর্ণরের বিবেচনা প্রযোজ্য ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং তাঁহার দ্বারা

নির্দ্ধারিত এই সকল অবশ্য-দেয় ব্যয় পরিষদের ভোটসাপেক্ষ ছিল না। আইন পরিষদ সরকারের কোন ব্যয় মঞ্জুরের দাবী অগ্রাহ্য বা হ্রাস করিয়া দিলে—ঐ বাতিল করিয়া দেওয়া বা হ্রাস করিয়া দেওয়া ব্যয় গভর্ণর মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন।

(ঘ) **জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা**—শাসনবিধি অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালন যদি অসম্ভব হইয়া পড়ে তাহা হইলে গভর্ণর একটী ঘোষণা জারী করিতে পারিবেন এবং এই ঘোষণা জারী করিয়া শাসন ব্যবস্থা পরিচালনের সমস্ত ক্ষমতাই তিনি নিজের হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন; অর্থাৎ যদি কখনও এইরূপ ঘটিত যে প্রদেশের অধিবাসীদিগের অসহযোগিতার দরুণ মন্ত্রী পরিষদ গঠন সম্ভব নহে এবং শাসনবিধিতে যেরূপ শাসনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল সেইরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রাখা সম্ভব নহে তাহা হইলে সমগ্র প্রদেশে শাসনের সকল প্রকার দায়িত্ব গভর্ণর নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল এই যে তিনি কোন উচ্চ আদালতের ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

(অণু-৪) "ব্যক্তিগত বিচার" অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা—
Powers to be exercised in individual judgement

যে সকল বিষয়ে শাসনবিধি অনুযায়ী গভর্ণরের উপর **বিশেষ দায়িত্ব** অর্পিত হইয়াছিল, সেই সকল বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে গভর্ণর তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচার" প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এই কার্য্যগুলি সম্পর্কে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব ছিল: (১) প্রদেশে বা উহার যে কোন অংশে জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিপন্ন হইলে তাহার প্রতিকার বিধান, (২) সংখ্যালঘিষ্ঠদের আইনানুগ স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা, (৩) সরকারী চাকুরীয়া এবং তাহাদিগের পরিজনবর্গের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা, (৪) দেশীয়-রাজ্যের নৃপতিদিগের অধিকার ও সম্ভ্রম রক্ষা, (৫) কোন বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপরে অধিক হারে যাহাতে কর ধার্য্য না হয় তাহা দেখা, (৬) আংশিক বহির্ভূত এলাকাসমূহের সুশাসন এবং (৭) বড়লাটের আইনসঙ্গত আদেশ পালন।

এই সকল ব্যাপার সম্পর্কে গভর্ণর মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শ শ্রবণ করিতে বাধ্য ছিলেন তবে সেই পরামর্শমত কাজ করিতে বাধ্য ছিলেন না। এই সকল ক্ষেত্রে তিনি "ব্যক্তিগত বিচার" প্রয়োগ করিতেন। (উপরন্তু প্রাদেশিক এ্যাডভোকেট জেনারেল নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগ করিতে পারিতেন)।

এইখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন প্রাদেশিক গভর্ণর যখনই তাঁহার **"বিবেচনা প্রযোজ্য ক্ষমতা"** প্রয়োগ করিতেন অথবা তাঁহার **"ব্যক্তিগত বিচার"**

অনুযায়ী কার্য্য করিতেন তখনই তাঁহাকে বড়লাটের অধীনস্থ হইয়া কার্য্য করিতে হইত; এবং এ সম্পর্কে বড়লাট তাঁহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ দিতেন তাহা তাঁহাকে পালন করিতে হইত।

(অনু-৫) মন্ত্রীপরিষদ—*Council of Ministers*

প্রাদেশিক শাসনকার্য্যে গভর্ণরকে পরামর্শ দান করিবার জন্য ও সহায়তা করিবার জন্য একটী মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হইত। আইনপরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে গভর্ণর মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। কয়জন মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম শাসনবিধিতে ছিল না। মন্ত্রীদের সংখ্যা গভর্ণরের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত, গভর্ণরের অভিরুচির উপর তাঁহাদের কার্য্যকাল নির্ভর করিত এবং যে কোন সময়ে তাঁহার বিবেচনামত যে কোন মন্ত্রীকে গভর্ণর পদচ্যুত করিতে পারিতেন।

ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত **উপদেশ পত্র*** অনুযায়ী গভর্ণরকে মন্ত্রীনিয়োগ সম্পর্কে গোটাকয়েক নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আইনপরিষদে সংখ্যাধিক সদস্যগণের নেতাকে তিনি মন্ত্রীপরিষদ গঠনে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিবেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীগণকে নিযুক্ত করিবেন; অর্থাৎ ঐ নেতাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হইবে। তবে মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও অন্তর্ভূক্ত হন তাহার জন্য গভর্ণর সচেষ্ট হইবেন। গভর্ণর তাঁহার বিবেচনা প্রযোজ্য ক্ষমতা অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন এবং মন্ত্রীদিগের মধ্যে যৌথ দায়িত্বের প্রথা যাহাতে প্রচলিত হয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। মন্ত্রীগণ কত বেতন ও ভাতা পাইবেন তাহা আইন পরিষদের দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারাই স্থির করা হইত; একটী মন্ত্রীসভার কার্য্যকালের মধ্যে উহা পরিবর্ত্তন করা চলিত না।

(ক) গভর্ণরের সহিত সম্পর্ক—মন্ত্রীগণ গভর্ণরের দ্বারাই নিযুক্ত হইতেন। এক একজন মন্ত্রীর উপরে একটী বা একটীর অধিক দপ্তর পরিচালনার ভার অর্পিত

* উপদেশ পত্র (Instrument of Instructions)—দৈনন্দিন শাসনকার্য্য কিভাবে চালাইতে হইবে এ সম্বন্ধে শাসনবিধির মধ্যে বিস্তারিতভাবে বিধান দেওয়া থাকিত না। শাসনবিধির আওতার মধ্যে থাকিয়া উহার উদ্দেশ্য কি ভাবে সিদ্ধ করিবেন ও কিভাবে তাঁহাদের ক্ষমতা তাঁহারা প্রয়োগ করিবেন এ সম্বন্ধে বড়লাট ও গভর্ণরকে ব্রিটিশ সরকার গোটা কয়েক উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ সমষ্টিকে উপদেশ পত্র বলা হইত। বড়লাট ও গভর্ণর নিয়োগের সময়েই তাঁহাদিগকে এই উপদেশপত্র দেওয়া হইত। বাহ্যতঃ এই উপদেশপত্র ইংলণ্ডরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত তবে ইহা প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

থাকিত এবং নিজের দপ্তরের সকল ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যেক মন্ত্রী গভর্ণরকে মন্ত্রণা দিতেন। যে সকল বিষয় গভর্ণরের বিবেচনা প্রযোজ্য ক্ষমতাব অন্তর্ভূক্ত ছিল সেই সকল বিষয় সম্পর্কে গভর্ণরকে মন্ত্রণা দিবার কোন ক্ষমতাই মন্ত্রীদিগের ছিল না; ঐ বিষয়গুলি মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাহিরে।, অন্যান্য সকল বিষয় সম্পর্কে গভর্ণরকে মন্ত্রণা দিবার অধিকার মন্ত্রীগণের ছিল, এবং গভর্ণর মন্ত্রীদের মন্ত্রণা অনুযায়ীই আদেশ দিতেন; অর্থাৎ মন্ত্রীগণের ইচ্ছামতই কার্য্য হইত। এই সকল ব্যাপারে মন্ত্রীগণের পরামর্শ উপেক্ষা না করাই গভর্ণরের নিয়মতান্ত্রিক কার্য্য ছিল তবে ইহার মধ্যে একটী ব্যতিক্রম ছিল। সেটী হইল এই যে, যে-সকল ব্যাপারে গভর্ণরের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল সেই সকল বিষয়ে গভর্ণর মন্ত্রীদিগের পরামর্শ শুনিতে বাধ্য হইলেও সেই মন্ত্রণা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন না।

(খ) আইন পরিষদের সহিত সম্পর্ক—আইন পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করা হইত। অতএব মন্ত্রীপরিষদ আইন পরিষদেরই একটী ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। অবশ্য মন্ত্রী পরিষদ গঠনের সময়ে আইন পরিষদের সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকেও মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা চলিত তবে তাঁহার সহিত সর্ত্ত থাকিত যে তিনি ছয় মাসের মধ্যে আইন পরিষদের সদস্য হইয়া লইবেন; নচেৎ ছয় মাস উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। আইন পরিষদের যে কোন কক্ষের অধিবেশনেই মন্ত্রীগণ যোগদান করিতে পারিতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা যে কক্ষের সদস্য শুধু সেই কক্ষেই ভোট দান করিতে পারিতেন। তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে আইন পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার জবাব দিতেন এবং তাঁহাদের শাসননীতি ও কার্য্যকলাপ পরিষদের মধ্যে তাঁহাদিগকে ব্যাখ্যা করিতে ও সমর্থন করিয়া চলিতে হইত; কারণ তাঁহারা ছিলেন আইন পরিষদের কাছে দায়ী। আইন পরিষদের আস্থাভাজন না থাকিলে তাঁহারা মন্ত্রীপদে বহাল থাকিতে পারিতেন না। আইন পরিষদ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক বা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইত এবং যাঁহারা পরিষদের আস্থাভাজন এইরূপ ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হইত। সরকার পক্ষের সমস্ত বিল মন্ত্রীগণই পরিষদে উত্থাপন করিতেন এবং উহার পক্ষ সমর্থন করিয়া উহাকে বিধিবদ্ধ করাইবার বন্দোবস্ত করিতেন। বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন এবং পরিষদের অনুমোদন লাভের জন্য সচেষ্ট হইতেন।

(অণু-৬) প্রাদেশিক সরকার (ক্ষমতা হস্তান্তরের পর)—*Provincial Government (after Transfer of Power)*

১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট, ভারত, ডমিনিয়ন মর্য্যাদা লাভ করিবার পর, প্রাদেশিক শাসন পরিচালনার জন্য গভর্ণর এবং মন্ত্রীপরিষদই রহিলেন। তবে গভর্ণরের ক্ষমতার, মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতার এবং গভর্ণর ও মন্ত্রীপরিষদের পারস্পরিক সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। প্রদেশের মধ্যে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হইল এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্য।

(অণু-৭) প্রাদেশিক গভর্ণর (ক্ষমতা হস্তান্তরের পর)—*Provincial Government (after Transfer of Power)*

প্রাদেশিক শাসন কাঠামোর শীর্ষদেশে গভর্ণরই থাকিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে, ভারত যেদিন ডমিনিয়ন মর্য্যাদা লাভ করিল সেই দিন,—যাঁহারা গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ড-রাজের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া ধরা হইল, কিন্তু ঐ তারিখের পরে প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত হইলে, ঐ নিয়োগের অধিকারী হইলেন ভারতের বড়লাট। ব্রিটিশ সরকার প্রাদেশিক গভর্ণর-দিগকে এতাবৎ যে "উপদেশ পত্র" (Instrument of Instructions) দিয়া আসিতেছিলেন তাহা বাতিল করিয়া করিয়া দেওয়া হইল। গভর্ণরের সহিত একটী মন্ত্রীপরিষদ থাকিল। প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংখ্যাধিক দলের নেতার সাহায্যে গভর্ণর এই মন্ত্রীপরিষদ গঠন করিবেন এবং ঐ মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে ও মন্ত্রণা লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

গভর্ণরের ক্ষমতার কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই পরিবর্ত্তনসাধনের পর গভর্ণরের ক্ষমতা যাহা দাঁড়াইল তাহা এইরূপ :—

(ক) **কার্য্য নির্ব্বাহক বা শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা** (Executive Powers)—প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁহার দ্বারই প্রযুক্ত হইত, প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত সকল কার্য্যই তাঁহার নামেই সাধিত হইত। বহির্ভূত এবং আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের সুশাসনের দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কয়েকটী উচ্চ পদে লোক নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রীগণ গভর্ণরের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ীই স্বপদে বহাল থাকিতেন।

প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীগণই শাসন পরিচালনা করিতেন,—গভর্ণরের নামে। মন্ত্রীদিগের নিয়োগে গভর্ণরের নিজস্ব কোনই হাত ছিল না।

(খ) **আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা** (Legislative Powers)—প্রাদেশিক আইন পরিষদের কার্য্যের উপর গভর্ণরের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হইয়াছিল। আইন পরিষদ আহ্বান করা বা স্থগিত রাখা বা আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া গভর্ণরের ক্ষমতাভূক্ত ছিল। তিনি আইন পরিষদে বাণী প্রেরণ করিতে অথবা অভিভাষণ প্রদান করিতে পারিতেন। কতিপয় বিষয় সম্পর্কে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে গভর্ণরের পূর্ব্ব-সম্মতি প্রয়োজন ছিল। গভর্ণর আইন পরিষদে কোন আলোচনা বন্ধ করিতে পারিতেন না। আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত প্রত্যেক বিল গভর্ণরের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। গভর্ণর তাঁহার অনুমোদন দিতেও পারিতেন, প্রত্যাখ্যান করিতেও পারিতেন। অথবা, কোন বিলকে তিনি বড়লাটের অনুমোদন গ্রহণের জন্য রাখিয়া দিতে পারিতেন। গভর্ণর কোন বিলকে আইন পরিষদের পুনর্ব্বিবেচনার জন্য উহার নিকট ফিরৎ পাঠাইতে পারিতেন। গভর্ণরের এই সকল ক্ষমতা মামুলী ক্ষমতারূপেই রহিল। বাস্তবক্ষেত্রে, আইন পরিষদের অনুমোদিত কোন বিলেই গভর্ণর তাঁহার অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে গভর্ণবেব 'যে গভর্ণরস্ এ্যাক্ট' (Governor's Act) প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ছিল সে ক্ষমতা আব রহিল না। যে কোন সময়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি যে অর্ডিনান্স জারী করিতে পারিতেন সে ক্ষমতাও তাঁহার রহিল না। কেবলমাত্র যে সময়ে আইন পরিষদের অধিবেশন না হইতেছে সেই সময়ে গভর্ণর অর্ডিনান্স জারী করিতে পারিতেন। আইন পরিষদের অধিবেশন সুরু হইবার ছয় সপ্তাহ পরেই অর্ডিনান্স শেষ হইয়া যাইত। গভর্ণরের এই অর্ডিনান্স-জারীর ক্ষমতাও মামুলী মাত্র, কারণ কেবলমাত্র মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অনুযায়ীই গভর্ণর ইহা করিতে পারিতেন।

(গ) **অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা**—গভর্ণরের অনুমোদনক্রমেই আইন পরিষদের নিকট বাজেট উত্থাপন করা যাইত। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্যয় বরাদ্দেব দাবী বা করধার্য্যের প্রস্তাব করা যাইত না, তবে আইন পরিষদ অনুমোদন না দিলেও গভর্ণর যে পূর্ব্বে প্রাদেশিক সরকারের অর্থব্যয় করিতে পারিতেন, সে ক্ষমতা তাঁহার আর রহিল না।

১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করিবার যে ক্ষমতা গভর্ণরের ছিল, উহা আর রহিল না।

"বিবেচনা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতা" এবং "বিশেষ দায়িত্ব" বলিয়া গভর্ণরের যাহা কিছু ক্ষমতা ১৯৩৫ এর শাসনবিধি অনুযায়ী ছিল, তাহা এক্ষণে সকলই বিলুপ্ত হইল।

অতএব গভর্ণরের ক্ষমতা বলিয়া উপরে যেগুলি বর্ণিত হইল সেগুলি ছিল আইনতঃ গভর্ণরের ক্ষমতা, কিন্তু কার্য্যতঃ সেগুলি মন্ত্রীদিগের।

(অণু ৮) মন্ত্রীপরিষদ (ক্ষমতা হস্তান্তরের পর) *Council of Ministers (after Transfer of Power)*

(ক) গভর্ণরের সহিত সম্পর্ক—গভর্ণরকে "সাহায্য এবং মন্ত্রণা" দিবার জন্য মন্ত্রীপরিষদ থাকিল, কিন্তু এক্ষণে "সাহায্য এবং মন্ত্রণা" শব্দ নিছক আনুষ্ঠানিক শব্দে পরিণত হইল। শাসন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব মন্ত্রীদিগের উপরই অর্পিত হইল—মন্ত্রীপরিষদই প্রাদেশিক শাসন পরিচালনার অধিকারী হইলেন,—অবশ্য গভর্ণরের মারফতে বা গভর্ণরের নামে। এমন কোন বিষয় থাকিল না, যে বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রীগণ গভর্ণরকে পরামর্শ দিতে সক্ষম নহেন, কারণ গভর্ণরের "বিবেচনা প্রযোজ্য ক্ষমতা" (discretionary powers) এবং "ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতা" (Powers to act in individual judgement) বলিয়া আর কিছুই রহিল না।

গভর্ণরই অবশ্য মন্ত্রীদিগের নিয়োগকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ীই মন্ত্রীগণ মন্ত্রীত্ব করিতেন ; কিন্তু উহাও নিছক আইনের ভাষা ; বাস্তবক্ষেত্রে মন্ত্রী নিয়োগে এবং বিতাড়নে গভর্ণরের হাত ছিল না। মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনেও গভর্ণরের যোগদান করিবার কোনই ক্ষমতা ছিল না।

(খ) প্রাদেশিক আইন পরিষদের সহিত সম্পর্ক—প্রাদেশিক আইন পরিষদের সহিত মন্ত্রী পরিষদের সম্পর্ক পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহা তো রহিলই, উপরন্তু ঐ সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হইল। কারণ, এক্ষণে আইন পরিষদের আস্থাভাজন মন্ত্রী-মণ্ডলীকে বিতাড়িত করিবার বাস্তব ক্ষমতা গভর্ণরের আর রহিল না। মন্ত্রী পরিষদের কার্য্যকাল সম্পূর্ণরূপে আইন পরিষদের আস্থার উপর নির্ভরশীল হইল।

পূর্ব্বের ন্যায়ই, মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের সদস্যদিগের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইতে থাকিলেন। আইন পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের এবং ভোটদানের ক্ষমতা তাঁহাদের রহিল। পরিষদের মধ্যে তাঁহাদের সম্পাদিত কার্য্যকলাপের এবং অনুসৃত নীতির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের রহিল ; সদস্যদিগের প্রশ্নাদির জবাব দিতে মন্ত্রীগণ প্রস্তুত থাকেন। আইন পরিষদের বিরূপ ভোটের দ্বারা তাঁহাদের পদত্যাগ যথারীতি অবশ্যম্ভাবী রহিল।

(অণু-৯) নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা (২৬শে জানুয়ারী,১৯৫০)—*Provincial Government under the New Constitution (January 26,—1950)*

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, উহাতেও প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইল, একজন গভর্ণর ও মন্ত্রীপরিষদের উপর।

(অনু-১০) প্রাদেশিক গভর্ণর (নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী)—*Provincial Governor (under the New Constitution)*

গভর্ণর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির অভিরুচি অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকিবেন। সাধারণতঃ তাঁহার কার্য্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর। পূর্ব্বেকার দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে যে নূতন প্রদেশ সৃষ্ট হইল সেই প্রদেশের প্রধানের নাম দেওয়া হইল রাজপ্রমুখ। পূর্ব্বেকার কোন না কোন দেশীয় রাজ্যের নৃপতি এইরূপ রাজপ্রমুখ পদে অধিষ্ঠিত। রাজপ্রমুখগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত নহেন, তবে তাঁহার দ্বারা স্বীকৃত। গভর্ণর শাসিত প্রদেশ এবং রাজপ্রমুখ শাসিত প্রদেশ—ইহাদের সবগুলিকে নূতন শাসনতন্ত্রে "মূলরাষ্ট্র" (state) রূপে অভিহিত করা হইল; পূর্ব্বে যাহাকে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বলা হইত এক্ষণে তাহাদিগকে "মূলরাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা" (State Government) বলা হইল।

মূলরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় গভর্ণরের (বা রাজপ্রমুখের) উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হইল সেগুলি পূর্ব্বের ন্যায় তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক ক্ষমতা, (খ) আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা, (গ) অর্থবিষয়ক ক্ষমতা।

(ক) **কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা**—মূলরাষ্ট্রের শাসনকার্য্য গভর্ণরের নামেই পরিচালিত হইবে। তিনিই মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দিবেন এবং কি ভাবে মন্ত্রীগণ তাঁহার নামে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন সে সম্পর্কে তিনি বিধি প্রণয়ন করিয়া দিবেন। যদিও শাসনকার্য্য সাধারণতঃ মন্ত্রীপরিষদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে (গভর্ণরের নামে) তবুও (১) মুখ্যমন্ত্রী শাসন কার্য্যের সকল বিষয় সম্পর্কে গভর্ণরকে অবহিত রাখিতে বাধ্য থাকিবেন; (২) গভর্ণর মন্ত্রীপরিষদকে এমন বিষয় বিবেচনা করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন যে বিষয় সম্পর্কে কোন একজন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু যে সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে সমগ্র

মন্ত্রীসভা আলোচনা করেন নাই ; (৩) কতিপয় বিষয় সম্পর্কে গভর্ণরকে স্বীয় "বিবেচনা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতা" (Discretionary Powers) অর্পণ করা হইল। এই সকল ক্ষমতার ক্ষেত্রে গভর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শমত কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন।

কতিপয় উচ্চপদে লোক নিয়োগের ক্ষমতা গভর্ণরের রহিল—যথা এ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল, পাব্লিক্ সার্ভিস্ কমিশনের চেয়ারম্যান। প্রদেশের সকল কর্ম্মচারী গভর্ণরের অভিরুচি অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকিবেন।

কতিপয় মূলরাষ্ট্রের মধ্যে কোন কোন অঞ্চল এবং কোন কোন জনসমষ্টিকে "তালিকাভুক্ত এলাকা" (scheduled area) ও "তালিকাভুক্ত উপজাতি" (scheduled tribes) রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইল। ইহাদের শাসনে গভর্ণরকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

অপরাধীর দণ্ড মকুব বা মেয়াদ হ্রাস কবিবার ক্ষমতাও গভর্ণরের রহিল।

(খ) **আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা**—গভর্ণর মূলরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন কোন মূলরাষ্ট্রে আইন পরিষদ দুইটী পরিষদ বা কক্ষ (Houses) লইয়া গঠিত—এইরূপ ক্ষেত্রে একটী কক্ষে (উর্দ্ধ কক্ষ) কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা গভর্ণরকে দেওয়া হইল। নিম্ন কক্ষেও তিনি এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্ প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারেন। আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা বা নির্দ্ধারিত কালের পূর্ব্বে উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা গভর্ণরের আছে। আইন পরিষদে বাণী প্রেরণ করিতে বা অভিভাষণ প্রদান করিতেও তিনি পারেন। আইন পরিষদের অনুমোদিত প্রত্যেক 'বিল' গভর্ণরের সম্মতি-সাপেক্ষ। তিনি এই সম্মতি দিতেও পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য রাখিয়া দিতে পারেন, অথবা সম্মতি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। সম্মতি প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি উহা আইন পরিষদের নিকট পুনর্ব্বিবেচনার জন্য পাঠাইবেন। আইন পবিষদ পুনরায় উহা অনুমোদন করিয়া পাঠাইলে গভর্ণর উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য।

আইন পরিষদের যখন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হইতেছে সেই সময়ে প্রয়োজনবোধে গভর্ণর অর্ডিনান্স জারী করিতে পারেন। কোন কোন অর্ডিনান্স রাষ্ট্রপতির উপদেশ ব্যতীত তিনি জারী করিতে পারেন না। আইন পরিষদের অধিবেশন সুরু হইবার ছয় সপ্তাহ পরেই এইরূপ অর্ডিনান্স বাতিল হইয়া যাইবে—ইতিমধ্যেও উহা বাতিল হইতে পারে যদি ঐ মর্ম্মে আইন পরিষদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে।

(গ) **অর্থ-সম্পর্কীয় ক্ষমতা**—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গভর্ণরের যেরূপ অর্থ-

সম্পর্কীয় ক্ষমতা ছিল, নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গভর্ণরের অর্থসম্পর্কীয় ক্ষমতা সেইরূপ করা হইয়াছে। [অণুচ্ছেদ—৭ (গ) দ্রষ্টব্য]

(অণু-১১) মন্ত্রীপরিষদ (নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী)—*Council of Ministers (under the New Constitution)*

মূলরাষ্ট্রের শাসনে গভর্ণরের সহিত একটী করিয়া মন্ত্রী পরিষদ থাকিবে।

মন্ত্রী পরিষদের গভর্ণরের সহিত সম্পর্ক—মন্ত্রীগণ গভর্ণরের দ্বারাই নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী তাঁহারা স্বপদে বহাল থাকিবেন। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু মন্ত্রীনিয়োগে এবং বিতাড়নে গভর্ণরের বিশেষ কিছুই হাত থাকিবে না। মন্ত্রীগণ গভর্ণরের নামে মূলরাষ্ট্রের শাসন চালাইবেন। তবে যে সকল ক্ষেত্রে গভর্ণর তাঁহার বিবেচনা অনুযায়ী কার্য্য করিবেন (according to his discretion) সে সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চলিবেন না। ইহা ব্যতীত মন্ত্রীদের কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং মন্ত্রীপরিষদের অধিবেশনেও তিনি যোগদান করিবেন না। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের সকল কার্য্য সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত রাখিতে হইবে।

আইন পরিষদের সহিত সম্পর্ক—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদের সহিত প্রদেশের মন্ত্রীপরিষদের যেরূপ সম্পর্ক স্থাপিত ছিল নূতন শাসনতন্ত্রে সেইরূপ সম্পর্কই বজায় রাখা হইয়াছে। (অণুচ্ছেদ ৮—খ দ্রষ্টব্য) তবে পূর্ব্বে একজন মন্ত্রীর কার্য্যকালের মধ্যে তাঁহার বেতন আইন পরিষদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না, কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন পরিষদ তাহা পারেন। ইহাতে মন্ত্রীগণের উপর আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হইয়াছে।

(অণু-১২) প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, ইহার অর্থ—*Provincial Autonomy—its meaning*

১৯৩৫ সালের ভারত শাসনবিধির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করা।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রদেশের শাসন ব্যবস্থায় তিনটী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন বলিয়া যে বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে সেগুলির শাসনের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা অপর কোন বৈদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের অধিবাসীদের নিকট,—(জনগণের নিকট) দায়ী থাকিবেন। স্বায়ত্ত-শাসন সরকারের নহে, জনগণের। প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা কতিপয় মন্ত্রীর দ্বারা

পরিচালিত হইবে এবং ঐ মন্ত্রীগণ জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন। তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক সরকারের সকল আয় ব্যয়ের প্রস্তাব প্রদেশের জনগণের, অর্থাৎ আইন পরিষদের, অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে।

(ক) ১৯৩৫এর শাসনবিধিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কি পরিমাণে প্রবর্তিত হইয়াছিল—১৯৩৫ এর শাসনবিধিতে আপাত দৃষ্টিতে এই সর্ত্ত কয়টী পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক শাসনের বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট তালিকায় গ্রথিত করিয়া প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে দেওয়া হইল এবং এই বিষয়গুলির শাসনে প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের ক্ষমতা লাভ করিলেন ইংলণ্ড-রাজের নিকট হইতে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নহে। অর্থাৎ বলা হইল প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের শাসনে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও প্রাদেশিক গভর্ণর প্রদেশ শাসনের প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তা রহিলেন, তাঁহাকে "সাহায্য ও মন্ত্রণা" দিবার জন্য একটী মন্ত্রীপরিষদ থাকিল। এই মন্ত্রীপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিলেন। তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিবার, এবং উহাতে প্রাদেশিক আইন পরিষদের অনুমোদন লইবার ব্যবস্থা করা হইল।

কিন্তু এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে বহু ব্যতিক্রম করা হইল। এই সকল ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা থাকার দরুণ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলা চলে। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বড়লাটের বহু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং সরকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অনেক ক্ষমতা বড়লাট পাইলেন। বিশেষ করিয়া গভর্ণরগণ যখনই তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন—অর্থাৎ নিজ বিবেচনা মত (according to discretion) অথবা ব্যক্তিগত বিচার মত (according to individual judgement) কার্য্য করিতেন, তখনই তাঁহাদিগকে বড়লাটের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণরের এই বিশেষ ক্ষমতা যে সকল ক্ষেত্রে ছিল সে সকল ক্ষেত্রে গভর্ণর মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন না। এই সকল বিষয়ে মন্ত্রীদিগের কোন হাত না থাকায় প্রাদেশিক সরকার ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন না; কারণ, কেবলমাত্র মন্ত্রীগণই আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন, গভর্ণর দায়ী ছিলেন না। তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব আইন পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু উহার উপরে আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল বিশেষ ভাবেই সীমাবদ্ধ।

অতএব ১৯৩৫ এর শাসনবিধি অনুযায়ী প্রদেশগুলিতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাকে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা বলিয়া ঘোষণা করিলেও, উহাকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন বলা চলিত।

(খ) ক্ষমতা হস্তান্তরের 'পর, ডমিনিয়ন অবস্থায়, স্বায়ত্তশাসন— ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত 'ডমিনিয়ন' মর্য্যাদা লাভ করিলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কিছু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক গভর্ণরের বিবেচনা প্রযোজ্য ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা লোপ পাইল এবং সেই অনুপাতে বড়লাটের, তথা কেন্দ্রীয় সরকারের, প্রাদেশিক সরকারের উপর ক্ষমতা হ্রাস পাইল। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণর নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই মন্ত্রীপরিষদের হস্তগত হইল। মন্ত্রীপরিষদ যথারীতি আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিলেন। তৃতীয়তঃ, গভর্ণরের অর্থ বিষয়ক বিশেষ ক্ষমতা লোপ পাইল এবং প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের উপর প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর হইল।

(গ) নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন- নূতন শাসনতন্ত্রে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সমগ্র ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার একান্ত প্রচেষ্টা করা হইল; অথচ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের গতি সম্পূর্ণ ফিরাইয়া লওয়াও সম্ভব ছিল না। সেই কারণে, আপাতদৃষ্টিতে দৃষ্টিকটু হইলেও ইহাই ঘটিল, যে ভারত ডমিনিয়ন থাকা অবস্থায় প্রদেশগুলির যে পরিমাণ স্বায়ত্ত শাসন ছিল, নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে প্রদেশগুলির ঠিক সেই পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন আর রহিল না। ইহার কারণ এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে: (১) প্রাদেশিক গভর্ণরকে বিবেচনা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই ক্ষমতা যখনই তিনি প্রয়োগ করিবেন তখনই তিনি রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াই করিবেন। সেই অনুপাতে প্রাদেশিক শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। (২) গভর্ণর যখন তাঁহার বিবেচনা-প্রযোজ্য ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন তখন তিনি মন্ত্রীদিগের পরামর্শমত চলিবেন না, এবং সেই অনুপাতে প্রাদেশিক সরকার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন না। (৩) একাধিক বিষয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে, রাষ্ট্রপতির পূর্ব্ব অনুমতি লইতে হইবে এবং একাধিক বিষয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত আইনে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। (৪) রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিলে সমগ্র প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হইবে।

Questions & Hints

1. How is a Minister appointed in an Indian Province to day ? What is his position in relation to the (a) Chief Minister and (b) Governor ? (1949)

[মন্ত্রী নিয়োগের পদ্ধতি—অনু-৫এর প্রথম অংশে প্রদত্ত।

মন্ত্রীর সহিত মুখ্য মন্ত্রীর সম্পর্ক—১৯৩৫ সালের ভারতশাসন বিধিতে মুখ্য মন্ত্রী সম্পর্কে কোন বিধান না থাকিলেও, গভর্ণরকে প্রদত্ত উপদেশপত্রে বলা হইয়াছিল যে গভর্ণর প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংখ্যাধিক সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে মন্ত্রীপরিষদ গঠনে সাহায্য করিতে আহ্বান জানাইবেন। ইহা হইতেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। মুখ্য মন্ত্রীর পদের অনন্যসাধারণতা শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একজন সাধারণ মন্ত্রী প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য। তাঁহার দপ্তর সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানের নিকট তাঁহাকে নতি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, গভর্ণরের নিকট এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট, মুখ্য মন্ত্রীকেই সমগ্র মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে চূড়ান্ত জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মুখ্য মন্ত্রীর সুস্পষ্ট মতের বিরুদ্ধে কার্য করিলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারেন, অথবা গভর্ণরের মারফতে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর একলারই পদত্যাগে, সকল মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে। গভর্ণরের সহিত সম্পর্ক—অনু-৫ (ক) এবং ৮ (ক)]

2. Explain the position of a minister in an Indian province in relation to the Provincial Legislative Assembly (1948) [অনু-৫ (খ) ; অনু-৮ (খ)]

3. Examine the position and powers of ministers in an Indian province (1947) [অনু-৫ ; অনু-৮]

4. Describe the legislative powers of the Governor of an Indian province (1946) [অনু ৩ (খ) ; অনু ৭ (খ)]

5 Discuss the relation between the Council of Ministers and Provincial Legislature under the New Constitution (1943) [অনু ৫ (খ)]

6. Indicate the powers of the Governor of a Province in British India (1943). [অনু-২, ৩, ৪]

7. Describe the main features of Provincial Autonomy as provided in the Government of India Act, 1935. (1942) [অনু-১২ (ক)]

8. Examine the position and powers of the Governor of an Indian Province to-day (1950) [অনু-৭

9. Examine the position and powers of the ministers in an Indian state to-day. [অনু ১১]

10. What do you understand by Responsible Government? To what extent was responsible government introduced in India under the Government of India Act.. 1935? (1949)

[দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় যে যে-সকল ব্যক্তি শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন তাঁহারা দেশের অধিবাসীদিগের নিকটে দায়ী থাকিয়াই শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। শাসকবর্গের যে শাসন ক্ষমতা, উহা তাঁহারা নিজেরা তৈয়ারী করেন নাই—উহা তাঁহারা জনগণের নিকট হইতে পাইয়াছেন। অতএব এই ক্ষমতার ব্যবহারে তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি সভা অর্থাৎ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিয়া কার্য্য করিবেন। অন্য কাহারও নিকট দায়ী থাকিবেন না—দায়িত্বশূন্য তো থাকিবেন না-ই।

কেন্দ্রে দায়িত্বশীল শাসন—আমাদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায়, ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী, বিন্দুমাত্র দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল না। গভর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার শাসন পরিষদ ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন না—আইন পরিষদের আস্থা অনাস্থার উপরে তাঁহাদের কার্য্যকাল নির্ভরশীল ছিল না। তাঁহারা ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ একটী বৈদেশিক সরকারের নিকট দায়ী ছিলেন।

প্রদেশে দায়িত্বশীল শাসন—১৯৩৫ সালের ভারত শাসনবিধি অনুযায়ী প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসনের আয়োজন করা হইয়াছিল। স্বায়ত্ত শাসনের মূল কথাই হইল প্রাদেশিক সরকার বাহিরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকিবেন এবং প্রদেশের জনগণের নিকট দায়ী থাকিবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল খুবই নগণ্য পরিমাণে।

অনু ১২ (ক) দ্রষ্টব্য।]

11. Indicate the extent to which 'states' enjoy Autonomy under the New Constitution of India. [অনুচ্ছেদ ১২ (গ)]

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন পরিষদ

The Provincial Legislature

(অণুচ্ছেদ-১) প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন পদ্ধতি (১৯৩৫ এর শাসনবিধি অনুযায়ী)—*Composition of the Provincial Legislature (According to the Act of 1935)*

প্রদেশের গভর্ণর এবং একটী বা দুইটী কক্ষ লইয়া প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠিত ছিল,—গভর্ণর ছিলেন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অংশ বিশেষ। এগারটী প্রদেশের মধ্যে ছয়টী প্রদেশে আইন পরিষদ ছিল দ্বিকক্ষ (bicameral legislature । এই প্রদেশগুলি ছিল,—আসাম, বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই। উর্দ্ধকক্ষকে বলা হইত ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) এবং নিম্নকক্ষকে বলা হইত ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)। অবশিষ্ট পাঁচটী প্রদেশের আইন পরিষদ ছিল এক কক্ষ ; ঐ কক্ষটীকে বলা হইত ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)

(ক) ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council)- ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা সকল প্রদেশেই সমান ছিল না। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-সংখ্যা বাঙ্গালা প্রদেশেই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—৬৩ জনের কম নহে এবং ৬৫ জনের বশী নহে। আসাম প্রদেশে এই সংখ্যা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প—২১ জনের কম নহে এবং ২২ জনের বেশী নহে। সদস্যগণের মধ্যে জনকয়েক থাকিতেন গভর্ণরের দ্বারা মনোনীত। গভর্ণরমনোনীত সদস্য সংখ্যা মাদ্রাজ প্রদেশেই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—৮ জনের কম নহে ও ১০ জনের বেশী নহে। অধিকাংশ সদস্যই নির্ব্বাচিত হইতেন। এই নির্ব্বাচন হইত দুই ভাবে। নির্ব্বাচিত সদস্যের এক অংশ সংশ্লিষ্ট প্রদেশের নিম্ন পরিষদের অর্থাৎ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন ;

অপর অংশ, পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে বিভক্ত ভোট দাতাগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইতেন। উর্দ্ধকক্ষ ছিল একটী স্থায়ী পরিষদ,—ইহা কখনই ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিত না। তবে প্রতি তিন বৎসর অন্তর, একতৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করিতেন এবং ঐ আসনগুলি পূরণ করিবার জন্য নূতন নির্ব্বাচন হইত। প্রত্যেক সদস্য নয় বৎসরের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকিতেন।

বাঙ্গালায়—ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৩ হইতে ৬৫ জনের মধ্যে। গভর্ণর মনোনীত করিতে পারিতেন ছয় বা আট জন। ৫৭ জন ছিলেন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। ইঁহাদের মধ্যে ৩০ জন ছিলেন প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ব্বাচিত এবং ২৭ জন নিম্ন পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন।

(খ) **ব্যবস্থা পরিষদ**—(Legislative Assembly)—ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ছিল। বাঙ্গালা প্রদেশেই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—২৫০ জন; এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঐ সংখ্যা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কম,—৫০ জন। এই পরিষদে গভর্ণরের মনোনীত সদস্য ছিলেন না; সকল সদস্যই নির্ব্বাচিত হইতেন,—অবশ্য পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ভিত্তিতে। সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন সকল প্রদেশেই নারী সদস্যের আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যকাল ছিল ৫ বৎসর, তবে গভর্ণর ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্ব্বেই পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। যুদ্ধের সময়ে পরিষদের আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসরের পরেও বাড়াইয়া দিবার জন্য গভর্ণরদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

বাঙ্গালা প্রদেশের—ব্যবস্থা পরিষদে ২৫০টী আসন ছিল। ইহার মধ্যে ১১৯টী আসন মুসলমানদিগের জন্য সংরক্ষিত ছিল (নারী সদস্যের জন্য ২টী আসন সমেত) এবং ৮০টী ছিল সাধারণ (অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য) আসন; তবে সাধরণের মধ্যেও আবার ৩০টী আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বাকী আসনগুলি এই ভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল—ইউরোপীয়দের জন্য ১১টী, ইঙ্গভারতীয়দের জন্য ৪টী, ভারতীয় খৃষ্টানদের জন্য ২টী; শিল্প-বাণিজ্যের জন্য ১৯টী, শ্রমিকদিগের জন্য ৮টী, জমিদারদিগের জন্য ৫টী এবং দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২টী।

মুখপাত্র (Speaker) ও সহমুখপাত্র (Deputy speaker) নামে পরিষদের, সভাপতি ও সহসভাপতি পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন।

(অনু-২) প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ—
(Powers and Functions of Provincial Legislature)

১৯৩৫ সালের শাসনবিধির মধ্যে প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির উপরে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রাদেশিক তালিকা ভিন্ন আরও একটী তালিকা ছিল—ইহার নাম যুগ্মাধিকার-ভূক্ত তালিকা। এই তালিকায় এই সমস্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে: ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী আইন; দেওয়ানী কার্য্যবিধি ইত্যাদি। যুগ্মাধিকারভূক্ত তালিকার বিষয়গুলির উপরে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে, তবে একটী বিষয়ের উপরে যদি উভয়েই আইন প্রণয়ন করে তাহা হইলে, প্রাদেশিক পরিষদকৃত আইনটী বাতিল হইয়া যাইবে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদকৃত আইনটীই বলবৎ থাকিবে।

প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলির উপরে সাধারণতঃ কেবলমাত্র প্রাদেশিক পরিষদই আইন প্রণয়ন করিতে পারে; কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিষদ এই বিষয়গুলির উপরেও আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন; প্রথমতঃ বড়লাট যদি ঘোষণা করিতেন, ভারতের শান্তির ব্যাঘাত হইতে পারে এইরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের উপরেও আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক পরিষদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে উহার সম্মতিক্রমে, কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরেও আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন।

(ক) প্রাদেশিক আইন পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নানা কারণে বিশেষ ভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। গোটাকয়েক ব্যাপার ছিল যেগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আইনের প্রস্তাব বড়লাটের অনুমতি ভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারিত না—যথা বড়লাটের দ্বারা কৃত এ্যাক্ট্, অর্ডিনান্স্ অথবা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দ্বারা বিধিবদ্ধ কোন এ্যাক্ট্‌কে সংশোধন বা বাতিল করিবার প্রস্তাব সমন্বিত কোন বিল। আবার গোটাকয়েক ব্যাপার ছিল যেগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিল গভর্ণরের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রাদেশিক আইন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারিত না, যথা পুলিশ আইন অথবা গভর্ণরের দ্বারা কৃত এ্যাক্ট্ বা অর্ডিনান্স্‌কে সংশোধন বা বাতিল করিবার প্রস্তাব সমন্বিত কোন বিল। উপরন্তু ইংলণ্ডেশ্বর ও তাঁহার পরিবার সম্পর্কে বা স্থলবাহিনী, বিমান বাহিনী বা নৌবাহিনী সম্পর্কে আইনের প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে কোন

ক্রমেই উত্থাপিত হইতে পারিত না। গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিলের আলোচনা গভর্ণর ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কোন বিল পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হইলে উহা বিধিবদ্ধ হইবার জন্য গভর্ণরের সম্মতি প্রয়োজন ছিল। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে এই সম্মতি নাও দিতে পারিতেন। পরিষদের অনুমোদিত কোন বিল তিনি পরিষদকে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিতেন অথবা বড়লাটের অনুমোদন লাভের জন্য উহা স্থগিত রাখিতে পারিতেন। উপরন্তু গভর্ণর পরিষদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া নিজ ইচ্ছামত এ্যাক্ট্ (এইগুলির নাম গভর্ণরের এ্যাক্ট) বিধিবদ্ধ করিতে বা অর্ডিনান্স জারী করিতে পারিতেন।

(খ) প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আইন পরিষদকে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু এই ক্ষমতাও বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। কতকগুলি ব্যয়ের খাত ছিল যেগুলি ছিল প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে অবশ্য দেয়; এই ব্যয়ের প্রস্তাব পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল না; ঐগুলির উপর পরিষদের ভোট লওয়া হইত না; ঐগুলির বাবদ কত খরচ করা হইবে তাহা গভর্ণর তাঁহার বিবেচনা অনুযায়ী স্থির করিতেন। তবে এইরূপ ব্যয়ের প্রস্তাব অন্যান্য ব্যয় প্রস্তাবের সহিত আইন পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করা হইত। অন্যান্য ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি, ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব হিসাবে, সাধারণতঃ আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু পরিষদ কোন ব্যয় মঞ্জুরের দাবী কমাইয়া দিলে অথবা বাতিল করিয়া দিলে, গভর্ণর যদি মনে করিতেন যে প্রস্তাবিত ব্যয় করা তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যয়ের দাবী পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারিতেন।

(গ) প্রাদেশিক মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও প্রাদেশিক আইন পরিষদকে দেওয়া হইয়াছিল। মন্ত্রী পরিষদ ছিলেন আইন সভার কাছে দায়ী এবং আইন পরিষদের আস্থাভাজন থাকিতে না পারিলে মন্ত্রীগণকে পদত্যাগ করিতে হইত। আইন পরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রীগণের কার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, অপছন্দমত কার্য্য করা হইলে তাহার সমালোচনা করিতেন এবং শাসনকার্য্য সম্পর্কে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীগণের কোন কার্য্যকলাপ আলোচনার জন্য তাঁহারা মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিতেন, অর্থাৎ তাঁহারা প্রস্তাব করিতেন যে অপর সকল কার্য্য মুলতুবী রাখিয়া এই বিষয়টী আলোচনা করা হউক। তবে মন্ত্রীদিগের উপরে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ অবাধ ছিল না। কারণ মন্ত্রীদিগের বেতন ও ভাতা একবার নির্দ্ধারিত হইবার পর তাঁহাদের কার্য্য-কালের মধ্যে উহার আর পরিবর্ত্তন করা চলিত না। উপরন্তু পার্লামেণ্ট-সম্মত

শাসনতন্ত্রে (যথা ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে) যে মন্ত্রীসভার উপরে আইন পরিষদের আস্থা আছে সেই মন্ত্রীসভাকে কোনক্রমেই বরখাস্ত করা চলে না। উহা করিলে ঘোরতর অনিয়মতান্ত্রিক কার্য্য করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণকে শুধু যে আইন পরিষদের আস্থাভাজন হইতে হইত তাহাই নহে—তাঁহাদিগকে গভর্ণরের আস্থাভাজনও হইতে হইত। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে আইন পরিষদের আস্থা আছে এইরূপ মন্ত্রীগণকে বরখাস্ত করিতে পারিতেন। ইহাতে আইন পরিষদের মন্ত্রীনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইত বলা চলে।

(অণু ৩) পরিষদের উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক—*Relation between the two Houses of Legislature*

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ছয়টী প্রদেশে দ্বিকক্ষ আইন পরিষদ ছিল। এই কক্ষ দুইটীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল এইরূপ : আইন প্রণয়নের কার্য্যে তাহাদের উভয়ের প্রায় সমান ক্ষমতা ছিল; উভয়ের অনুমোদন না পাইলে কোন বিলই আইন পরিষদের অনুমোদন পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইত না। যে কোন বিল প্রথমে যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পারিত, সেই কক্ষের অনুমোদন লাভের পর উহাকে অপর কক্ষেরও অনুমোদন লাভ করিতে হইত।

উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতার মধ্যে একটু ব্যতিক্রম ছিল। অর্থ বিষয়ক বিলগুলি কেবলমাত্র নিম্নকক্ষেই প্রথম উত্থাপিত হইত তবে ঐগুলির পক্ষেও উর্দ্ধকক্ষের অনুমোদন লাভ প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু ব্যয় মঞ্জুরের দাবী সম্পর্কে উর্দ্ধকক্ষ কেবলমাত্র আলোচনা করিতে পারিত—উহার উপর ভোট দিতে পারিত না। ব্যয় মঞ্জুরের দাবীর উপরে ভোট দিতে পারিত কেবলমাত্র নিম্ন কক্ষ।

কোন বিষয় সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে যদি মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে উহা নিরসনের জন্য ব্যবস্থাও ছিল। গভর্ণর যদি দেখিতেন যে একটী বিল যে তারিখে উচ্চ কক্ষে পাঠানো হইয়াছিল তখন হইতে বারো মাসের মধ্যে উহাকে তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না (অর্থাৎ যেহেতু উভয় কক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে) তাহা হইলে তিনি উভয় কক্ষের যুক্ত বৈঠক আহ্বান করিতেন। এই যুক্ত বৈঠকে যদি বিলটী সংখ্যাধিক সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদিত হইত তাহা হইলে উহা উভয় কক্ষের দ্বারাই অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইত।

(অণু-৪) প্রাদেশিক আইন সভার কর্ম্মপদ্ধতি—*Procedure in the Provincial Legislatures*

প্রাদেশিক আইন পরিষদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইন প্রণয়নের পদ্ধতির অনুরূপ ছিল (চতুর্থ অধ্যায়ের অণু-৪ দ্রষ্টব্য)। প্রভেদ ছিল এই যে প্রাদেশিক আইন পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে কোন বিল উত্থাপিত হইতে হইলে ঐ প্রদেশের কোন মন্ত্রী উহা উত্থাপন করিতেন। বিলটী পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হইলে প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে উপস্থাপিত করা হইত। গভর্ণর উহাতে সম্মতি দিতে অথবা উহা বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন অথবা পরিষদের নিকট উহা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ফিরৎ পাঠাইতে পারিতেন। নিজেই সম্মতি না দিয়া অথবা সম্মতি প্রত্যাখানও না করিয়া পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত কোন বিল তিনি বড়লাটের সম্মতির জন্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন।

(অণু-৫) প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন (ক্ষমতা হস্তান্তরের পর)—*Composition of Provincial Legislature (after Transfer of Power)*

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত, ডমিনিয়ন মর্য্যাদা লাভ করিলে, প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন পূর্ব্বেকার মতই রহিল।

পরিবর্ত্তন সাধিত হইল বাঙ্গালা, আসাম এবং পাঞ্জাবে। আসামের কিয়দংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত হইল এবং বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্বপাঞ্জাব নামে ভারত ডমিনিয়নের অন্তর্ভূক্ত দুইটী নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। অতএব কেবলমাত্র এই তিনটী প্রদেশের আইন পরিষদের গঠন পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

আসামের ঊর্দ্ধকক্ষ অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) উঠাইয়া দেওয়া হইল। পশ্চিম বঙ্গেরও ব্যবস্থাপক সভা বলিয়া কিছু থাকিল না। অতএব ভারত ডমিনিয়নে মাত্র চারিটী প্রদেশের আইন পরিষদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট রহিল— মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার। তবে এই সকল প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-সংখ্যা একটী বা দুইটী করিয়া কমানো হইল। ইউরোপীয়দিগের জন্য আসন উঠাইয়া দেওয়া হইল।

ব্যবস্থা পরিষদ—(Legislative Assembly)—আসামের ব্যবস্থা পরিষদের পূর্ব্বে সদস্যসংখ্যা ছিল ১০৮; এক্ষণে উহা হইল ৭১। পূর্ব্বপাঞ্জাবের ব্যবস্থা

পরিষদের সদস্য সংখ্যা করা হইল ৮১। অন্যান্য যে সকল প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে ইউরোপীয়দিগের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল, সেই সকল প্রদেশে ঐ আসনগুলি উঠাইয়া দেওয়াতে একটী, দুইটী বা তিনটী করিয়া সদস্যসংখ্যা হ্রাস করা হইল। **পশ্চিম বঙ্গের** ব্যবস্থা পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা হইল ৯০ ; ইহার মধ্যে ৪৪টী সাধারণ আসন, ২১টী মুসলমানদিগের জন্য, ৮টী শ্রমিকের জন্য, ৭টী শিল্প বাণিজ্যের জন্য, ৩টী এ্যঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য, ৩টী স্ত্রীলোকদিগের জন্য, ২টী জমিদারদিগের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় খৃষ্টানদিগের জন্য একটী করিয়া।

(অণু-৬) ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ (ক্ষমতা হস্তান্তরের পর)—*Powers and funcuons (After transfer of Power)*

(ক) **আইন প্রণয়ন**—পূর্ব্বের ন্যায় তিনটী তালিকা থাকিল। প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার প্রাদেশিক আইন পরিষদের রহিল, যুগ্মাধিকারভুক্ত তালিকার বিষয়েও প্রাদেশিক আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করিতে পারিত, তবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ঐ তালিকার কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইনই বলবৎ হইত। তবে নিজস্ব সীমার মধ্যে আইন প্রণয়নের কার্য্যে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলি অধিকতর স্বাধীনতা পাইল। মাত্র দুই একটী বিষয়ে আইন প্রণয়নে গভর্ণরের পূর্ব্ব-সম্মতি প্রয়োজন ছিল। কোন বিষয় সম্পর্কে আইন পরিষদের আলোচনা গভর্ণর থামাইয়া দিতে পারিতেন না। অবশ্য আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত প্রত্যেক বিলে গভর্ণরের সম্মতি যথারীতি প্রয়োজন ছিল। এই সম্মতিপ্রদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামুলি বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। কোন কোন বিল গভর্ণর বড়লাটের সম্মতির জন্য রাখিয়া দিতে পারিতেন।

(খ) **অর্থ-সম্পর্কিত**—প্রাদেশিক সরকারের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ক্ষমতা পূর্ব্বের ন্যায় ছিল,--কেবলমাত্র একটী বিষয়ে উহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বে কোন ব্যয়ের প্রস্তাব আইন পরিষদ প্রত্যাখান করিলে বা কমাইয়া দিলে, গভর্ণর, তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য ঐ ব্যয় প্রয়োজন, এই অজুহাতে, ঐ ব্যয়-প্রস্তাব পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারিতেন। এখন গভর্ণরের এই ক্ষমতা লোপ পাইল এবং সেই অনুপাতে প্রাদেশিক আইন পরিষদের অর্থসম্পর্কিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল।

(গ) **মন্ত্রী-নিয়ন্ত্রণ**—মন্ত্রী-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ তো রহিলই বরং উহা

বৃদ্ধিই পাইল। কারণ গভর্ণরকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত করার প্রবণতা থাকায়, আইন পরিষদের আস্থাভাজন কোন মন্ত্রীপরিষদকে তিনি বরখাস্ত করিবেন না, এই শাসনতান্ত্রিক আচার (Constitutional Convention) প্রতিষ্ঠিত হইল।

আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং দ্বিকক্ষ আইন পরিষদের দুইটী কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক পূর্ব্ববৎ রহিল।

(অণু-৭) **নূতন শাসনতন্ত্রে মূলরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ**—*State Legislature under New Constitution*

নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদেশের নাম হইয়াছে মূলরাষ্ট্র বা State; মূল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ৬টীর আইন পরিষদ দ্বিকক্ষ। ইহারা হইল বিহার, বোম্বাই মাদ্রাজ, পাঞ্জাব (পূর্ব্ব পাঞ্জাব), উত্তর প্রদেশ (যুক্তপ্রদেশ) পশ্চিম বঙ্গ এবং মহীশূর। ইহাদের ঊর্দ্ধকক্ষ ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) এবং নিম্নকক্ষ ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) রূপে অভিহিত হইল।

ব্যবস্থাপক সভা—(Legislative Council —ব্যবস্থাপক সভার ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা হইবে ৪০ এবং উর্দ্ধতম সদস্য সংখ্যা হইবে সংশ্লিষ্ট মূলরাষ্ট্রের নিম্ন পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ। সদস্যদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত হইবেন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট মূলরাষ্ট্রের নিম্ন পরিষদের দ্বারা, এক দ্বাদশাংশ গ্র্যাজুয়েটদিগের দ্বারা এবং এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকদিগের দ্বারা। অবশিষ্ট সদস্যগণ গভর্ণরের দ্বারা মনোনীত হইবেন। ব্যবস্থাপক সভা একটী স্থায়ী পরিষদ, তবে প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের কার্য্যকাল শেষ হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদ—(Legislative Assembly)—জনসাধারণের দ্বারা সরাসরিভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে। প্রত্যেক ৭৫,০০০ লোক পিছু ১জন প্রতিনিধি থাকিবে। কোন ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬০ জনের কম হইবে না বা ৫০০ জনের বেশী হইবে না। এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে গভর্ণর এই পরিষদে জনকয়েক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য এবং তালিকাভুক্ত উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। ইহার কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর, তবে গভর্ণর প্রয়োজনবোধে উহার পূর্ব্বেই ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

(অনু-৮) **ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ (নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী)**—
Powers and Functions (According to New Constitution)

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মূলরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর প্রাদেশিক আইনপরিষদের যেরূপ ছিল, তদনুরূপ থাকিল।

(অণুচ্ছেদ-৬ দ্রষ্টব্য)

Questions and Hints

1. Point out the distinction between a "Bill" and an "Act". What are the stages through which a Bill must pass before it becomes an Act of a provincial legislature in India under the Government of India Act, 1935 (1949)

[বিল হইল আইনের খসড়া প্রস্তাব। এই খসড়া প্রস্তাব আইনপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া গভর্ণরের সম্মতি লাভ করিলে, উহা এ্যাক্ট বা বিধিতে পরিণত হয়। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার জন্য অণুচ্ছেদ-৪ দ্রষ্টব্য]

2. Describe the functions and powers of the Legislature of an Indian province. (1950). [অনু-২ এবং অনু-৬]

3. Describe the composition and functions of the Legislative Assembly of Bengal (or Assam) (1946) [অনু-১ (খ) ; অনু-২]

4. Describe the nature of control exercised by the Legislature of an Indian Province over finances of the Province. (1945)

[অনু-২ (খ) ; অনু-৬ (খ)]

5. Describe the composition and functions of a State Legislature under the New Constitution. [অনু-৭ এবং ৮]

সপ্তম অধ্যায়

ইংলণ্ড ও ভারত শাসন

England and Indian Administration

[১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল গ্রেট ব্রিটেনের অধীনস্থ একটী দেশ। অতএব ব্রিটিশ রাজ, তাঁহার মন্ত্রীপরিষদ এবং চূড়ান্তভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিকার ছিল ভারতের শাসন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিবার।]

(**অণুচ্ছেদ-১**) **ব্রিটিশ রাজ**—*The British Crown*

ব্রিটিশ ভারতরূপে পরিচিত ভারতের বিরাট অংশে ব্রিটিশ সরকারের কর্ত্তৃত্ব সরাসরিভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহ সম্রাটের নিকট হইতেই তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের নামেই তাঁহারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল, তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণ, ভাইসরয়, জঙ্গীলাট (Commander-in-Chief) ফেডারেল কোর্ট এবং হাই কোর্টের বিচারপতিগণ, প্রাদেশিক গভর্ণরগণ এবং ভারতের অডিটর জেনারেল · ইঁহারা ব্রিটিশ রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির দ্বারা প্রণীত যে কোন আইনই তিনি বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন এবং বড়লাট যে কোন আইন রাজসম্মতির জন্য রাখিয়া দিতে পারিতেন। তিনি পদবী প্রদান করিতে এবং দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জ্জনা প্রদান করিতে পারিতেন।

ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত নহে অথচ ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত যে সকল দেশীয় রাজ্য ছিল সেগুলির উপরেও চরম কর্ত্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন ব্রিটিশ রাজ। এই চরম কর্ত্তৃত্বের অধিকারীরূপে তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে অনেক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত একজন ভাইসরয়ের দ্বারা ইহা প্রযুক্ত হইত।

(অণু ২) ভারত-সচিব—*The Secretary of State for India*

ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে রাজার সকল প্রকার ক্ষমতা কোন না কোন মন্ত্রীর দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারত শাসনের ক্ষেত্রেও তাঁহার যে ক্ষমতা

ছিল তাহা ব্রিটেনের একজন মন্ত্রীর দ্বারা প্রযুক্ত হইত। এই মন্ত্রী ছিলেন "ভারত সচিব"। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত একজন মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীর ন্যায় ইনিও ইহার কার্য্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী ছিলেন। ১৯৩৫এর শাসনবিধি অনুযায়ী ভারত শাসনে ভারত সচিবের ক্ষমতা ছিল এইরূপ :—

কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে—ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণরূপেই ভারতসচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে তত্ত্বাবধান, পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ভারত সচিবের উপর অর্পিত ছিল। ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে তিনি যে কোন আদেশ বা নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারিতেন এবং এই আদেশ বা নির্দ্দেশ পালন করিতে গভর্ণর জেনারেল বাধ্য থাকিতেন।

প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কে—১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব ছিল গভর্ণর এবং মন্ত্রীপরিষদের উপর অর্পিত। গভর্ণর মন্ত্রীপরিষদের মন্ত্রণা অনুযায়ী চলিতেন এবং মন্ত্রীপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতেন। এক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অবকাশ ভারত-সচিবের ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থাও ছিল যে গভর্ণর সর্ব্ববিষয়েই মন্ত্রীপরিষদের ইচ্ছানুযায়ী চলিবেন না—বহু ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় বিবেচনা বা ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন। গভর্ণর যখনই প্রদেশের শাসনে তাঁহার এই বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন তখনই প্রাদেশিক সরকারের উপর ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হইত। কারণ ভারত সচিব নিয়ন্ত্রণ করিতেন বড়লাটকে এবং বড়লাট নিয়ন্ত্রণ করিতেন গভর্ণরকে—যখনই গভর্ণর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন।

আর্থিক বিষয় সম্পর্কে—ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ব্রিটেনে ঋণ গ্রহণ করা, অবসর প্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগকে পেনসন প্রদান করা ইত্যাদি বিষয় ভারত সচিব নিয়ন্ত্রণ করিতেন।

সর্ব্বভারতীয় চাকুরী সম্পর্কে—আই. সি. এস্, আই. পি. এস্ প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় চাকুরী সম্পর্কে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। এই পর্য্যায়গুলিতে লোক-নিয়োগের নিয়মকানুন তিনিই রচনা করিতেন তিনিই এই সকল পদে লোক নিয়োগ করিতেন এবং ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণেরও দায়িত্ব বহন করিতেন বলা চলে। ভারতে অবস্থিত যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ, নির্দ্দেশ বা শাস্তির বিরুদ্ধে এই পর্য্যায়ের চাকুরীয়াগণ ভারতসচিবের নিকট আপীল করিতে পারিতেন।

ব্রিটিশ রাজ এবং পার্লামেণ্টের এজেণ্টরূপে—ভারতশাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজের বিভিন্ন ক্ষমতা ভারত সচিবের মাধ্যমে প্রযুক্ত হইত; আবার ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতশাসনে যে পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করিতেন উহাতেও এজেণ্টরূপে কার্য্য করিতেন ভারত সচিব—যথা উপদেশ পত্রাদি, অর্ডার-ইন-কাউন্সিল, অর্ডিনান্স প্রভৃতি পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভারতসচিবের পদ আর রহিল না। ঐ তারিখে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করা যাঁহার কার্য্য ছিল এইরূপ ভারত সচিবের আর কোন প্রয়োজন রহিল না।

(অণু-৩) **ভারত সচিবের পরামর্শদাতা**—*Advisers of the Secretary of State for India*

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, ভারতসচিবের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য "ভারত পরিষদ" (Council of India) নামে একটী পরিষদ ছিল। ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী এই পরিষদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উহার পরিবর্ত্তে ভারতসচিবকে সাহায্য করিবার জন্য একটী পরামর্শ সংসদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জনের কম নহে এবং ১২ জনের বেশী নহে; ঠিক কত সংখ্যক সদস্য থাকিবেন তাহা ভারতসচিবই নির্দ্ধারিত করিতেন। সদস্যদিগের কার্য্যকাল ছিল ৫ বৎসর; ইঁহারা ভারতসচিবের দ্বারাই নিযুক্ত হইতেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রেণীভুক্ত থাকিতেন না। মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধেক সদস্য এমন থাকিতেন যাঁহারা অন্ততঃ ১০ বৎসরের জন্য ভারতে রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য করিয়াছেন এবং "পরামর্শ সংসদে" নিযুক্ত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারত ত্যাগ করেন নাই। ভারত সচিব তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন বিষয়েই তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারিতেন তবে তাঁহাদের পরামর্শমত কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। ইহার ব্যতিক্রম ছিল ৩টী বিষয়ে—ভারত সরকারের রাজস্ব সম্পর্কে কোন বিষয়ে, ইংলণ্ডে ষ্টার্লিং ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে, এবং ভারতে সরকারী চাকুরী সম্পর্কে আদেশ ও নিয়মাবলী রচনায়। এই বিষয়গুলিতে পরামর্শ সংসদের পরামর্শ মত কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন।

পরে, ভারত সচিবের পরামর্শ সংসদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছিল। "ভারত স্বাধীনতা আইনের" দ্বারা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে এই পরামর্শ-সংসদের বিলোপ-সাধন করা হয়।

(অণু-৪) ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও ভারত শাসন—*British Parliament and Indian Administration*

ভারতের শাসন ব্যাপারে পার্লামেণ্টের প্রচুর ক্ষমতা ছিল। সকল ভারত শাসন আইন পার্লামেণ্টের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধিও পার্লামেণ্টের দ্বারাই বিধিবদ্ধ ছিল। বড়লাট এবং গভর্ণরগণ শাসন বিধির আওতার মধ্যে থাকিয়াই ভারতের শাসন পরিচালনা করিতে বাধ্য ছিলেন। ভারত শাসনের ব্যাপারে ভারত সচিবের যে সকল ক্ষমতা ছিল সেই সব ক্ষমতার ব্যবহারে তিনি পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। বড়লাট ও গভর্ণরদিগের প্রতি ব্রিটিশ রাজের উপদেশলিপি (Instruments of Instructions) এবং ভারতের শাসন সম্পর্কিত 'অর্ডার-ইন কাউন্সিল' সমূহ পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত জারী করা চলিত না। বড়লাট ও গভর্ণরগণ শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা করিলে এবং কোন অর্ডিনান্স দ্বিতীয়বারের জন্য জারী করিলে ঐগুলি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করিতে হইত।

(অণু-৫) ভারতের হাই কমিশনার—High Commissioner for India (in England)

১৯১৯ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী ইংলণ্ডে ভারতের একজন হাই কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৫ সালের শাসন বিধিতেও এই পদবী বহাল ছিল। বড়লাটের দ্বারা ইনি পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন তবে পাঁচ বৎসর অন্তে পুনর্নিযুক্তও হইতে পারিতেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বড়লাট যে কার্য্যগুলি তাঁহাকে দিতেন সেই কাজ সম্পন্ন করা ছিল তাঁহার দায়িত্ব এবং বড়লাটের সম্মতি লইয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে কোন কোন কার্য্যও তিনি সম্পাদন করিতে পারিতেন। বিভিন্ন সরকারের পক্ষ হইতে তিনি কোন কোন চুক্তি সম্পাদন করিতেও পারিতেন। ভারতীয় ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং ভারতীয় ছাত্রদিগের ইনি তত্ত্বাবধান করিতেন। ইনি বাণিজ্য বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহ করিতেন এবং যুক্তরাজ্যে ভারতীয় বাণিজ্য তৎপরতার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে নজর রাখিতেন।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের দ্বারা ঐ সালের ১৫ই আগষ্টের পরেও এই পদটী রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে ভারত ও পাকিস্থান, এই দুইটী ডমিনিয়নের দুইজন হাই কমিশনার যাহাতে নিযুক্ত হন সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হয়।

(অনু-৬) ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের বিবর্ত্তন—*Evolution of Indo-British Relations*

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী উত্থিত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মধ্যে তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আশ্বাস প্রদান করেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন বিধিতে যে মুখবন্ধ গ্রথিত করা হইয়াছিল তাহাতেও এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির কথা ছিল। কিন্তু ঐ বিধির দ্বারা কেবলমাত্র প্রদেশগুলিতে যে দায়িত্বশীল শাসনের আয়োজন করা হইল, তাহা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভারতবাসী এই অকিঞ্চিৎকর দায়িত্বশীল শাসনের কণিকা লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনের অধিকার দাবী করিতে থাকে। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার "সাইমন কমিশন" নামে পরিচিত এক কমিশন গঠন করিলেন—দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা কিভাবে সম্প্রসারিত করা বিধেয় সেই সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য। এই কমিশন সম্পূর্ণ অভারতীয়দিগকে লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া ভারতবাসী ইহার সহিত সহযোগিতা করিল না। কমিশন সুপারিশ করিলেন যে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে এবং প্রদেশগুলিতে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের পার্থক্য অর্থাৎ দ্বৈতশাসন (Dyarchy) উঠাইয়া দিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবে—অবশ্য প্রাদেশিক গভর্ণরের হস্তে রক্ষাকবচ (Safeguard) রূপে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

সাইমন কমিশনের এই সুপারিশ ভারতবাসীর মনঃপূত না হওয়ায় ১৯২৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ডমিনিয়ন মর্য্যাদা দাবী করিলেন এবং ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ দাবী করিলেন। এই দাবী পূর্ণ হইবার আশা না পাওয়ায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্যরূপ গণ আন্দোলন সুরু হইল; ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করিলেন বটে কিন্তু স্বায়ত্বশাসনের দাবীর উগ্রতা প্রশমিত হইল না।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার আর একটী ভারত শাসন বিধি প্রণয়ন করিয়া দিলেন। ইহার দ্বারা কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আয়োজন থাকিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে আংশিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা থাকিল। প্রদেশের শাসনে দ্বৈতশাসন উঠাইয়া দিয়া প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদকে শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হইল কিন্তু প্রকৃত

ক্ষমতা রহিল ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী গভর্ণরের নিকট। ভারতবাসী ইহাকে "ক্ষমতাশূন্য দায়িত্ব" ("Responsibility without Powers") বলিয়া অভিহিত করিল। তবে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু স্বায়ত্বশাসন উপলব্ধি করা সম্ভব, ততটুকু কার্য্যকরী করিবার জন্য সকল প্রদেশেই মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইল—অবশ্য কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে কিছু প্রাথমিক মনোমালিন্য ঘটিবার পরে। সমগ্র ভারতের শাসনব্যবস্থা যথারীতি ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ রহিল। ভারতের মর্য্যাদায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইলে ভারতকে ভারতবাসীর অভিমত না লইয়াই যুধ্যমান দেশ বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রতিবাদে, এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সাহচর্য্য অস্বীকার স্বরূপ, কংগ্রেসের তরফ হইতে গঠিত মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করিল এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে, ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে, ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট ভারতে অহিংস বিদ্রোহ সুরু হইল। এই বিদ্রোহও কঠোর হস্তে দমিত হইল।

ইতিমধ্যে মুসলীম লীগ নামক মুসলমানদিগের একটী রাজনৈতিক দল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই দল দাবী করিল যে ভারতের মুসলমানগণ একটী স্বতন্ত্র জাতি এবং ভারতকে খণ্ডিত করিয়া মুসলমানদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে—এই সম্ভাবিত রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হইল "পাকিস্থান"। আগষ্ট বিদ্রোহ সুরু হইবার মাস কয়েক পূর্ব্বে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে 'স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্' শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সমাধানের নিমিত্ত কতিপয় প্রস্তাব লইয়া ভারতে আগমন করিয়া কংগ্রেস ও মুসলীম নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। 'ক্রিপ্‌স্' প্রস্তাবে, যুদ্ধের শেষে ভারতকে ডমিনিয়ন মর্য্যাদা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হইল অবার বলা হইল, যে কোন প্রদেশ বা একাধিক প্রদেশ এই ডমিনিয়নে না থাকিয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। ইহার মধ্যে পাকিস্থানের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু স্থির নিশ্চয়তা ছিল না; তাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব হইল ব্রিটিশ সরকারের সর্ব্বপ্রথম পরিকল্পনা যাহাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সরকারী তরফে ভারতকে ডমিনিয়ন মর্য্যাদা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হইল উপরন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকারেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৩৬ সালে ব্রিটেনের তিনজন কেবিনেট মন্ত্রী লইয়া গঠিত এক 'মিশন' (কেবিনেট মিশন) ভারতে আসেন। ভারতের মেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া কোনরূপ মতৈক্য সৃষ্টি করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিজেরাই

ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের এক প্রস্তাব পেশ করিলেন; ইহা "কেবিনেট মিশন প্রস্তাব" নামে পরিচিত। সমগ্র ভারতে একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠন, এই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তিনটী মণ্ডলী সরকার গঠন এবং প্রত্যেক মণ্ডলী সরকারের মধ্যে একাধিক প্রাদেশিক সরকার গঠন—ইহাই ছিল কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত শাসন কাঠামো। এইরূপে রাষ্ট্রের শাসনবিধি রচনার জন্য একটী গণপরিষদ প্রতিষ্ঠার (ইহাতে ব্রিটিশ ভারতের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি থাকিবে) ব্যবস্থাও থাকিল।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী গণপরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইল; মুসলীম লীগ গণ-পরিষদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মুসলমানদিগের প্রায় সকল আসন দখল করিয়া লইল এবং দাবী করিল যে তাহারা ঐক্যবদ্ধ ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় যোগদান করিবে না - স্বতন্ত্র পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের জন্য স্বতন্ত্র গণ-পরিষদ চাই।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত শাসনের সকল দায়িত্ব পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন—ইতিমধ্যে ভারতবাসীর মধ্যে মতের ঐক্য ঘটুক বা নাই ঘটুক। কিছুকাল পরেই নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা 'পাকিস্থান" সৃষ্টির ভিত্তিতে ঐক্যমত সমন্বিত একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ঐ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট "ভারত স্বাধীনতা আইন" নামে একটী বিধি প্রণয়ন করিলেন। এই বিধিতে বলা হইল যে ১৫ই আগষ্ট হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার পরিত্যাগ করিবেন। ভারতের কয়েকটী অঞ্চল লইয়া একটী স্বতন্ত্র "পাকিস্থান" রাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং অবশিষ্ট ভারত 'ভারত' নামেই পরিচিত থাকিবে। ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই "ডমিনিয়ন" মর্য্যাদা লাভ করিবে। দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর ব্রিটিশ সরকারের চরম কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিবে। বড়লাট এবং গভর্ণরদিগকে ইতিপূর্ব্বে ব্রিটিশ সরকার যে সকল উপদেশপত্র প্রদান করিয়াছিলেন সে সকলই প্রত্যাহার করা হইবে। ভারত সচিবের পরামর্শদাতা সংসদ উঠিয়া যাইবে। প্রত্যেক ডমিনিয়নে ব্রিটিশ রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন বড়লাট থাকিবেন। পাকিস্থান অঞ্চল হইতে গণপরিষদে নিযুক্ত সদস্যগণ পৃথক গণ-পরিষদ গঠন করিবেন। পূর্ব্বেকার গণ-পরিষদ ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে থাকিবে। ভারত ডমিনিয়নের বড়লাট ১৯৩৫ সালের শাসন বিধিকে, ডমিনিয়ন মর্য্যাদার সহিত খাপ খাওয়াইয়া, সংশোধন করিয়া লইবেন। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র যতদিন না রচিত হইবে ততদিন ভারতের গণ-পরিষদ ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদরূপে কার্য্য করিবে এবং এই কেন্দ্রীয়

আইন পরিষদের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বা ব্রিটিশ সরকারের কোনই নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না।

(অনু-৭) ডমিনিয়ন মর্য্যাদা—ইহার প্রকৃতি—*Dominion Status, —its nature*

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারত এবং ব্রিটেনের সম্পর্কে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ব্রিটেনের অধীনস্থ দেশের মর্য্যাদা পরিহার করিয়া ভারত এক্ষণে ব্রিটেনের সমকক্ষ ডমিনিয়ন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

ডমিনিয়নগুলি হইল "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত স্বায়ত্বশাসনভোগী জনসমষ্টি যাহারা পরস্পরের মধ্যে সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন, যাহাদের মধ্যে কোনটাই আভ্যন্তরীণ বা বহির্বিষয়ের কোন ক্ষেত্রেই অপরের অধীন নহে, যদিও সকলেই ইংলণ্ড রাজের প্রতি সাধারণ আনুগত্যের দ্বারা পরস্পরের সহিত গ্রথিত এবং ব্রিটিশ জাতি সমবায়ের সদস্যরূপে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা সংযুক্ত।" অতএব একটী ডমিনিয়ন কোনরূপেই ব্রিটিশ সরকারের অধীন নহে। ডমিনিয়নের শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা বিভিন্ন দিক হইতে বিশ্লেষণ করা চলে।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে—প্রত্যেক ডমিনিয়ন অপর যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন এবং প্রত্যেক আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘে উহা স্বীয় অধিকারে সদস্যপদ সংগ্রহ করিতে পারে।. বিদেশে দূত প্রেরণ করিতে এবং বিদেশ হইতে দূত গ্রহণ করিতে প্রত্যেক ডমিনিয়ন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ইহা ব্রিটিশ সরকারের কোনরূপ সম্মতি গ্রহণ না করিয়া যে কোন অপর রাষ্ট্রের সহিত যে কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ইহা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় না—হয়তো প্রভাবিত হইতে পারে মাত্র। প্রভাবিত হইবে কিনা তাহারও নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্রিটিশ সরকার কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইলে কোন ডমিনিয়ন সেই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য নহে।

আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে—ডমিনিয়নের সহিত ব্রিটেনের এই সম্পর্ক থাকে যে বৃটেনের রাজা প্রত্যেক ডমিনিয়নের রাজা বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু ডমিনিয়নের শাসনকার্য্যে রাজার প্রকৃত কোনই ক্ষমতা নাই; শাসন পরিচালিত হয় ডমিনিয়ন মন্ত্রীপরিষদের দ্বারা,—অবশ্য একজন বড়লাটের নামে। বড়লাট কাগজ পত্রে ইংলণ্ডের রাজার দ্বারা নিযুক্ত হন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি নিযুক্ত হন ডমিনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের দ্বারা। **আইন প্রণয়নেও** ডমিনিয়নের আইনপরিষদের .উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের

কোনই নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা প্রণীত কোন বিধি কোন ডমিনিয়নে প্রযোজ্য নহে। ডমিনিয়ন আইন পরিষদ যে কোনরূপ আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। নিজেদের বিচার ব্যবস্থার সংগঠনে এবং বিচার কার্য্য নির্ব্বাহে প্রত্যেক ডমিনিয়ন স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। ডমিনিয়নগুলির হাইকোর্ট হইতে পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা চলিত। কিন্তু প্রত্যেক ডমিনিয়ন প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

অতএব আইনের দিক হইতে প্রত্যেক ডমিনিয়ন ইংলণ্ডের রাজার শাসিত দেশ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহা একটী স্বাধীন রাষ্ট্র।

(অনু ৮) ভারত প্রজাতন্ত্রের সহিত ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক —*Constitutional Relation of Indian Republic with Great Britain*

ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছিল যে গণপরিষদ, উহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারত গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল। এই সঙ্কল্প ছিল "সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" গঠনের। প্রজাতন্ত্র হইল এমন একটী দেশ যাহার রাজা বলিয়া কেহই থাকিবেন না,—শাসন ব্যবস্থার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা থাকিবেন একজন রাষ্ট্রপতি (President)—যিনি ঐ দেশেরই অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

সকলেই বুঝিল যে ভারতে এইরূপ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রিটেনের রাজা আর ভারতের রাজা বলিয়া গণ্য হইবেন না এবং ভারত ও ব্রিটেনের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে। অতএব ব্রিটেন, ভারত এবং অন্যান্য ডমিনিয়ন-গুলির রাষ্ট্রনীতিকগণ উপলব্ধি করিলেন যে ভারত কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে উহা সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর হইবে। সুতরাং ভারত প্রজাতন্ত্র হইলেও উহাকে কিভাবে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখা যায় সে সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে ডমিনিয়ন সমূহের প্রধান মন্ত্রীদের একটী বৈঠক বসিয়াছিল।* এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইল যে ভারত সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র হইবার পরেও কমনওয়েলথের সদস্য থাকিবে। কমনওয়েলথের নাম আর 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ' থাকিবে না ইহার নাম হইবে 'কমনওয়েলথ অফ নেশন্স্'। ইংলণ্ডের রাজা এই কমনওয়েলথে সমবেত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের

*ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের পক্ষ হইতে এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়াছিলেন। গণ-পরিষদও পরে সম্মতি দিয়াছিল।

প্রতীকরূপে অবস্থান করিবেন। ভারত ইংলণ্ডের রাজার প্রতি কোন আনুগত্য দিবে না। বর্ত্তমানে ভারতের সহিত ব্রিটেনের ইহাই সম্পর্ক যে ভারত এবং ব্রিটেন উভয়েই, এমন একটী জাতি সমবায় বা কমনওয়েলথের সদস্য, যাহা পৃথিবীর কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র লইয়া গঠিত এবং যাহার ঐক্যের প্রতীক হইলেন ইংলণ্ডের রাজা।

Questions & Hints

1. Write note on Dominion Status (1947). What is meant by Dominion Status? (1946) [অনু-৭]

2. Has India at present any constitutional relationship with Great Britain? If so, what is the nature of the relationship? [অনু-৮]

অষ্টম অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা ও সরকারী চাকুরী

The Judiciary and Public Services

(অণুচ্ছেদ-১) বিচার ব্যবস্থার সংগঠন—*Organisation of the Judiciary*

ভারতের বিচার ব্যবস্থাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা চলে,—দেওয়ানী এবং ফৌজদারী। এই দুই পর্য্যায়ের মামলা নিষ্পত্তির জন্য দুই পর্য্যায়ের আদালতের ব্যবস্থা আছে।

(ক) **দেওয়ানী আদালত** দেওয়ানী মামলা বিচারের সর্ব্বনিম্ন আদালত হইল ইউনিয়ন বোর্ড আদালত; ইহাতে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ বিচারের কার্য্য করেন এবং গ্রামের মধ্যেকার সামান্য ব্যাপার সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার এইখানে বিচার হয়। নগর এলাকায় সর্ব্বনিম্ন আদালত হইল মুন্সেফের আদালত; প্রেসিডেন্সি নগরগুলিতে উহার জন্য 'স্মল কসেস্ কোর্ট' আছে। প্রত্যেক মহকুমা চৌকিতেই মুন্সেফ আদালত আছে। মুন্সেফ আদালতের উপরে সাবজজের আদালত; ইহা মুন্সেফের আদালত হইতে আনীত আপীলেব বিচার করে, উপরন্তু অধিক পরিমাণ অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট মোকর্দ্দমার বিচারের জন্য ইহার আদিম বিচার ক্ষমতাও আছে। সমগ্র জিলার উপরে জিলা জজ আদালতের বিচার ক্ষমতা প্রসারিত। জিলার মধ্যে অবস্থিত মুন্সেফ আদালত ও সাবজজ আদালতগুলি হইতে আনীত আপীলের বিচার জিলা জজ করিয়া থাকেন; ইহা ভিন্ন জিলা জজকোর্টের আদিম বিচার ক্ষমতাও বিদ্যমান। উপরন্তু জিলার মধ্যেকার সকল নিম্ন আদালতের বিচার কার্য্যের উপর তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব জিলাজজদিগের উপর অর্পিত।

জিলাজজ ও সাবজজের আদালত হইতে হাইকোর্টে আপীল করা চলে। হাইকোর্টই প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি এবং

জনকয়েক সাধারণ বিচারপতি থাকেন। কোন কোন হাইকোর্টের, যে সকল ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ খুবই অধিক সেই সকল ব্যাপার সম্পর্কে, আদিম বিচার ক্ষমতাও আছে।

হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত হইতে ইংলণ্ডের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করা চলিত—অবশ্য সেই সকল মামলায়—যাহাতে সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ থাকিত দশ হাজার টাকার অধিক। যদি কোন মোকর্দ্দমায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির কোন অংশের ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত থাকিত, তাহা হইলে ঐ মোকর্দ্দমার আপীল হাইকোর্ট হইতে ফেডারেল কোর্টে লওয়া যাইত। সেখান হইতে প্রয়োজন হইলে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করা যাইত। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ফেডারেল কোর্ট উঠিয়া গিয়া সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল; উহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ভারতের হাইকোর্ট হইতে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে কোন আপীল প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) ফৌজদারী আদালত-ফৌজদারী মামলার বিচারের সর্ব্বনিম্ন আদালত হইল ইউনিয়ন বেঞ্চ। গ্রামের সামান্য বিষয় সম্পর্কে ইহা মামলার নিষ্পত্তি করে। নগরে এইরূপ মামলার বিচারের জন্য অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকেন। অধিকতর গুরুতর ধরণের মামলার বিচার করেন প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ। প্রেসিডেন্সি সহরে গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকেন। জিলার মধ্যে অধিকতর গুরুতর ধরণের ফৌজদারী মামলার বিচারের প্রথমে কোন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে শুনানী হয়, তাহার পর ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিতে পারেন। এই সকল মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয় জিলা ও দায়রা জজের দ্বারা—অবশ্য জুরী বা এ্যাসেসরের সাহায্যে। প্রেসেডেন্সি সহরের মধ্যে গুরুতর অপরাধীকে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাইকোর্টে দায়রা সোপর্দ্দ করিতে পারেন। জিলা ও দায়রা জজের আদালত হইতে এবং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে, হইকোর্টের নিকট ফৌজদারী মামলার আপীল করা চলে। গুরুতর আইনের প্রশ্ন যে সকল মামলায় জড়িত থাকিত সেই সকল মামলায় হাইকোর্ট হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা চলিত। বর্ত্তমানে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(অনু-২) হাইকোর্ট—*The High Court*

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, এলাহাবাদ, পাঞ্জাব ও নাগপুরে হাইকোর্ট

গঠিত আছে। লক্ষ্ণৌয়ের চীফ্ কোর্ট হাইকোর্টের সহিত সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন। হাইকোর্টগুলি নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শুধুই যে সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত তাহাই নহে, কোন কোন হাইকোর্টের (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) আদিম বিচার ক্ষমতাও আছে। প্রদেশের সকল নিম্ন আদালতের উপর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক হাইকোর্টের তত্ত্বাবধান ক্ষমতাও আছে। হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন (অনধিক ২০ জন) বিচারক থাকেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাজ হাই-কোর্টের বিচারক নিয়োগ করিতেন। ভারত ডমিনিয়ন মর্য্যাদা লাভ করিলে, হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা ডমিনিয়ন বড়লাটের উপর অর্পিত হয়। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বর্ত্তমানে এই নিয়োগ কার্য্য করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

(অণু-৩) ফেডারেল কোর্ট—*The Federal Court*

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধি অনুযায়ী ভারতে একটী ফেডারেল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। ফেডারেল কোর্টের মোটামুটি তিন প্রকারের কার্য্য ছিল: (১) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ফেডারেল কোর্ট সেই বিরোধের বিচার করিয়া দিতেন—অবশ্য ঐ বিরোধের মধ্যে যদি এরূপ কোন বিষয় থাকিত যাহার উপরে কোন পক্ষের কোন আইন প্রদত্ত অধিকার নির্ভর করিত। (২) হাইকোর্টের বিচার বা আদেশের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্ট আপীলের বিচার করিতে পারিতেন—অবশ্য, ঐ মামলার মধ্যে ভারত শাসন বিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যা জড়িত রহিয়াছে, এই মর্মে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট যদি সার্টিফিকেট প্রদান করিতেন। (৩) বড়লাট যে কোন বিষয় ফেডারেল কোর্টের নিকট উপস্থাপিত করিয়া ঐ সম্পর্কে ফেডারেল কোর্টের অভিমত চাহিতে পারিতেন।

ফেডারেল কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ছয় জন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইত। ইহারা সকলেই ব্রিটিশ রাজের দ্বারাই নিযুক্ত হইতেন। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদিগকে নিয়োগের ক্ষমতা বড়লাটের ছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও ফেডারেল কোর্ট বজায় রাখা হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী, নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, একটী সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল এবং ফেডারেল কোর্ট বিলুপ্ত হইল।

(অণু-৩) সুপ্রীম কোর্ট—*The Supreme Court*

সুপ্রীম কোর্টই ভারত প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ আদালত। সুপ্রীম কোর্টের কার্য্য মোটামুটি চারি পর্য্যায়ের।

(১) **মামলার বিচার**—বিভিন্ন পর্য্যায়ের মামলার বিচারকার্য্য সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা সাধিত হয়। মামলার বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের আদিম, আপীল ও পুনর্ব্বিবেচনা-মূলক—এই তিন প্রকারের বিচার ক্ষমতা আছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সরকারের মধ্যে মামলা হইলে উহা বিচার করিবার আদিম ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপীলের বিচার ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের আছে। সমগ্র ভারতে যাহাতে অভিন্ন আইনের কোড্ (Code) সৃষ্ট হয় এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যাহাতে নিম্ন আদালতের ভুলভ্রান্তি শোধরানো যায় সেই উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের উপর এইরূপ আপীল বিচার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। উপরন্তু সামরিক আদালত ব্যতীত, ভারতের যে কোন কোর্ট বা যে কোন ট্রাইব্যুন্যালের বিচারের উপর পুনর্ব্বিবেচনামূলক বিচার ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত।

(২) **মৌলিক অধিকার রক্ষা**—নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকদিগকে কতিপয় মৌলিক অধিকারের স্থির নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। কাহারও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে সুপ্রীম কোর্ট উহার বিচার করিতে পারিবে।

(৩) **অভিমত প্রদান**—পূর্ব্বেকার দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি অথবা জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয় সম্পর্কে, ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাহিতে পারেন ; এইরূপ অভিমত প্রদান করা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম কার্য্য।

(৪) **আইন ঘোষণা**—মামলার বিচারে এবং শাসনবিধি ও আইনের ব্যাখ্যার কার্য্যে সুপ্রীম কোর্ট আইন ঘোষণা করিবেন এবং এই আইন ভারতে অবস্থিত সকল আদালতের দ্বারা গ্রাহ্য হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের গঠন—সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক সাতজন অন্যান্য বিচারপতি লইয়া গঠিত থাকিবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদিগকে নিয়োগ করিবেন। ভারতের নাগরিক নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে পারিবেন না। যাঁহারা অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন বা অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট ছিলেন কেবলমাত্র এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হইবে। সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন পর্য্যায়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ন্যূনসংখ্যক কতজন বিচারপতির প্রয়োজন হইবে তাহাও নির্দ্ধারিত করা আছে। কোন ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম সংখ্যা বা কোরামের অভাব ঘটিলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া কাজ চালানো বিচারক (Ad-hoc Judge) নিয়োগ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে সুপ্রীম কোর্ট প্রধান বিচারপতি এবং পাঁচজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া গঠিত।

(অণু-৫) সরকারী চাকুরী—*Public Services*

ভারতের সরকারী চাকুরীগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সামরিক ও বেসামরিক্।

(অণু ৬) সামরিক চাকুরী—*Defence Services*

সামরিক চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষমতা ছিল কেবলমাত্র ব্রিটিশ রাজের। এই সকল চাকুরীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী ভারতসচিবই রচনা করিতেন,—তাঁহার পরামর্শ সংসদের অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সামরিক পদগুলিতে লোক নিয়োগ করিতেন ভারতের বড়লাট। বর্ত্তমানে এই নিয়োগের ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রপতির।

(অণু-৭) বেসামরিক চাকুরী—*Civil Services*

বেসামরিক চাকুরীতে তিনটী পর্য্যায দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) নিখিল ভারত চাকুরী (খ) কেন্দ্রীয় চাকুরী এবং গ) প্রাদেশিক চাকুরী।

(ক) **নিখিল ভারত চাকুরী** (All-India Services)—নিখিল ভারত চাকুরীর কর্ম্মচারীগণ ভারতের যে কোন অংশে কায্য করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কায্য করেন, তবে অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারী বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারে নিযুক্ত থাকেন। নিখিল ভারত চাকুরীয়াদিগের মধ্যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্, ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিস্, ভারতীয় পুলিস সার্ভিস্ এইরূপ কয়েকটী পর্য্যায় ছিল। ইহাদের নিয়োগ কর্ত্তা ছিলেন ভারত সচিব। ইহাদের চাকুরী সংক্রান্ত সকল নিয়মাবলী তিনিই রচনা করিতেন।

এই সকল চাকুরীয়াদিগের বহুবিধ বিশেষ অধিকার ছিল। ভারতে অবস্থিত যে কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত নিন্দাসূচক বা শাস্তিমূলক আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা ভারতসচিবের নিকট আপীল করিতে পারিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা (যথা শাসন পরিষদের সদস্য বা মন্ত্রী) প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা বড়লাট বা গভর্ণরের নিকট আপীল করিতে পারিতেন। ইহাদের অধিকার সংরক্ষণ করা বড়লাট ও গভর্ণরদিগের বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতসচিবের পদ উঠিয়া গেল এবং এই

সকল নিখিল ভারত চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষমতা ভারত সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন হইল। ইহাদের চাকুরী সংক্রান্ত নিয়মাবলী রচনার ক্ষমতা লাভ করিলেন ডমিনিয়নের বড়লাট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণর। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, দুই শ্রেণীর সর্ব্ব ভারতীয় চাকুরীতে লোক নিয়োগ ও চাকুরীর সর্ত্তাদি পার্লামেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এইরূপ সর্ব্বভারতীয় চাকুরী হইল ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান য়্যাডমিনিষ্ট্রেটীভ সার্ভিস। ভারত ডমিনিয়ন থাকা অবস্থাতেই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে লোক নিয়োগ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং উহার স্থলে ইণ্ডিয়ান য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস পত্তন হইয়াছিল। তবে পূর্ব্বেকার ভারতসচিবের দ্বারা নিযুক্ত সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভূক্ত যে সকল কর্ম্মচারী, স্বাধীনতার পরেও, কেন্দ্রীয় সরকারে বা প্রাদেশিক সরকারে চাকুরী করিতে থাকিবেন তাঁহারা, ভারতের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যতটা খাপ খায়, পূর্ব্বেকার চাকুরীর সর্ত্ত ও অধিকার সমূহ ভোগ করিতে থাকিবেন—নূতন শাসনতন্ত্রে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে।

(খ) **কেন্দ্রীয় চাকুরী** (Central Services)—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলির সহিত কেন্দ্রীয় চাকুরী সম্পর্কিত; এইগুলি হইল রেলওয়ে চাকুরী, ডাক ও তারবিভাগে চাকুরী, শুল্ক বিভাগে চাকুরী ইত্যাদি। বর্ত্তমানে এই সকল পদে রাষ্ট্রপতির দ্বারা অথবা রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা লোক নিয়োগ করা হয়—অবশ্য ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও সরাসরি মনোনয়ন উভয় পদ্ধতিতেই লোক নিয়োগ করা হয়।

(গ) **প্রাদেশিক বা মূলরাষ্ট্রীয় চাকুরী** (Provincial or State Services)—বর্ত্তমানে মূলরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে কার্য্য করিবার জন্য 'মূলরাষ্ট্র সার্ভিস' পর্য্যায়ভূক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়। এইগুলি হইল পূর্ব্বেকার প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস্—ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভূক্ত কর্ম্মচারীগণের পরেই ইঁহাদের স্থান ছিল। মূলরাষ্ট্র শাসনের কতিপয় উচ্চ পদ ইঁহাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। মূলরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে গভর্ণরের দ্বারা ইঁহারা নিযুক্ত হন। অবশ্য এই চাকুরীতে লোক নির্ব্বাচন ও বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে ষ্টেট পাব্লিক সার্ভিস কমিশন পরামর্শ দিয়া থাকেন।

(অনু-৮) পাব্লিক সার্ভিস কমিশন (যুক্তরাষ্ট্রীয় ও মূলরাষ্ট্রীয়)— ***Public Services Commissions—Union and State***

১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রাদেশিক

সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগে সাহায্য করিবার জন্য পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। একটীর অধিক প্রদেশের একত্রিতভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একটী মাত্র জয়েণ্ট পাব্লিক সার্ভিস কমিশনও থাকিতে পারিত; নূতন শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গঠন পদ্ধতি—কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে একটী ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন থাকিবে এবং প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রে একটী ষ্টেট্ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন থাকিবে। যদি একাধিক মূল রাষ্ট্র ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাদের জন্য সমবেত ভাবে একটী 'জয়েণ্ট্ ষ্টেট্ পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন' পার্লামেণ্টের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারিবে। ইউনিয়ন এবং জয়েণ্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং ষ্টেট্ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। প্রত্যক পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের সদস্য সংখ্যার অর্দ্ধেক এরূপ হইবেন যাঁহারা অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য ভারতে সরকারী চাকুরী করিয়াছেন।

কার্য্যকলাপ—সকল বেসামরিক পদে লোক নিয়োগ রাষ্ট্রপতি এবং গভর্ণর (বা রাজপ্রমুখ) যথাযথ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া করিবেন। বিভিন্ন চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাও পাব্লিক সার্ভিস কমিশনগুলি গ্রহণ করিবেন। শুধু নিয়োগের ক্ষেত্রেই নহে, পদোন্নতি বা এক চাকুরী হইতে অপর চাকুরীতে বদলী অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন—ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনগুলির সহিত পরামর্শ করা হইবে। প্রত্যেক বৎসর ইঁহারা প্রেসিডেণ্ট অথবা গভর্ণরের নিকট একটী বিবরণী প্রদান করিবেন এবং এই বিবরণী পার্লামেণ্ট অথবা মূলরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের নিকট পেশ করা হইবে।

Questions & Hints

1. Give some account of the organisation of the Judicial System of India (1950) [অনু-১]

2. Write note on—Public Service Commission (1947) [অনু-৮]

3. Discuss the constitution and functions of the Supreme Court of India [অনু ৪]

4. Write notes on the Civil Services in India (1936) [অনু ৭]

নবম অধ্যায়

ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহ

The Native States in India

(অনুচ্ছেদ-১) দেশীয় রাজ্যসমূহের মর্য্যাদা (ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে)—*Status of Natire States (Before Transfer of Power)*

ব্রিটিশ আমলে ভারতে প্রায় ৫৬২টী দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন দেশীয় রাজ্য ছিল খুবই বৃহৎ আবার কোন কোন রাজ্য ছিল খুব ক্ষুদ্র। ইহারা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না—অর্থাৎ এইগুলি ব্রিটিশ এলাকা ছিল না। ইহাদের প্রজাগণ ব্রিটিশ রাজের প্রজা ছিল না, ব্রিটিশ ভারতের আইন ইহাদের উপর প্রযোজ্য ছিল না ও ব্রিটিশ ভারতের আদালতের বিচারক্ষমতা ইহাদের উপর প্রসারিত ছিল না। কিন্তু ইহাদের সকলেই ব্রিটশ সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ বা ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে সনদপ্রাপ্ত ছিল। এই সকল চুক্তি বা সনদের দ্বারাই তাহাদের মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত ছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় এই রাজ্যগুলি প্রভূত পরিমাণে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করিত। অনেকের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা, ডাক ব্যবস্থা, রেলপথ, এমন কি সৈন্যদলও ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের পৃথক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও সেই আইন অনুযায়ী চলিবার ক্ষমতা ছিল।

কিন্তু তবুও এই রাজ্যগুলি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। ব্রিটিশ রাজের সহিত সম্পাদিত চুক্তির দ্বারা বা তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত সনদের দ্বারা এই সকল রাজ্যের ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব্বিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার এই সকল রাজ্যের উপর চরম ক্ষমতার (Paramount Power) অধিকারী ছিলেন। ব্রিটিশ রাজ ছিলেন সমগ্র ভারতের সম্রাট এবং দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দকে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিতে হইত। ইহাদের বৈদেশিক নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে

ব্রিটিশরাজের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহারা কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অথবা চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম ছিল না। ব্রিটিশ রাজের স্বার্থের দিকে নজর রাখিবার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে একজন করিয়া রেসিডেন্ট বা এজেন্ট থাকিতেন।

আভ্যন্তরীন বিষয়েও ব্রিটিশ রাজের যে কোনই ক্ষমতা ছিল না এরূপ নহে। দেশীয় রাজাদিগের উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণ সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল—এ সম্পর্কে রাজ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহার সিদ্ধান্ত আরোপ করিতে পারিতেন। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য, বা দেশীয় রাজ্যের প্রজা সাধারণের কল্যাণের জন্য অথবা শাসন-কার্য্যে অযোগ্যতা প্রতিরোধের জন্য, ব্রিটিশরাজ দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীন শাসনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন, এমন কি প্রয়োজন হইলে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। এই সকলের পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজের দায়িত্ব ছিল যে তাঁহারা দেশীয় রাজ্যগুলিকে বাহিরের আক্রমণ বা আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ হইতে রক্ষা করিবেন।

(অনু-২) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় রাজ্য—*Native States after Transfer of Power*

ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপর শাসন কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন ভারত স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) বিধিবদ্ধ করিয়া। এই আইনের ৭নং ধারায় বলা হইয়াছিল যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভারতের রাজ্যগুলির সহিত ব্রিটিশ সরকারের সকল বাধ্যবাধকতা এবং উহাদের উপর ব্রিটিশ সরকারের চরম কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইবে।

অতএব ঐদিন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইবার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত সরকার দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় এবং ঐ সম্পর্কের বিবর্ত্তন সাধনের উদ্দেশ্যে একটী দেশীয় রাজ্য দপ্তর স্থাপনা করেন। এই দপ্তরের প্রচেষ্টায়, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বহু দেশীয় রাজ্য ভারত সরকারের সহিত চুক্তিসম্পাদন করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। কালক্রমে যে নয়টী দেশীয় রাজ্য পাকিস্থানে যোগদান করিল সেগুলি বাদে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হইয়া গেল।

ভারত সরকার এই দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বিলি ব্যবস্থা করিলেন, উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীর রাজ্যগুলির মধ্যে যতটা সম্ভব পার্থক্য বিদূরিত করা

এবং তাহার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ভারত সৃষ্টি করা। এই বিলি ব্যবস্থা হইল মোটামুটি চারিপ্রকারের :—

(১) যে সকল দেশীয় রাজ্য বৃহৎ এবং নিজ সঙ্গতি দ্বারা টি'কিয়া থাকিতে এবং দক্ষ শাসন পরিচালনা করিতে সক্ষম তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা হইল কিন্তু দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আয়োজন হইল ; যথা মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর।

(২) কতিপয় রাজ্যকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাজ্য সমবায় গঠন করা হইল এবং উহাকে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করা হইল (যথা হিমাচল প্রদেশ) অথবা পৃথক পৃথক ভাবেই কেন্দ্রীয় শাসন এলাকায় পরিণত করা হইল (যথা ত্রিপুরা, মণিপুর, ভূপাল, বিলাসপুর ইত্যাদি ।)

(৩) একাধিক দেশীয় রাজ্য একত্রিত করিয়া একটি রাজ্য সমবায় গঠন করা হইয়াছে এবং ঐগুলিতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় শাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অংশীভূত ইউনিট—যেরূপ গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলি, যথা, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ইত্যাদি।

(৪) বহু দেশীয় রাজ্য সন্নিহিত প্রদেশগুলির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

Questions & Hints

1. What are the rights and obligations of the British Crown in relation to Indian States? (1945) [অনু-১]

2. Describe the effects of the Transfer of Power on the Indian States [অনু-২]

দশম অধ্যায়

প্রাদেশিক শাসনযন্ত্র

Machinery of Provincial Administration

(অনুচ্ছেদ-১) গভর্ণর, মন্ত্রীমণ্ডলী ও দপ্তরখানা—*The Governor, Ministry and Secretariate*

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার শীর্ষদেশে আছেন গভর্ণর ; গভর্ণর সাধারণতঃ একটী মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্য ও মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এক একজন মন্ত্রী একটী বা একটীর অধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। এই সকল দপ্তরগুলির প্রত্যেকটীতেই সেক্রেটারী, সহ সেক্রেটারী ইত্যাদি থাকেন। ইঁহারা ঐ সকল দপ্তরের স্থায়ী কর্ম্মচারী। মন্ত্রীদিগের প্রায়ই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সেক্রেটারী, সহ সেক্রেটারী ইত্যাদি কর্ম্মচারী-গণের চাকুরী স্থায়ী ; ইঁহারা মন্ত্রীগণের অধস্তন কর্ম্মচারী এবং মন্ত্রীগণের আদেশ কার্য্যকরী করা ইঁহাদিগের কার্য্য। ইঁহাদিগকে এবং ইঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সরকারের দপ্তরখানা গঠিত। সেক্রেটারী মন্ত্রীর নিকট দপ্তর-সম্পর্কিত সকল কার্য্যের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং তাঁহার অনুমোদন গ্রহণ করেন। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে আমাদের দেশে সেক্রেটারীগণ একটী বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেন, তাঁহারা গভর্ণরের সহিত সরাসরি সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন এবং তাঁহার নিকট দপ্তর-সম্পর্কিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিতে পারিতেন। ইংলণ্ডে দপ্তরের সেক্রেটারীগণ মন্ত্রীদিগকে অতিক্রম করিয়া সরাসরি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। ইহাতে লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থা ক্ষুন্ন হয়, কারণ মন্ত্রীগণ জনসাধারণের দ্বারা প্রেরিত এবং অনুমোদিত শাসক। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজাকে প্রভাবান্বিত করিবার অধিকার মন্ত্রীগণের অধীন কর্ম্মচারীগণের—অর্থাৎ সেক্রেটারীগণের, থাকা উচিত নহে।

(অণু-২) বিভাগীয় কমিশনার—*Divisional Commissioner*

সমগ্র প্রদেশটী গোটাকয়েক বিভাগে ভাগ করা আছে ; এক একটী বিভাগের জন্য বিভাগীয় কমিশনার আছেন। ইনি সাধারণতঃ ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিস স্তরের কর্ম্মচারী। বিভাগের সকল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব ইঁহার উপর ন্যস্ত। সাধারণ বিচার সম্পর্কীয় কোনো ক্ষমতা ইঁহার নাই তবে রাজস্ব সম্পর্কীয় মামলায় ইনি আপীল আদালতরূপে কার্য্য করেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যের এবং রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্যের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ইঁহার উপর অর্পিত। বিভাগের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জেলার কালেক্টারদিগের কার্য্য তত্ত্বাবধানও ইনি করিয়া থাকেন এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ইনিই হইলেন যোগাযোগের মাধ্যম। কোনো কোনো প্রদেশে বিভাগীয় কমিশনার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার ক্ষমতারও অধিকারী।

(অণু-৩) জিলা অফিসার—*The District Officer*

এক একটী বিভাগের মধ্যে অনেকগুলি জিলা অবস্থিত। জিলার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা থাকেন জিলা অফিসার ; সাধারণতঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ স্তরের কর্ম্মচারীকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। তবে কখনো কখনো প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস স্তরের কর্ম্মচারী-গণকেও এই পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ইনি একাধারে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর। সেইজন্য ইঁহাকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জিলা কালেক্টরও বলা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ইনি সমগ্র জিলাটীর প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী। জিলার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা তাঁহার কাজ; সেই উদ্দেশ্যে জিলার পুলিশ-কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ও পরিচালনের ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত। জিলার পুলিশ সুপরিনটেন্ডেন্ট্ ইঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য্য করিয়া থাকেন। জিলার মধ্যেকার নিম্ন ফৌজদারী আদালত সমূহের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা ইঁহার আছে এবং নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত ফৌজদারী মামলার আপীলও তিনি বিচার করিয়া থাকেন। আবার কাহাকে কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করিতে হইবে এবং আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত করিতে হইতে সে সম্বন্ধেও তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই দিক হইতে দেখিলে, ইনি একাই অভিযোগকারী এবং বিচারক। একই লোকের হস্তে এই দুইপ্রকার দায়িত্ব সংস্থাপন জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

কালেক্টর হিসাবে ইঁহার উপর রাজস্ব সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার ভার ন্যস্ত। জিলার মধ্যে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইনি দায়ী এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র

রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও ইনি দায়ী। সরকারী খাস্ মহল জমির ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যের নিয়ন্ত্রণও ইঁহার দায়িত্ব।

এই সকল বিশেষ কার্য্য ছাড়া জিলার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিভাগের উপর মোটামুটি তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা জিলা অফিসারের উপর ন্যস্ত। জিলার এক্‌জিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার, সিভিল সার্জ্জেন, ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্—ইঁহাদিগের কার্য্য জিলা অফিসার তত্ত্বাবধান করেন। জিলার মধ্যেকার জেল ব্যবস্থার ইনি তত্ত্বাবধান করেন এবং জেলসমূহ পরিদর্শন করেন। জেলার ট্রেজারীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণও ইঁহার দায়িত্ব। জিলা বোর্ড ও ইউনিয়ন-বোর্ডরূপ স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের উপরেও জিলা অফিসারের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আছে।

জিলা অফিসারের কার্য্যের এই তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় জিলা অফিসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। জিলার অধিবাসীগণের সহিত প্রাদেশিক সরকারের যোগাযোগ তাঁহার মারফৎই স্থাপিত হয়। শান্তি রক্ষার কার্য্যে, রাজস্ব সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনে, আইন ভঙ্গ কারী-দিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনে, ফৌজদারী মামলার বিচার কার্য্যে, জেল ব্যবস্থার তদারকে, এবং জেলার অন্যান্য সকল ব্যবস্থায় মোটামুটি তত্ত্বাবধানের কার্য্যে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জিলার মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজকর্ম্মচারী। ইঁহার কর্ম্মকুশলতার উপরে শাসনকার্য্যের যোগ্যতা ও সুনাম নির্ভর করে। জিলার অধিবাসীদিগের পৌর এবং রাজনৈতিক জীবনের সকল স্তরের উপরেই ইঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং এই সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাকে বিবরণী পেশ করিতে হয়। ইঁহাদের দ্বারা প্রদত্ত বিবরণী হইতেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যথা গভর্ণর এবং মন্ত্রীগণ প্রদেশের অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেন। এই সকল কারণে ইঁহাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের সহিত মিশিতে হয় এবং অনেক সময়ে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয়। জিলার শাসনকার্য্যে জিলা অফিসারের স্থান এমনি গুরত্বপূর্ণ যে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই শাসন ব্যবস্থা প্রঘূর্ণিত, বলা যায়।

(অনু-৪) **মহকুমা**—*Subdivisions*

এক একটী জিলাকে আবার গোটাকয়েক মহকুমায় বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, বর্দ্ধমান জিলায়—বর্দ্ধমান, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া এই চারিটী মহকুমা আছে, অথবা ঢাকা জিলায়—ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এই চারটী মহকুমা আছে। পশ্চিম বঙ্গে কলিকাতা বাদে ৩৮টী মহকুমা আছে ও পূর্ব্ববঙ্গে আছে ৪৬টী (শ্রীহট্ট বাদে

এই সকল মহকুমার একজন করিয়া মহকুমা অফিসার (সাব ডিভিসনাল অফিসার) থাকেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্ম্মচারীগণ বা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রবীন কর্ম্মচারীগণ এইপদ অধিকার করিতেন। ইঁহারা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট-গণের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদিগের অনুরূপ কার্য্য মহকুমার মধ্যে সম্পাদন করিয়া থাকেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ন্যায় ইঁহাদিগের কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা, বিচারক্ষমতা ও রাজস্ব সম্পর্কিত ক্ষমতা বিদ্যমান।

Questions & Hints

1. Give an account of how District Administration is carried on in **Bengal** or Assam (1948) [অনু-৩

একাদশ অধ্যায়

পুলিশ ও জেল

Police and Prisons

(অণুচ্ছেদ-১) পুলিশ—*Police*

দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার দায়িত্ব পুলিশ বিভাগের উপরে। কে কোন্ আইনভঙ্গ করিল তাহা অন্বেষণ করা, আইনভঙ্গকারীকে বাধা দেওয়া এবং দোষীকে বিচারের জন্য হাজির করা পুলিশের কার্য্য। জনগণের ধনপ্রাণ ও সম্মান রক্ষা করাই পুলিশের মূল দায়িত্ব। পুলিশ বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর উপরে ন্যস্ত। ইনি প্রাদেশিক মন্ত্রী, সাধারণত: ইহাকে প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলা হয় এবং ইনি প্রদেশের পুলিশ কার্য্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তবে পূর্ব্বেকার শাসনবিধি অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল না। কারণ পুলিশ বাহিনীর আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্পর্কিত কোনো নিয়ম কানুন বা আদেশ জারী করিবার সময়ে গভর্ণরকে তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। উপরন্তু গভর্ণর ইচ্ছা করিলেই, মন্ত্রীগণ রাজনৈতিক অপরাধগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের সূত্র যাহাতে না জানিতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর গভর্ণরের এই সকল বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয় এবং এক্ষণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পুলিশ বিভাগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।

মন্ত্রীর নিচেই আছেন প্রদেশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। ইনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া পুলিশ বিভাগের আভ্যন্তরিক ব্যপার সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস স্তরের কর্ম্মচারীগণের মধ্য হইতেই ইনি নিযুক্ত হন এবং ইনিই পুলিশ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। তবে ভারতের তিনটী প্রেসিডেন্সি টাউনের (অর্থাৎ কলিকাতার, মাদ্রাজের এবং বোম্বাইএর, পুলিস বাহিনী ইহার কর্ত্তৃত্বাধীনে নহে। এই নগর গুলির মধ্যে পুলিশ কমিশনার নামক

উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে পুলিশ বাহিনী ব্যবস্থিত। প্রদেশের পুলিশবাহিনীর উপর ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের যে স্থান, এই নগর তিনটীর পুলিশ বাহিনীর উপরে পুলিস কমিশনারেরও সেই স্থান।

এই নগরগুলি বাদে সমগ্র প্রদেশ পুলিশ ব্যবস্থার দিক হইতে গোটাকয়েক রেঞ্জে (range) বিভক্ত। এক একটী রেঞ্জের জন্য একজন করিয়া ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জেনারেল আছেন। গোটাকয়েক জিলাকে একত্রিত করিয়া একটী রেঞ্জ গঠিত এবং এই প্রত্যেক জিলার মধ্যে একজন করিয়া সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট্ অব পুলিশ আছেন। ইনি সমগ্র প্রদেশের ইনস্‌পেক্টর্ জেনারেল এবং তাঁহার রেঞ্জের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের নির্দ্দেশমত কার্য্য করেন। ইহা ছাড়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌কে জিলার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুযায়ীও কার্য্য করিতে হয়। অবশ্য পুলিশ বাহিনীর আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনো হাত নাই। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌কে সাহায্য করিবার জন্য জনকয়েক এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ ও ডেপুটী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ থাকেন। সাধারণতঃ এক একটী মহকুমার দায়িত্ব একএকজন ডেপুটী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের উপর ন্যস্ত থাকে —ইঁহাদিগকে তখন মহকুমা পুলিস অফিসার বলা হয়। এক একটী মহকুমা বিভিন্ন সার্কেলে বিভক্ত এবং এক একটী সার্কেলের জন্য একজন করিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর থাকেন; ইঁহাদিগকে বলা হয়, সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর। প্রত্যেক সার্কেলের মধ্যে গোটাকয়েক থানা (গোটাকতক গ্রামের উপর একটী থানার এলাকা) থাকে এবং প্রত্যেক থানা একজন সাব ইন্‌স্‌পেক্‌টারের জিম্মায় থাকে। প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন চৌকিদার থাকে, —ইহার মাহিনা দেয় ইউনিয়নবোর্ড। এই নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ছাড়া গুরুতর অপরাধ অন্বেষণের জন্য গুপ্তচর বিভাগ আছে। ইহার মধ্যে আবার সন্ত্রাসবাদীগণের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিবার জন্য স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চও আছে। তাহা ছাড়া জলপুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ আছে।

(অণু-২) জেলসমূহ—*Prisons*

জেল বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী থাকেন। জেলব্যবস্থার নীতি নির্দ্ধারণ এবং জেল সমূহের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা তাঁহার উপরেই ন্যস্ত। জেলসমূহের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব প্রিসিন্‌স থাকেন। ইনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পর্য্যায়ের প্রবীন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হন। প্রদেশের মধ্যে যতগুলি বিভাগ (যথা প্রেসিডেন্সি বিভাগ বা বর্দ্ধমান বিভাগ) থাকে,

প্রত্যেক বিভাগের জন্য একটী করিয়া সেনট্রাল জেল আছে। ইহা ছাড়া প্রেসিডেন্সি সহরগুলিতে প্রেসিডেন্সি জেল আছে। এই সকল সেনট্রাল জেল বা প্রেসিডেন্সি জেলের জন্য একজন করিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্ থাকেন। সাধারণতঃ ইহারা ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস পর্য্যায়ের কর্ম্মচারী। প্রত্যেক্ জিলার জন্য একজন করিয়া সিভিল সার্জ্জেনের তত্ত্বাবধানে একটী করিয়া জিলাজেল আছে। প্রত্যেক জেলের জন্য জেলার এবং ডেপুটী জেলার থাকেন। সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা জেল পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থাও আছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণেরও জেল ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা আছে। মহকুমাগুলিতেও একটী করিয়া মহকুমা জেল থাকে, এইগুলির জন্য এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সিভিল সার্জ্জেন থাকেন।

শিশু অপরাধীগণের জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বন্দোবস্ত আছে। এইস্থানে অল্পবয়সী অপরাধীগণের চরিত্র সংশোধনের বন্দোবস্ত থাকে। চরিত্র সংশোধণের দ্বারা যাহাতে অল্পবয়স্ক অপরাধীগণ অপরাধ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে তাহার জন্য চেষ্টা হয়। উপরন্তু তাহারা যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং কিছু কিছু শিল্প কার্য্যও শিখানো হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

Local Self Government

(**অণুচ্ছেদ-১**) কোন একটী নির্দ্দিষ্ট এলাকার অধিবাসীদিগের দ্বারা পৌর-জীবনের স্থানীয় বিষয়গুলির—যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি—সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বন্দোবস্তের নামই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। আমাদের দেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি তিনটী পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়। (১) গ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান (২) নগর বা সহরের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান (৩) অন্যান্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান !

(**অণু ২**) **গ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান**—*Village Self Governing Institutions*

গ্রামের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় (ক) জিলাবোর্ড (খ) লোক্যাল অথবা তালুক বোর্ড (গ) ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ। একটী জিলার জন্য জিলাবোর্ড গঠিত হয় এবং সমগ্র জিলা ব্যাপিয়া ইহার কার্য্য এলাকা। জিলাবোর্ডগুলির নীচে থাকে লোক্যাল বোর্ড, একটী মহকুমা ব্যাপিয়া ইহার কার্য্য এলাকা। গোটা-কয়েক গ্রাম একত্রিত করিয়া একটী ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠিত হয়। কোনো কোনো প্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে; ইহা একটী বা গোটাকয়েক গ্রামের স্থানীয় ব্যাপার তদারক করে। আসামে জিলাবোর্ড নাই। ঐ প্রদেশে লোক্যাল বোর্ড সমূহ জিলা বোর্ডের কার্য্য করিয়া থাকে।

(ক) **জিলা বোর্ড**—(*District Board*) প্রত্যেক জিলার জন্য একটী করিয়া জিলা বোর্ড গঠিত হয়। ইহার ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা নয়জন। তবে কোন্ জিলা বোর্ডে কয়জন সদস্য থাকিবেন তাহা প্রাদেশিক সরকার নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। সাধারণতঃ জিলাবোর্ডগুলির সদস্যসংখ্যা থাকে ১৮ হইতে ৩৩ জনের মধ্যে। মোট

সদস্যের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ থাকেন সরকারের দ্বারা মনোনীত—অবশিষ্ট সদস্যগণ হন নির্ব্বাচিত। মনোনয়ন করেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন লোক্যাল বোর্ডের সদস্যগণ। অনেক স্থানে লোক্যাল বোর্ড নাই। এই সকল জিলায় ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত গ্রাম সমূহের মধ্যে যে সকল অধিবাসী ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী সেই সকল ব্যক্তির ভোটের দ্বারাই জিলা বোর্ডের সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হন। একবার জিলাবোর্ড গঠন হইলে পাঁচ বৎসর উহার কার্য্যকাল থাকে। সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবার পর তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করেন। ইঁহাদিগের পদ অবৈতনিক। চেয়ারম্যান (অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান) বেতনভোগী কর্ম্মচারীমণ্ডলীর সাহায্যে জিলা বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করেন। এই সকল বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের মধ্যে থাকেন সেক্রেটারী, জিলা এঞ্জিনিয়ার, জিলা হেলথ্ অফিসার ইত্যাদি।

জিলাবোর্ডের দায়িত্ব ও কার্য্য অনেক। প্রথমতঃ জিলার মধ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষা জিলা বোর্ডের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিবাসীদিগকে সচেতন করিবার জন্য এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য প্রচারের জন্য ইহা প্রচার কার্য্য করিয়া থাকে। মহামারী প্রতিরোধের জন্য কলেরা ও বসন্তের টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে হাঁসপাতাল ও দাওয়াইখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণও ইহার কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ জিলা-বোর্ডগুলি বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য দায়ী। এই উদ্দেশ্যে বোর্ড সমূহ জিলার মধ্যে কূপ খনন ও পুষ্করিণী স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কল্পে, জল নিকাশের ব্যবস্থার দিকেও নজর দেয়। তৃতীয়তঃ স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্বও জিলা বোর্ডের উপর অর্পিত। ঐ উদ্দেশ্যে জিলাবোর্ডগুলিকে রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ এবং ঐগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জিলাবোর্ডগুলির উপরে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্বও ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে জিলাবোর্ডগুলি জিলার মধ্যেকার প্রাথমিক ও মধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য করে। কোনো কোনো বিদ্যালয় জিলা বোর্ডের দ্বারা স্থাপিতও হয়। ইহাছাড়াও জিলাবোর্ডগুলির অন্যান্য বিবিধ কার্য্য আছে যথা খোঁয়াড় রক্ষা, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান, জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রীকরণ, চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি।

এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য এবং তাহাদের অফিস্ চালাইবার জন্য জিলা বোর্ড সমূহকে ব্যয় করিতে হয়। অফিস্ বজায় রাখিবার খরচা অবশ্য অধিক নহে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার জন্যই বোর্ডকে অধিক ব্যয় করিতে হয়, মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ ব্যয় এই খাতে হইয়া থাকে। জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য

কমই খরচ করা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং রাস্তা, পুল প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যথাক্রমে শতকরা ১৫ হইতে ১৭ ভাগ ব্যয় করা হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ খোঁয়াড়, পশুচিকিৎসালয়, জল নিকাশ ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় হইয়া থাকে।

এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতে হয়। রাস্তা নির্ম্মাণ ও অন্যান্য জনকল্যাণকর কার্য্যের জন্য ইহা জিলার অধিবাসীগণের নিকট হইতে সেস্ আদায় করিয়া থাকে। ভূমির মালিকদের উপরে ইহা ধার্য্য করা হয় এবং ভূমি রাজস্বের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ইহা আদায় করা হয়। খেয়াঘাট ও কোনা কোনা রাস্তা হইতে আদায়যোগ্য টোল হইতেও জিলা বোর্ডগুলির আয় হইয়া থাকে। অন্যান্য বিভাগের কার্য্য হইতেও সাধারণভাবে কিছু আয় হইতে পারে—যথা জরিমানা, খোঁয়াড়, স্কুলের ছাত্রদের বেতন, হাঁসপাতাল ও দাওয়াইখানা হইতে প্রাপ্তি। উপরন্তু অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য সরকার ইহাদিগকে অর্থ মঞ্জুর করিয়া থাকেন। সরকারের অনুমতি লইয়া জিলাবোর্ডগুলি ঋণগ্রহণও করিতে পারে।

(খ) **লোক্যাল বোর্ড**—(*Local Board*) একটী মহকুমার মধ্যেই লোক্যাল বোর্ডের কার্য্য পরিধি। তবে লোক্যালবোর্ডের কোনো নিজস্ব কার্য্যের পৃথক পর্য্যায় নাই এবং ইহার নিজস্ব আয়ের কোনো পথও নাই। জিলা বোর্ড যে কাজগুলি লোকাল বোর্ডকে দেয় লোকাল বোর্ড কেবলমাত্র সেই কাজগুলিই করে এবং এই সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য জিলা বোর্ড ইহাদিগকে অর্থমঞ্জুর করিয়া থাকে। লোক্যাল বোর্ডে ন্যূনপক্ষে নয়জন সদস্য থাকেন তবে প্রকৃত সদস্যসংখ্যা সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সরকারের দ্বারা মনোনীত হন এবং বাকী দুইতৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত হন। অনেকের মতে লোক্যালবোর্ডগুলির কোনা পৃথক অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন। সেইজন্য বাঙ্গালা সরকার জিলাবোর্ডগুলিকে লোক্যাল বোর্ডসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

(গ) **ইউনিয়ন বোর্ড**—(*Union Board*) একত্রিত ভাবে গোটাকয়েক গ্রামের ব্যাপার পরিচালনার জন্য এক একটী ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত। এক একটী সার্কেলের মধ্যে কয়েকটী ইউনিয়নবোর্ড থাকে এবং সার্কেল অফিসার নামক একজন সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত ইউনিয়ন বোর্ডগুলির উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করেন এবং উহাদের হিসাব পরীক্ষা করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর এইরূপ সরকারী তদারকীতে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেন কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার খাতিরেই ইহা অনেক সময়ে প্রয়োজনও হইয়া পড়ে। তবে সরকারী তদারকী যত শীঘ্রই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান

গুলির উদ্দেশ্য ততই দ্রুত সিদ্ধ হইবে। বাঙ্গালাদেশের ইউনিয়নবোর্ডগুলি ১৯১৯ সালের বাঙ্গালার স্বায়ত্বশাসন আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত। একটী ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যসংখ্যা ছয় হইতে নয়জনের মধ্যে। ইঁহাদিগের মধ্যে একতৃতীয়াংশ সরকারের দ্বারা মনোনীত। অবশিষ্ট দুইতৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত। সদস্যগণের কার্য্যকাল চারবৎসর। ইঁহারা নিজদিগের মধ্যে হইতে একজন প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত করেন। ইনি বোর্ডের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং বোর্ডের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্য করেন। অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইএকজন কেরাণী থাকেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যের মধ্যে চৌকিদার ও দফাদারদিগের সাহায্যে গ্রামে শান্তি বজায় রাখা, একটী বিশেষ কাজ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সম্পর্কিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার ক্ষমতাও ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইহাদের অন্যান্য কার্য্য জিলাবোর্ড সমূহের কার্য্যের অনুরূপ। গ্রামের রাস্তা বা সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কার্য্য ইহাদিগকে করিতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বা এইরূপ বিদ্যালয়ে সাহায্য প্রদান করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে সাহায্যে করা ইহার কর্ত্তব্য। দাওয়াইখানা স্থাপনার দ্বারা রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার দিকে নজর রাখাও ইহাদের দায়িত্ব। নলকূপ ও পুষ্করিণী খননের দ্বারা জলসরবরাহের ব্যবস্থা করাও ইউনিয়নবোর্ডের কার্য্য। জলসেচ ব্যবস্থা, খোঁয়াড় ও খেয়াঘাট রক্ষা, মেলা হইলে তাহার তত্ত্বাবধান, পশুরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা— ইত্যাদি কাজের দায়িত্বও ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

এই সকল কার্য্য করিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের পক্ষে অর্থব্যয় প্রয়োজন। মোট ব্যয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় হয় চৌকিদারদিগের মাহিনা দিবার জন্য। মোট ব্যয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ খরচ হয় রাস্তা, সেতু, জল সরবরাহ, বিদ্যালয়, দাওয়াইখানা, জলনিকাশ, জনস্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির জন্য। অবশিষ্টাংশ খরচ হয় ইউনিয়ন আদালত, খেয়া ইত্যাদি বাবদ। এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে অর্থ অদায়ের যে ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স্। খোঁয়াড় ও খেয়াঘাট হইতেও ইহার অর্থাগম হয়। ইউনিয়ন আদালতের কার্য্য হইতেও ইহার আয় হয়। মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স দিয়াও ইহা আয় করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, ইউনিয়নবোর্ডসমূহ সরকার ও জিলা বোর্ডের নিকট হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ সাহায্যও পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের সভাকে পঞ্চায়েত বলা হইত; এবং এই সকল পঞ্চায়েত গুলিই গ্রামে শাসনের ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিত; কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত এই সকল পঞ্চায়েতগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ

ও পাঞ্জাবে আইন প্রণয়নের দ্বারা পঞ্চায়েতগুলিকে পুনরুদ্ধারের প্রয়াস হইয়াছে বোম্বাই প্রদেশে পঞ্চায়েতগুলি কার্য্য করিতেছে। ইহাদের সদস্যসংখ্যা সাত হইতে এগারোজন এবং ইহার মধ্যে মুসলমান, হরিজন ও স্ত্রীলোকদিগের আসন সংরক্ষিত আছে। ইঁহারা সকলেই নির্ব্বাচিত হন এবং সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই হইলেন নির্ব্বাচক। একবার গঠিত হইবার পর পঞ্চায়েতের কার্য্যকাল থাকে তিনবৎসর পর্য্যন্ত। সদস্যগণের দ্বারা একজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং ইনিই হইলেন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

(অনু-৩) **নগরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান**—*Urban Self Governing Institutions*

সহর বা নগরের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আছে তিনপ্রকার (ক) কর্পোরেশন (খ) মিউনিসিপ্যালিটি (গ) ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড।

(ক) **কর্পোরেশন** (Corporation)—কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভারতের এই তিনটী প্রেসিডেন্সি সহরে পৌরজীবনের বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কর্পোরেশন নামক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত। এইগুলি এক একটী সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কর্পোরেশনগুলির সদস্য সংখ্যা একরূপ নহে। বোম্বাইতে কর্পোরেশনের সদস্যসংখ্যা ১১৭, মাদ্রাজের ৬১ এবং কলিকাতার ৯৮। কর্পোরেশনের সদস্য-নির্ব্বাচনেও সকল সহরের অধিবাসীদিগের ভোটদান ক্ষমতার ভিত্তি একরূপ নহে। সকল কর্পোরেশনের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণও একই প্রকার নহে। অবশ্য সব কর্পোরেশনে কিছু সংখ্যক সদস্য আছেন যাঁহারা সরকারের দ্বারা মনোনীত হন তবে ইঁহারা মোট সদস্য সংখ্যার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বোম্বাই ও মাদ্রাজের কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ্ অফিসার প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত হন কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসারগণ প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত নহেন; তবে ইঁহাদিগের নিয়োগ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। পৌরজীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কর্পোরেশনগুলির স্বায়ত্তশাসনের পরিধি বিশেষ বিস্তৃত।

কলিকাতা কর্পোরেশন (Calcutta Corporation)—কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা ৯৮; ইহার মধ্যে ৮৫ জন রেট্ প্রদাতাগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন এবং ৮ জন প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত। এই ৯৩ জন সদস্যকে কাউন্সিলার বলা হয়। প্রত্যেকবার নির্ব্বাচনের পর নব গঠিত কর্পোরেশনের প্রথম অধিবেশনে এই ৯৩ জন কাউন্সিলার ৫জন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন করেন।

রেট্দাতাগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ৮৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জন সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হন; অবশ্য ইহার মধ্যে চারিটী আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষিত। ২২জন সদস্য মুসলমানদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। উপরন্তু ঈঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়ের দুইজন এবং শ্রমিকদিগের দুইজন প্রতিনিধি থাকেন। অবশিষ্ট ১২জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—যথা ৪জন নিযুক্ত হন কলিকাতা ব্যবসায়ী সঙ্ঘের (Calcutta Traders Association) দ্বারা—২জন পোর্টকমিশনারগণের দ্বারা ও ৬জন বাঙ্গালা বাণিজ্য সংসদের (Bengal Chamber of Commerce) দ্বারা। যে আটজন সদস্য প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত হন তাঁহাদিগের মধ্যে তিনজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত সদস্য থাকিবেন। এই সকল সদস্যগণের কার্য্যকাল তিন বৎসর। সদস্যগণ তাঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিবৎসর একজন মেয়র ও একজন ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন করেন। এই পদ দুইটী অবৈতনিক ও বিশেষ সম্মান ও মর্য্যাদাযুক্ত। কর্পোরেশন সভার অধিবেশনে মেয়র (তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটী মেয়র) সভাপতিত্ব করেন ও সভার কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করেন। কর্পোরেশন সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী করিবার জন্য তিনি আদেশ দিয়া থাকেন।

কর্পোরেশনের কার্য্য বিশেষ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্রভাবে কর্পোরেশন সভার দ্বারা সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বন্দোবস্ত করা সম্ভব নহে। সেই কারণে, কর্পোরেশনের বিস্তারিত কার্য্যের জন্য ১০টী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে; এক একটী কমিটিতে ১২জন করিয়া থাকেন। এই কমিটিগুলির কার্য্যকাল একবৎসর করিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরে এই কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হয়। এক একটী কমিটির উপরে এক এক প্রকার কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত। কর্পোরেশনের দ্বারা সম্পাদন যোগ্য সকল বিষয় কোনো না কোন কমিটির নিকট উপস্থাপিত করা হয়। কমিটির দ্বারা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবার পর বিষয়টী কর্পোরেশনের অনুমোদনের জন্য সভায় উত্থাপিত হয়। কর্পোরেশন সভা সাধারণভাবে কার্য্যের নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

দৈনন্দিন কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্ম্মচারীমণ্ডলী আছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে প্রধান হইলেন চীফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার, ইনি কর্পোরেশন কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া যান। ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন ডেপুটী এক্সিকিউটিভ্ অফিসার আছেন। ইহা ভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে আছেন হেলথ্ অফিসার, চীফ এঞ্জিনিয়ার,

সেক্রেটারী প্রভৃতি। কাউন্সিলারগণের ভোটের দ্বারাই এই সকল নিয়োগ হইয়া থাকে—এবং এই সকল নিয়োগ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

কর্পোরেশনের কার্য্যতালিকা বিশেষ ব্যাপক। সহরের মধ্যে রাস্তা পার্ক ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইহার কার্য্য। ইহা রাস্তা আলোকিত করে ও আবর্জ্জনা অপসারণের দ্বারা সহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে। পরিশ্রুত পানীয় জল এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার্য্য অপরিশ্রুত জলও ইহা সরবরাহ করিয়া থাকে। জল নিকাশের ব্যবস্থার জন্য কর্পোরেশন দায়ী। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করাও ইহার অন্যতম কার্য্য; এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষা করিয়া থাকে—এইখানে ছাত্রগণ বিনা বেতনে পড়িতে পারে। শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাঠাগার স্থাপন করাও কর্পোরেশনের কার্য্য। জনস্বাস্থ্য বজায় রাখা কর্পোরেশনের বিশেষ দায়িত্ব এবং কার্য্য। ইহা দাওয়াইখানা ও হাঁসপাতাল রক্ষা করে এবং বিভিন্ন উপায়ে ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। ইহা বাজার ও কষাইখানা রক্ষা করে ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে। জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রী করা ও অদাবীকৃত মৃতদেহের ব্যবস্থা করাও ইহার কার্য্য। জনস্বাস্থ্য ও নিরপত্তার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যও ইহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অগ্নি প্রতিরোধ করিবার জন্য ইহার দ্বারা ফায়ার ব্রিগেডও রক্ষিত হয়। দেশীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবাব জন্য ইহা একটী কমার্শিয়াল মিউজিয়ামও স্থাপন করিয়াছে।

এই সকল কার্য্যের জন্য কর্পোরেশনকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী কলিকাতায় ২১ লক্ষ লোকের বাস ছিল এক্ষণে উহার জন সংখ্যা ৫০ হইতে ৬০ লক্ষের মধ্যে। এই বিপুল লোক সংখ্যা অধ্যুষিত সহরের পৌরসমস্যা সমূহ যেমন জটিল উহাদের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনও তেমনি ব্যয়-সাপেক্ষ। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীবৃন্দের মাহিনা ও অন্যান্য দপ্তর খরচা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই জনহিতকর পৌরকার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে—যথা রাস্তা ও পার্ক রক্ষা, আবর্জ্জনা পরিষ্কার, জল ও আলো সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। উপরন্তু সহরের উন্নতির জন্য গঠিত উন্নয়ন সভাকে (ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট) কর্পোরেশন বাৎসরিক প্রায় ২০লক্ষ টাকা দিয়া থাকে।

এই সকল ব্যয়ের জন্য কর্পোরেশন যে আয় করিয়া থাকে তাহা বৎসরে প্রায় কোটি টাকার সমান। নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে কর্পোরেশনের আয় হইয়া থাকে :—
(১) জমি ও বাড়ীর উপর কর; (২) ব্যবসা বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর কর; (৩) বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়; (৪) যানবাহন ও জন্তুর উপর কর;

(৫) সরকারের দ্বারা দেয় অর্থ সাহায্য। (৬) মোটরযান কর—লব্ধ অর্থের অধিকাংশ ইহা পাইয়া থাকে তবে এই কর প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা সংগৃহীত হয়।

(খ) **মিউনিসিপ্যালিটি** (Municipality) কর্পোরেশনগুলি ছাড়া, অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে প্রায় সাড়ে সাতশত মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে কয়েকজন করিয়া কমিশনার থাকেন—ইহাদের সংখ্যা, নিয়োগ পদ্ধতি ও কার্য্যকাল বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমান নহে। অবশ্য সর্ব্বত্রই নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাই অধিক। মধ্যপ্রদেশে সদস্যসংখ্যা ন্যূনকল্পে পাঁচজন। বাঙ্গালায় সদস্য সংখ্যা ন্যূনকল্পে নয়জন। মধ্যপ্রদেশে সদস্যগণের কার্য্যকাল তিনবৎসর—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কার্য্যকাল চারি বৎসর। বোম্বাই ও মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটিতে মনোনীত সদস্য নাই। বোম্বাইতে হরিজন ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে।

বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য সংখ্যা নয় হইতে ত্রিশ জনের মধ্যে—তবে কোন্ মিউনিসিপ্যালিটির প্রকৃতপক্ষে কতজন সদস্য থাকিবেন তাহা প্রাদেশিক সরকারের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে। মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ সরকারের দ্বারা মনোনীত হন অবশিষ্ট সকলে নির্ব্বাচিত। হাওড়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকা এই তিনটী সহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কিছু অধিক এবং অনুপাতে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কম। যাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটিকে কর প্রদান করিয়া থাকেন অথবা একটী নির্দ্দিষ্ট মানে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁহারাই নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতার অধিকারী। একবার গঠিত হইবার পর একটী মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যকাল চারি বৎসর পর্য্যন্ত, তবে প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করিলে এই কার্য্যকাল একবৎসরের জন্য বর্দ্ধিত করিতে পারেন। কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস্‌চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করেন—ইহাদিগের কার্য্যকাল অন্যান্য সদস্যগণের সমান। মিউনিসিপ্যালিটির অধিবেশনে চেয়ারম্যান (ইহার অনুপস্থিতিতে ভাইস্‌চেয়ারম্যান) সভাপতিত্ব করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী উহার কার্য্যকলাপ তিনি পরিচালন করেন। চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা—মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী, হেলথ্ অফিসার, স্যানিটারি ইনস্‌পেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারী মণ্ডলীর সাহায্যে ইনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তবে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকার উপরে সেই সকল মিউনিসিপ্যালিটিকে একজন চীফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার নিয়োগ করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকার নির্দ্দেশ দিতে পারেন।

প্রেসিডেন্সি সহরগুলিতে কর্পোরেশনের যে সকল দায়িত্ব ও কার্য্য অন্যান্য সহর ও নগরে মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব ও কার্য্যও সেইরূপ। মিউনিসিপ্যালিটিকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহা হাঁসপাতাল ও দাওয়াইখানা স্থাপন করে। ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার বা মহামারীর প্রতিরোধ করিবার দায়িত্বও ইহা পালন করে। পানীয় জল সরবরাহ ও রাস্তার জল নিকাশের ব্যবস্থাও ইহাকে করিতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার কার্য্য। রাস্তা তৈয়ারী ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উহা আলোকিত করা ও জলসিক্ত করাও ইহার দায়িত্ব। জন-সাধারণের নিরাপত্তার খাতিরে গৃহাদি নির্ম্মাণের প্রস্তাব ইহা অনুমোদন করিয়া থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বও ইহার উপর ন্যস্ত এবং বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইহা করিয়া থাকে। পাঠাগার স্থাপনা ও যাদুঘর রক্ষার ব্যবস্থাও অনেক মিউনিসিপ্যালিটি করিয়া থাকে। বাজার রক্ষা, শ্মশান ও কবরস্থান রক্ষা, জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রক্ষা ইত্যাদি কার্য্যও মিউনিসিপ্যালিটি করিয়া থাকে।

এই সকল কার্য্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কর্ম্মচারীগণের মাহিনা ও সরঞ্জামী খরচা বাদে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামতী, আলো ও জল সরবরাহ, জলনিকাশ, হাঁসপাতাল ও দাওয়াইখানা, বিদ্যালয়, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, শ্মশান ও কবরস্থান রক্ষা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করিতে হয়। এই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যে আয় প্রয়োজন উহা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি বিভিন্ন উপায়ে করিয়া থাকে। সহরে অধিবাসীদিগের জমি ও বাটীর বার্ষিক মূল্যের উপর ইহা কর বসাইয়া থাকে এবং মেথরকরও ধার্য্য করা হইয়া থাকে। ব্যবসায় ও পেশার উপরেও ইহা কর ধার্য্য করিতে পারে। কোনো কোনো প্রদেশে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে সামগ্রী আনয়ন এবং ঐ এলাকা হইতে সামগ্রী প্রেরণের উপরেও মিউনিসিপ্যালিটি কর বসাইতে পারে। ইহাকে 'অকট্রয় ডিউটী' বলা হয়। বাঙ্গালা প্রদেশে এই কর নাই। খেয়া ও সেতুর উপর টোল, যানবাহন ও জন্তুর উপর কর, গোশকট রেজিষ্ট্রি করার ফি, আলো ও জলসরবরাহের জন্য ফি—ইত্যাদি হইতেও মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ আয় করিতে পারে। কোনো একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া সরকার ইহাদিগকে অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন। ইহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে সরকারের অনুমতি লইয়া ইহা ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

(গ) **ক্যাণ্টনমেণ্ট্ বোর্ড** (Cantonment Board) যে সকল সহরে সৈন্যাবাস থাকে—সেই সকল সহরে মিউনিসিপ্যালিটির অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য

ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড থাকে। এই বোর্ডের একজন প্রেসিডেণ্ট থাকেন—ইনি সৈন্য-বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন একজন সরকারী কর্মচারী। ক্যাণ্টনমেণ্টের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

(**অণু ৪**) **অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান**—*Other Self governing Institutions*

অন্যান্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে (ক) উন্নয়ন সঙ্ঘ (Improvement Trust) ও (খ) বন্দর-সঙ্ঘ (Port Trust)

(ক) **উন্নয়ন সঙ্ঘ** (Improvement Trust)—জনবহুল সহরগুলিতে উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ সালে কলিকাতায় এইরূপ একটী উন্নয়ন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্ঘে দশজন সদস্য আছেন। ইহাদের মধ্যে চারজন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও চারজন কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ব্বাচিত। অপর দুইজনের মধ্যে একজন বাঙ্গালা বাণিজ্য সংসদ (Bengal Chamber of Commerce) ও আরেকজন বাঙ্গালা জাতীয় বাণিজ্য সংসদ (Bengal National Chamber of Commerce) দ্বারা মনোনীত। এই দশজন সদস্য বাদে সঙ্ঘের একজন প্রেসিডেণ্ট থাকেন। ইনি সরকারের দ্বারা নিযুক্ত। সঙ্ঘের কাজ হইল নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া, সহরের বস্তি এলাকা পরিষ্কার ও পুনর্গঠন করিয়া, পার্ক, ক্রীড়াভূমি ইত্যাদি স্থাপনা করিয়া সহরের উন্নতি বিধান করা। এই সঙ্ঘ পাটের উপর কর ও যাত্রী ও মালের উপর প্রান্তিক কর (Terminal Taxes) হইতে আয় করিয়া থাকে তবে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অধিকাংশ স্থলেই ইহা কর্পোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। কর্পোরেশন বৎসরে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ইহাকে প্রদান করিয়া থাকে। উপরন্তু সঙ্ঘের কার্য্যের দ্বারা যে সকল এলাকায় উন্নয়ন হয় সেই সকল এলাকায় স্থিত জমি ও বাড়ীর উপর ইহা অতিরিক্ত কর বসাইতেও পারে। কলিকাতার সহরতলি এলাকায় উন্নয়ন সঙ্ঘ বহু উন্নতিমূলক কার্য্যের দ্বারা বৃহত্তর কলিকাতা গঠনের সহায়তা করিয়াছে।

(খ) **বন্দর সঙ্ঘ** (Port Trust)—কয়েকটী প্রধান বন্দরে, বন্দর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটী করিয়া সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাকে বন্দর সঙ্ঘ বা পোর্টট্রাষ্ট বলা হয়। বর্ত্তমানে ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ, ভিজাগাপটম ও বোম্বাই বন্দরে এবং পাকিস্থানের করাচী ও চট্টগ্রাম বন্দরে এইরূপ সঙ্ঘ আছে। ইহাদিগকে বন্দর কমিশনও (পোর্ট কমিশন) বলা হয় এবং ইহার সদস্যগণকে কমিশনার আখ্যা

দেওয়া হয়। প্রত্যেক বন্দর সঙ্ঘে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইসচেয়ারম্যান থাকেন; ইঁহারা বেতনভোগী। ইহা ভিন্ন জনকয়েক কমিশনার থাকেন, ইঁহাদের মধ্যে মনোনীত এবং নির্ব্বাচিত উভয় পর্য্যায়ের সদস্যই আছেন। সঙ্ঘগুলি আংশিক ভাবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানও আছে। ইঁহাদের কার্য্য হইল বন্দর সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা—পোতাশ্রয়, ডক্, জেটী গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও রক্ষা করা। বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দান, পোতসমূহকে নির্দ্দেশ দান, খেয়াপার ব্যবস্থা ইত্যাদিও ইহার কার্য্য। এই সকল কার্য্যের দরুণ দাম আদায় হওয়াতে বন্দর সঙ্ঘের আয় হইয়া থাকে। কলিকাতা বন্দর সঙ্ঘের মধ্যে ১৯ জন সদস্য আছেন। উঁহাদের মধ্যে ৭জন মনোনীত এবং ১২জন নির্ব্বাচিত। নির্ব্বাচিত সদস্যগণের পর্য্যায়ে, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ব্যবসায়ী সমিতি, বাঙ্গালা বাণিজ্য সংসদ, বাঙ্গালা জাতীয় বাণিজ্য সংসদ, ভারতীয় বাণিজ্য সংসদ ও মুসলিম বাণিজ্য সংসদ,—এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ইহার আয় ও ব্যয় তিন কোটী টাকার উর্দ্ধে।

করাচী বন্দর শাসন সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ১৫জন। ইহার মধ্যে ৬জন মনোনীত ও ৯জন নির্ব্বাচিত। ইহার আয় প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ১৮লক্ষ টাকা। চট্টগ্রাম বন্দর শাসন সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা বারো; ইঁহাদের মধ্যে ৫জন মনোনীত এবং ৭জন নির্ব্বাচিত। ইহার আয় প্রায় ৭ লক্ষ এবং ব্যয় ৯ লক্ষ টাকা।

(অনু-৫) স্থানীয় শাসনের সাফল্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—*Conditions for the Success of Municipal Administration*

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই যে সাফল্য লাভ করে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময়েই স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ ত্রুটী বিচ্যুতি এবং সেহেতু নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় ও অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পৌরজনদিগের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে পারে এইরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে তবেই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিয়াছে বলা চলে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্য গোটাকয়েক বিষয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, অধিবাসীদিগের মধ্যে উচ্চস্তরের **পৌরচেতনা** থাকা প্রয়োজন। পৌরচেতনা বলিতে বুঝায় যে জনসাধারণ তাহাদিগের যৌথ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকিবে ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সকলের সমবেত স্বার্থের স্থান অধিক উচ্চে এবং সমবেত কল্যাণের জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকিতে হইবে—এই চেতনার নাম পৌরচেতনা

নগরে বা গ্রামে—সমষ্টিগতভাবে জনকল্যাণ সাধনই যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ পৌরচেতনার উন্মেষ না হইলে সেই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জনগণকে গ্রাম বা নগর শাসনের ক্ষেত্রে **সক্রিয় অংশ** গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করা জনগণ যদি সময় ও উদ্যমের অপব্যয় বলিয়া মনে করে—তাহা হইলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা জনকয়েক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া যাইবে এবং তাহারা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে ক্রমশঃ কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তৃতীয়তঃ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের **কর্ম্মচারীগণকে** শিক্ষিত, কর্ম্মঠ ও অসাধু কার্য্যে বিমুখ—এইরূপ হইতে হইবে। কারণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য্য কর্ম্মচারীগণই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং বহুলাংশে তাঁহাদের কার্য্যের উপরেই প্রতিষ্ঠানের নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য নির্ভর করে। চতুর্থতঃ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি যথাযথ নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট **অর্থ সংস্থান** থাকা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য রক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, রাস্তা নির্ম্মাণ—আলো ও জলসরবরাহ ইত্যাদি কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে অধিক পরিমাণে অর্থ পায় তাহার জন্য জনসাধারণকে অধিক কর প্রদানে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সরকারকেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঠিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য।

Questions and Hints

1. Briefly describe the organisation of rural self government in Bengal (1949) [অনু-২]

2. Describe the constitution and indicate the sources of revenue of a mofussil municipality in Bengal or Assam. (1948) [অনু-৩ (খ)]

3. Describe the constitution, functions and sources of revenue of the Union Boards in West Bengal (1950) [অনু-২ (গ)]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নির্ব্বাচক মণ্ডলী

The Electorate

(অণুচ্ছেদ-১) নির্ব্বাচক মণ্ডলী—*The Electorate*

ভারতে আইন পরিষদগুলিতে নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন একটী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ১৯০৯ সালে সর্ব্বপ্রথম পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ইহারই পরিণতি ও বিস্তৃতি। ইহার ফলে নির্ব্বাচকমণ্ডলী বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত হয় যথা,—সাধারণ, মুসলমান, ইঙ্গভারতীয়, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান ও ইউরোপীয়। সাধারণ আসনের মধ্যে আবার অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি সংরক্ষিত। ইহা ভিন্ন, বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচন এলাকাও গঠিত হয়, যথা—ভূস্বামী, বাণিজ্য সংসদ, শ্রমিক, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

(অণু-২) নির্ব্বাচনের যোগ্যতা (১৯৩৫এর ভারত শাসনবিধি অনুযায়ী)—*Qualifications for Voters (According to the Act of 1935)*

নির্ব্বাচন যোগ্যতা নির্ভর করে সম্পত্তি, করপ্রদান ও শিক্ষার উপর অর্থাৎ যাহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা কিছু পরিমাণ কর প্রদান করে, অথবা যাহাদিগের কিছু সম্পত্তি আছে—তাহারা সাধারণতঃ ভোট দিবার অধিকারী। তবে নির্ব্বাচন যোগ্যতা সম্পর্কে সকল প্রদেশের মধ্যে সমান নিয়ম কার্য্যকরী নাই।

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের (Provincial Legislative Assembly) নির্ব্বাচনের জন্য, নির্ব্বাচককে কোনো একটী নির্ব্বাচন এলাকার অধিবাসী এবং একুশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। যিনি একটী নির্দ্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ আয়কর বা মিউনিসিপ্যাল কর প্রদান করেন, করপ্রদানের ভিত্তিতে তাঁহার ভোটদানের ক্ষমতা থাকে। কোনো প্রদেশে এই নির্দ্ধারিত করের ন্যূনতম পরিমাণ ৫০৲ টাকা আবার কোনো প্রদেশে ইহা ১৫০৲ টাকা।

সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের ক্ষমতা এইরূপ—একটী ন্যূনতম পরিমাণ বাৎসরিক ভাড়া ধার্য্যকৃত কোনো গৃহের বসবাসকারী ভোটদানের ক্ষমতা পান। এই ন্যূনতম ভাড়া প্রদেশ অনুযায়ী ৬৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকার মধ্যে। যাঁহারা, একটী নির্দ্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণের খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছে, এইরূপ ভূসম্পত্তির অধিকারী, অথবা নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম হারে খাজনা ধার্য্য-কৃত একটী জমির প্রজা তাঁহাদিগেরও ভোটদানের ক্ষমতা আছে।

শিক্ষার ভিত্তিতেও ভোটদানের অধিকার আছে। বাঙ্গালা, বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ন্যূনতম গুণ। পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা, যুক্তপ্রদেশে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, মাদ্রাজে অক্ষরজ্ঞান,—শিক্ষার ভিত্তিতে এই সকল হইল ন্যূনতম গুণ।

স্ত্রীলোকদিগের এই সকল গুণ থাকিলে তাঁহারাও ভোটদান করিতে পারেন। উপরন্তু তাঁহারা গোটাকয়েক বিশেষ গুণের জন্য উক্ত অধিকার লাভ করিতে পারেন। যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামী অথবা পুত্র সৈন্যবিভাগে কাজ করিবার কালে নিহত হন এবং সেইজন্য তাঁহারা সরকারের পেন্সন্ ভোগী হন, অথবা যে সকল স্ত্রীলোক এমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রী যাঁহারা ন্যূনতম ১৷৷০ আনা মিউনিসিপ্যাল কর অথবা ১৲ টাকা রাস্তাসেস্ বা সরকারী নির্ম্মাণ (পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্) সেস্ দেন, অথবা ২৲ চৌকিদারী কর দেন—তাঁহাদিগেরও ভোটদানের ক্ষমতা আছে।

ইহা দ্বারা সৈন্যবিভাগে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ভোটদানের ক্ষমতা আছে। ১৯৪৬ সালে যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে শিক্ষার ভিত্তিতে যোগ্যতার মাপ আরো কমাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল গুণের ভিত্তিতে যাঁহারা ভোট দিবার অধিকারী তাঁহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা চৌদ্দ ভাগের মতন।

প্রাদেশিক আইন সভার উচ্চ পরিষদের (ব্যবস্থাপক সভার) সভ্য নির্চ্চাচনে নির্ব্বাচন-যোগ্যতার মাপ আরো কঠোর ও সীমাবদ্ধ। উচ্চ পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য প্রত্যেক নির্ব্বাচকের এই যোগ্যতাগুলির যে কোনও একটী থাকা প্রয়োজন। (১) তিনি অন্যূন পাঁচহাজার টাকা আয়ের উপর আয়কর দেন। (২) কোনো আইন পরিষদের বা শাসনপরিষদের বর্ত্তমান বা ভূতপূর্ব্ব সদস্য, কোনো প্রদেশের বর্ত্তমান বা ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার বর্ত্তমান বা ভূতপূর্ব্ব সদস্য, কোনো উচ্চআদালতের বর্ত্তমান বা ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অথবা কোনো মিউনিসিপ্যালিটি বা জিলা বোর্ডের বর্ত্তমান বা ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান। (৩) যদি তিনি মুসলমান হন তাহা হইলে

বাৎসরিক অন্ততঃ ২৫০ টাকা ভূমি রাজস্ব দেন। (৪) বাঙ্গালা দেশে যদি তিনি বর্দ্ধমান বা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অমুসলমান হন তাহা হইলে তিনি বাৎসরিক অন্ততঃ ২০০০৲ টাকা ভূমি রাজস্ব দেন, অথবা ঢাকা, চট্টগ্রাম বা রাজসাহী বিভাগের অমুসলমান অধিবাসী হইলে, যদি তিনি বাৎসরিক অন্ততঃ ১৫০০৲ টাকা ভূমি রাজস্ব দেন।

(অণু-৩) **সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণাচুক্তি**—*Communal Award and Poona Pact*

আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচকগণকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে - অর্থাৎ পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে ভাগ করা হইয়াছে। এই বিভাগের ভিত্তি হইল ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক রচিত "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" এবং ভারতীয় তথা হিন্দু নেতৃবৃন্দের দ্বারা সম্পাদিত পুণা-চুক্তি।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ভারতীয় নেতাগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোনো ঐক্যমতে পৌছাইতে না পারায় ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক রচিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন। এই বাঁটোয়ারা নীতি দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কতজন প্রতিনিধি আইন পরিষদে স্থান পাইবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে একটী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে শুধু সেই সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভোট দিবেন। এইভাবে আইন পরিষদগুলিতে সাধারণ (অর্থাৎ হিন্দু) অনুন্নত সম্প্রদায়, মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয়—এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য, আসনের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে হিন্দুসমাজের ভিতরে একটী স্থায়ী রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করিবার আয়োজনও ছিল কারণ ইহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত করা হয় এবং পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করা হয়। বাঙ্গালা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে ৮০টী সাধারণ আসনের মধ্য হইতে ১০টী অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করা হয় এবং তাহাদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি প্রতিরোধ করিবার জন্য পুনা জেলে আবদ্ধ মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য বর্ণ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু নেতাগণ তাঁহার নিকট সমবেত হইয়া সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারার হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কিত অংশটীকে সংশোধন করিয়া একটী চুক্তি সম্পাদান করেন। ব্রিটিশ সরকার এই চুক্তি মানিয়া লন ও উহাকে কার্য্যকরী করেন। এই চুক্তির বলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলী উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ইহার পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে কয়টী আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করা হয়। সম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপরিষদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ১০টী আসন সংরক্ষিত ছিল পুণাচুক্তির বলে এই সংখ্যা বাড়াইয়া ৩০টি করা হইল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচনে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত এই দুই স্তরের নির্ব্বাচন প্রথা ধার্য্য হইয়াছিল। প্রাথমিক নির্ব্বাচনে একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে কেবল অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ ৪জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন এবং পরে চূড়ান্ত নির্ব্বাচনে সেই কেন্দ্রের সকল হিন্দু ভোটদাতা এই ৪জনের যে কোনও একজনকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

(অনু-৪) নির্ব্বাচনের যোগ্যতা (নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী)— *Qualifications for Voters (According to New Constitution)*

স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে, নির্ব্বাচনযোগ্যতার বৈষম্য এবং জটিলতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রের ৩২৬নং ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে প্রাপ্ত বয়স্ক (Adult Suffrage) ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই পার্লামেণ্টের নিম্নপরিষদের (লোক সভা) এবং সকল মুলরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ; অর্থাৎ শিক্ষা, ধর্ম্ম, সম্পত্তি ইত্যাদি কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক (২১ বৎসর) ব্যক্তির ভোটদানের অধিকার থাকিবে।

মূলরাষ্ট্র সমূহের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার থাকিবে এই সকল ব্যক্তির : (১) মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য, (২) অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন যাঁহারা ; (৩) অন্ততঃ তিন বৎসর যাবৎ যাঁহারা শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন।

(অনু-৫) বিশেষ প্রতিনিধিত্ব—*Special Representation (According to New Constitution)*

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক নির্ব্বাচন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ধর্ম্মের ভিত্তিতে আইন পরিষদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিলোপ করা হইয়াছে। নাগরিকদিগের মধ্য হইতে কোন বিশেষ শ্রেণীর কোন বিশেষ প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না।

ইহার মধ্যে দুই একটী ব্যতিক্রম আছে। পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদে এবং মূলরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে তপশীলী জাতি (Scheduled Caste) এবং তপশীলী উপজাতীর (Scheduled Tribe) জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকিবে। উপরন্তু পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদে রাষ্ট্রপতি এবং মূলরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে গভর্ণর প্রয়োজনবোধে এ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অনধিক দুইজন করিয়া প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থাও স্থায়ী হইবে না। শাসনতন্ত্র চালু হইবার দশ বৎসর পরে ইহা বিলুপ্ত হইবে।

প্রাথমিক অর্থনীতি

মূলরা

উপজ

উপর

প্রয়ো

মনো

বৎসর

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিধি

Definition and Scope of Economics

(অনুচ্ছেদ-১) 'অর্থনীতি' কাহাকে বলে—*Meaning of 'Economics'*

প্রত্যেক মানুষ তাহার জীবনে বিভিন্ন প্রকারের অভাব অনুভব করিয়া থাকে। কোনো কোনো অভাব হইল মৌলিক—অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, আবার কোনো কোনো অভাব হয়তো আরাম-ব্যঞ্জক বা বিলাস-ব্যঞ্জক, জীবন ধারণের জন্য যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। অভাব যে প্রকারেরই হউক, প্রত্যেক মানুষ তাহার জীবনে কোনো না-কোনো অভাব বোধ করিবেই। এইরূপ অভাব বোধ করিবার অর্থই হইল যে মানুষ ঐ অভাব সকল তৃপ্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে এবং উহার জন্য তাহাকে প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয়।

জীবনের বিভন্ন অভাব তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত মানুষ যে প্রচেষ্টা করিয়া থাকে তাহার নাম 'Economic effort' বা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। মানুষের জীবনের অভাব অপরিসীম কিন্তু সেই অভাবসমূহ তৃপ্ত করিবার জন্য যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলির অপরিমিত সরবরাহ নাই; কারণ এই সকল সামগ্রী মানুষের কর্ম্মশক্তি ও উদ্যমের দ্বারা উৎপাদন বা সংগ্রহ করিতে হয়। প্রকৃতিদত্ত বস্তুর উপরে মানুষ তাহার উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করে; কিন্তু মানুষের উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি যেমন অসীম নহে, প্রকৃতিদত্ত বস্তুর পরিমাণও তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সেইজন্য মানুষ অপ্রচুর সামগ্রীর সাহায্যে তাহার অপরিমিত অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস করে। এইরূপ অপ্রচুর সামগ্রীর সাহায্যে অপরিসীম অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াসের নাম "অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা"।

এই অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাই অর্থনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। 'পেন্সন্' বলেন, এইরূপ প্রচেষ্টার কারণসমূহ, প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনাই হইল অর্থ-নীতির বিষয়বস্তু"। ["Economics deals with the causes, nature and

results of such i.e, economic effort"—PENSON] অর্থাৎ মানুষ কেন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, এই প্রচেষ্টা কি ভাবে কোন্ দিকে পরিচালিত হয় এবং এই প্রচেষ্টা হইতে মানুষ কি ফললাভ করে,—এই সকল হইল অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ সমাজবদ্ধ মানুষের কর্ম্মজীবন আবর্ত্তিত। আমরা প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোককে কর্ম্মব্যস্তভাবে ঘুরিতে দেখি। এই কর্ম্মব্যস্ততার প্রধান কারণ হইল যে মানুষ উপার্জ্জন করিতে চাহে এবং সেই উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার প্রয়োজন মিটাইতে চাহে। আয় ও ব্যয়-সম্পর্কিত কার্য্যকলাপ মানুষের দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্য। ইহা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টারই কার্য্যকরী রূপ। অর্থনীতির বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক 'মার্শাল' বলেন,—"মানুষের জীবনের সাধারণ কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অলোচনাই হইল অর্থনীতি। কি ভাবে সে উপার্জ্জন করে এবং উহা কি ভাবে ব্যবহার করে,—অর্থনীতি ইহা অনুসন্ধান করিয়া থাকে।" ["Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It enquires how he gets his income and how he spends it"—MARSHALL]

এইখানে অর্থনীতির বিষয়-বস্তুর তুইটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অর্থনীতি কেবলমাত্র সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্য্যকলাপের সহিত সম্পর্কিত। মনুষ্য-সমাজের বাহিরে যদি কেহ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তাহা হইলে তাহার সেই কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনা অর্থনীতির বিষয়-বহির্ভূত। কারণ সমাজবদ্ধ মনুষ্যসমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে যে ব্যক্তি জীবনযাপন করে (যথা সন্ন্যাসী) তাহার জীবনযাত্রা ও কার্য্যকলাপকে 'সাধারণ' পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। অর্থনীতি হইল সমাজ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান;—কেবলমাত্র সমাজবদ্ধ মানুষের অভাব, সেই অভাব তৃপ্তির প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা এবং ঐ প্রচেষ্টার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, এইগুলি হইল অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ বিভিন্ন ব্যক্তি অনেক সময়ে অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, যাহার দ্বারা একজন আর একজনের নিকট হইতে বহু সাহায্য পায়; ইহাতে সাহায্য গ্রহণকারীর অনেক অভাবও তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু অর্থনীতি এইরূপ কর্ত্তব্যবোধে বা স্নেহবশতঃ করণীয় কার্য্যের পর্য্যালোচনা করে না। কারণ এই সকল কার্য্য মুদ্রার (Money) বিনিময়ে আদান প্রদান হয় না বলিয়া উহাদের দ্বারা কি ধরণের অভাব কি পরিমাণে তৃপ্ত হইল তাহার কোনোই সঠিক মাপকাটি পাওয়া সম্ভব নহে।

(অনু-২) সম্পদমূলক বিজ্ঞান—*Science of Wealth*

যে অপ্রচুর সামগ্রীসমূহের সাহায্যে মানুষের বিবিধ অভাব তৃপ্ত করা হয় সেইগুলিকে প্রচেষ্টা বা মেহ্‌নতের দ্বারা লাভ করিতে হয়। মানুষের মেহ্‌নতের দ্বারা লভ্য অপ্রচুর সামগ্রীগুলিকে বলা হয় সম্পদ (Wealth) ; সেইজন্য কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ্ "অর্থনীতিকে" 'সম্পদমূলক বিজ্ঞান' আখ্যা দিয়াছেন। অধ্যাপক 'ফিশার' বলেন, "অর্থনীতির সর্ব্বাপেক্ষা সরল সংজ্ঞা হইল যে ইহা সম্পদমূলক বিজ্ঞান।" ["Economics may be most simply defined as the science of wealth"—FISHER] অবশ্য ফিশার ইহার পরে বলিয়াছেন যে অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের জীবন ও কল্যাণের সহিত সম্পদের সম্পর্ক নির্ণয় করা ; কিন্তু সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিবার জন্যই হউক বা যে কোনো কারণেই হউক ইহাকে সম্পদ-মূলক বিজ্ঞান আখ্যা দানের জন্য অনেক ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়। অনেকে ধারণা করেন যে সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিই অর্থনীতির মূখ্য আলোচ্য বিষয় এবং সেহেতু ইহা মানুষকে কেবলমাত্র সম্পদ আহরণে দীক্ষিত করে এবং নিছক স্বার্থান্বেষী প্রাণী হিসাবেই গড়িয়া তুলে। অর্থনীতি সম্পর্কে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রসার হওয়ায় কোনো কোনো চিন্তানায়ক এই বিজ্ঞানটীকে বিশেষ নিন্দা করেন।

কিন্তু বিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতি এইরূপে নিন্দার্হ নহে ; এই জাতীয় নিন্দাবাদ ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। অর্থনীতি নিছক সম্পদমূলক বিজ্ঞান নহে। ইহার আসল লক্ষ্য হইল মানুষের এক ধরণের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা করা। মানুষের বহু প্রকার ক্রিয়াকলাপ আছে—তাহার মধ্যে একপ্রকার হইল, তাহার জীবনের অভাব বা প্রয়োজন মিটাইবার প্রচেষ্টা। সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ,—ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই এই প্রচেষ্টা প্রঘূর্ণিত হয়, তাহা সত্য। কিন্তু সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ মানুষের ক্রিয়াকলাপ হইতে উদ্ভূত এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই নির্দ্ধারিত। অতএব অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল মানুষ—সে কোন্ অভাব অনুভব করে ও সেই অভাব তৃপ্তির জন্য কি ভাবে কোন্ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অর্থনীতি এই শিক্ষা দেয় না যে সম্পদই হইল আসল জিনিষ, এবং যে কোনো উপায়ে যত অধিক সম্পদ সৃষ্টি করা যায় ততই মানুষের মঙ্গল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল যে কোনো প্রকারেই হউক সম্পদ উৎপাদনের দিকেই মানুষ দৃষ্টি রাখুক,—এই শিক্ষা অর্থনীতি দেয় না। মানুষের কল্যাণ কেবল সম্পদ সৃষ্টির মধ্যে নিহিত নহে—ইহা অর্থনীতি অকপটে স্বীকার করে। ইহা আরও স্বীকার করে যে মানুষের কল্যাণের একটী অংশ মাত্র সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগের মারফৎ উপলব্ধি করা সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের (Total Welfare) কতখানি অংশ সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগের মারফৎ সাধিত হইতে পারে সেই দিকে অর্থনীতি লক্ষ্য রাখে। অতএব অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল মানুষ। অধ্যাপক 'পেন্‌সন্‌' বলেন, মানুষের অভাব, শ্রম, উপার্জন এবং ব্যয়—এইগুলি হইল অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং যে সম্পদ তাহার অভাব তৃপ্ত করিতে পারে, তাহা হইল গৌণ। ["Economics deals primarily with man as wanting, working, getting and spending and secondarily with the wealth which can satisfy his wants"—PENSON]

অনু-৩) অর্থনীতি এবং অন্যান্য সমাজ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান— *Economics and other Social Sciences.*

অর্থনীতি একটী সমাজ-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। সেহেতু অন্যান্য সমাজ-সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের সহিত ইহার বহুলাংশে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সমাজ-সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology), রাজনীতি-বিজ্ঞান (Politics) ইতিহাস (History) এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics)—এইগুলির সহিত অর্থনীতির সাদৃশ্য ও সম্পর্ক আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান**—(Economics and Sociology)—মানব সমাজের সংগঠন, ক্রমোন্নতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকেই বলা হয় সমাজ-বিজ্ঞান। ইহা মোটামুটিভাবে সমাজ জীবনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করে; কিন্তু সমাজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রই মোটামুটিভাবে ইহার আলোচনার পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও কোনো একটী বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। অর্থনীতি সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র বাছিয়া লয় এবং ইহার বিস্তারিত আলোচনা করে; এই ক্ষেত্রটী হইল সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অতএব সমাজ-বিজ্ঞান অপেক্ষা অর্থনীতির আলোচনাক্ষেত্র অল্প পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ। তবে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরের বিষয়ের উপরে অর্থনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে। অবশ্য অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান—উভয়ের মধ্যেই সমাজ-কল্যাণ সন্ধান প্রবণতা বর্ত্তমান।

(২) **অর্থনীতি ও রাজনীতি-বিজ্ঞান**—(Economics and Politics)—অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক জীবন বহুলাংশে পরিচালিত ও নির্দ্ধারিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের কতখানি কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত, দেশের অর্থনৈতিক

উন্নতির জন্য ও জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্রের কি ক্রিয়াকলাপ থাকিতে পারে বা থাকা উচিত—ইহার আলোচনা রাজনীতি বিজ্ঞানের মধ্যে একটী বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে। কারণ, ইহার সহিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অপর পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপরে,—অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা পরিচালনের পদ্ধতির উপরে—রাষ্ট্রের কাঠামো বহুলাংশে নির্ভরশীল। অবশ্য এই সকল বিষয়ের বাহিরে রাজনীতির মধ্যে বহু বিষয় আছে যাহার সহিত অর্থনীতির সম্পর্ক নাই এবং অর্থনীতির মধ্যে বহু বিষয় আছে যাহার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক নাই।

(৩) **অর্থনীতি ও ইতিহাস**—(Economics and History)—আধুনিক মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহিত সঠিকভাবে পরিচিত হইতে হইলে অতীতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কিরূপ ছিল এবং কি কারণে ও কি পদ্ধতিতে উহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য অর্থনীতিকে মানুষের অতীত ক্রিয়াকলাপের সন্ধান করিতে হয়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মানুষের জীবনের একটী বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া থাকে; সেইজন্য অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা না করিলে মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তবে ইতিহাস হইল অতীতের ইতিবৃত্ত এবং শুধু অর্থনীতি নহে, অন্যান্য বহু বিষয় সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের ইতিবৃত্ত। অর্থনীতি প্রধানতঃ বর্ত্তমানের পর্য্যালোচনা এবং অন্যান্য কোনো বিষয়ের নহে—শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা।

(৪) **অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র**—(Economics and Ethics)—মানুষের কার্য্য ও চিন্তাধারা কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত—ইহা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। মানুষের মঙ্গলার্থে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ ইহার অন্তর্ভূক্ত অর্থনীতি মানুষের বাস্তব ক্রিয়াকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট; বহু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নীতি-বিগর্হিত হইলেও অর্থনীতির মধ্যে আলোচিত হয়। ইহার কারণ অর্থনীতি মানুষের স্বভাবের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি বহুলাংশে মানিয়া লইয়াই তাহার ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করে। কিন্তু বর্ত্তমানে নীতিশাস্ত্রের দ্বারা অর্থনীতির প্রভাবিত হইবার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। কিভাবে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হওয়া উচিত এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য নীতির দিক হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কি অংশ গ্রহণ করা উচিত—অর্থনীতির এই সকল আলোচনায় নীতিশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(অনু-৪) অর্থনৈতিক নিয়ম—*Economic Laws.*

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মধ্যেই কার্য্য কারণের সংযোগ নির্ণয়কারী অনেকগুলি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনীতির মধ্যেও এইরূপ অনেকগুলি নিয়ম আলোচিত হয়। কোনো অর্থনৈতিক কারণ হইতে যে ফলাফল উদ্ভূত হইতে পারে সেই সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতির ব্যাখ্যাকে "অর্থনৈতিক নিয়ম" (Economic Law) বলা হয়। যথা—সামগ্রীর দাম কমিলে উহার চাহিদা বাড়িবে। এক্ষেত্রে সামগ্রীর দাম "হ্রাস" হওয়া হইল "কারণ" এবং উহার চাহিদা বৃদ্ধি হইল সেই কারণের ফলাফল। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া অর্থনীতিবিদ্‌গণ "চাহিদার নিয়ম" তৈয়ারী করিলেন। এই ধরণের বহু নিয়ম (যথা—"যোগানের নিয়ম") অর্থনীতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যেও এই ধরণের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত অর্থনৈতিক নিয়মসমূহের একটী মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়ম সর্ব্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং সঠিক; অবস্থার বা প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যতিক্রম না হইলে উহার ব্যতিক্রম হয় না, যথা—পদার্থ বিজ্ঞান বা রাসায়ণশাস্ত্রের নিয়ম। কিন্তু অর্থনৈতিক নিয়ম সর্ব্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নহে; উহাদের বিবিধ ব্যতিক্রম হয়। অর্থনীতির নিয়মে যাহা বলা হয় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে—উহা যে ঘটিবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। যথা সামগ্রীর দাম কমিলেও উহার চাহিদা কখনো কখনো নাও বাড়িতে পারে। লবণের দাম কমিলে লোকে অধিক পরিমাণে লবণ খাইবে, এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই। এইভাবে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। অপরাপর অর্থনৈতিক নিয়মেরও বহু ক্ষেত্রে বহু ব্যতিক্রম ঘটে। ইহার কারণ অর্থনীতি জড় পদার্থ লইয়া আলোচনা করে না; ইহার মুখ্য বিষয়বস্তু হইল মানুষের ক্রিয়াকলাপ; এবং বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের মনস্তত্বে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার সাধারণ প্রবণতা ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া একটী নিয়ম প্রস্তুত করা যাইতে পারে বটে কিন্তু উহাকে সঠিক, অভ্রান্ত ও সর্ব্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। কারণ, মানুষের মানসিক প্রবণতা বা গতি এবং উহা দ্বারা পরিচালিত ক্রিয়াকলাপ যে সকল ক্ষেত্রেই একই ভাবে প্রবাহিত হইবে—ইহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। সেইজন্য অধ্যাপক 'মার্শাল' অর্থনৈতিক নিয়মকে "স্রোতের নিয়মের" (Laws of Tide) সহিত তুলনা করিয়াছেন—কারণ কখন জোয়ার-ভাঁটা হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা যায় বটে কিন্তু বিভিন্ন অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণে অনুমান

ঠিক নাও হইতে পারে। সেহেতু 'সেলিগ্‌ম্যান' বলেন, "অর্থ নৈতিক নিয়মসমূহ মূলতঃ অনুমান-প্রসূত।" ["Economic laws are essentially hypothetical"—SALIGMAN.]

(অনু-৫) অর্থ নৈতিক জীবনের ক্রমোন্নতি—*Development of Economic Life.*

বর্ত্তমান সময়ের অর্থ নৈতিক জীবন লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর প্রয়োজন বোধ করি এবং বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন ও ভোগ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করি না। আমরা প্রত্যেকে মাত্র এক ধরণের কাজ করিয়া থাকি—মাত্র একপ্রকার সামগ্রীর অথবা একপ্রকার সামগ্রীর একটী বিশেষ অংশ মাত্রের উৎপাদনেই ব্যাপৃত থাকি। অথচ প্রত্যেকেই আমরা ভোগ করিয়া থাকি বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী। বিভিন্ন অর্থ নৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ হইয়া তবেই আধুনিক সময়ে এইরূপ অর্থনৈতিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে। অর্থ নৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশকে বিভিন্ন অবস্থায় বা স্তরে (stage) ভাগ করিয়া উহার পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথম অবস্থা (First Stage)—আদিম যুগের মানুষের জীবনে অভাব ছিল খুবই সামান্য। খাদ্য, পরিধেয় এবং আশ্রয়স্থলের অভাব সে বোধ করিত বটে, কিন্তু খুব সামান্য দ্রব্যের (যথা—পশুর কাঁচা মাংস, পশুচর্ম্ম বা বল্কল এবং পর্ব্বত গুহা) দ্বারা সে ঐ অভাবগুলি মিটাইয়াই সন্তুষ্ট হইত। এইগুলি সংগ্রহের জন্য যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইত তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বয়ং প্রয়োগ করিত। প্রথম অর্থ নৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল যে মানুষ যখন যেমন অভাব বোধ করিত তখন অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই তদনুরূপ প্রচেষ্টা করিত এবং তাহার শ্রমের দ্বারা লব্ধ সামগ্রীর সাহায্যে তাহার অভাব তৃপ্ত করিত; অপর কাহারও দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহার করিবার রীতি তখন প্রচলিত হয় নাই। এক্ষেত্রে সামান্য অভাবের সরাসরি তৃপ্তি বিধানই ছিল রীতি।

দ্বিতীয় অবস্থা (Second Stage)—প্রথম অবস্থার অর্থ নৈতিক জীবন বেশী দিন স্থায়ী ছিল না। সময় যত অতিবাহিত হইতে লাগিল মানুষের অভাব ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও পত্রের সাহায্যে সে গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন বোধ করিল, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইল। তখন প্রত্যেক লোক তাহার সকল কাজ স্বয়ং করিবার অভ্যাস পরিত্যাগ

করিতে শিখিল এবং ক্রমশঃ মানুষ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা সমেত কার্য্য-বিভাগ বা শ্রম-বিভাগের প্রবর্ত্তন করিল। একদল লোক শুধু গৃহ নির্ম্মাণেই ব্যাপৃত রহিল, একদল লোক শুধু খাদ্যান্বেষণেই ব্যাপৃত রহিল, একদল লোক হয়তো শুধুই অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিল। যাহাতে একজন লোক কেবল একপ্রকারের সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিয়া অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে ঐ সামগ্রী অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে—সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা এইরূপ শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাহারা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতারও ব্যবস্থা করিল। যে শুধু গৃহ নির্ম্মাণ করে সে তাহার নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহের বিনিময়ে অপরের নিকট হইতে তাহার প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে। যে শুধু পশু শীকার করে সে তাহার সংগৃহীত মাংসের উদ্বৃত্ত অংশের বিনিময়ে, অন্যান্য অভাব তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, অপর ব্যক্তিদের নিকট হইতে অপরাপর সামগ্রী সংগ্রহ করে। পরস্পরের মধ্যে এই সহযোগিতার মাধ্যমে তাহারা সামগ্রীর বিনিময় করিত। এই দ্বিতীয় অবস্থার বৈশিষ্ট হইল যে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের অভাব প্রত্যক্ষভাবে, অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজ প্রচেষ্টায়, তৃপ্ত করে না, তাহাদের অভাব তাহারা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরের মধ্যে সামগ্রী বিনিময় করিয়া তৃপ্ত করে। অভাব-বোধ এবং অভাব-তৃপ্তির মধ্যে সরাসরি প্রচেষ্টা ছিল না; এ দু'য়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা সামগ্রী বিনিময়ের দ্বারা পূরণ করা হইত।

তৃতীয় অবস্থা—(Third Stage) ক্রমশঃ সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার প্রসারলাভ ঘটিল; তখন শুধু যে একজন ব্যক্তি তাহার অভাব তৃপ্ত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বয়ং উৎপাদন করিল না, তাহাই নহে—এক একটী সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্য আবার একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইল। বহু লোকের সহযোগিতায় একটীমাত্র সামগ্রী উৎপাদিত হইতে লাগিল; একজন লোকই গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য একলাই সম্পন্ন করিল না। কেহ ইঁট গড়িল, কেহ ইঁট গাঁথিল, কেহ যোগাড় দিল, কেহ জানালা দরজা নির্ম্মাণ করিল এইভাবে একটীমাত্র সামগ্রী (যথা গৃহ) উৎপাদনের কার্য্য বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত হইল। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠিল, সমগ্র গৃহটী কাহার? সকলেই স্বীকার করিল যে যাহারা কোনো না কোনো কার্য্যের দ্বারা ঐ গৃহটী নির্ম্মাণে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সমবেতভাবে উহার মালিক। কিন্তু কে কত পরিমাণে উহার মালিক? সকলের পরিশ্রম তো আর সমান নহে—কেহ

অধিক পরিশ্রম করিয়াছে, কেহ অল্প পরিশ্রম করিয়াছে, কাহারও কার্য্যে অধিক নৈপুণ্য প্রয়োজন হইয়াছে কাহারও বা কোনো নৈপুণ্য প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারীগণের সকলেই উৎপাদিত সামগ্রীটার সমান অংশীদার হইতে পারে না। সমগ্র সামগ্রীটী (যথা গৃহ) যদি অপর কোনো সামগ্রীর সহিত বিনিময় করা হয় তাহা হইলে বিনিময়ে পাওয়া ঐ সামগ্রীটী প্রথম সামগ্রীটার (অর্থাৎ গৃহটার) উৎপাদনকারীগণের মধ্যে সমান পরিমাণে তো ভাগ করিয়া দেওয়া যায় না; অতএব কাহার কতখানি অংশ প্রাপ্য তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একটী বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হইল—ইহার নাম "বণ্টন" (Distribution)। তৃতীয় অবস্থায় মানুষের অভাব-বোধ এবং অভাব-তৃপ্তির মধ্যে ব্যবধান আরও ব্যাপক হইল, কারণ ঐ দুইটার মধ্যে শুধুই যে সামগ্রী বিনিময়ের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই নহে—পরন্তু একটী সামগ্রীর বিনিময়ে যে অপর সামগ্রী পাওয়া যাইত, উহা প্রথম সামগ্রীর উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার প্রয়োজন হইল।

চতুর্থ অবস্থা (Fourth Stage)—আধুনিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় আরও ব্যাপক শ্রম-বিভাগ অবলম্বিত হইয়া থাকে। তৃতীয় অবস্থায় দেখা গিয়াছে, জনকয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটী সমগ্র সামগ্রী উৎপাদন করিল; এই সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্য বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয় এবং এক একজন ব্যক্তি এক একটী অংশ (যথা—ইঁট গাঁথা, দরজা তৈয়ারী ইত্যাদি) সম্পাদন করে। কিন্তু আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় যে একটী ব্যবহার্য্য সামগ্রী উৎপাদন করিবার কার্য্য বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে, আবার ঐ এক একটী অংশ (যথা—'দরজা তৈয়ারী' একটী অংশ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকে (যথা—কেহ শুধুমাত্র কাঠ হইতে তক্তা কাটিতেছে, অপর কেহ তক্তাগুলিকে মসৃণ করিতেছে, অপর একজন তক্তাকে দরজার মাপে কাটিতেছে, অন্য কেহ কব্জা তৈয়ারী করিতেছে ইত্যাদি) আবার শেষের কাজগুলির প্রত্যেকটী ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হয় (যথা—কাঠ হইতে তক্তা কাটিবার কার্য্যটী বিভিন্ন অংশে ভাগ হইতে পারে।) এইরূপে একটী ব্যবহার্য্য সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্য কত বিভিন্ন অংশে যে বিভক্ত থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাই হইল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার বিবর্ত্তনের চতুর্থ অবস্থার বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু এই অবস্থায়, সাধারণ বিনিময়ের বাহন হিসাবে মুদ্রার ব্যবহার হয়; বিভিন্ন ব্যক্তি মিলিয়া যে সামগ্রীটী উৎপাদন করে উহা মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। যাহারা ঐ সামগ্রীটী উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সামগ্রীটার বিক্রয়লব্ধ মুদ্রা হইতে অংশ পায়। আবার সেই মুদ্রার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া

তাহারা তাহাদের অভাব তৃপ্ত করে। অতএব চতুর্থ অর্থাৎ আধুনিক অর্থনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল ক্রমবর্দ্ধনশীল শ্রম-বিভাগ এবং মুদ্রার ব্যবহার।

প্রথম অবস্থায় একজন ব্যক্তি তাহার অভাব তৃপ্ত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার সামগ্রী নিজেই উৎপাদন করিত; দ্বিতীয় অবস্থায়, একজন ব্যক্তি নিজের অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য অপরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিত (তবে একটী সম্পূর্ণ সামগ্রী একেলাই উৎপাদন করিত); তৃতীয় অবস্থায়, বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা একটী সামগ্রী উৎপাদিত হইত—ইহাকে বলা হয় শ্রম-বিভাগ। চতুর্থ অবস্থায়, এইরূপ শ্রম-বিভাগ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হইতে থাকিল এবং সকল ব্যবসায় বাণিজ্য মুদ্রার সাহায্যে পরিচালিত হইল। এক্ষেত্রে অভাব-বোধ ও অভাব-তৃপ্তির মধ্যে ব্যবধান তৃতীয় অবস্থার অপেক্ষাও ব্যাপকতর হইল কারণ এক্ষণে শুধুমাত্র সামগ্রীর দ্বারা সামগ্রী বিনিময় নহে, মুদ্রার দ্বারা সামগ্রী বিনিময় প্রচলিত হইল।

Questions & Hints

1. "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life"—Explain (1933) [অনুচ্ছেদ ১]

2. "Economics is the Science of Wealth." Do you agree with this definition? Give reasons. (1929, 1949) [অনুচ্ছেদ ২]

3. Define the term "Economic laws", and explain their nature. [অনুচ্ছেদ ৪]

4. Trace the development of economic life through the various stages from the earliest to the modern times giving briefly the characteristics of each stage of development. (1942) [অনুচ্ছেদ ৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামগ্রী ও সম্পদ

Goods and Wealth.

(অনুচ্ছেদ ১) সামগ্রী—*Goods.*

যাহা কিছু মানুষের কোনো না কোনো প্রয়োজন মিটায় তাহাকেই বলা হয় সামগ্রী। এই প্রয়োজন খুব সামান্য হইতে পারে আবার খুব গুরুত্বপূর্ণও হইতে পারে কিন্তু যাহাই মানুষের কোনো না কোনো প্রয়োজন মিটাইতে, অর্থাৎ কোনো না কোনো অভাব তৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় তাহাকেই বলা হয় সামগ্রী (Goods)। সামগ্রী বলিতে কোনো "কাজ" বুঝাইতে পারে আবার কোনো বস্তুও বুঝাইতে পারে। যদি কেহ এমন কোনো কাজ করিয়া দেয় যাহা আমাদের কোনো না কোনো অভাব বা প্রয়োজন মিটায় (যথা ভৃত্যের কাজ) তাহা হইলে তাঁহার ঐ কাজ বা সেবাকে সামগ্রী বলা হইয়া থাকে। আবার যে সকল বস্তু আমাদের কোনো না কোনো অভাব তৃপ্ত করে সেগুলিকেও "সামগ্রী" বলা হয় যথা—কলম, পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি। অতএব, সামগ্রী বস্তু-সাপেক্ষ (Material) হইতে পারে অথবা বস্তু-নিরপেক্ষ (Immaterial) হইতে পারে। প্রথমটীকে বলা হয় "বস্তু-সামগ্রী" (Material Goods) দ্বিতীয়টীকে বলা হয় "অবস্তু-সামগ্রী" (Immaterial Goods)।

অনেক "সামগ্রী" আছে যাহা এতই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে উহা উৎপাদন করিবার জন্য মানুষকে কোনোই মেহনৎ করিতে হয় না। এইগুলি মানুষের প্রয়োজন মিটায় বটে কিন্তু এতই অধিক পরিমাণে থাকে যে যে ব্যক্তিই উহার প্রয়োজন বোধ করিবে সেই ইচ্ছা কবিলে উহা পাইতে পারে। এইগুলি প্রকৃতি বিনামূল্যে আমাদিগকে দিয়াছে ; যথা নদীর জল, সূর্য্যের আলো, বাতাস ইত্যাদি। এইগুলিকে বলা হয় "অবাধ-লভ্য সামগ্রী" (Free Goods) কিন্তু সকল সামগ্রী এরূপ অবাধ-লভ্য নহে। অনেক সামগ্রীই আছে যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না অর্থাৎ যে পরিমাণে থাকিলে সকল লোকের সকল চাহিদা বা প্রয়োজন মিটিবে সেই পরিমাণে উহা নাই। ঐ জিনিষগুলিকে ভোগ করিবার জন্য মানুষকে কিছু মেহনৎ করিতে হয়। অথবা উহার বিনিময়ে কিছু মূল্য প্রদান করিতে হয়।

প্রকৃতি এইগুলি বিনামূল্যে দেয় নাই; যথা কাপড় জামা খাতা পেন্সিল ইত্যাদি। এইগুলির নাম পরিমিত সামগ্রী (Economic Goods)।

(**অনু-২) সম্পদ**—*Wealth.*

(সম্পদ হইল মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা লভ্য বহিঃস্থ এবং হস্তান্তরযোগ্য সামগ্রী যাহার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। সম্পদের চারিটী বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ সম্পদ হইল 'সামগ্রী'—অর্থাৎ কোনো কোনো সামগ্রীকে সম্পদ বলা হয়। সামগ্রী হিসাবে ইহা মানুষের কোনো না কোনো অভাব তৃপ্ত করিতে পারে অর্থাৎ ইহার প্রয়োজনীয়তা (Utility) আছে। [কোনো সামগ্রীর পক্ষে মানুষের কোনো অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতাকে বলা হয় "প্রয়োজনীয়তা" বা ইউটিলিটি।] তবে বস্তু-সামগ্রী এবং অবস্তু সামগ্রী উভয়েই সম্পদ হইতে পারে—যদি অবশ্য তাহাদের সম্পদ হইবার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে।) দ্বিতীয়তঃ সম্পদ হইল সেই সামগ্রী যাহার পরিমাণ প্রচুর নহে। সম্পদের অপ্রাচুর্য্য আছে। [কোনো সামগ্রীর চাহিদার তুলনায় পরিমাণ পর্য্যাপ্ত না থাকিলে, উহার "অপ্রাচুর্য্য" আছে বলা হয়।] এই অপ্রাচুর্য্যের কারণ হইল যে মানুষের পরিশ্রম বা মেহ্‌নতের দ্বারা 'সম্পদ' পদ-বাচ্য, সামগ্রীগুলিকে উৎপাদন বা সংগ্রহ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ সম্পদ মাত্রই হস্তান্তর যোগ্য হইবে, অর্থাৎ ইহা এমন একটী সামগ্রী হইবে যাহা একজন ব্যক্তি আর একজনকে দিতে পারে। যথা—রামবাবু আমাকে একটী বই দিলেন বা রামবাবুর ভৃত্য তাঁহাকে 'সেবা' দিল; এক্ষেত্রে 'বই' বা 'সেবা' একজন আর একজনকে দিতেছে অতএব ইহারা হস্তান্তরযোগ্য। তবে সব হস্তান্তরযোগ্য সামগ্রীকেই যে হাতে হাতে দেওয়া যায় এরূপ নহে, যেমন করিয়া হউক তাহার মালিকানা (Ownership) হস্তান্তর করিতে পারিলেই একটী সামগ্রী হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যথা জমি বা বাড়ীর মালিকানা হস্তান্তরিত হয় দলিল-দস্তাবেজের মারফৎ। চতুর্থতঃ যে সামগ্রী সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা মানুষের শরীরের বহিঃস্থ (External) কোনো জিনিষ হইবে। যথা—একজন ব্যক্তির যদি খুব মেধা থাকে তাহা হইলে তাহার সেই মেধাকে 'সম্পদ' বলা হইবে না—কারণ উহা তাহার শরীরের অভ্যন্তরস্থ, বহিঃস্থ নহে। মেধা ব্যবহারের দ্বারা ঐ ব্যক্তি সম্পদ উপার্জ্জন করিতে পারে কিন্তু মেধাকেই সম্পদ বলা হইবে না। যেমন, কারখানায় কলের দ্বারা কাপড় তৈয়ারী হয় কিন্তু কারখানা বা কলকে কাপড় বলা চলে না।

অতএব সম্পদ হইল এমন সামগ্রী যাহা (১) মানুষের প্রয়োজনীয় (২) অপ্রচুর, (৩) হস্তান্তরযোগ্য এবং (৪) মনুষ্য-দেহের বহিঃস্থ।

সম্পদ সম্পর্কে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। (১) কোনো কোনো 'সামগ্রী'কে 'সম্পদ' বলা হয় না যথা—'অবাধলভ্য সামগ্রী' (Free Goods); কেবলমাত্র 'পরিমিত সামগ্রী'গুলিই (Economic Goods) হইল "সম্পদ"। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নাই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই সামগ্রী পরিমিত সামগ্রী হইতে পারে বা অবাধলভ্য সামগ্রী হইতে পারে; অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র ভেদে একই সামগ্রী কখনও সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে আবার কখনও সম্পদ বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। যাহা একস্থানে একসময়ে বা একজন ব্যক্তির নিকট "সম্পদ" বলিয়া গণ্য হয়, তাহা অপর স্থানে (স্থানভেদে) বা অপর সময়ে (কালভেদে) বা অপর ব্যক্তির নিকট (পাত্রভেদে) সম্পদ বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে।

(২) আমরা "সম্পদ" শব্দটী সাধারণ ভাষায় যে অর্থে ব্যবহার করি অর্থনীতিতে উহার অর্থ তাহা অপেক্ষাও সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ সম্পদ বলিতে প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী বুঝায় এবং এই সামগ্রীগুলি আবার বিশেষ মূল্যবান বা দামী হইবে। যাহার মূল্যবান সামগ্রী অনেক আছে তাহারই সম্পদ আছে বলা হয়। যে ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে অল্প পরিমাণে এবং সেহেতু বিশেষ দুঃখে কষ্টে যাহার জীবন অতিবাহিত হয়, সাধারণ কথাবার্ত্তায় তাহার সম্পদ আছে বলা হয় না। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ শব্দটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সামগ্রী প্রয়োজনীয়, অপ্রচুর, দেহের বহিঃস্থ ও হস্তান্তরযোগ্য কেবলমাত্র তাহাই সম্পদ। এই সামগ্রীর, অর্থাৎ সম্পদের, প্রাচুর্য্য নাই এবং ইহা যে খুব দামী হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই অর্থে ভিখারীর ছিন্ন বস্ত্রটীও তাহার "সম্পদ"। উপরন্তু সাধারণ ভাষায় অনেক অবাধলভ্য প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীকে আমরা "সম্পদ" বলিয়া থাকি; শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় হিসাবে ঐগুলিকে সম্পদ বলি। যথা লণ্ডনে টেমস্ নদীকে ইংলণ্ডের সম্পদ বলা হয়। হস্তান্তরযোগ্য নহে এইরূপ সামগ্রীকেও সাধারণ ভাষায় সম্পদ বলা হইয়া থাকে, যথা—কোনো ব্যক্তির কবিত্ব-শক্তি বা হাস্যরসাত্মক কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তি; কখনো কখনো দেহাভ্যন্তরস্থ সামগ্রীকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া যায় যথা কোনো ব্যক্তির প্রখর স্মরণশক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অতএব সাধারণ ভাষায় সম্পদ শব্দটী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে উহা সুনির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। * 'পেনসন' বলেন, "অর্থনীতিতে যখন শব্দটী (অর্থাৎ "সম্পদ") ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণ ভাষার

* অধ্যাপক চ্যাপমান বলেন, "সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইলে, একাধিক ভাবের সংমিশ্রণে

অপেক্ষা অধিকতর সীমাবদ্ধ অর্থে উহা ব্যবহৃত হয়।" ["When the word is used in Economics it has a much more restricted sense than it has in ordinary speech"—PENSON]

(অনু-৩) ব্যক্তিগত সম্পদ—*Individual Wealth.*

একজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ হিসাব করিতে গেলে দেখিতে হইবে ঐ ব্যক্তির কতগুলি বস্তু-সামগ্রী আছে যাহা প্রয়োজনীয় মেহ্‌নতের দ্বারা উৎপাদিত বলিয়া অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য এবং দেহের বহিঃস্থ ; যথা—বাড়ী, জমি, টেবিল, চেয়ার, বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি। ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে সেই জিনিষ-গুলিকে যেগুলি চোখে দেখা যায় না—অতএব বস্তু বলা যায় না, যেগুলিকে বস্তু-নিরপেক্ষ সামগ্রী বলা চলে অথচ যাহাদের সম্পদ হইবার বৈশিষ্ট্য-সমূহ আছে—যথা গ্রন্থস্বত্ব (Copy-right) বা কোনো কারবারের বাজার নাম (Good will)।

(অনু-৪) সমষ্টিগত সম্পদ—*Collective Wealth.*

সমষ্টিগত সম্পদ বলিতে সেই পরিমিত সামগ্রীগুলিকে বুঝায় যেগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের মালিকানার মধ্যে নহে—যেগুলির মালিক সমষ্টিগতভাবে সকল ব্যক্তিই। এইগুলিকে সাধারণ কথাবার্ত্তায় সরকারী সামগ্রী বলা হয় ; যথা—সরকারী রাস্তা, সরকারী পুকুর, সরকারী ব্রিজ ইত্যাদি। জনসাধারণ সমষ্টিগতভাবে এইগুলির মালিক। কলিকাতার রাস্তা, পার্ক, 'গড়ের মাঠ', 'ইডেন গার্ডেন' ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পদের দৃষ্টান্ত। সম্পদ হইবার বৈশিষ্ট্য ইহাদের আছে অথচ ইহারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভোগ্য নহে। সমগ্র সমাজের লোকে একত্রিতভাবে উহাদের মালিক।

(অনু-৫) জাতীয় সম্পদ—*National Wealth.*

একটী জাতির সমগ্র সম্পদকে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। এই সমগ্র সম্পদের মধ্যে এই বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত হইবে : (১) দেশের সকল অধিবাসীর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পদ যোগ করিয়া যাহা হইবে—তবে ইহার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে যে দেনা-পাওনা আছে তাহা অন্তর্ভূক্ত করা হইবে না ; যথা, রাম যদি শ্যামকে ১০৲ টাকা ঋণ দিয়া থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবের সময়ে

"সম্পদ" শব্দটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। মানুষের অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম কিন্তু পরিমাণে সীমাবদ্ধ—এইরূপ বস্তুতেই "সম্পদ" সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের মধ্যে যেগুলি মেহ্‌নতের দ্বারা উৎপাদিত সেইগুলির ক্ষেত্রেই সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকিবে বলা হয়। আবার বলা হয় হস্তান্তরযোগ্যতা হইল সম্পদের আবিশ্যিক বৈশিষ্ট্য।"

(Chapman—Outlines of Political Economy)

উহা রামের সম্পদ হিসাবে ধরিতে হইবে বটে কিন্তু রাম ও শ্যাম উভয়ের যুক্ত সম্পদ কত তাহা হিসাব করিতে গেলে ঐ ১০৲ টাকা হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে। কারণ রামের যাহা পাওনা, তাহাই শ্যামের দেনা। (২) জাতির সমষ্টিগত সম্পদ যাহা কিছু আছে সবই এই জাতীয় সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্রের যে দেনা থাকে সেগুলি জনসাধারণের সম্পদ হিসাবে ধরা হইবে না। কারণ রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট ঋণী—ইহার অর্থ হইল যে জনসাধারণ যৌথভাবে তাহাদের নিজেদের কাছেই ঋণী, যেহেতু রাষ্ট্র হইল জনসাধারণের যৌথ প্রতিষ্ঠান। উপরন্তু রাষ্ট্র অনেকক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা সমষ্টিগত সম্পদ, যথা রেলপথ, রাস্তা ইত্যাদি তৈয়ারী করে। সমষ্টিগত সম্পদ যখন একবার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তখন যে অর্থের দ্বারা ঐ সম্পদ নির্ম্মিত তাহাকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

(অনু-৬) ভোগ সামগ্রী ও উৎপাদক সামগ্রী—*Consumption goods and Production goods.*

যে সামগ্রীগুলিকে আমরা সরাসরি অভাব তৃপ্তির কার্য্যে নিয়োগ করি সেইগুলিকে বলা হয় ভোগ সামগ্রী, (Consumption goods) যথা—ঘড়ি, কলম, পুস্তক খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। কিন্তু যে সামগ্রীগুলিকে আমরা সরাসরি অভাব তৃপ্ত করিবার কার্য্যে না প্রয়োগ করিয়া অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করি সেগুলিকে বলা হয় উৎপাদক সামগ্রী (Production goods) যথা—কল, কারখানা, কাঁচা মাল ইত্যাদি।

অনেক সময়ে, ব্যবহার অনুযায়ী একই সামগ্রীকে ভোগ সামগ্রী বা উৎপাদক সামগ্রী বলা চলে। যথা বসিবার গদী তৈয়ারীর জন্য যদি তুলা ব্যবহার করি তাহা হইলে ঐ তুলাকে ভোগ সামগ্রী বলা হইবে। কিন্তু বস্ত্র উৎপাদনের জন্য যদি তুলা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে উহাকে উৎপাদক সামগ্রী বলা হইবে।

Questions & Hints

1. How would you define wealth ? Illustrate your answer with examples. (1943)—[২নং অনুচ্ছেদের প্রথম হইতে "ব্যক্তির কাছে উহা সম্পদ নহে"—এই পর্য্যন্ত।]

2. "When the word wealth is used in Economics, it has a much more restricted sense than it has in ordinary speech." Explain the statement. (1946) —[২নং অনুচ্ছেদর প্রথম হইতে "কলকে কাপড় বলা চলে না"—এই পর্যন্ত এবং (২) সম্পূর্ণ।]

তৃতীয় অধ্যায়

অভাব ও ভোগকার্য্য

Wants and Consumption.

(অনুচ্ছেদ-১) অভাব-সমূহ—*Wants.*

অভাব বলিতে বুঝায় কোনো সামগ্রীর প্রয়োজন অনুভব এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐ সামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা। মানুষের জীবনের কোনো না কোনো অভাব মিটাইবার জন্য মানুষ মেহ্‌নৎ (Effort) করিয়া সম্পদ উৎপাদন করে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে মনুষ্য জীবনের অভাব ও প্রয়োজনসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; উহার জন্য মানুষকে অধিক প্রকারের ও অধিক সংখ্যক সম্পদ উৎপাদন করিতে হয়,—অর্থাৎ তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। অতএব মনুষ্য-জীবনের অভাবগুলির গুরুত্ব সমধিক।

এক্ষেত্রে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে,—প্রথমতঃ অভাবসমূহের বৈশিষ্ট্য কি; দ্বিতীয়তঃ অভাবগুলি কত প্রকারের আছে।

(অনু-২) মানুষের অভাবের বৈশিষ্ট্য—*Characteristics of human Wants.*

প্রথমতঃ সাধারণভাবে মানুষের অভাব সংখ্যায় সীমাহীন। আমাদের ভোগ করিবার ক্ষমতা সীমাহীন তাই একটী অভাব মিটিলে অপরাপর বিবিধ অভাব বোধ করি। মানুষ গুহায় বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, ক্রমশঃ উন্নততর বাসস্থানের অভাব বোধ করিয়াছে; পশু মাংস ও বনের ফল খাইয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই—উন্নততর খাদ্যের অভাব বোধ করিয়াছে। শুধু একই সামগ্রীর বিভিন্ন প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীরও প্রয়োজন মানুষ ক্রমাগতই বোধ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহা যে শুধু সমষ্টিগত জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহাই নহে, ব্যক্তিগত জীবনেও প্রত্যেক লোকেরই এই অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির ভোগের শক্তি সীমাহীন এবং স্পৃহাও

সীমাহীন বটে কিন্তু কোনো একটী বিশেষ সামগ্রী ভোগের শক্তি সীমাবদ্ধ এবং ঐ সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইলে উহার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবেই মিটিয়া যাইতে পারে। লোক ভালো জুতা পরিতে আগ্রহান্বিত কিন্তু জুতার অভাব তাহার নিকট সীমাহীন নহে। যতই সে অধিক সংখ্যক জুতা কিনিতে থাকিবে ততই তাহার জুতার আকাঙ্ক্ষা কমিয়া আসিবে। কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক লোক জুতা দিয়া ঘরের মেঝে হইতে খাটের উপর ও দেওয়ালের গা ছাইয়া ফেলিবে না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির নিকট কোনো একটি বিশেষ সামগ্রীর অভাব সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, আমরা প্রত্যেকেই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা লইয়া সীমাহীন অভাবের সম্মুখীন হই। তখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা আসে যে কোন্ অভাবগুলিকে পূরণ করিব এবং কোন্ অভাবগুলি পূরণ না করিয়াই রাখিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অভাব যেন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে—যেন প্রত্যেক অভাবটী চাহে, তাহাকেই আগে মিটাইয়া লওয়া হয়। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা যদি সীমাহীন হইত তাহা হইলে সকল অভাবগুলিই মিটানো যাইত এবং অভাবগুলির মধ্যে কোনোই প্রতিযোগিতা হইত না। তাহা নহে বলিয়াই অভাবগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী (Competitive)।

চতুর্থতঃ, গোটাকয়েক অভাব আছে যেগুলি পরস্পরের মধ্যে অনুপূরক (Complementary); অর্থাৎ একটী সামগ্রীর অভাব মিটাইতে হইলে অন্য আরেকটী সামগ্রীর অভাব মিটাইতে হইবে। যথা চা ও চিনি; চা পানের অভাব মিটাইতে হইলে চিনির অভাব বোধ হইবে এবং উহা মিটাইতে হইবে। মোটর গাড়ী চড়িতে হইলে পেট্রলও প্রয়োজন হইবে। এক্ষেত্রে চা ও চিনির অভাব এবং মোটর গাড়ী ও পেট্রলের অভাব পরস্পরের অনুপূরক।

অতএব অভাবের বৈশিষ্ট্য হইল যে (ক) সাধারণভাবে মানুষের সকল অভাব কোনো দিনই মিটানো সম্ভব নহে (খ) কিন্তু যে কোনো একটী বিশেষ লোকের কোনো বিশেষ সামগ্রীর অভাব মিটিয়া যাইবে যদি ঐ লোকটী ঐ সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পায়; (গ) অভাবগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী; (ঘ) তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটীর অধিক অভাব পরস্পরের মধ্যে অনুপূরকও হইতে পারে।

(অনু-৩) অভাবের শ্রেণীবিভাগ—*Classification of Wants.*

সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির জীবনে যত প্রকারের অভাব আছে

সেগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে : (১) আবশ্যকীয় সামগ্রীর (Necessaries) অভাব (২) আরাম সামগ্রীর (Comforts) অভাব এবং (৩) বিলাস সামগ্রীর (Luxuries) অভাব।

(১) আবশ্যকীয় সামগ্রী—(necessaries) মানুষের সাধারণ জীবনে যে সামগ্রীগুলি অপরিহার্য্য সেইগুলিকে আবশ্যকীয় সামগ্রী বলা হয়। আবশ্যকীয় সামগ্রী বিবিধ প্রকারের আছে ; সেইজন্য এই আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলিকে পুনরায় তিনভাগে ভাগ করা হয় : (ক) অন্ততঃ সামান্য কিছু খাদ্য, কিছু পরিধেয় ও একটু আশ্রয় ;—ইহা না পাইলে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। নিছক জীবন ধারণের জন্য যে সামগ্রীগুলির অভাব মানুষ বোধ করে সেগুলিকে বলা হয় "জীবন ধারণের আবশ্যকীয় সামগ্রী" (necessaries for life)। (খ) জীবন ধারণের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করিয়া সম্পদ উৎপাদন করিতে হয় ; অতএব মানুষের কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মানুষের কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখা একটী অভাব। যে সামগ্রীগুলির দ্বারা মানুষের কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিবার বা বর্দ্ধিত করিবার অভাব পূরণ করা হয় সেই গুলিকে বলা হয় "কর্ম্মক্ষমতার আবশ্যকীয় সামগ্রী" (necessaries for efficiency) —যথা পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে গৃহ ইত্যাদি। (গ) মানুষের জীবনে গোটাকয়েক অভাব আছে যেগুলি পূরণ না করিলে বাঁচিয়া থাকা বা কর্ম্ম-ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব অথচ যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে মানুষ মিটাইয়া থাকে ; এইগুলি অভ্যাস জনিত অভাব বা গতানুগতিক প্রথানুসারে অভাব। মানুষ বরং কষ্ট করিবে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এইগুলিকে যথাসাধ্য মিটাইবেই। যে সামগ্রীগুলির দ্বারা এই ধরনের অভাব মিটানো হয়, সেগুলিকে বলা হয় "অভ্যাসজনিত আবশ্যকীয় সামগ্রী" (conventional necessaries) যথা, চা, পান, তামাক ইত্যাদি।

(২) আরাম সামগ্রী—(Comforts)—যে সামগ্রীগুলির দ্বারা মানুষ আরামভোগ করিতে পারে সেই সামগ্রীগুলিকে বলা হয় আরাম সামগ্রী (comforts) যথা, মুখরোচক খাদ্য, আরামপ্রদ বস্ত্র, উত্তম গৃহ ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আরাম-সামগ্রীগুলির ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষমতাও বাড়িতে পারে। যেমন মুখরোচক খাদ্য গ্রহণ করিলে, উৎকৃষ্ট গৃহে বসবাস করিলে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু "আরাম-সামগ্রী" এবং "কর্ম্মক্ষমতার আবশ্যকীয় সামগ্রী",—এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আরাম-সামগ্রী ভোগ করিবার সময়ে উহা হইতে যে আরাম পাওয়া যায় তাহাই হইল আরাম-সামগ্রী ভোগের প্রধান লক্ষ্য ; কর্ম্মদক্ষতা কতখানি বৃদ্ধি পাইবে বা আদৌ পাইবে কিনা তাহা

হিসাব করিয়া আরাম-সামগ্রী ভোগে অগ্রসর হই না। ইহার দ্বারা কর্মক্ষমতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহা নৈমিত্তিক ও গৌণ।

(৩) **বিলাস-সামগ্রী—(Luxuries)** অনেক লোকের এমন গোটাকয়েক অভাব থাকে যেগুলি না মিটানো হইলেও জীবন ধারণ, কর্মক্ষমতা রক্ষা এবং আরামভোগ সম্ভব; এইগুলি হইল বাহুল্যের অভাব। অতিরিক্ত ব্যয়ে যে সামগ্রীর দ্বারা এই বাহুল্যের অভাব মিটানো হয় সেই সামগ্রীগুলিকে বিলাস-সামগ্রী (luxuries) বলা হয়। কোনো কোনো বিলাস-সামগ্রীর ভোগ হইতে আরাম পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা গৌণ মাত্র। বিলাস-সামগ্রীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা সূচনা ও প্রচার করা—যথা, অতিরিক্ত দামী গহনা, পরিচ্ছদ, গাড়ী ইত্যাদি।

(অনু-৪) বিলাস সামগ্রীর ভোগ কি সমর্থনযোগ্য—*Is the use of luxuries justified ?*

অনেক দার্শনিক ও চিন্তানায়ক বিলাস-সামগ্রী ভোগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে দেশের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিরা যখন দুঃখে ও কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয় সেই সময়ে জনকয়েক ধনী ব্যক্তি নিছক ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। ইহা সমর্থনযোগ্য নহে।

অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়া অনেকেই আবার বলিলেন যে ধনবানদের বিলাস-সামগ্রী ভোগ হইতে জন-সাধারণের ও সমাজের অনেক উপকার সাধিত হয়। (১) বিলাস-সামগ্রী ভোগ করিবার প্রলোভনে মানুষকে অধিক পরিমাণে মেহনৎ করিতে হয়; কারণ অধিকতর মেহনতের দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতি করিলে তবেই কোনো ব্যক্তি বিলাস-সামগ্রী ভোগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব ইহাতে মানুষ অধিকতর পরিশ্রমী হয় এবং লোকে অধিকতর পরিশ্রম করে বলিয়া সম্পদ উৎপাদন হয় অধিক পরিমাণে। (২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহা অধিকতর সঞ্চয়ে সহায়তা করে। লোকে বিলাসের জন্য যখন সোনা, রূপা, হীরা অথবা যে কোনো মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করে তখন উহাতে তাহাদের অর্থ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইয়া যায়। পরে অভাবগ্রস্ত হইলে তাহারা ঐগুলিকে বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে। তবে ইহা সম্ভব হয় যখন বিলাস সামগ্রীগুলি বস্তুসামগ্রী; অবস্তু-সামগ্রীর (যথা বহুসংখ্যক ভৃত্যের সেবা) উপর ব্যয় করিলে ব্যয়কারীর তাহাতে সঞ্চয় হয় না। (৩) ধনী ব্যক্তিরা বিলাস সামগ্রী চাহিলে ঐ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হইবে।

ইহাতে জনসাধারণের অধিক পরিমাণে চাকুরীর সংস্থান হইবে ও তাহাদের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে। (৪) ধনী ব্যক্তিরা উন্নত ধরণের শিল্পকলার সামগ্রীসমূহ বিলাস সামগ্রী হিসাবে পছন্দ করে; সেই কারণে তাহাদের বিলাস-অভ্যাস হইতে শিল্প-কলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে বিলাস সামগ্রী দুই প্রকারের আছে; (ক) অনপকারী (harmless)—অর্থাৎ যেগুলি ভোগের দ্বারা ভোগকারীর শারীরিক বা নৈতিক কোনোরূপ অবনতি ঘটে না; এবং (খ) অপকারী (harmful)—অর্থাৎ যেগুলি ভোগ করিলে ভোগকারীর শারীরিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিতে পারে এবং সমগ্র সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। তাঁহারা বলেন যে অপকারী বিলাস সামগ্রী ভোগ সমর্থনযোগ্য নহে কারণ ঐগুলি ভোগের দ্বারা যে উপকার সাধিত হইবে তাহা অপেক্ষা ভোগকারীর ও সমাজের, বহুগুণ অধিক অপকার সাধিত হইবে—যথা নীতি বিগর্হিত ক্লাব প্রতিষ্ঠা বা মদ্যপান ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারা অনপকারী বিলাস সামগ্রীভোগ সমর্থন করেন কারণ উহাতে সমাজের কোনো অপকার সাধিত হয় না, পরন্তু উপরোক্ত সুবিধাগুলি লাভ করা যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনপকারী বিলাস সামগ্রী ভোগও সকল ক্ষেত্রে সমর্থন যোগ্য নহে। প্রত্যেক শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর জন্য গোটাকয়েক মূলবস্তুর প্রয়োজন হয়—যথা লৌহ, কয়লা, কাঁচামাল ইত্যাদি। এই মূলবস্তুগুলি কোনো দেশে অফুরন্ত নাই। কিন্তু এই বস্তুগুলির দ্বারা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ উৎপাদিত হয় আবার ইহাদের দ্বারাই বিলাস সামগ্রীও নির্ম্মিত হয়; যথা, লোহা হইতে কাঠুরিয়ার কুড়াল তৈয়ারী হয় আবার ধনবানের মটরগাড়ীও তৈয়ারী হয়। প্রত্যেক দেশেই এই মূলবস্তুগুলি যখন পরিমিত পরিমাণে রহিয়াছে, তখন বিলাস সামগ্রী যতই অধিক পরিমাণে তৈয়ারী হইবে জনসাধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ ততই অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হইবে। প্রাচুর্য্যের মধ্যেই জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সামগ্রীর একান্ত অভাব—ইহা পরিলক্ষিত হইতে পারে। ইহা এক বিভৎস অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ছবি।

(অনু ৫) জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান—*Standard of living*

মানুষ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে দুইটী জিনিষ দিয়া, দেহ ও মন। নানাবিধ সামগ্রী ভোগের দ্বারা যেমন দেহ সম্বন্ধে বিবিধ অভাব মিটানো প্রয়োজন তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। দেহকে বজায় রাখিবার জন্য এবং তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য

যেমন দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিবিধ সামগ্রীর অভাব মিটানো প্রয়োজন তেমনি মানুষ হিসাবে চিন্তাশক্তির দ্বারা আমাদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করাও প্রয়োজন। কোনো একটী দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বলিতে বুঝায় (১) তাহারা দৈনন্দিন জীবনে যে অভাবগুলি বোধ করে এবং সেই অভাব মিটাইবার জন্য যে সম্পদগুলি ভোগ করে তাহাদের প্রকৃতি ও পরিমাণ,—অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কতগুলি আবশ্যকীয় সামগ্রী, কতগুলি আরাম সামগ্রী ও কতগুলি বিলাস সামগ্রী; এবং (২) তাহাদের চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত কার্য্যের পরিধি।

অতএব কোনো একটী দেশের জনগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান নিচু বলিতে পারা যায় তখন (১) যখন নাকি দৈনন্দিন জীবনে তাহারা অল্পসংখ্যক অভাব বোধ করে এবং সেহেতু অল্পসংখ্যক সম্পদ ভোগ করে এবং এই অল্পসংখ্যক সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশই আবশ্যকীয় সামগ্রী,—আরাম-সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর অনুপাত নগণ্য; (২) উপরন্তু তাহাদের চিন্তাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের পরিধি সীমাবদ্ধ। অথবা কোনো একটী দেশের জনগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান উঁচু বলিতে পারা যায় তখন (১) যখন নাকি তাহারা দৈনন্দিন জীবনে বিবিধ অভাব বোধ করে এবং সেহেতু অধিক সংখ্যক সামগ্রী উৎপাদন ও ভোগ করে। এই অধিক সংখ্যক সামগ্রীর মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আবশ্যকীয় সামগ্রী আছে, উপরন্তু আরাম-সামগ্রী ও বিলাস-সামগ্রীর অনুপাত নগণ্য নহে; (২) উপরন্তু তাহাদের অভাব বোধ এবং অভাব মিটানোর মধ্যে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিন্তাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

অতএব (১) অভাব বোধ ও অভাব তৃপ্তির সংখ্যা এবং (২) ঐ অভাব বোধ ও অভাব তৃপ্তির মধ্যে চিন্তাশক্তির নিয়ন্ত্রণ—এই দুই বিষয়ের উপরে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের মান নির্ভর করে। কোনো একটী দেশের জনগণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের মান উন্নয়ন করিবার উপায় হইল প্রথমতঃ তাহাদের বিভিন্ন অভাব তৃপ্তির জন্য যথেষ্ট পরিমান সামগ্রীর উৎপাদন ও তাহারা যাহাতে ঐ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের যথেষ্ট উপার্জ্জনের ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা তাহাদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ।

(অনু ৬) ভোগকার্য্য—*Consumption.*

মানুষের অভাব তৃপ্তির জন্য সম্পদের ব্যবহার করা হয়। ইহারই নাম ভোগ-কার্য্য (Consumption)। আমরা যখন বলি যে কোনো একটী সামগ্রী বা সম্পদ আমরা ভোগ করিতেছি তাহার অর্থ হইল যে কোনো একটী অভাব তৃপ্ত করিবার

জন্য আমরা কোনো একটী সম্পদ ব্যবহার করিতেছি। শুধু তাহাই নহে, ভোগ-কার্য্যের জন্য সম্পদের ব্যবহার হইবে প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ শব্দটীর দ্বারা এই বুঝায় যে মূলতঃ যে সামগ্রীর আমরা অভাব বোধ করিতেছি ঠিক সেই সামগ্রীটীরই আমরা ব্যবহার করিতেছি। যথা আমরা বস্ত্রের অভাব বোধ করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন করি। এক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারকে ভোগকার্য্য বলা হইবে না, বস্ত্রের ব্যবহারকে ভোগকার্য্য বলা হইবে। কারণ আমাদের মূল অভাব যন্ত্রের নহে—বস্ত্রের। সেইজন্য পেনসন বলেন "অভাব মিটাইবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সম্পদের ব্যবহারকে ভোগকার্য্য বলে।"

সাধারণ কথাবার্ত্তায় "ভোগকার্য্য" বলিতে বুঝায় যে আমরা কোনো একটী সামগ্রী ব্যবহার করিয়া উহা নিঃশেষিত বা ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছি। ইংরাজী "Consumption" শব্দটীর আভিধানিক অর্থই হইল 'ক্ষয়' বা 'ধ্বংস'। কিন্তু অর্থনীতিতে ভোগকার্য্য বা Consumption শব্দটীর একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

মানুষ পৃথিবীর কোনো বস্তু বা পদার্থ (matter) ধ্বংস করিতে পারে না। কোনো একটী সামগ্রীর ব্যবহারের দ্বারা বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র, ধ্বংস-প্রাপ্তি ঘটে না। আগুনের উপর যদি এক কড়াই জল ফুটানো হইতে থাকে তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে কড়াইয়ের মধ্যে জল নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জল নামক পদার্থ ধ্বংস হইয়া যায় নাই। উহা দৃষ্ট পদার্থ হইতে অদৃশ্য পদার্থে অর্থাৎ বাষ্পে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা একটী চেয়ার ব্যবহার করিতে করিতে যখন উহা অব্যবহার্য্য হইয়া যায় তখন বলি উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসলে যে পদার্থ দ্বারা অর্থাৎ কাঠ দ্বারা ঐ চেয়ারটী তৈয়ারী হইয়াছে তাহা থাকিয়া গিয়াছে। এমন কি ঐ কাঠ বহু কাল মাটীতে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যদি মাটীতে পরিণত হইয়া যায় তাহা হইলেও বলিব যে চেয়ারটী নষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু যে বস্তু বা পদার্থের দ্বারা উহা তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা ধ্বংস হয় নাই ; তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে মাত্র।

অতএব ভোগ-কার্য্যের দ্বারা মানুষ কোনো বস্তু বা পদার্থ ধ্বংস করিতে পারে না। কিন্তু যে অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য একটী সামগ্রী আমরা ব্যবহার করি, কিছুদিন ভোগ করিবার পর হয়তো দেখা যাইবে যে আমাদের সেই অভাব মিটাইবার ক্ষমতা ঐ সামগ্রীর নাই। অর্থাৎ একটী সামগ্রী ভোগ করিয়া আমরা উহার অভাব মিটাইবার ক্ষমতাটীকে নিঃশেষিত করিয়া দেই ; উহার "প্রয়োজনীয়তা" (utility) আমরা ব্যবহার করিয়া লই। অতএব ভোগকার্য্য দ্বারা বুঝায় কোনো

একটী সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের দ্বারা উহার প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষয় বা ধ্বংস করা।

Questions & Hints

1. Analyse the characteristics of human wants. [অনুচ্ছেদ-২]

2. Human wants are usually classified as necessaries, comforts and luxuries. Examine this classification (1948) [অনুচ্ছেদ-৩]

3. Explain what is meant by the standard of life (1944) [অনুচ্ছেদ-৫]

4. Can luxuries be economically justified ? [অনুচ্ছেদ-৪]

চতুর্থ অধ্যায়

প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা

Utility and Demand

(অনুচ্ছেদ-১) প্রয়োজনীয়তার অর্থ—*Meaning of utility*

একটী সামগ্রী কোনো মানুষের কোনো অভাব মিটাইতে সক্ষম হইলে ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা (utility) আছে বলা হয়। অতএব প্রয়োজনীয়তার অর্থ হইল মানুষের কোনো অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয়তার সহিত নীতির সম্পর্ক নাই। মানুষের কোনো কোনো অভাব বোধ নীতির দিক হইতে আপত্তিকর হইতে পারে; কিন্তু উহা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যদি কোনো সামগ্রীর থাকে তাহা হইলেই ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে বলা হইবে।

উপরন্তু ব্যক্তি অনুযায়ী কোনো সামগ্রীর "প্রয়োজনীয়তা"র বর্ত্তনশীলতা (variation) বা তারতম্য আছে। একজন ব্যক্তি যে অভাব বোধ করে অপর ব্যক্তি হয়তো সে অভাব বোধ করে না। অতএব একজনের কাছে যে সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে, অপরজনের কাছে সে সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা নাই।

অতএব প্রয়োজনীয়তার দুইটী বৈশিষ্ট্য আছে—(১) ইহার সহিত নৈতিক উপযোগিতার সম্পর্ক নাই এবং (২) ইহা বর্ত্তনশীল।

(অনু-২) ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম—*Law of Diminishing utility.*

মানুষের অভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটী হইল এই যে একজন ব্যক্তির কোনো একটী বিশেষ সামগ্রীর অভাব সম্পূর্ণভাবেই মিটিয়া যাইতে পারে (১৬-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অভাবের এই বৈশিষ্ট্য হইতে "ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম" স্থাপিত হইয়াছে। একজন ব্যক্তি যদি একটী বিশেষ সামগ্রীর অভাব বোধ করে এবং সেই অভাব মিটাইতে সক্ষম এইরূপ কোনো সামগ্রী যত পরিমাণে সে ভোগ করিতে

চাহে তত পরিমানেই ভোগ করিতে পায়, তাহা হইলে তখনকার মতন তাহার সেই অভাব সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাইবে। সেক্ষেত্রে ঐ সামগ্রীটীর প্রয়োজনীয়তা তাহার কাছে আর থাকে না, কারণ তখনকার মতন ঐ সামগ্রীটী ঐ ব্যক্তির অভাব মিটাইবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে; অভাব মিটাইবার ক্ষমতার নামই "প্রয়োজনীয়তা"।

যথা, আমি যখন খুব ক্ষুধার্ত্ত বোধ করি তখন আমার কাছে খাদ্যের অভাব অত্যধিক। কিন্তু আমি যদি খাদ্য খাইতে আরম্ভ করি তাহা হইলে এমন অবস্থা আসিতে বাধ্য যখন আমার খাদ্যের অভাব সেই সময়কার মতন সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাইবে। ঐ অবস্থা আসিবার পরে, সেই সময়কার মতন, আমার কাছে খাদ্যের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। খাদ্যের পক্ষে যেরূপ, প্রত্যেক সামগ্রীর পক্ষেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। একটি লোকের একটি বিশেষ সামগ্রীর অভাব সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোন একটী অভাব তৃপ্ত করিবার ক্রিয়া আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অভাবটী চকিতেই সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যায় না। আমি যখন খুব ক্ষুধার্ত্ত হইবার দরুণ খাদ্যের অভাব বোধ বোধ করি তখন এক গ্রাস খাদ্য খাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাব সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যায় না। আমি যতই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করি—অর্থাৎ এক গ্রাসের পর আর এক গ্রাস;—এই ভাবে খাইতে থাকি, ততই ধীরে ধীরে আমার নিকট খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসিতে থাকে। প্রত্যেক বস্তু-সামগ্রী ও অবস্তুসামগ্রী ভোগের পক্ষে এই একই কথা প্রযোজ্য। একটী লোক যে কোনো একটী সামগ্রীর ভোগ কার্য্য যতই পরিমাণে বৃদ্ধি করে ততই তাহার নিকট ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা **ক্রমশঃ** হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই অভিজ্ঞতাকেই অর্থনীতিবিজ্ঞান একটী সূত্র বা নিয়মের আকারে ব্যক্ত করে। 'মার্শাল' বলেন, "একজন লোকের নিকট কোনো একটী সামগ্রী যে পরিমাণে আছে সেই পরিমাণ যদি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বর্দ্ধিত করা হয় তাহা হইলে উহার সমগ্র পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু বর্দ্ধিত মাত্রাটুকু হইতে লভ্য বাড়তি সুবিধা (অর্থাৎ সন্তুষ্টি বা প্রয়োজনীয়তা) কমিয়া যায়।" ["The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with the growth of the stock that he already has"—MARSHALL.]

দৃষ্টান্ত ঃ—ধরা যাক, রামবাবুর বস্ত্রের একান্ত অভাব ; এবং আরও অনুমাণ করা যাক যে তিনি বস্ত্রের জন্য যে দাম দিতে রাজী আছেন ঐ দাম হইল তাঁহার নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ। ধরা যাক রামবাবু একখানি বস্ত্রের জন্য ২০৲ টাকা মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন। এই ধুতিখানির প্রয়োজনীয়তা তাঁহার নিকট ২০৲ টাকার মতন। ঐ দামে তিনি ঐ ধুতিটী কিনিলেন। হয়তো বস্ত্র বিক্রেতা তাঁহাকে আরেকখানি বস্ত্র বিক্রয় করিতে চাহিল। কিন্তু এক্ষেত্রে রামবাবু প্রথম বস্ত্রটীর জন্য যে দাম দিতে চাহিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বস্ত্রটির জন্য তত বেশী দাম দিতে রাজী হইবেন না ; তিনি হয়তো ২য় বস্ত্রটীর জন্য ১৫৲ টাকা দিতে রাজী হইলেন। কারণ, বস্ত্রের যখন তাঁহার একান্ত অভাব ছিল তখন ১ম বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা তাঁহার নিকট যত অধিক ছিল, ১ম বস্ত্রটী কিনিবার পর ২য় বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা তত অধিক হইবে না,—তাহা অপেক্ষা কম হইবে। এক্ষেত্রে রামবাবু ২য় বস্ত্রখানি কিনিবার পর তাঁহার নিকট বস্ত্রের পরিমাণ একখানি হইতে দুইখানিতে বৃদ্ধি পাইল কিন্তু বর্দ্ধিত মাত্রাটীর (অর্থাৎ ২য় বস্ত্রটীর) প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বের অপেক্ষা কমিয়া গেল। এইভাবে রামবাবু তাঁহার বস্ত্রের পরিমাণ যতই বর্দ্ধিত করিতে থাকিবেন ততই তাঁহার নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসিবে।

(অনু-৩) প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ও মোট প্রয়োজনীয়তা—
Marginal Utility and Total Utility

ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম বর্ণনা করে যে একজন ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী যতই পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, ততই তাহার কাছে ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসিবে। এই স্থানে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একজন লোক একই সামগ্রী অধিক পরিমাণে খরিদ করিতে করিতে, খরিদ কার্য্যের মধ্যে এমন স্থানে আসিয়া পড়িবে যখন নাকি তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, ঐ একই সামগ্রী আর অধিক পরিমাণে খরিদ করা তাহার উচিত কি না—কারণ তাহাকে সামগ্রীটি ক্রয় করিবার জন্য অর্থ প্রদান করিতে হইতেছে। এই সন্দেহাকুল মনে ঐ সামগ্রীর যে মাত্রা বা পরিমাণ সে খরিদ করিবে, যাহার পর সে আর ঐ সামগ্রী খরিদ করিবে না—সেই মাত্রা বা পরিমাণকে বলা হয় "প্রান্তিক খরিদ" (Marginal Purchase)। এই প্রান্তিক খরিদের তাহার কাছে যতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া খরিদ্দারটী মনে করে ততখানি প্রয়োজনীয়তাকে বলা হয় "প্রান্তিক-প্রয়োজনীয়তা" (Marginal Utility)।

দৃষ্টান্তঃ—ধরা যাক দুইখানি বস্ত্র ক্রয় করিবার পর রামবাবুকে আর একখানি বস্ত্র ক্রয় করিতে বলা হইল। রামবাবু দেখিলেন যে ১ম ও ২য় বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার বস্ত্রের প্রয়োজন কতকাংশে মিটিয়া গিয়াছে—অতএব ৩য় বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা তাঁহার নিকট ২য় বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম (ঠিক যে কারণে ২য় বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা ১ম বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম হইয়াছিল)। অতএব তিনি ২য় বস্ত্রটীর জন্য যদি ১৫৲ টাকা দাম দিতে রাজী ছিলেন, ৩য় বস্ত্রটীর জন্য উহা অপেক্ষা কম, ধরা যাক্ ১০৲ টাকা দাম দিলেন কিন্তু উহার পরে আর কোনো বস্ত্র কিনিলেন না। এক্ষেত্রে ৩য় বস্ত্রটী হইল তাঁহার "প্রান্তিক খরিদ" এবং উহার প্রয়োজনীয়তা ১০৲ টাকার সমান।

"মোট প্রয়োজনীয়তা" (Total Utility) বলিতে বুঝায় একটী সামগ্রীর যতগুলি মাত্রা একজন ব্যক্তি খরিদ করিয়াছে, সেই সব মাত্রাগুলির প্রয়োজনীয়তার যোগফল। অতএব "মোট প্রয়োজনীয়তা"র মধ্যে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তাও নিহিত, উপরন্তু প্রান্তিক খরিদের পূর্ব্বে যে মাত্রাগুলি খরিদ করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তাও মোট প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আছে।

দৃষ্টান্তঃ—রামবাবু যে ৩খানি বস্ত্র খরিদ করিয়াছেন উহার মধ্যে প্রথম বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা হইল ২০৲ টাকা, ২য় বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা হইল ১৫৲ টাকা, ৩য় বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা হইল ১০৲ টাকা; এক্ষেত্রে রামবাবুর নিকট বস্ত্রের "মোট প্রয়োজনীয়তা" হইল (২০৲+১৫৲+১০৲)=৪৫৲ টাকা—অর্থাৎ সব মাত্রাগুলির একত্রিত প্রয়োজনীয়তা।

অতএব "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" এবং "মোট প্রয়োজনীয়তা"র মধ্যে প্রভেদ হইল :—(১) একটী সামগ্রীর যতগুলি মাত্রা একজন ব্যক্তি খরিদ করিবে উহার **শেষ মাত্রাটীর** প্রয়োজনীয়তা হইল ঐ ব্যক্তির নিকট ঐ সামগ্রীর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা; কিন্তু **সকল মাত্রাগুলির** প্রয়োজনীয়তা যোগ করিলে যাহা হইবে—উহাই হইল ঐ সামগ্রীর মোট প্রয়োজনীয়তা। (২) একটি সামগ্রী অধিক মাত্রায় ক্রয় করিতে থাকিলে উহার মোট প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে।

(অনু-৪) চাহিদা—*Demand*

কোনো একটী সামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা হইতে, সেই সামগ্রীর "চাহিদা"র উদ্ভব হয়; কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন "চাহিদার" দুইটী বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ চাহিদা বলিতে একটী নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের আকাঙ্ক্ষা বুঝাইবে

আমি যদি বলি, "আমার চাহিদা আছে" বা "আমি চাহিদা করি" তাহা হইলে "অর্থনীতি"তে উহার কোনোই অর্থ হইল না—আমাকে বলিতে হইবে আমি কোন্ সামগ্রীর চাহিদা করি এবং কি পরিমাণে, যথা—আমার একমণ চাউলের চাহিদা আছে" অথবা "আমি দুইখানি ধুতির চাহিদা করি।" দ্বিতীয়তঃ আমি **কোন্ সামগ্রীর** চাহিদা করি তাহা বলা সহজ (কারণ যে সামগ্রী আমি আকাঙ্ক্ষা করি এবং যাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি তাহার নাম আমি অক্লেশেই করিতে পারি) কিন্তু ঐ সামগ্রী **কত পরিমাণে** চাহিদা করি তাহা সহসা বলিতে পারিব না ; কারণ একটী সামগ্রী কত পরিমাণে কিনিব তাহা নির্ভর উহার দামের উপরে ; বিক্রেতা কত দামে ঐ সামগ্রী দিতে পারে তাহা জানিলে তবেই ক্রেতা বলিতে পারে কত পরিমাণে সে ঐ সামগ্রী কিনিবে। বিক্রেতা কম দাম চাহিলে ক্রেতা হয় তো বেশী পরিমাণ কিনিবে এবং বেশী দাম চাহিলে সে কম করিয়া কিনিবে। 'ওয়াকার' বলেন, "চাহিদা বলিতে বুঝায় একটী নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা একটী নির্দ্দিষ্ট দামে গৃহীত হইতে পারে।" ["Demand means the quantity of a given article which would be taken at a given price". WALKER]

(**অনু-৫**) **চাহিদার নিয়ম**—*Law of Demand.*

একটী সামগ্রীর দামের সহিত উহার চাহিদার সম্পর্ক কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটী নিয়ম আছে ; উহার নাম "চাহিদার নিয়ম" (Law of Demand)। সামগ্রীর দাম যখন চড়া থাকে, তখন কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরা এবং যাহাদের নিকট উহা অবশ্যই প্রয়োজনীয় তাহারাই উহা কিনিতে পারিবে। উহার দাম যদি কমিতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব দামে উহা কিনিতে যাহাদের সঙ্গতি ছিল না কিন্তু কম্‌তি দামে কিনিবার মতন সঙ্গতি আছে তাহারাও এখন উহা কিনিবে। উপরন্তু চড়া দামে ঐ সামগ্রী ভোগ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া যাহারা মনে করিত না তাহাদের অনেকেই কম্‌তি দামে ঐ সামগ্রী ভোগ করা পোষাইবে বলিয়া মনে করিবে। অতএব একটি সামগ্রীর দাম যতই কমিতে থাকিবে উহার চাহিদা ততই বাড়িতে থাকিবে।

অপর পক্ষে একটি সামগ্রীর দাম যদি কম থাকে তাহা হইলে উহা ক্রয় করা অনেকের সঙ্গতিতে কুলাইবে এবং কম দামে অনেকেই উহাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে। অতএব ঐ সামগ্রীর চাহিদা থাকিবে বেশী। কিন্তু কোন কারণে যদি উহার দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অনেকের উহা

কিনিতে সঙ্গতিতে কুলাইবে না আবার অনেকের সঙ্গতিতে কুলাইলেও ঐ দামে উহা খরিদ করা তাহারা পোষায় না বলিয়া মনে করিবে—অর্থাৎ দামের তুলনায় ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা তাহাদের নিকট কম। এক্ষেত্রে চাহিদা কমিয়া যাইবে।

এই বিষয়টিই "চাহিদার নিয়ম" ব্যাখ্যা করে। চাহিদার নিয়ম বলে—যে কোন একটি সামগ্রীর দামের সহিত উহার চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক। দাম যদি বৃদ্ধি পায় চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং দাম যদি হ্রাস পায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। †

(অনু-৬) চাহিদা দাম—*Demand Price*

একজন ব্যক্তি কোন একটি সামগ্রীর একমাত্রা খরিদ করিবার জন্য যে দাম দিতে ইচ্ছুক থাকিবে তাহাই হইল ঐ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সামগ্রীর চাহিদা দাম (*Demand Price*)। এই দাম দিয়াই সে যে ঐ সামগ্রীটি খরিদ করিল এমন কোন নিশ্চয়তা নাই—এই দাম সে চাহিদাকারী হিসাবে তাহার তরফ হইতে দিতে প্রস্তুত আছে। ঐ ব্যক্তি একটী সামগ্রীর একটী মাত্রা হইতে যতখানি প্রয়োজনীয়তা পাইবে বলিয়া আশা করে সেই অনুযায়ী সে উহার চাহিদা দাম স্থির করিবে।

(অনু-৭) চাহিদা-তালিকা—*Demand Schedule*

একজন লোক একই সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে। অতএব একজন ব্যক্তি একটী সামগ্রীর বিভিন্ন দামে কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণে উহার চাহিদা করিবে তাহার একটী তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব। যথা:—

ধুতির দাম ২০৲ টাকা হইলে রামবাবু ১খানি ধুতির চাহিদা করিবেন;
„ „ ১৫৲ „ „ „ ২ „ „ „ „
„ „ ১০৲ „ „ „ ৩ „ „ „ „

এই ভাবে একই সামগ্রীর বিভিন্ন দাম দাবী করিলে ঐ সামগ্রীর যে বিভিন্ন পরিমাণ একজন ব্যক্তি চাহিদা করিবে—তাহার তালিকাকে ঐ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সামগ্রীর "চাহিদা-তালিকা" (Demand Schedule) বলা হয়।

"কোনো একটী সামগ্রীর চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত হইবার জন্য আমাদের জানিতে হইবে যে একটি সামগ্রী যত বিভিন্ন দামে বিক্রয় হওয়া সম্ভব, উহাদের

† "A rise in price diminishes demand and a fall in price increases demand."
—MORELAND.

প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কত পরিমাণ সামগ্রী সে (অর্থাৎ চাহিদাকারী) ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।……যে বিভিন্ন দাম সে দিতে ইচ্ছুক তাহার তালিকা হইতে,—অর্থাৎ সামগ্রীটির বিভিন্ন পরিমাণের জন্য তাহার বিভিন্ন চাহিদা দাম হইতে, তাহার চাহিদার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।" (মার্শাল) †

উহা হইল ব্যক্তি বিশেষের কাছে একটি সামগ্রীর চাহিদা-তালিকা (Individual Demand Schedule); কিন্তু কোন সামগ্রীর বাজারে—অর্থাৎ যেক্ষেত্রে একটী সামগ্রীর অনেক খরিদ্দার—প্রত্যেক খরিদ্দারের একইরূপ চাহিদা তালিকা হইবে না; একই দ্রব্যের জন্য গরজ অনুযায়ী কেহ হয়তো অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে এবং কেহ হয়তো কম দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমাণ করা হয় যে বিভিন্ন খরিদ্দারের বিভিন্ন গরজ পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি হইয়া যায় § এবং সমষ্টিগতভাবে বাজারের সমস্ত খরিদ্দারদের কোনো সামগ্রী সম্বন্ধে একটি চাহিদা তালিকা প্রস্তুত হইয়া যায়। ইহাকে বলা হয় বাজার চাহিদা তালিকা। (Market Demand Schedule); যথা,—

ধুতির	দাম	যখন	২০৲	টাকা.	তখন	বাজারে	মোট	ধুতির	চাহিদা	হইবে	৫ খানি
"	"	"	১৬৲	"	"	"	"	"	"	"	১১ "
"	"	"	১৩৲	"	"	"	"	"	"	"	১৮ "
"	"	"	১০৲	"	"	"	"	"	"	"	২৪ "
"	"	"	৭৲	"	"	"	"	"	"	"	৩৫ "
"	"	"	৪৲	"	"	"	"	"	"	"	৫০ "

(অনু-৮) ভোগকারীর উদ্বৃত্ত

কখনো কখনো এইরূপ ঘটে যে একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রী হইতে যতখানি প্রয়োজনীয়তা লাভ করে তাহার তুলনায় কম দামেই সে ঐ সামগ্রীটী কিনিতে সক্ষম হয়। প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে যত দাম সে দিতে রাজী হইত তাহা,—অর্থাৎ তাহার চাহিদা দাম,—অপেক্ষা কম দাম দিয়াই সে ঐ সামগ্রীটী ক্রয় করিতে পারে। এই বাড়তি সুবিধাটুকু (যাহা সে ভোগ করে অথচ যাহার জন্য সে দাম দেয় না) হইল ভোগকারী হিসাবে তাহার বাড়তি ভোগ; ইহারই নাম "ভোগকারীর উদ্বৃত্ত"

---

† Principles of Economics.

§ "The variety and the fickleness of individual action are merged in the comparatively regular aggregate of the action of many"—MARSHALL 'Principles of Economics'.

(Consumer's Surplus)। যথা—একজন লোক একস্থান হইতে অপর স্থানে কোন সংবাদ পাঠাইতে হয়তো ১৲ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিন পয়সা দিয়া পোষ্টকার্ড কিনিয়া সে ঐ কাজটী করিতে পারে। এক্ষেত্রে সওয়া পনের আনা হইল ভোগকারী হিসাবে তাহার উদ্বৃত্ত। একটী সামগ্রীর জন্য ক্রেতা যত দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইতে যতদাম সে প্রকৃত পক্ষে দিল উহা বাদ দিলে, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই হইল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত। অর্থাৎ, চাহিদা-দাম – প্রকৃত দাম = ভোগকারীর উদ্বৃত্ত।

(অনু-৯) চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা—*Elasticity of Demand.*

"চাহিদার নিয়ম" বলে—যে কোনো সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন হইলে, উহার চাহিদার বিপরীতমুখী পরিবর্ত্তন হয়; দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কমিয়া যায়। একটি সামগ্রীর দামের পরিবর্ত্তনের সহিত উহার চাহিদার প্রসার (বৃদ্ধি) হইতে পারে অথবা সঙ্কোচ (হ্রাস) হইতে পারে।

দামের পরিবর্ত্তনের নিকট চাহিদা যে সাড়া দেয়, উহাকে—অর্থাৎ দাম পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্ত্তন-যোগ্যতাকে—চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা আখ্যা দেওয়া হয়।

কোন কোন ব্যক্তির কাছে বা কোন বিশেষ অবস্থায় একাধিক ব্যক্তির কাছে, কোন একটী সামগ্রীর দামের পরিবর্ত্তন হইলেও, চাহিদার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। যথা লবণের দাম যদি ।০ আনা হইতে কমিয়া ৵০ আনা হয় তাহা হইলেও আমি প্রতি মাসে যত পরিমাণ লবণ ক্রয় করিতাম ঠিক তত পরিমাণই ক্রয় করিব, বেশী ক্রয় করিব না; অপর পক্ষে লবণের দাম যদি ।০ হইতে ।/০ আনায় উঠে তাহা হইলেও আমার লবণের যতখানি চাহিদা ছিল ততখানিই থাকিবে কমিয়া যাইবে না। দামের পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না; এক্ষেত্রে বলা হইবে যে ঐ সামগ্রীটীর চাহিদা **"সঙ্কোচ প্রসার বিহীন"** (Inelastic Demand)। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, যে সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন উহার ক্ষেত্রে "চাহিদার নিয়মের" (law of demand) ব্যতিক্রম হইল।

কিন্তু বহু সামগ্রী আছে যাহাদের ক্ষেত্রে "চাহিদার নিয়ম" কার্য্যকরী হয় অর্থাৎ "দামের বৃদ্ধি চাহিদাকে কমাইয়া দেয় এবং দামের হ্রাস চাহিদাকে বাড়াইয়া দেয়।" যে সকল সামগ্রীর ক্ষেত্রে "চাহিদার নিয়ম" ক্রিয়া করে, উহাদের চাহিদা **"সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম"** (Elastic Demand) বলা হয়।

কিন্তু যে সকল সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার আছে, উহাদের সকলেরই

চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা সমান নহে; অর্থাৎ বিভিন্ন সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্ত্তন বিভিন্ন হারে হইতে পারে। (ক) কোন কোন সামগ্রীর দাম সামান্য পরিবর্ত্তন হইলে চাহিদার পরিবর্ত্তন হয় অত্যধিক। এক্ষেত্রে বলা হইবে ঐ সামগ্রীটীর "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা" অত্যধিক (Elasticity of Demand is great); (খ) কোন কোন সামগ্রীর দাম সামান্য পরিবর্ত্তন হইলে চাহিদার পরিবর্ত্তন হয় অল্পই। এক্ষেত্রে বলা হইবে ঐ সামগ্রীটীর "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা" অল্প (Elasticity of Demand is small); (গ) কোন কোন সামগ্রী আছে যাহাদের দামের পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা অত্যধিক নহে অল্পও নহে—দামের পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্ত্তন সমহার বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে বলা হয়, সামগ্রীটীর "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা" না-অধিক না-অল্প (Elasticity of Demand is unity)।

কিন্তু কি করিয়া জানা যাইবে যে একটী সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্ত্তন অত্যধিক হইয়াছে, বা অল্প হইয়াছে, বা অধিক ও অল্পের মাঝামাঝি হইয়াছে? ইহার উত্তর হইল যে দামের পরিবর্ত্তন যে হারে (rate) হইয়াছে চাহিদার পরিবর্ত্তন যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হারে হয়—তাহা হইলে চাহিদার পরিবর্ত্তন অধিক হইয়াছে বলা হইবে; দামের পরিবর্ত্তন যে হারে হইয়াছে চাহিদার পরিবর্ত্তন যদি তাহা অপেক্ষা কম হারে হয়, তাহা হইলে চাহিদার পরিবর্ত্তন অল্প হইয়াছে বলা হইবে; এবং দামের পরিবর্ত্তন যে হারে হইয়াছে চাহিদার পরিবর্ত্তন যদি ঠিক সেই হারেই হয়, তাহা হইলে বলা হইবে, চাহিদার পরিবর্ত্তন না-অধিক না-অল্প।

দৃষ্টান্তঃ—ধরা যাক্ একটী কলমের দাম ১২৲ টাকা এবং ঐ দামে প্রতি বৎসর ১০০টী কলম বিক্রয় হয়,—অর্থাৎ ১২৲ টাকা দামে কলমের চাহিদা ১০০।

(ক) কোনো কারণে কলমের দাম বাড়িয়া ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা হইল। দাম বাড়িল ১২৲ টাকায় ৩৲ টাকা—অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ। 'চাহিদার নিয়ম' অনুযায়ী দাম বৃদ্ধির সহিত চাহিদা কমিবে। ধরা যাক্ কলমের চাহিদা ১০০ হইতে কমিয়া ৭০টীতে দাঁড়াইবে। অর্থাৎ চাহিদা শতকরা ৩০ ভাগ কমিল। কলমের দাম যে অনুপাতে বাড়িয়াছে (২৫%) উহার চাহিদা তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে (৩০%) কমিয়াছে। এক্ষেত্রে "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা" অধিক (Elasticity of Demand is great)।

(খ) কলমের দাম যখন ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা হইল অর্থাৎ

ধরা যাক্ উহার চাহিদা ১০০ হইতে ৮০তে নামিল—চাহিদা শতকরা ২০ ভাগ কমিল। কলমটীর দাম যে হারে বাড়িয়াছে (২৫%) উহার চাহিদা তাহা অপেক্ষা কম হারে (২০%) কমিয়াছে। এক্ষেত্রে বলা হইবে "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা" অল্প (Elasticity of Demand is small)।

(গ) কলমের দাম যখন ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ হইল—তখন ধরা যাক্ উহার চাহিদা ১০০ হইতে ৭৫টীতে নামিল, অর্থাৎ চাহিদা শতকরা ২৫ ভাগ কমিল। কলমটির দাম যে হারে বাড়িয়াছে (২৫%) উহার চাহিদা ঠিক সেই হারেই (২৫%) কমিয়াছে। এক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্ত্তন দাম পরিবর্ত্তনের সহিত সমহার বিশিষ্ট—অধিক নহে অল্পও নহে। (Elasticity of Demand is unity)।

[এই দৃষ্টান্তে দাম বাড়িলে চাহিদার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহাই দেখানো হইল। দাম কমিলে ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে অর্থাৎ চাহিদা বাড়িবে। তবে দাম যে অনুপাতে কমিয়াছে চাহিদা তাহা অপেক্ষা (ক) অধিক অনুপাতে বাড়িতে পারে, বা (খ) তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতে বাড়িতে পারে অথবা (গ) ঠিক সেই অনুপাতেই বাড়িতে পারে।]

অতএব দেখা যায় কোনো কোনো সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার মোটেই পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম হইল এবং ইহাদের "চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন" (Inelastic demand) বলা হইবে। ইহাদের বাদে যে সকল সামগ্রীর দাম—পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্ত্তন হয়—তাহাদের সকলেরই "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা" (Elasticity of Demand) আছে বলা হইবে। তবে সকল সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা একই রূপ নহে; কোনো চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অধিক (Elasticity of demand is great); কাহারও বা অল্প (Elasticity of demand is small); কাহারও বা কম নহে, বেশীও নহে,—মাঝামাঝি (Elasticity of demand is unity)।

অতএব 'মার্শাল' বলিলেন, "দামের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হ্রাসের সহিত চাহিদার পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পায় কি অল্প বৃদ্ধি পায় এবং দামের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত চাহিদার পরিমাণ অধিক কমিয়া যায় কি অল্প কমিয়া যায়—সেই অনুযায়ী বাজারে চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (বা সাড়া দিবার ক্ষমতা) অধিক হইতে

পারে বা অল্প হইতে পারে।" ["The elasticity (or responsiveness) of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price"]*

(অণু-১০) বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—
Elasticity of demand for different kinds of goods.

সকল সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা একইরূপ নহে; তবে কি ধরণের সামগ্রীর সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা কি পরিমাণে তাহার একটী মোটামুটি বিশ্লেষণ অর্থনীতিবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন।

(১) অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম চাহিদা (great elasticity)

(অ) যে সামগ্রীগুলি বিভিন্নভাবে ভোগ করা যায় অর্থাৎ যেগুলি বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে (যথা চিনি) সেইগুলির চাহিদা অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম। এইরূপ সামগ্রীর দাম কমিলে বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহারের জন্য ইহার চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে এবং দাম বাড়িলে যে কার্য্যে উহা ব্যবহার না করিলে নয়, শুধু সেই কার্য্যের জন্যই উহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে এবং চাহিদা অত্যধিক কমিয়া যাইবে। (আ) আরাম-সামগ্রী ও বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা সাধারণতঃ অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়। এইগুলি ভোগের স্পৃহা বহু ব্যক্তির থাকে—সাধ্যে কুলাইলেই তাহারা উহা ভোগ করিবে; সেইজন্য ইহাদের দাম কমিলে চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। অপর পক্ষে জীবন ধারণের জন্য এইগুলি অবশ্যম্ভাবী নহে—অতএব দাম বৃদ্ধি হইলে অনেকেই উহার ব্যবহার সহজেই ত্যাগ করিবে এবং চাহিদা অত্যধিক কমিয়া যাইবে; যথা ঝরণা কলম, কলের গান, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি। (ই) যে সকল সামগ্রীর অপর কোনো প্রতিযোগী সামগ্রী আছে (যেমন চিনির প্রতিযোগী সামগ্রী হইল গুড়, ট্রামের প্রতিযোগী হইল বাস) উহাদের দামের পরিবর্ত্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্ত্তন হয় অত্যধিক।

(২) অল্প সঙ্কোচ প্রসারক্ষম চাহিদা (small elasticity)

যে সকল সামগ্রী জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় (necessaries for life) এবং যেগুলি অভ্যাসজনিত আবশ্যকীয় সামগ্রী (conventional necessaries) যথা চাউল, চা, পান ইত্যাদি—সেগুলির চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা কম।

MARSHALL—'Principles of Economics' page 102.

কারণ, ঐগুলির দাম বাড়িলেও আবশ্যকীয় সামগ্রী হিসাবে, সাধারণ লোকে যত পরিমাণে তাহাদের সাধ্যে কুলাইবে তত পরিমাণে খরিদ করিবে; আবার দাম কমিলে সাধারণ লোকে যে পরিমাণে এইগুলি ক্রয় করে তাহা অপেক্ষা হয়তো সামান্য অধিক কিনিবে।

(৩) সঙ্কোচ প্রসারবিহীন চাহিদা (Inelastic demand)

যে সামগ্রীসমূহের চাহিদা অল্প সঙ্কোচ প্রসারক্ষম তাহাদের মধ্যেকার গোটাকয়েক সামগ্রীর স্থান কাল·পাত্র ভেদে মোটেই সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের ক্ষেত্রে "চাহিদার নিয়মের" ব্যতিক্রম হয়। যথা আমাদের দেশে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট লবণের দাম একটু কমিলে বা একটু বাড়িলে উহার চাহিদার মোটেই পরিবর্ত্তন হইবে না। সাধারণ লোকদের পক্ষে 'চা' এইরূপ একটী সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। শীতকালে বৈদ্যুতিক পাখার মাসিক ভাড়া যদি (ধরা যাক) ১০৲ টাকা হইতে দশ পয়সায় কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও কেহ উহা ভাড়া করিবে না; এক্ষেত্রে ঐ সময়ে ঐ সামগ্রীর চাহিদা সম্পূর্ণ "সঙ্কোচ প্রসার বিহীন"।

Questions & Hints.

1. State and explain the law of diminishing utility. [অণুচ্ছেদ-২]

2. State and explain the relation between marginal utility and total utility. Illustrate your answer by means of an example. (1942)-[অণুচ্ছেদ-৩]

3. Write notes on (i) Demand (ii) Demand Schedule (iii) Consumers surplus. [অণুচ্ছেদ-৪; ৭ ও ৮]

4. What do you understand by elasticity of demand? Consider the elasticity of demand in the case of wheat, salt, watches and furniture (1931) [অণুচ্ছেদ-৯] [গম ও লবণের চাহিদা অল্প সঙ্কোচ প্রসারক্ষম কিন্তু ঘড়ি ও আসবাবের চাহিদা অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম।]

পঞ্চম অধ্যায়

ভোগ কার্য্য সম্পর্কে অধিকতর বিবেচনা

Further Considerations about Consumption.

(**অণুচ্ছেদ-১**) **উপার্জ্জন**—*Income.*

একজন ব্যক্তি যে সকল সামগ্রীর অভাব বোধ করে সেগুলি যদি সে নিজের প্রয়োজনমত সরাসরি উৎপাদন করে ও তাহাদের দ্বারা অভাব তৃপ্তি করে তাহা হইলে বলা হয় যে তাহার উৎপাদিত সামগ্রী হইতে সে যে তৃপ্তি পায় তাহাই হইল তাহার উপার্জ্জন। আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষ ক্ষুধা পাইলে নিজেই বন্য জন্তু শীকার করিয়া আনিত, পরিধেয়ের প্রয়োজন বোধ করিলে গাছের বল্কল ছাড়াইয়া লইত, আশ্রয়ের প্রয়োজন হইলে গাছের শাখাপ্রশাখা দ্বারা বাসস্থান তৈয়ারী করিয়া লইত। তাহার নিজের প্রত্যক্ষ চেষ্টায় প্রাপ্ত ঐ বন্যজন্তু, বল্কল ও বাসস্থান হইতে সে যে তৃপ্তি পাইত তাহাই তাহার উপার্জ্জন। সেইজন্য উপার্জ্জনের নাম দেওয়া হয় "নানাবিধ তৃপ্তি প্রবাহ।" আধুনিক সময়ে মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সরাসরি উপার্জ্জন করে না। এক এক ব্যক্তি এক এক প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করে এবং সেইগুলি বাজারে বিক্রয় করিয়া মুদ্রা পায়; এই মুদ্রার সাহায্যে প্রত্যেকেই তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় মুদ্রামান ব্যবস্থা (money economy)।

আধুনিক জগতে এই মুদ্রমান ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার দরুণ প্রত্যেক লোক তাহার উপার্জ্জন করে মুদ্রার হিসাবে। অতএব এক্ষণে "উপার্জ্জন" হইল "মুদ্রা-উপার্জ্জন" (money income)। একজন ব্যক্তি তাহার সকল কার্য্যের দ্বারা মোট যত পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে তাহা হইল সেই ব্যক্তির "সাকুল্য মুদ্রা উপার্জ্জন" (gross money income); কিন্তু এই উপার্জ্জন করিবার জন্য (অর্থাৎ সে যে সামগ্রী উৎপাদন করিয়াছে উহা উৎপাদন করিবার জন্য) তাহাকে

হয়তো কিছু খরচা করিতে হইয়াছে। ঐ ব্যক্তির সাকুল্য মুদ্রা উপার্জ্জন হইতে এই খরচসমূহ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইল উহার নীট মুদ্রা উপার্জ্জন (net money income)।

কিন্তু একজন ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জিত মুদ্রাগুলি তো সরাসরি ভোগ করিবে না,—মুদ্রা খাদ্যও নহে, পরিধেয়ও নহে। মুদ্রার দ্বারা সে তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিবে। একজন ব্যক্তি তাহার নীট মুদ্রা উপার্জ্জন দ্বারা যে সামগ্রীগুলি খরিদ করিবে সেই সামগ্রীসমূহ হইল তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন (Real income) কারণ মানুষ সামগ্রী ভোগ করিবার জন্যই মুদ্রা উপার্জ্জন করে। এই সামগ্রী ভোগের দ্বারা সে অভাবের তৃপ্তি পায়।

অতএব মুদ্রা প্রচলনের পূর্ব্বে যেমন উপার্জ্জনের নাম দেওয়া যাইত তৃপ্তি প্রবাহ, মুদ্রা প্রচলনের পরেও তেমনি একজন ব্যক্তির উপার্জ্জন বলিতে বুঝায় "প্রকৃত উপার্জ্জনের" দ্বারা সে কতখানি তৃপ্তি লাভ করে, তাহা—অর্থাৎ তাহার নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিপ্রবাহ। 'সেলিগম্যান' বলেন ; "অর্থনৈতিক অর্থে, উপার্জ্জন হইল পরিমিত সামগ্রীসমূহ হইতে (লভ্য) তৃপ্তি-প্রবাহ। ["Income, in the economic sense, is the inflow of satisfactions from economic goods"—SELIGMAN.]

অনেকে তাহাদের উপার্জ্জন বর্ত্তমানে সম্পূর্ণভাবে ভোগ না করিয়া, উহা হইতে কিছু উদ্বৃত্ত রাখিয়া দিতে পারে। ভবিষ্যতে ভোগ করিবার জন্য এই উদ্বৃত্ত রাখা হয়। ইহাকে বলা হয় সঞ্চয়। অতএব মানুষ উপার্জ্জনের যে অংশ বর্ত্তমানে ভোগ করিতে পারে কিন্তু তাহা না করিয়া ভবিষ্যতে ভোগ কার্য্যের উদ্দেশ্যে স্থগিত রাখিয়া দেয় সেই অংশকে বলা হয় **সঞ্চয়** (Saving)। অধ্যাপক 'যাইড' সঞ্চয়কে "স্থগিত-কৃত ভোগ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "স্থগিত-কৃত ভোগের অর্থেই আমরা "সঞ্চয়" শব্দটীকে ব্যবহার করি।" ["We use the word "saving"......meaning...consumption postponed"—GIDE].

উপার্জ্জনের যে অংশ ভবিষ্যতের জন্য না রাখিয়া মানুষ বর্ত্তমানের ভোগকার্য্যেই ব্যবহার করিয়া লয়—তাহাকেই বলা হয় ব্যয় (Spending)।

অতএব উপার্জ্জনের, অর্থাৎ তৃপ্তি প্রবাহের, দুইটী অংশ আছে ; (১) বর্ত্তমানের তৃপ্তি এবং (২) ভবিষ্যতের তৃপ্তি। বর্ত্তমানের তৃপ্তিই যদি সমস্ত তৃপ্তি প্রবাহের সমান হয় (অর্থাৎ ব্যয় যদি উপার্জ্জনের সমান হয়) তাহা হইলে ভবিষ্যতের তৃপ্তি সম্ভব নহে (অর্থাৎ সঞ্চয় সম্ভব নহে)। আবার সমস্ত তৃপ্তি প্রবাহ যদি ভবিষ্যতের তৃপ্তির

জন্য রাখিয়া দেওয়া হয় (অর্থাৎ সমস্ত উপার্জ্জন যদি সঞ্চয় করা হয়) তাহা হইলে বর্ত্তমানের তৃপ্তি সম্ভব হয় না (অর্থাৎ বর্ত্তমানের ভোগ কার্য্য সম্ভব হয় না)।

অথচ দুইটাই প্রয়োজন। বর্ত্তমানের ভোগকার্য্য যেমন প্রয়োজন তেমনি বিভিন্ন কারণে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও প্রয়োজন। উপার্জ্জনের কতখানি বর্ত্তমানে ভোগ করা উচিত এবং কতখানি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত এ সম্বন্ধে দুইটী চরম মতবাদ আছে।

(১) কেহ কেহ বলেন যে উপার্জ্জনের মধ্য হইতে যতদূর সম্ভব ব্যয় করা উচিত। লোকে যতই ব্যয় করিবে ততই মঙ্গল। "জনসমষ্টির শ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধনের উপায় হইল যে প্রত্যেকে তাহার উপার্জ্জন সমস্তটাই ব্যয় করিবে।" ["The best way to benefit a community is to spend ones income".] ইহার কারণ তাঁহারা বলেন যে জনসাধারণ তাহাদের উপার্জ্জন যতই ব্যয় করিবে ততই সামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে। সামগ্রীর চাহিদা বাড়িলে নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়া বেশী করিয়া সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। তাহাতে (ক) শ্রমিক প্রয়োজন হইবে বেশী এবং (খ) কাঁচামাল প্রয়োজন হইবে বেশী। অতএব (গ) জনসাধারণের বেশী করিয়া চাকুরীর সংস্থান হইবে এবং (ঘ) যাহারা কাঁচামাল উৎপন্ন করে অর্থাৎ কৃষকগণ বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবে। অতএব একদিকে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি হইবে অন্য দিকে তাহাদের ভোগ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইবে।

কিন্তু এইরূপ যুক্তির মধ্যে বিশেষ ত্রুটী রহিয়াছে। প্রথমতঃ একজন ব্যক্তি যদি তাহার সমস্ত উপার্জ্জন বর্ত্তমানেই ভোগ করিয়া ফেলে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার উপার্জ্জন কমিয়া গেলে বা অভাব বৃদ্ধি পাইলে, কি ভাবে সে তাহার অভাব সমূহ তৃপ্ত করিবে? এইরূপ অদূরদর্শী ব্যক্তি বর্গকে লইয়া যে জনসমষ্টি গঠিত, তাহা সুখী বা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ লোকে যদি তাহাদের সব উপার্জ্জন বর্ত্তমান ভোগের জন্যই খরচ করিয়া ফেলে তাহা হইলে "পুঁজি" (Capital) সৃষ্ট হইবে কি ভাবে? সঞ্চয় না হইলে তো আর "পুঁজির" অস্তিত্ব সম্ভব নহে। পুঁজি না থাকিলে কল কারখানা কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা হইবে কি দিয়া? সেক্ষেত্রে পুঁজির অভাবে উৎপাদনই হইতে পারিবে না।

(২) কেহ কেহ বলেন যে উপার্জ্জনের মধ্য হইতে যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করা উচিত; লোকে যতই সঞ্চয় করিবে সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। "সমাজের দিক

হইতে, সর্ব্বদাই ব্যয় অপেক্ষা সঞ্চয় অধিক হিতকর।" ["From the social point of view, saving is always better than spending"] ইহার সমর্থনে এই যুক্তিগুলি দেখানো যাইতে পারে ; (ক) লোকে যতই সঞ্চয় করিবে ততই পুঁজির (Capital) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ততই পুঁজি সামগ্রী (Capital goods) অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। ইহাতে অধিক পরিমাণে সাধারণের ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। লোকে বেশী করিয়া চাকুরী পাইবে এবং অধিক পরিমাণ ভোগ-সামগ্রী (consumers goods) পাইবে। (ঘ) লোকের সমষ্টিই হইল সমাজ। অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিলে প্রত্যেক লোকে সুখী হইবে কারণ সঞ্চয়ের দ্বারা ভবিষ্যতের সংস্থান করা হইবে, অর্থাৎ অভাব তৃপ্তির ধারাবাহিকতা বজায় থাকিবে ; ব্যষ্টির সুখে সমষ্টির সুখ।

কিন্তু এই মতবাদও সঠিক নহে কারণ অত্যধিক সঞ্চয় ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে অহিতকর হইতে পারে। (ক) লোকে যতই অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিবে ততই তাহারা বর্ত্তমানে খরচ করিবে কম। লোকে কম খরচ করিলে সামগ্রী কম পরিমাণে বিক্রয় হইবে। উৎপাদিত সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় না হইলে বেশী করিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিয়া সেগুলি উৎপাদন করিবে কোন্ ব্যবসাদার ? (খ) লোকে যতই সঞ্চয় করিবে ততই পুঁজি বৃদ্ধি পাইবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই ; কারণ অনেকেই সঞ্চয় করিয়া ঘরেই জমাইয়া রাখিতে পারে, তাহাতে পুঁজি-সামগ্রীর বৃদ্ধি হইবে না ; (গ) ব্যয় অত্যধিক হ্রাস করিলে, ভবিষ্যতের সংস্থান হইল ভাবিয়া সন্তোষ লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু উহা ভোগ করিবার মতন আয়ুর সংস্থান না হইবার সম্ভাবনা থাকে। বর্ত্তমানের ভোগ অত্যধিক কমাইয়া দিলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। অধ্যাপক 'যাইড্' বলেন, "সঞ্চয় যখনই আবশ্যকীয় সামগ্রীর ভোগ বা ন্যায়সঙ্গত অভাব-তৃপ্তিকে কমাইয়া দেয়, তখনই উহা হিতকর অপেক্ষা অনিষ্টকর হইয়াই দাঁড়ায় অধিক পরিমাণে। বর্ত্তমানের ভোগ পরিত্যাগের দ্বারা যদি ভবিষ্যতকে বিপদগ্রস্ত করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" ["Saving is more harmful than useful whenever it curtails necessaries or legitimate wants. It is absurd to sacrifice the present for the future if the sacrifice of the present be such as to jeopardise the future"—GIDE].

অতএব ব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ই প্রয়োজন কিন্তু অত্যধিক ব্যয়ও সঙ্গত নহে আবার অত্যধিক সঞ্চয়ও সঙ্গত নহে। প্রত্যেক লোক তাহার স্বাস্থ্য ও নৈতিক সম্পদ (যথা শিক্ষা) বজায় রাখিবার ও উন্নত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করিবে অথচ ভবিষ্যতের বিপদ আপদ পরিহার করিবার জন্য,—ভবিষ্যৎ অভাবের তৃপ্তির জন্য সঞ্চয় করিবে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক সাধারণ লোক তাহার উপার্জ্জনকে ব্যয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে এমন ভাবে ভাগ করিবার চেষ্টা করে যাহাতে তাহার উপার্জ্জনের সঞ্চিত অংশ হইতে ভবিষ্যতে সে যে তৃপ্তি পাইবে এবং উপার্জ্জনের ব্যয়িত অংশ হইতে বর্ত্তমানে সে যে তৃপ্তি পায়—তাহাদের পরিমাণ যতটা সম্ভব সমান হয়।

অণু-২) সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (বা তৃপ্তির) নিয়ম—*Law of Equi-marginal utility or returns.*

ঠিক যেমন আমাদের উপার্জ্জন আমরা ব্যয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে এমন ভাবে বণ্টন করিবার চেষ্টা করি যাহাতে উভয়বিধ কার্য্য হইতে আমরা সমপরিমাণ তৃপ্তি পাই, ঠিক তেমনি আমরা যে পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করিব বলিয়া ঠিক করি উহা বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে এমন ভাবে বণ্টন করিবার চেষ্টা করি যাহাতে আমরা প্রত্যেক সামগ্রী হইতে সমপরিমাণ তৃপ্তি পাই। আমাদের অভাব সীমাহীন কিন্তু উপার্জ্জন এবং সেহেতু ব্যয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ব্যয়ক্ষমতা আমরা প্রত্যেক সামগ্রীর উপরে এমন ভাবে প্রয়োগ করি (অর্থাৎ এমন ভাবে খরচ করি) যাহাতে প্রত্যেক সামগ্রী হইতে আমরা একই পরিমাণ তৃপ্তি পাই। যথা, আমি যদি মনে করি যে আরেকটা ধুতি কিনিলে আমি যতখানি তৃপ্তি পাইব তাহা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পাইব আরেকটা জামা কিনিলে কিন্তু আমার হাতে যদি এমন টাকা থাকে—যাহার দ্বারা আমি হয় ধুতি না-হয় জামা খরিদ করিতে পারি (দুইটাই খরিদ করিতে পারি না) তাহা হইলে আমি আর ধুতি খরিদ না করিয়া জামা খরিদ করিব। এক্ষেত্রে আমার যে ধুতিগুলি আগে হইতেই আছে তাহার শেষ ধুতিটার যে প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা) এবং যে জামাটা কিনিলাম তাহার প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা) প্রায় সমান হইবে। পরে আরও টাকা পাইলে ও ব্যয় করিতে পাইলে হয়তো দেখিতাম যে ধুতি বা জামার তুলনায় আমার জুতার প্রয়োজন বেশী—অর্থাৎ পুনরায় একখানি ধুতি বা জামা কিনিলে যে তৃপ্তি পাইব তাহা অপেক্ষা একজোড়া জুতা কিনিলে অধিক তৃপ্তি পাইব —তাহা হইলে আমি অপর ধুতি বা জামা না কিনিয়া আর একজোড়া জুতাই কিনিব। কিন্তু নূতন একজোড়া জুতা কিনিবার পর জুতার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা

কমিয়া ধুতির বা জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। এই ভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এমন ভাবে আমরা ক্রয় করি যাহাতে প্রত্যেক সামগ্রী হইতে যতটা সম্ভব সমপরিমাণ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পাই। অধ্যাপক ঘোষ ইহাকে এই বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন: "বিভিন্ন বস্তুগুলি এরূপ পরিমাণে খরিদ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটীর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অপরটীর সমান হয়।" ইহাকে বলা হয় সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (বা তৃপ্তির) নিয়ম-Law of equimarginal utility or returns.

আমরা সকল সময়েই যে ঠিক এইভাবেই খরচ করিয়া থাকি তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই তবে এই ভাবেই খরচ করিতে চেষ্টিত থাকি এবং এই ভাবে খরচ করিলে একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পাই। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে আমি যদি ভ্রমক্রমে টাকাগুলি জামা কিনিতে খরচ না করিয়া ধুতি কিনিয়া আনি, তাহা হইলে ধুতি অপেক্ষা জামার প্রয়োজনীয়তা আমার নিকট অধিক ছিল, ইহা মনে করিয়া আমি অনুশোচনা বোধ করি। অধ্যাপক টমাসের ভাষায়, "আমাদের খরচা এরূপভাবে বণ্টন করিতে ও খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করি যাহাতে আমাদের ব্যয় আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি-দান করিতে পারে।" ["We seek to distribute and adjust our expenditure so that our outlay will yield the maximum of satisfaction"—S. E. THOMAS.] † সেইজন্য এই নিয়মটীর আরেকটী নাম হইল "সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তির মতবাদ" (Doctrine of maximum satisfaction)।

(অণু-৩) এঙ্গেলের ভোগ-কার্য্যের নিয়ম—Engels Law of Consumption.

ডাক্তার এঙ্গেল নামে একজন জার্ম্মাণ অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন পরিবারের আয়-ব্যয় বিবরণ পরীক্ষা করিয়া লোকের উপার্জ্জনের সহিত ভোগকার্য্যের কিরূপ সম্বন্ধ সে সম্পর্কে গোটাকয়েক বৈশিষ্ঠ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এইগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় "এঙ্গেলের ভোগকার্য্যের নিয়ম।" তিনি বলেন (১) যাহাদের উপার্জ্জন যত অধিক তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত ততই কম।—অর্থাৎ ধনবান ব্যক্তিরা তাহাদের উপার্জ্জনের কম ভাগ খাদ্য দ্রব্যের উপর ব্যয় করে; (২) উপার্জ্জনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, পরিচ্ছদের উপরে সকলেরই উপার্জ্জনের মধ্যে শতকরা ব্যয়ের হার একই; (৩) উপার্জ্জনের পরিমাণ যাহার যত বেশী আমোদ প্রমোদ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর তাহাদের শতকরা ব্যয়ের হার ততই বেশী।

(†) "Elements of Economics"—p. 53

Questions & Hints.

1. What do you mean by Income? Explain the law of equi-marginal returns.

[অনুচ্ছেদ ১ এবং ৩]

2. Discuss : (a) The best way to benefit a community is to spend one's income. (b) From the social point of view saving is always better than spending.

(1934)—[অনুচ্ছেদ-২]

3. Define spending and discuss the general principles which underlie the spending of the income. (1949)

[অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩]

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎপাদন ও যোগান

Production and Supply.

(**অণুচ্ছেদ-১**) **উৎপাদনের অর্থ**—*Meaning of Production.*

ভোগকার্য্যের দ্বারা যেমন মানুষ কোন বস্তু বা পদার্থ ধ্বংস করিতে পারে না তেমনি মানুষ কোন বস্তু বা পদার্থের (matter) কণিকামাত্রও সৃষ্টি করিতে পারে না। আমরা যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করি সেগুলিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহারা যে পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে (যথা চেয়ার তৈয়ারী হইয়াছে কাঠ দিয়া এক্ষেত্রে কাঠ হইল পদার্থ বা ম্যাটার) তাহার কোনটাই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নহে—উহা প্রকৃতিদত্ত।

তাহা হইলে মানুষের দ্বারা কৃত উৎপাদন বলিতে কি বুঝায়? মানুষ যদি বস্তু বা পদার্থ উৎপাদন করিতে না পারে তাহা হইলে কি উৎপাদন করে?

উৎপাদনের অর্থ হইল কোনো প্রকৃতিদত্ত বস্তুর আকৃতি বা প্রকৃতিতে এমন পরিবর্ত্তন সাধন করা যাহাতে উহা মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা অধিক-পরিমাণে লাভ করে। যথা একটী কাষ্ঠখণ্ড আমাদের উপবেশনস্থানের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা ধারণ করে কম পরিমাণে কিন্তু ছুতার মিস্ত্রির পরিশ্রম ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডটীকে চেয়ারে পরিণত করিয়া আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার অধিকতর ক্ষমতা ঐ কাষ্ঠখণ্ডটীর সহিত যোগ করিল। ছুতারের উৎপাদন কার্য্য শুধু এইটুকুই।

মানুষ শুধু ইহাই পারে। আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার সামর্থ্য **কম পরিমাণে** আছে এইরূপ কোনা বস্তুকে উৎপাদক তাহার মেহনতের দ্বারা, আমাদের অভাব তৃপ্ত করিতে **অধিক পরিমাণে** সক্ষম করিয়া তুলে; অথবা আমাদের অভাব তৃপ্ত করিতে **অক্ষম** কোনা বস্তুকে তাহার মেহনতের দ্বারা আমাদের অভাব তৃপ্ত করিতে **সক্ষম** করিয়া তুলে। ইহারই নাম উৎপাদন।

উৎপাদন বলিতে বুঝায় কোন বস্তুকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার অধিকতর ক্ষমতা প্রদান। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, উৎপাদন বলিতে বুঝায় প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি; কারণ "মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতার" নামই হইল "প্রয়োজনীয়তা।" 'মানুষ উৎপাদন করে'—ইহার অর্থ হইল,—তাহার প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলে বা অল্প প্রয়োজনীয় বস্তুকে অধিক প্রয়োজনীয় করিয়া তুলে। উৎপাদন হইল—'প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন।' (Production of utilities).

(অণু-২) বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয়তা—*Different kinds of utility*

প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে। কোন বস্তুকে মোটামুটি তিনপ্রকার কার্য্যের দ্বারা "নিষ্প্রয়োজনীয়" হইতে "প্রয়োজনীয়" বস্তুতে অথবা "অল্প প্রয়োজনীয়" হইতে "অধিকতর প্রয়োজনীয়" বস্তুতে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ তিন প্রকার কার্য্যের দ্বারা কোন বস্তুতে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যোগ করিয়া দেওয়া যায়।

(১) কোন বস্তুর আকার পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে মানুষের কোনো অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য (অথবা অধিকতর যোগ্য) করিয়া তুলিলে, "আকার প্রয়োজনীয়তা" (Form utility) উৎপাদন করা হইল বলা হয়। যথা একজন কাঠুরিয়া একটী সম্পূর্ণ বৃক্ষকে কাটিয়া জ্বালানীর উপযুক্ত কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত করিলে, সে "আকার প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করিল। [অধ্যাপক সোলিগ্ম্যানের মতে "আকার প্রয়োজনীয়তা" বলিয়া কোনো পৃথক প্রয়োজনীয়তার আখ্যা দেওয়া উচিত নহে। তিনি বলেন "বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা" (material utility) শব্দটী ব্যবহার করা উচিত এবং ইহা দ্বারা বুঝাইবে 'বস্তুর কোন নিজস্ব গুণের পরিবর্ত্তন' করিয়া প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন। তিনি বলেন যে কোনো একটি বস্তুর যে কেবলমাত্র আকার (Form) পরিবর্ত্তন করা যায় তাহাই নহে ; উহার গঠন, ওজন, রঙ, স্বাদ, গন্ধ অথবা যে কোন গুণের পরিবর্ত্তনের দ্বারা উহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।]

(২) কোন একটী বস্তুকে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োজনের জন্য মজুত করিয়া উহাকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য (অথবা অধিকতর যোগ্য) করিয়া তুলিলে "কাল-প্রয়োজনীয়তা" (Time utility) উৎপাদন করা হইল বলা হয়। দোকানদার কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে দোকানে মজুত করিয়া রাখে এবং যাহার যখন দরকার সে ঐ দোকান হইতে জ্বালানীকাঠ খরিদ করিতে পারে। এক্ষেত্রে দোকানদার কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে মজুত করিয়া কালক্ষেপনের দ্বারা "কাল প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করিয়াছে।

(৩) একটী বস্তুকে একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া গিয়া অর্থাৎ স্থানান্তরকরণের দ্বারা উহাকে মানুষের কোন অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য (বা অধিকতর যোগ্য) করিয়া তুলিলে "স্থান .প্রয়োজনীয়তা" (Place utility) উৎপাদন করা হইল বলা হয়। যথা একজন কুলী খাদ্যখণ্ডগুলিকে দোকান হইতে গৃহস্থের বাড়ীতে বহন করিয়া দিলে তাহার দ্বারা "স্থান-প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদিত হইল।

(অণু-৩) উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদক শ্রম—*Productive or unproductive labour.*

ফরাসীদেশের ভূম্যৈকবাদীরা (Physiorats) বলিতেন ভূমি হইতে ফসল উৎপাদন করিবার যে শ্রম তাহাই হইল উৎপাদনক্ষম শ্রম (productive) আর সকল শ্রম অনুৎপাদক (unproductive)। পরবর্ত্তীযুগে প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ য়্যাডাম স্মিথ বলিলেন, কোন বস্তুসামগ্রীর (material goods) উৎপাদনই হইল একমাত্র উৎপাদন। যে শ্রমের দ্বারা কোন না কোন বস্তুসামগ্রী উৎপাদিত হয়,—যথা, চেয়ার, টেবিল, চাউল, বস্ত্র-ইত্যাদি,—তাহাই হইল একমাত্র উৎপাদনক্ষম শ্রম এবং যে শ্রমের দ্বারা এইরূপ বস্তু সামগ্রী উৎপাদন করা হয় না সে শ্রমের কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নাই—অর্থাৎ উহা অনুৎপাদক শ্রম (unproductive labour)। অতএব তাঁহার মতে ধর্মযাজক, উকিল, ডাক্তার, অভিনেতা, বাদ্যকর, গায়ক, শিক্ষক অর্থাৎ যাঁহাদের কাজের দ্বারা কোনো বস্তু সামগ্রী উৎপাদিত হয় না, তাঁহাদের সকলেরই শ্রম অনুৎপাদক।

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই মত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে বস্তু সামগ্রীর উৎপাদনের ভিত্তিতে, শ্রমকে উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদক এই ভাবে ভাগ করা যায় না। ইহার জন্য তাঁহারা গোটাকয়েক যুক্তি প্রদর্শন করেন; (১) যে ব্যক্তিই কোনো না কোনো সম্পদ উৎপাদন করিবে তাহার শ্রমকেই উৎপাদনক্ষম শ্রম বলা যাইবে। সম্পদ দুই প্রকার হয়—বস্তু সম্পদ (material wealth) এবং অবস্তু সম্পদ (immaterial wealth); যাহা কিছুই মানুষের প্রচেষ্টায় তৈয়ারী, অপ্রচুর এবং আমাদের কোন না কোন অভাব তৃপ্ত করিতে পারে তাহাই সম্পদ,—সে সম্পদ বস্তু সম্পদ হইতে পারে যথা কাপড়, জামা, জুতা ছাতা ইত্যাদি অথবা অবস্তু সম্পদ হইতে পারে যথা উকিলের পরামর্শ, ডাক্তারের উপদেশ, নার্শের সেবা, গায়কের গীত। বস্তু সম্পদ উৎপাদনের শ্রমকে যেমন উৎপাদনক্ষম বলা হয় তেমনি অবস্তু সম্পদ উৎপাদনের শ্রমকেও উৎপাদনক্ষম বলিতে হইবে। উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন হইল এবং উৎপাদনের অর্থই প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন। (২) যে যতই

বস্তু সামগ্রী তৈয়ারী করুক, যে বস্তু বা পদার্থ হইতে ঐ সামগ্রী উৎপাদন করা হইবে তাহার কণামাত্রও সে উৎপাদন করিতে পারে না; মানুষ উৎপাদন করে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তা। অতএব যে ব্যক্তিই এমন কোন শ্রম করিতেছে যাহার দ্বারা আমাদের কোন না কোন প্রয়োজন মিটে তাহারই শ্রম উৎপাদনক্ষম। অতএব ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক—প্রভৃতির শ্রম উৎপাদনক্ষম কারণ ইঁহাদের শ্রম নানালোকের নানা প্রয়োজন মিটায়। (৩) য়্যাডাম স্মিথের মতবাদ গ্রহণ করিলে, বাস্তবক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইবে। শিক্ষক ছাত্রদিগের সম্মুখে যাহা পড়াইবেন সে শ্রমের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই কিন্তু তিনি ঠিক সেই কথাগুলিই লিখিয়া যদি পুস্তক প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহার শ্রম প্রয়োজনীয়তা লাভ করিল—এইরূপ ধারণার মধ্যে সঙ্গতি নাই।

সেইজন্য আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে শুধু সেই শ্রমকেই নিরর্থক বা অনুৎপাদক বলা চলে যাহাতে আমাদের কোনই অভাবের তৃপ্তি হয় না। ইহা ভিন্ন, আমাদের কোনো না কোনো অভাব মিটাইতে সক্ষম এইরূপ যে কোনো শ্রমই উৎপাদনক্ষম। কেহ হয়তো "আকার" বা "বস্তুতান্ত্রিক" প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন করে। কেহ হয়তো "স্থান প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন করে" কেহ বা কাল প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন করে। কেহ বস্তু সম্পদ উৎপাদন করে কেহ বা অবস্তু সম্পদ উৎপাদন করে। অতএব কাঠুরিয়া যেরূপ উৎপাদনকার্য্য করে, কুলীও সেইরূপ উৎপাদনকার্য্য করে, দোকানদারও সেইরূপ উৎপাদন কার্য্য করে। কারখানায় শ্রমিকের শ্রম (যাহার দ্বারা বস্তুসামগ্রী উৎপাদিত হয়) যেমন উৎপাদনক্ষম, শিক্ষক বা ডাক্তারের শ্রমও (যাহার দ্বারা কোনো বস্তু সম্পদ উৎপাদিত হয় না) তেমনি উৎপাদনক্ষম। অর্থনীতিতে "উৎপাদন" এর এইরূপ ব্যাপক অর্থ। ইহার মধ্যে কোনো শ্রম হয়তো বেশী প্রয়োজনীয় হইতে পারে যাহার জন্য আমরা বেশী দাম দেই অথবা কোনো শ্রম হয়তো কম প্রয়োজনীয় হইতে পারে যাহার জন্য আমরা কম দাম দেই। যথা পুরোহিতের পারিশ্রমিক দেই কম, শিক্ষকের পারিশ্রমিক হয়তো তাহা অপেক্ষা একটু বেশী; কাঠুরিয়াকে পারিশ্রমিক দেই ২৲ টাকা; কুলীকে হয়তো ।।০ আনা।

যে ব্যক্তির পরিশ্রমের কথায় কোনই সম্পদ উৎপাদন হইতেছে না, যে এমন কার্য্য করিতেছে যাহার দ্বারা মানুষের কোনোই অভাব তৃপ্ত হয় না,—শুধুমাত্র তাহারই পরিশ্রম অনুৎপাদক। এই সম্পর্কে পেনসনের কথাগুলি স্মরণ করিতে পারি: "আধুনিক সময়ে আমাদের নিকটে এই প্রশ্নের যথার্থ গুরুত্ব নাই যে, কোন

প্রচেষ্টা উৎপাদনক্ষম না অনুৎপাদক ; আমাদের নিকট প্রকৃত গুরুত্ব হইল এই প্রশ্নের যে, কোনো প্রচেষ্টা অধিক উৎপাদনক্ষম না অল্প উৎপাদনক্ষম—অর্থাৎ ব্যয়িত প্রচেষ্টার দ্বারা অধিক পরিমাণ না অল্প পরিমাণ সম্পদ উৎপাদিত হয়।”

(অণু-৪) যোগান—*Supply*

উৎপাদিত সম্পদগুলি বাজারে যোগান দেওয়া হয়। যোগান বলিতে বুঝায় একটী সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা বাজারে **বিক্রয়** করিবার উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয়। কেহ যদি কোনো সামগ্রী বিতরণের জন্য সরবরাহ করে তাহা হইলে তাহার সেই কার্য্যকে যোগান বলা হইবে না—যথা কোনো কোম্পানী যদি কোন সামগ্রীর নমুনা বিতরণ করে। কিন্তু কোনো একটী সামগ্রীর যে পরিমাণ বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত করা হয় উহা নির্ভর করে উহার দরুণ কত দাম পাওয়া যায় তাহার উপরে। অতএব কোনো একটি বিশেষ দামে কোনো একটি সামগ্রীর যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য সরবরাহ করা হয় সেই পরিমাণকে সেই সামগ্রীর “যোগান” বলে।

যোগান (supply) ও মজুদ-মালের (stock) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মজুদ-মাল হইল সেই পরিমাণ সামগ্রী যাহা উৎপাদিত হইয়াছে এবং যে কোনো সময়ে বাজারে সরবরাহ করা যায় কিন্তু কার্য্যতঃ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় নাই। কিন্তু যোগান বলিতে বুঝায় কোনো সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা প্রকৃত পক্ষে বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। ওয়াকার বলেন “যোগান বলিতে বুঝায় একটী নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা একটী নির্দ্দিষ্ট দামে পাওয়া যাইতে পারে।” [“Supply means the quantity of a given article which could be had at a given price”—WALKER]

(অণু-৫) যোগানের নিয়ম—*Law of Supply*

একটী সামগ্রীর দামের সহিত উহার যোগানের সম্পর্ক কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটী নিয়ম আছে ; উহার নাম “যোগানের নিয়ম।” সামগ্রীর দাম যদি কম থাকে তাহা হইলে লাভ হইবে কম ; ইহাতে উৎপাদনকারীরা বেশী করিয়া সামগ্রী উৎপাদন করিবে না বা মজুদকারীরা বেশী পরিমাণে সামগ্রী বাজারে সরবরাহ করিবে না। অপর পক্ষে দাম যদি চড়া হয় তাহা হইলে লাভ হইবে বেশী ; অতএব উৎপাদনকারীরা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিবে বা মজুদকারীরা মজুদ হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণে সামগ্রী সরবরাহ করিবে।

এই বিষয়টাই যোগানের নিয়ম ব্যাখ্যা করে। "যোগানের নিয়ম" বলে যে একটী সামগ্রীর দামের সহিত উহার যোগানের একমুখী ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক; দাম যদি কমে যোগান কমিবে এবং দাম যদি বৃদ্ধি পায় যোগানও বৃদ্ধি পাইবে। "উঠ্‌তি দাম যোগান বৃদ্ধি করে এবং পড়তি দাম যোগান হ্রাস করে।"

চাহিদার নিয়ম (২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও যোগানের নিয়ম একত্রিত করিয়া বলা চলে :—দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে ও যোগান কমিবে,

দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে ও যোগান বাড়িবে।

(অণু-৬) যোগান দাম—*Supply price*

একজন ব্যক্তি কোনো একটী সামগ্রীর একমাত্রা যোগান দিবার জন্য যে দাম অতি অবশ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে—অর্থাৎ যে দাম না হইলে ঐ সামগ্রীর ঐ মাত্রা সরবরাহ করা হইবেই না—তাহাই হইল ঐ সামগ্রীর যোগান দাম। ভোগকারীরা (consumers) যেমন একটী সামগ্রীর কোনো মাত্রা হইতে যতখানি প্রয়োজনীয়তা পাইবে আশা করে সেই অনুযায়ী উহার চাহিদা দাম স্থির করে, উৎপাদনকারীরা তেমনি একটী সামগ্রীর কোনো মাত্রা উৎপাদন করিতে যত খরচা হইয়াছে সেই অনুযায়ী ঐ সামগ্রীর ঐ মাত্রার যোগান দাম নির্দ্ধারিত করে।

(অণু-৭) যোগান তালিকা—*Supply Schedule*

কোনো একটী সামগ্রীর দাম, যদি ঐ সামগ্রী উৎপাদন করিতে যাহা খরচ হয়, তাহার উপরে থাকে তাহা হইলে উৎপাদনকারীর মুনাফা (profit) হইয়া থাকে; অতএব উৎপাদন খরচার উপরে দাম যতই অধিক থাকিবে ততই অধিক মুনাফা হইবে এবং উৎপাদনখরচার উপরে দাম যতই কম থাকিবে ততই কম মুনাফা হইবে। মুনাফার এই উঠতি কমতির সহিত উৎপাদন বাড়িবে বা কমিবে এবং সেহেতু যোগান বাড়িবে বা কমিবে। অতএব একজন ব্যক্তি একই সামগ্রীর বিভিন্ন দাম দিতে চাহিলে ঐ সামগ্রীর যে বিভিন্ন পরিমাণ একজন ব্যক্তি যোগান দিবে—তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যথা,

ধুতির দাম যখন ৪৲ টাকা তখন যোগান হইবে ৩ খানি ধুতি।
" " " ৭৲ " " " " ৭ " "
" " " ১০৲ " " " " ১২ " "
" " " ১৩৲ " " " " ১৭ " "
" " " ১৬৲ " " " " ২৫ " "
" " " ২০৲ " " " " ৪০ " "

ইহার নাম যোগান তালিকা। কোনো একটী সামগ্রীর বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণের যোগান হয় বা হইতে পারে সেই দাম ও সেই যোগান সমান্বিত একটি তালিকাকে "যোগান তালিকা" (Supply Schedule) বলা হয়।

(অণু-৮) উৎপাদন খরচা—*Cost of Production*

যে সকল সামগ্রী আমরা ভোগ করিতে চাহি সে গুলি অফুরন্ত ভাবে পাই না কেন? তাহাদের অফুরন্ত যোগান হয়না কেন? তাহার কারণ হইল যে আমাদের ভোগ্য সম্পদগুলি উৎপাদন করিতে কিছু না কিছু খরচা পড়ে; একজন উৎপাদনকারী অন্ততঃ তাহার নিজস্ব মেহনৎ যেটুকু প্রয়োগ করে, উহাও ঐ সামগ্রীর উৎপাদনের খরচা বলিয়া বিবেচ্য। উৎপাদনের খরচা থাকার দরুণই আমাদের ভোগ্য সম্পদের অফুরন্ত যোগান সম্ভব নহে। একটী সামগ্রী উৎপাদন করিতে যাহা খরচ হইয়াছে অন্ততঃ সেই পরিমাণ দাম ঐ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া না পাইলে, উহার উৎপাদন হইবে না ও যোগান হইবে না।

(অণু-৯) মোট উৎপাদন খরচা ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচা—*Total cost of production and marginal cost of production.*

কোনো একটী সামগ্রী যতপরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে তাহার সমগ্র পরিমাণ উৎপাদন করিতে সর্ব্ব সাকুল্যে যত খরচা হইয়াছে তাহা হইল ঐ সামগ্রীর মোট উৎপাদন খরচা (Total cost of production)।

দৃষ্টান্তঃ—কেদার বাবু কুড়ি খানি ধুতি উৎপাদন করিয়াছেন। সবশুদ্ধ তাঁহার খরচ হইয়াছে ৬০৲ টাকা। এক্ষেত্রে ৬০৲ টাকা হইল ধুতির মোট উৎপাদন খরচা।

কোনো একটী সামগ্রীর মোট উৎপাদনের পরিমাণ যদি একমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা যদি একমাত্রা বাড়তি উৎপাদন করা হয়) তাহা হইলে মোট খরচা যে **হারে** বৃদ্ধি পাইল (অর্থাৎ পূর্ব্বেকার মোট-খরচার উপরে যে বাড়তি খরচাটুকু হইল) তাহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন খরচা (Marginal cost of production)।

দৃষ্টান্তঃ—২০ খানি ধুতি উৎপাদন করিতে ৬০৲ টাকা খরচা পড়িল;
২১ " " " " ৬২৲ " " ";

এক্ষেত্রে একবিংশ ধুতিটী বাড়তি উৎপাদন এবং উহার জন্য বাড়তি উৎপাদন খরচা হইয়াছে ২৲ টাকা। একবিংশ ধুতিটী হইল প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal

product) এবং এই প্রান্তিক উৎপাদনের খরচা (অর্থাৎ ২৲ টাকা) হইল প্রান্তিক উৎপাদন খরচা।

(অণু-১০) প্রান্তিক উৎপাদন খরচার বৈশিষ্ট্য—*Peculiarity of marginal cost of production.*

আমরা যখন একটী সামগ্রী অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে থাকি তখন তাহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসে। কিন্তু একটী সামগ্রী যখন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা হয় তখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচা (বাড়তি পরিমাণটুকু উৎপাদনের খরচা) কমিয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উহা বাড়িয়া যাইতেও পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহা স্থির থাকিতেও পারে।

"প্রয়োজনীয়তা" ক্ষেত্রে একটী মাত্র নিয়ম আছে—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম (Law of diminishing utility)। কিন্তু উৎপাদন খরচার ক্ষেত্রে তিন প্রকার নিয়ম আছে (১) ক্রমিক উৎপাদন খরচা হ্রাস (২) ক্রমিক উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি এবং (৩) সমপরিমাণ উৎপাদন খরচা। সাধারণতঃ শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনে যতই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ততই প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কমিতে থাকে; এক্ষেত্রে বলা হয় "ক্রমিক খরচা হ্রাসের নিয়ম" ক্রিয়া করিতেছে। কৃষি সামগ্রীর উৎপাদনে যতই উৎপাদন বৃদ্ধি হয় প্রান্তিক উৎপাদন খরচাও ততই বাড়িয়া যায়; এক্ষেত্রে বলা হয় "ক্রমিক খরচা বৃদ্ধির নিয়ম" ক্রিয়া করিতেছে। কখন কখন কৃষি কার্য্যে বা শিল্পোৎপাদনে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রান্তিক উৎপাদন খরচার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এক্ষেত্রে বলা হয় "সমপরিমাণ খরচার নিয়ম" ক্রিয়া করিতেছে।

(অণু-১১) উৎপাদক-উপাদান সমূহ—*Factors of Production.*

যে কোন সম্পদ উৎপাদন করিতে হইলে গোটাকয়েক অপর সামগ্রীর প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ এই অপর সামগ্রীগুলির সাহায্যেই সম্পদ উৎপাদিত হয়। এই গুলিকে বলা হয় উৎপাদক উপাদান (Factors of Production)।

ধরা যাক একটী বস্ত্র উৎপাদন করা হইবে। শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া তো আর বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব নহে; উহার জন্য ভূমি প্রয়োজন। কিন্তু শুধু ভূমি থাকিলেই তো বস্ত্র উৎপাদন হইবে না; মানুষ শ্রম করিলে তবেই উহা উৎপাদন করা সম্ভব। আবার শুধু ভূমি ও শ্রম হইলেই চলিবে না। কারণ ভূমিতে দাঁড়াইয়া একজন ব্যক্তি যতই হস্তপদ সঞ্চালনের দ্বারা পরিশ্রম করুক উহাতে কণামাত্র বস্ত্রও উৎপাদিত হইবে না। উহার জন্য প্রয়োজন হইবে তুলা, কলকারখানা ইত্যাদি; ইহাদিগকে

বলা হয় পুঁজি। উপরন্তু শ্রমিকদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোন্ কাজটী করিবে, কতজন শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে কতপরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করা হইবে, উহার জন্য কতপরিমাণ ভূমি ও পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইবে—এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য একজন প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন। ইনি উৎপাদনের উদ্যোগ করিবেন ও তত্ত্বাবধান করিবেন। সম্পদ উৎপাদিত হইবার পর উহা কি দামে ও কি পরিমাণে বিক্রয় হইবে, উহা হইতে লাভ হইবে কি লোকসান হইবে—এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ঝুঁকি রহিয়াছে। এই প্রধান ব্যক্তিই উৎপাদনের ঝুঁকি (risk) বহন করেন। ইহাকে বলা হয়, ব্যবস্থাপক (Organiser) বা আঁত্রেপ্রনা (Entrepreneur)।

অতএব মোটামুটি চারিটী উৎপাদক-উপাদান আছে—যাহাদের সম্মিলিত সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব :—(১) ভূমি (land) (২) শ্রম (labour) (৩) পুঁজি (Capital) ও (৪) ব্যবস্থাপন (organisation)।

Questions & Hints

1. What is production ? What are the factors of production ? (1927)

[অণুচ্ছেদ—১ এবং—১২]

2. In what different ways can man engage in production ? Explain the different kinds of utility that can be created by human labour.

[অণুচ্ছেদ—২]

3. Distinguish between productive labour and unproductive labour. "What is of real importance to us to day is—not whether labour is productive or unproductive—but whether it is more or less productive i..e., whether the effort expended results in the production of a large or small amount of wealth." Explain. (1934)-

[অণুচ্ছেদ-৩]

4. What do you mean by supply ? Examine the relation between the price of a commodity and its supply and construct a hypothetical supply schedule.

[অণুচ্ছেদ—৪ ; ৫ ; ৭]

5. What do you mean by production of wealth in Economics ? (1949)

[অণু-৩]

সপ্তম অধ্যায়

ভূমি

Land

(অণুচ্ছেদ ১) অর্থনীতিতে "ভূমির" বিশেষ তাৎপর্য্য—*Special significance of "land" in Economics.*

অর্থনীতিতে 'ভূমি' শব্দটী একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ভূমি বলিতে বুঝায় স্থলভাগের উপরের স্তর-যাহা মৃত্তিকা ও যেখানে কৃষিকার্য্য হইতে পারে অথবা অন্যান্য গাছপালা জন্মিতে পারে। অর্থনীতিতে "ভূমি" শব্দটী আরও ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়—"ভূমি" বলিতে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্থলভাগের মৃত্তিকাময় উপরের স্তরই বুঝায় না। যাহা কিছু প্রকৃতির দান এবং সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার যোগ্য তাহাই "ভূমি"। অতএব ভূমির মধ্যে স্থলভাগ বা মৃত্তিকা তো অন্তর্ভূক্ত আছেই উপরন্তু কোনো না কোনো প্রকারে মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত বা ব্যবহার যোগ্য নদী, সমুদ্র, অরণ্য, খনি, সকলপ্রকার মৎস্যস্থলী, অন্যান্য প্রাণী ইত্যাদি যাহা কিছু প্রকৃতির দান, সকলই "ভূমি" পর্য্যায়ভূক্ত। মার্শাল "ভূমি" উপাদানটীর সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন, "ভূমি বলিতে বুঝায়, জমি এবং জলে ; বায়ু, আলো এবং উত্তাপে যে পদার্থ এবং শক্তি সমূহ প্রকৃতি অবারিত ভাবে মানুষের সাহায্যের জন্য দান করে।" ["By land is meant the material and the forces which nature gives freely for man's aid, in land and water, in air, light and heat"—MARSHALL]

(অণু ২) অন্যান্য উৎপাদক-উপাদান হইতে মৌলিক প্রভেদ—*Fundamental difference from other factors of production.*

ভূমির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল উহার বিস্তৃতি। মার্শাল বলেন "একখণ্ড ভূমি-ব্যবহারের অধিকারের অর্থ একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের উপর,—পৃথিবীর উপরিস্থ স্তরের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশের উপর,—কর্ত্তৃত্ব।" ["The right to use a piece

of land gives command over a certain space—a certain part of the earths surface"—MARSHALL] ভূমির এই বিস্তৃতির উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। মানুষের ইচ্ছা দ্বারা ইহা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইতে পারে না। ইহাই হইল ভূমির মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং উহার উপরেই ভূমির সহিত অন্যান্য উৎপাদক-উপাদান সমূহের পার্থক্য নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ ভূমির বিস্তৃতি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নহে, ইহার মোট পরিমাণ প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্ধারিত। উহার যোগান করিয়াছে পৃথিবী এবং মানুষের দ্বারা উহার যোগান বাড়ানো বা কমানো সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যান্য উৎপাদক-উপাদান সমূহের পরিমাণ-বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে সকল পুরাতন দেশে সমগ্র পরিমাণ ভূমি ব্যবহৃত হইতেছে বা অধিকৃত হইয়াছে, সেখানে এক ব্যক্তি যদি তাহার অধিকারভুক্ত ভূমির উপরেও অধিক পরিমাণে ভূমি লইতে চাহে তাহা হইলে অপর কোনো ব্যক্তিকে সমপরিমাণ ভূমির উপর অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু একজন উৎপাদনকারী যদি অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ বা অধিক পরিমাণে পুঁজি নিয়োগ করিতে চাহে তাহা হইলে অপর কাহাকেও সমসংখ্যক শ্রমিক বা সম পরিমাণ পুঁজি হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। তৃতীয়তঃ ভূমির ব্যবহার হইতে পারে দুই উপায়ে; (ক) ভূমির নিছক বিস্তৃতিকেই ব্যবহার করিয়া (যথা একখণ্ড জমির উপর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া) অথবা (খ) উহার স্বকীয় গুণকে অর্থাৎ উহার উর্ব্বরতা বা প্রাণীসম্পদকে ব্যবহার করিয়া—(যথা একখণ্ড জমিতে কৃষিকার্য্য করিয়া বা মেষপালন করিয়া অথবা জঙ্গলে শীকার করিয়া অথবা জলাশয়ে মৎস্য চাষ করিয়া অথবা মৎস্য ধরিবার প্রয়াস করিয়া †)। ভূমির বিস্তৃতির ন্যায় উহার স্বকীয় গুণও প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের শ্রমশক্তি বা পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। বস্তুত পক্ষে মানুষের শ্রমের বা পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃতির দ্বারা সীমা বদ্ধ নহে বলিয়াই মানুষের চেষ্টায় উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে ও পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির ক্ষতিপূরণ করিয়া এবং নিজ উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা লব্ধ নূতন নূতন উপকরণের দ্বারা প্রকৃতিকে তোষামোদ করিয়া প্রকৃতির প্রসাদ বৃদ্ধি করিতে পারে বটে কিন্তু উহার প্রসাদের শেষ সীমা শীঘ্রই পৌছাইয়া যায়। শতহস্তে দান করিয়াও প্রকৃতি

---

† এই শীকারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে যথা খাদ্য অন্বেষণে বা চর্ম্ম সংগ্রহ ইত্যাদি অর্থাৎ কোনো সম্পদ উৎপাদন।

কল্পনা। সেই জন্য পৃথিবীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শিল্পজাত দ্রব্যের যত অভাব না ঘটুক, খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটে তাহা অপেক্ষা অধিক।

(অণু-৩) ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম—*Law of Diminishing Returns.*

ভূমিতে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণের সহিত ঐ উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণের কিরূপ সম্পর্ক তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একটী নিয়ম আছে। ইহার নাম "ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম" (Law of Diminishing Returns)। এখানে "আয়" বলিতে বুঝায় উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ।

একখণ্ড ভূমিতে শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগ করিলে কিছু পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। উৎপাদনকারীর যদি অধিক পরিমাণ ফসলের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে হয়তো অধিক পরিমাণে শ্রম ও পুঁজি সেই একই জমিতে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে চাষী একই ভূখণ্ডে যে অনুপাতে শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তাহার ফসলের ঠিক সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয় না। একই ভূখণ্ডে শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইবে, ফসলও যদি সেই অনুপাতে অধিক উৎপন্ন হয় (যথা শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ করা হইলে, ফসলেরও উৎপাদন হইবে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ) তাহা হইলে একজন ব্যক্তি এক কাঠা জমি হইতেই সমগ্র পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে পারিত; শুধু তাহাই নহে হয়তো ৫।১০ বিঘা জমি হইতেই সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্যশস্য এবং শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল উৎপাদন করা যাইত। উহা যে হয়না তাহার কারণ হইল একখণ্ড জমির উৎপাদিকাশক্তি সীমাবদ্ধ। তাহার উপর যত অধিক চাপ দেওয়া হইবে ততই অধিক চাপ উহা সহ্য করিয়া যাইবে না। অতএব একই ভূখণ্ডে যদি শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে মোট ফসল উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল যে হারে, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল তাহা অপেক্ষা কম হারে।

দৃষ্টান্তঃ—ধরা যাক একজন চাষী ১ বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক ও ২০৲ টাকার মতন পুঁজি নিয়োগ করিয়া ১০ মণ ধান উৎপাদন করিল। হয়তো দশমণ ধানে চাষী সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ভাবিল, আরও বাড়তি ১০ জন শ্রমিক ২০৲ টাকার মতন পুঁজি নিয়োগ করিলে, অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন শ্রমিক ও ৪০৲ টাকার পুঁজি

নিয়োগ করিলে,—ধান উৎপাদন হইবে ১০ মণের স্থলে ২০ মণ। কিন্তু ফসল উৎপন্ন হইলে হয়তো দেখা গেল যে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ মন ধান হইয়াছে।

অতএব বাড়্‌তি যে পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করা হইল তাহা হইতে বাড়্‌তি ফসল হইল ৮ মণ। পুঁজি ও শ্রম দ্বিগুণ করিয়া দ্বিগুণ ফসল হইল না—দ্বিগুণের কম হইল।

ইহাই হইল "ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম।" এই নিয়মটীর মার্শাল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: "ভূমিতে কৃষির জন্য প্রযুক্ত পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ সাধারণতঃ কম অনুপাতেই বর্দ্ধিত হয়—অবশ্য যদি সে সময়ে কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়।" ["An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with improvement in the arts of agriculture"—MARSHALL]

এই নিয়ম সম্বন্ধে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। (১) ইহা যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সকল অবস্থাতেই সকল সময়ে কার্য্যকরী হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কখনো কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। সেই কারণে মার্শাল ক্রমিক আয়-হ্রাস নিয়মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন (উপরে দ্রষ্টব্য) তাহাতে "সাধারণতঃ" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। এমন যদি হয় যে একখণ্ড ভূমিতে যে পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি পূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা ঐ ভূখণ্ডের স্বকীয় গুণ বা উর্ব্বরতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে পারে নাই (অর্থাৎ উহার উর্ব্বরতার তুলনায় পূর্ব্বে প্রযুক্ত শ্রম ও পুঁজি যথেষ্ট হয় নাই) তাহা হইলে পুঁজি ও শ্রমের বৃদ্ধি করিলে ফসলের বৃদ্ধি উহার তুলনায় কম হারে না হইয়া বেশী হারেই হইতে পারে। (২) কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক যদি কাজ করা হয় যথা জলসেচনের ব্যবস্থা অথবা বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত যন্ত্রের ব্যবহার (অর্থাৎ অধিক পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা যদি কৃষিশিল্পের এইরূপ কোনো উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়) তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ, পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণের তুলনায়, অধিক হারে বৃদ্ধি হইতে পারে। আয়হ্রাস নিয়মের সংজ্ঞার মধ্যেই মার্শাল ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "যদি সে সময়ে কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়।"

কিন্তু এই ব্যতিক্রম দুইটী সাময়িক। ইহারা স্থায়ীভাবে ক্রমিক আয় হ্রাস নিয়মের ক্রিয়াকে বাধা দিতে পারে না। যখনই একখণ্ড জমির যেটুকু উর্ব্বরতা

আছে তাহা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিবার মতন যথেষ্ট পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি ব্যবহার করা হইবে, তাহার পর হইতেই অধিকতর পুঁজি ও শ্রমের অনুপাতে ফসল উৎপাদনের বৃদ্ধি কম হইবে। উপরন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে একখণ্ড জমিতে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যতটা উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা করা হইবার পর ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম অবশ্যই ক্রিয়া করিতে সুরু করিবে।

(অণু-৪) ক্রমিক আয়-হ্রাস = ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি—*Diminishing Return = Increasing Cost,*

এক খণ্ড জমিতে পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে বাড়্‌তি ফসল যদি পূর্ব্বের তুলনায় কম হইতে থাকে তাহার অর্থ হইল যে ফসল উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বেকার মতন সমপরিমাণ ফসল উৎপাদন করিতে এখন অধিক খরচা হইতেছে। সেই জন্য ক্রমিক আয়হ্রাসের অর্থ ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি।

দৃষ্টান্ত :—পূর্ব্বেকার দৃষ্টান্তটী লক্ষ্য করা যাক। ধরা যাক একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক ৩৲ টাকা।

(১) চাষী এক বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক (৩০৲) ও ২০৲ টাকার পুঁজি নিয়োগ করিয়া—মোট ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া দশমণ ধান উৎপাদন করিল। এক্ষেত্রে **প্রতিমণ ধান** উৎপাদন করিতে খরচা পড়িয়াছে $\left(\frac{\text{৫০৲ টাকা}}{\text{১০ মণ}}\right)$ = **৫৲ টাকা**।

(২) পরের বছর চাষী ঐ একই জমিতে ২০ জন শ্রমিক (৬০৲ টাকা) ও ৪০৲ টাকা পুঁজি (পূর্ব্বেকার দ্বিগুণ) নিয়োগ করিয়া—অর্থাৎ মোট ১০০৲ টাকা খরচ করিয়া আঠারো মণ ধান উৎপাদন করিল (২০ মণ হইল না) এক্ষেত্রে **প্রতিমণ ধান** উৎপাদন করিতে খরচ পড়িল $\left(\frac{\text{১০০ টাকা}}{\text{১৮ মণ}}\right)$ = ৫৲ টাকা ॥০ আনা ১০$\frac{২}{৩}$ পাই অর্থাৎ **৫$\frac{১}{২}$ টাকার উপর**।

(৩) ধরা যাক তারও পরের বছর ঐ একই জমিতে চাষী ৩০ জন শ্রমিক (৯০৲ টাকা) ও ৬০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া (প্রথমবারের তিনগুণ এবং দ্বিতীয় বারের দেড়গুণ)—মোট ১৫০৲ টাকা খরচা করিয়া হয়তো দেখিল পঁচিশ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে, ৩০ মণ (প্রথম বারের তিনগুণ) বা ২৭ মণ (দ্বিতীয় বারের দেড়গুণ) নহে। এক্ষেত্রে **প্রতিমণ ধান** উৎপাদন করিতে খরচা পড়িয়াছে $\left(\frac{\text{১৫০৲ টাকা}}{\text{২৫}}\right)$ = **৬৲ টাকা**।

প্রতিমাত্রার উৎপাদন খরচা ১ম ক্ষেত্রে ৫৲ টাকা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৫½ টাকার সামান্য বেশী, ৩য় ক্ষেত্রে ৬৲ টাকা। অতএব ফসল উৎপাদনের ক্রমিক হ্রাসের সহিত প্রতিমাত্রা ফসল উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়।

(অণু-৫) কৃষিকার্য্য ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—*Applicable in spheres other than Agriculture.*

মূলতঃ কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ক্রিয়া আলোচনা করা হইলেও ভূমি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাদের সবকিছুর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

(ক) খনি (Mining) :—খনিজ দ্রব্য খনি হইতে যতই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইবে ততই অধিক নীচে নামিতে হইবে। যতই ক্রমবর্দ্ধনশীল গভীরতা হইতে খনিজ সামগ্রী উপরে উত্তোলন করিতে হইবে ততই অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যথা খনির নীচে অধিক পরিমাণে আলো, বায়ু ইত্যাদি সরবরাহের জন্য এবং অবতরণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বন্দোবস্ত করিবার জন্য অধিকতর ব্যয় করিতে হইবে। অপর পক্ষে একটী খনির মধ্যে যত পরিমাণ খনিজ দ্রব্য থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত এবং সেহেতু উৎপাদন একদিন ফুরাইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে আয়হ্রাস বা খরচা-বৃদ্ধির নিয়ম ক্রিয়া করে।

(খ) মৎস্যস্থলী (Fishery) : মৎস্যস্থলীতে, যথা পুষ্করিণী বা নদীতে মাছের চাষের কার্য্যে বা মৎস্য ধরিবার কার্য্যেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। একটী জলাশয়ের মধ্যে কত পরিমাণ মাছ চাষ করা যাইতে পারে তাহার একটী সীমা আছে। এই সীমা নির্দ্ধারিত হয় জলাশয়ের বিস্তৃতির দ্বারা এবং উহার মধ্যে প্রাপ্য মৎস্যের উপযোগী খাদ্যের দ্বারা। সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া অধিক শ্রম ও পুঁজির দ্বারা অধিক চাষ করিলে উৎপাদন কম হারে বৃদ্ধি হইবে এবং এমন সময় আসিয়া যাইবে যখন আর উৎপাদন বৃদ্ধি কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না ; মাছগুলি মরিয়া যাইবে। নদীর মধ্যে প্রকৃতি সীমাহীন মৎস্য দেয় না অতএব এক সময় আসিবে যখন পুঁজি ও শ্রমের বৃদ্ধি করিলে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ কম অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে—অথবা পূর্ব্বেকার সমান পরিমাণ মৎস্য ধরিবার জন্য অধিক পরিমাণ খরচ করিতে হইবে।

(গ) গৃহনির্ম্মাণ ভূমি (Building Site)—গৃহ নির্ম্মাণ ভূমির পক্ষেও এই নিয়ম ক্রিয়া করে। একখণ্ড ভূমি কিনিয়া একজন ব্যক্তি তাহার উপর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারে। কিন্তু একতলা, দুইতলা, তিনতলা—এইভাবে কয়তলা নির্ম্মাণ করিতে পারে? একটী গৃহের যতই উপরে ঘর নির্ম্মাণ করা হইবে ততই

উপরতলা নির্ম্মাণ করিবার খরচা বাড়িতে থাকিবে। উপরন্তু উপরের তলা ব্যবহার করিবার জন্যও খরচা বাড়িতে থাকিবে এবং অসুবিধা বাড়িতে থাকিবে। ঠিক যেমন কৃষিভূমির উর্ব্বরতার উপরে চাপ দিবার সীমা আছে ঠিক তেমনি গৃহ-নির্ম্মাণ ভূমির বিস্তৃতির উপর চাপ দিবার সীমা আছে। সেই সীমালঙ্ঘন করিলেই খরচার তুলনায় সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে কম।

(ঘ) **শিল্পোৎপাদন** (Industrial production)—শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনে মানুষ অংশ গ্রহণ করে অধিক, যেমন প্রকৃতি অংশ গ্রহণ করে অধিক কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে। মানুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের দ্বারা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করে, যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ব্যয়ের অনুপাতে অধিক হইতে পারে। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই জন্য ক্রমিক আয়হ্রাসের পরিবর্ত্তে ক্রমিক আয় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

কিন্তু কখনও কখনও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমিক আয় হ্রাস হয় দেখা যায়। যখনই একটী উৎপাদক উপাদানকে সমান রাখিয়া—অর্থাৎ বৃদ্ধি না করিয়া, অন্যান্য উৎপাদক-উপাদানগুলির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইতে থাকিবে—তখনই দেখা যাইবে এমন এক অবস্থা আসিয়াছে যখন নাকি উৎপাদনের পরিমাণ, ব্যয়ের তুলনায় কম অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল—অর্থাৎ পুঁজির পরিমাণ সমান রাখিয়া যদি ভূমি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন দেখা যাইবে যে যে-অনুপাতে ভূমি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে। সেই কারণে বলা যায় যে অবস্থা বিশেষে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করিতে পারে।।

---

† সেই জন্য পেনসন্ বলেন যে 'ক্রমিক আয হ্রাস' ও 'ক্রমিক আয় বৃদ্ধি'—এ দুটাই একই নিয়মের অভিব্যক্তি। এই নিয়মের তিনি নাম দিলেন "শিল্প প্রচেষ্টার উৎপাদন ক্ষমতার নিয়ম" ("Law of Productivity of Industrial Effort"); ক্রমিক আয় বৃদ্ধি ও ক্রমিক আয় হ্রাস—ইহাদের দ্বারা বুঝায় অধিকতর প্রচেষ্টার অনুপাতে অধিক অথবা অল্প উৎপাদন। এই উৎপাদন নির্ভর করে কি ভাবে উৎপাদক উপাদানগুলিকে মিশানো হয় তাহার উপরে। শিল্প ব্যবস্থাপক, অর্থাৎ আঁত্রেপ্রনা, উৎপাদক-উপাদানগুলির পরিমাণ যদি ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন তাহা হইলে যে ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো ফল পাওয়া যাইবে (অর্থাৎ সব থেকে বেশী উৎপাদন হইবে) সেই ভাবেই তিনি ঐগুলিকে মিশাইতে পারিবেন। যখনই কোনো একটী উৎপাদক উপাদান সাময়িক ভাবেও বর্দ্ধিত করা যাইবেনা তখনই বুঝিতে হইবে যে শিল্প ব্যবস্থাপকের উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নাই এবং সেহেতু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালো ফল লাভ করিতে পারেন না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে

কিন্তু শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে আয়হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করিলেও কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কম ক্রিয়াশীল (operative)। ইহার কারণ হইল যে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি মানুষের সাধ্যাতীত কিন্তু অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি বহুলাংশে মানুষের আয়ত্তাধীন। কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ভূমি কিন্তু শিল্পোৎপাদনে (ভূমি প্রয়োজন বটে কিন্তু) অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি। সেই-জন্য কৃষিকার্য্যে মানুষের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা তাহার শেষ সীমায় খুব শীঘ্রই পৌছাইয়া যায় কিন্তু শিল্পকার্য্যে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা শেষ সীমানায় পৌছানো বহু বিলম্বিত করা যাইতে পারে। এই দিক বিচার করিয়া অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন, "মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, যখন নাকি উৎপাদনের কার্য্যে প্রকৃতি যে অংশ গ্রহণ করে উহাতে ক্রমিক আয়হ্রাসের দিকে প্রবণতা দেখা যায়, মানুষ যে অংশ গ্রহণ করে তাহাতে দেখা যায় ক্রমিক আয়-বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা।" ["We say broadly that while the part which nature plays in production shows a tendency to diminishing return, the part which man plays shows a tendency to increasing return."—MARSHALL]

Questions & Hints

1. What is meant by land in Economics ? In what respects does land fundamentally differ from other factors of production ? [অনুচ্ছেদ ১ এবং ২]

2. Explain with illustration the law of diminishing returns (1945) [অনুচ্ছেদ—৩]

3. Does the law of diminishing return operate with equal vigour in industry and agriculture ? (1929) [অনুচ্ছেদ—৫নং অনুচ্ছেদের (ঘ)]

4. Explain the law of diminishing returns. Is it applicable to (a) mines and (b) manufacturing industries ? (1949)—[অনু-৩, ব্যতিক্রমগুলি দিবার প্রয়োজন নাই; অনু-৫ (ক) ও (ঘ) ।]

উৎপাদন চালাইতে থাকিলে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন এক সময় আসিবেই যখন ব্যয়ের অনুপাতে আয় হইবে কম।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রম

Labour

(অণুচ্ছেদ—১) 'শ্রম' এর অর্থ—*Meaning of labour.*

শ্রম বলিতে সাধারণতঃ আমরা মেহনৎ বুঝি কিন্তু অর্থনীতিতে সকল মেহনৎকেই শ্রম বলা চলিবে না। নিছক আনন্দের জন্য যে মেহনৎ করা হয় সেই মেহনৎকে শ্রম বলা হইবে না—যথা ক্রীড়ামোদীর ক্রীড়ার মেহনৎ। নিছক পরিশ্রম করার আনন্দ ভিন্ন, অপর কোনো পুরস্কারের (অর্থাৎ পারিশ্রমিকের) আশায় মানুষ যে প্রচেষ্টা করে অর্থনীতিতে তাহাকেই "শ্রম" বলা হইবে। এইরূপ প্রচেষ্টা মস্তিষ্কের হইতে পারে বা শরীরেরও হইতে পারে অথবা আংশিক ভাবে শরীরের এবং আংশিক-ভাবে মস্তিষ্কের হইতে পারে। ফলকথা, শ্রমজীবী ও মস্তিষ্কজীবী উভয়েই শ্রমিক হইতে পারে। টমাস্ বলেন "কোনো পুরস্কারের আশায় সম্পাদিত, মানুষের সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা শ্রম-পদ বাচ্য।"

["Labour connotes all human effort, of body or mind, which is undertaken in the expectation of reward"

—S. E. THOMAS]

একটি দেশের মধ্যে কত পরিমাণ শ্রম উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা সম্ভব তাহা নির্ভর করে এই বিষয়গুলির উপরে : (১) জনসংখ্যার পরিমাণ (population) মোট জনসংখ্যার মধ্যে অনেকেই অবশ্য থাকে যাহারা পরিশ্রম করিবার মতন বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা বিভিন্ন কারণে পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। তবে জনসংখ্যার উপরে শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ভর করে এই হিসাবে যে জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির সহিত শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যাও হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। (২) শ্রমযোগ্য ব্যক্তিগণের জনসংখ্যার শতকরা হার—(percentage of working population to total population)—সাধারণতঃ কুড়ি হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক লোক শ্রমযোগ্য

বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার মধ্য হইতে যে সকল স্ত্রীলোক পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন না তাঁহাদিগকে বাদ দিতে হইবে। আরও বাদ দিতে হইবে তস্কর ও ভিক্ষুকদিগকে যাহারা কেবলমাত্র অপরের মেহনতের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের উপরেই নির্ভর করে। এই সকল বাদ দিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ কোনো দেশের শ্রমযোগ্য লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। (৩) শ্রমিকদের দৈনিক কার্য্যকাল (Daily working hours)—একটি দেশের সম্পদ উৎপাদনের জন্য কত পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করা হইতেছে বা হইতে পারে তাহা প্রতি শ্রমিক দৈনিক কতক্ষণ কার্য্য করে তাহার উপরেও নির্ভর করে। (৪) শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা (efficiency of labourers)-মোট শ্রমের পরিমাণ শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার উপরে বহুপরিমাণে নির্ভর করে। ধরা যাক্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকগণ দৈনিক যতক্ষণ কাজ করে ভারতীয় শ্রমিকও দৈনিক ততক্ষণ কাজ করে। অনুমান করা যাক্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিদের সংখ্যা হইল ১১ কোটী এবং ভারতীয় শ্রমিকদের সংখ্যা হইল ১৪ কোটী। সংখ্যার দিক হইতে ভারতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা শ্রমের যোগান অধিক। কিন্তু মার্কিণ দেশের শ্রমিকগণ হয়তো ভারতের শ্রমিক অপেক্ষা দ্বিগুণ কর্ম্মদক্ষ—অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজন ভারতীয় শ্রমিক যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিবে, একজন মার্কিন শ্রমিক একই সময়ের মধ্যে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ উৎপাদন করিবে। সেক্ষেত্রে যদি বলা হয় ভারতের শ্রমিকদের তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকের যোগান ২২ কোটীর মতন তাহা হইলে ভুল হইবে না।

(অণু-২) শ্রম দক্ষতা—*Efficiency of labour*

শ্রমদক্ষতা বলিতে বুঝায় শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতা—অর্থাৎ তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা। এই উৎপাদন ক্ষমতা বা কর্ম্মদক্ষতা মোটামুটি পাঁচটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) স্বাস্থ্য, (২) শিক্ষা (৩) কার্য্যের অবস্থা (৪) শিল্পের ব্যবস্থা (৫) মজুরীর পরিমাণ ও প্রদানরীতি (৬) নৈতিক গুণাবলী।

(১) **স্বাস্থ্য**—স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মানুষ পরিশ্রমে অক্ষম ও অপারগ হয়; শ্রমদক্ষতার জন্য সেইহেতু উত্তম স্বাস্থ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অনেক বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। (ক) কুলগত গুণের (racial qualities) উপর স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এক এক মনুষ্যকুলের (race) এক এক প্রকার শারীরিক গঠন হয়। কোনো কোনো কুলের লোকেরা সাধারণতঃ সবল ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং

কোনো কোনো কুলের লোকে সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও হীন স্বাস্থ্য হয়। (ঘ) একজন শ্রমিক যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহার গুণ ও পরিমাণের উপরেও তাহার স্বাস্থ্য নির্ভর করে। (গ) বসবাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরেও স্বাস্থ্য ও কর্ম্মোদ্যম নির্ভর করে। বাসায় মুক্ত বায়ু ও আলো যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে, অপরিষ্কার পরিবেশের মধ্যে বাস করিলে বা অল্প পরিসরের মধ্যে অত্যধিক সংখ্যক লোক বাস করিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি হয়। (ঘ) স্বাস্থ্য ও উদ্যম অনেকাংশে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপরেও নির্ভর করে।

(২) **শিক্ষা**—বুদ্ধি বৃত্তির স্ফুরণ না হইলে এবং কার্য্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে, কেবল মাত্র স্বাস্থ্য থাকিলেই শ্রমদক্ষতা আসে না। উহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা তিন প্রকারের হইতে পারে। (ক) সাধারণ শিক্ষা (general education)—ইহা মানুষের চিন্তাশক্তি উন্মেষ করে এবং জীবনের নানাক্ষেত্রের (কর্ম্মক্ষেত্র বা পেশাও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) কার্য্যকলাপে বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করে। সাধারণ শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়া উহার দ্বারা শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। (খ) কারিগরী শিক্ষা (Technical education)—পরিবারের মধ্যে ছেলেরা তাহাদের বাবা, জ্যাঠা, কাকা বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে থাকিয়া হাতে নাতে তাহাদের বংশগত শিল্প শিক্ষা করিয়া কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিতে পারে। আধুনিক বৃহদাকার শিল্পে বহু জটিল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদনের জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। এই সকল যন্ত্র ব্যবহার ও প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ; এই শিক্ষা না থাকিলে আধুনিক যন্ত্রশিল্পে কার্য্য করিবার মতন যোগ্যতা বা দক্ষতা শ্রমিকদের থাকেনা। (গ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational education)—উকিল, ডাক্তার, মোক্তার শিক্ষক, এঞ্জিনীয়ার, শিল্প-পরিচালক ইত্যাদি মস্তিষ্কজীবী শ্রমিকদিগের প্রয়োজনীয় বিশেষ যোগ্যতা আনয়নের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ইহাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যায়।

(৩) **কার্য্যের অবস্থা** (Conditions of work)—অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বাস করিলে যেমন স্বাস্থ্য ও কর্ম্মোদ্যম নষ্ট হয় সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কারখানায় কাজ করিলে কর্ম্মশক্তি কমিয়া যায়। মন প্রফুল্ল থাকে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে এইরূপ পরিবেশের মধ্যে কাজ করিলে কর্ম্মদক্ষতা বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়। ইহা ভিন্ন একজন শ্রমিক দৈনিক কতক্ষণ কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে উহার উপরেও তাহার কর্ম্মদক্ষতা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। বহুক্ষণ ধরিয়া অতিরিক্ত

পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলে শ্রমিকের কর্ম্মোদ্যম নষ্ট হইতে বাধ্য। উপরন্তু বেশী জবরদস্তি ও কড়া নিয়ন্ত্রণ করিলে শ্রমিকের কার্য্যের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও থাকে। ক্রীতদাসের উপর চাবুক চালাইয়া যে কাজ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট কাজ পাওয়া সম্ভব শ্রমিককে কিছুটা স্বাধীন পরিবেশের আস্বাদ দিয়া এবং তাহাকে মানুষের মর্য্যাদা প্রদান করিয়া। অবশ্য প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার জন্য যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন তাহা শ্রমিকের প্রকৃত স্বাধীনতা খর্ব্ব করেনা—উহা সকলকেই মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

(৪) **শিল্পের ব্যবস্থা** (Organisation)—আঁত্রেপ্রনা বা শিল্প পরিচালকের উপরে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার উপরেও শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতা অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। শিল্প পরিচালক যদি ঠিকমত শ্রম-বিভাগ করেন, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন, উৎকৃষ্ট কাঁচা মাল সরবরাহ করেন, যে শ্রমিক যে কাজে উপযুক্ত তাহাকে ঠিক সেই কাজ করিতে দেন এবং এক খণ্ড ভূমিতে যতটা পুঁজি ও শ্রম প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী বা কম যদি নিয়োগ না করেন-তাহা হইলে শ্রমিকদের দ্বারা সর্ব্বাধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব। অন্যথায় শ্রমিকগণ অধিক উৎপাদনের দ্বারা তাহাদের দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম হইবে না।

(৫) **মজুরীর পরিমাণ ও প্রদান রীতি** (*Amount and payment of wages*) কর্ম্মদক্ষতার জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী ভোগ করিতে পারা যায় এইরূপ পারিশ্রমিক না পাইলে শ্রমিকদের পক্ষে কর্ম্মদক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নহে। উপরন্তু যে পারিশ্রমিক তাহারা পাইবে তাহা তাহাদিগের পক্ষে নিয়মিতভাবে পাওয়া প্রয়োজন। পাইতে অনিয়ম হইলে শ্রমিকদের কর্ম্মোদ্যমের অভাব হইবে। তবে আসল জিনিষ হইল যে মজুরীর পরিমাণের মারফৎ শ্রমিকদিগকে কর্ম্ম প্রেরণা যোগাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মজুরীর উপরেও মুনাফার কিছু অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করা উচিত।

(৬) **নৈতিক গুণাবলী** (*Moral qualities*)—শুধু মজুরীর পরিমাণের উপরেই নহে, উহার ব্যবহার পদ্ধতির উপরেও শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা নির্ভর করে। একজন শ্রমিক তাহার মজুরীর অধিকাংশই যদি মদ্যপান ও জুয়াখেলায় ব্যয় করে, যত অধিক মজুরীই দেওয়া হউক না কেন উহার দ্বারা তাহার কর্ম্মক্ষমতা বা দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে না। অতএব শ্রমিকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (যাহাতে সে ভবিষ্যতের সঞ্চয় করিতে পারে) ও পান ভোজন সম্পর্কে সংযম ইত্যাদি নৈতিক গুণ থাকা প্রয়োজন।

ইহা ভিন্ন কর্ম্মদক্ষতার জন্য শ্রমিকের সততা, আত্মসম্মান বোধ, উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গুণও থাকা প্রয়োজন।

(অণু-৩) লোকসংখ্যা সম্পর্কীয় মতবাদ—*Theories of Population*

—ইংরাজ অর্থনীতিবিদ ম্যাল্‌থাস লোকসংখ্যা সম্পর্কে একটী মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় লোক-সংখ্যা অতিক্রুত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু জীবন ধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অল্প পরিমাণেই বৃদ্ধি পায়। অতএব কোনো একটী দেশে যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন খুব ঘন বসতি হয় তখন খাদ্য সামগ্রীর অভাব ঘটে। গণিত শাস্ত্র হইতে দুইটী শব্দ ব্যবহারের দ্বারা তিনি এই বিষয়টী ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয় গুনোত্তর অগ্রগতির (Geometrical progression) এবং খাদ্য সামগ্রীর বৃদ্ধি হইল সমান্তর অগ্রগতির (Arithmetical progression) মতন। গুনোত্তর অগ্রগতি হইল সমান্তর অগ্রগতি অপেক্ষা বহুদ্রুত। (†) অতএব তাঁহার মতে, এক সময় আসিবে যখন দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে জীবন ধারণের মতন যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী থাকিবে না। দেশের মধ্যে মোট যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাইবে তাহার অনুপাতে লোকসংখ্যা হইবে অধিক। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণের তুলনায় এই বাড়্‌তি লোকসংখ্যা প্রকৃতি তাহার নিষ্ঠুর হস্তে অপসারিত করিবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার মারফৎ এই বাড়তি-লোকসংখ্যা অপসারিত হইবে। ইহা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ; লোকসংখ্যার উপর এইরূপ প্রাকৃতিক বাধাকে ম্যালথাস "ধ্রুব নিশ্চিত বাধা" (Positive Checks) বলিয়া অভিহিত করিলেন। ম্যালথাস বলিলেন মানুষের উচিত নৈতিক সংযমের দ্বারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভয়ঙ্কর "ধ্রুব নিশ্চিত বাধা" পরিহার করা। মানুষের নৈতিক সংযমের দ্বারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণকে ম্যালথাস "নিবারক বাধা" (Preventive checks)

(†) গুনোত্তর অগ্রগতি হয় যখন গোটাকয়েক সংখ্যা পরপর সন্নিবিষ্ট করিলে দেখা যাইবে যে নিম্নসংখ্যা হইতে উর্দ্ধসংখ্যায় যাইলে দুইটীর মধ্যেকার অন্তর ক্রমশই অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। যথা ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪—এখানে দেখা যাইবে ২ ও ৪এর মধ্যে অন্তর হইল ২; ৪ ও ৮এর মধ্যে অন্তর হইল ৪; এইভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সংখ্যার মধ্যে অন্তর ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে।

সমান্তর অগ্রগতি হয় তখন গোটাকয়েক সংখ্যা পরপর সন্নিবিষ্ট করিলে দেখা যাইবে যে নিম্ন সংখ্যা হইতে উর্দ্ধ সংখ্যায় যাইলে যেকোনো দুইটী সংখ্যার মধ্যেকার অন্তর ঠিক সমানই থাকিতেছে যথা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬।

বলিয়া অভিহিত করিলেন। তিনি মনুষ্য সমাজকে নিবারক বাধা প্রয়োগের দ্বারা ধ্রুবনিশ্চিত বাধার ক্রিয়াকে নিষ্প্রয়োজনীয় করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ম্যাল্‌থাসের লোকসংখ্যা সম্পর্কীয় এই মতবাদের বিবিধ সমালোচনা করিয়া থাকেন; (১) গণিত শাস্ত্রের যে শব্দ দুইটী ম্যাল্‌থাস প্রয়োগ করিয়াছন সেগুলি এক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য নহে। লোকসংখ্যা ঠিক গুণোত্তর অগ্রগতিতে বৃদ্ধি পায় না এবং খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনও ঠিক সমান্তর অগ্রগতির মতন বৃদ্ধি পায় না। (২) ম্যাল্‌থাস ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্ণয় করিয়াছিলেন কিন্তু "সৌভাগ্যক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং ক্রমিক আয়হ্রাসের প্রবণতা অতিক্রম করিবার জন্য মনুষ্য সমাজ যে প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা এযাবৎ চমৎকার-ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নূতন খাদ্য-সামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের এলাকার আবিষ্কার, নূতন যন্ত্রচালিত শক্তির প্রয়োগ, কৃষিপদ্ধতির ক্রমোন্নয়ন, চলাচল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনিময় ব্যবস্থা ও সাধারণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি,—এই সকল বিষয়সমূহ ক্রমিক আয়হ্রাসের পরিবর্তে ক্রমিক আয়বৃদ্ধি আনয়ন করিতে এবং জীবন ধারণের উপকরণের উপর লোকসংখ্যার চাপ লাঘব করিতে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে।" (৩) রাশীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ বহু প্রকারের বহু পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে শিখিয়াছে; ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান (standard of living) উন্নত হইয়াছে। জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান যতই উন্নত হয় ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় কম হারে। কারণ প্রথমতঃ জীবনযাত্রার মান যতই উন্নত হয় ততই মানুষ নূতন নূতন অভাব ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে ও সেইগুলি তৃপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়—যৌন-আকাঙ্খা তাহাদের মনযোগ কম আকর্ষণ করে; দ্বিতীয়তঃ মানুষ দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগ করে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনে বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে।

(অনু·৪০) শ্রমের (শ্রমিকদিগের) গতিশীলতা—*Mobility of Labour.*

উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম গতিশীল হইল শ্রম; শ্রমিকগণ সহজে একস্থান হইতে অপরস্থানে বা এক পেশা হইতে অপর পেশায় পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না। সেই জন্য বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এবং বিভিন্ন কার্য্য, বৃত্তি বা পেশার মধ্যে শ্রমিকগণ যে অনুপাতে ছড়াইয়া থাকিলে একটী দেশের (অথবা সমগ্র

জগতের মধ্যে) সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সম্পদ উৎপাদিত হইতে পারিত, ঠিক সেই অনুপাতে ছড়াইয়া থাকে না। অর্থাৎ শ্রমিকদিগের গতিশীলতা সীমাবদ্ধ।

শ্রমের গতিশীলতা বলিতে বুঝায়, একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার বা এক পেশা হইতে অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত হইবার অথবা একই পেশার মধ্যে একটী প্রতিষ্ঠান হইতে অপর কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগদানের ইচ্ছা ও সামর্থ্য। শ্রমিকদিগের গতিশীলতা মোটামুটি তিন প্রকারের হইতে পারে ঃ

(ক) **স্থান-পরিবর্ত্তন** (Geographical Mobility)—স্থান পরিবর্ত্তন দুই প্রকারের হইতে পারে—একটী রাষ্ট্র হইতে অপর কোনো রাষ্ট্রে গমন ; ইহাকে বলা হয় দেশান্তরগমন (emigration)। অথবা একই রাষ্ট্রের মধ্যে এক অঞ্চল হইতে অপর কোনো অঞ্চলে গমন ; ইহাকে বলা যায় স্থানান্তরগমন (internal migration)। স্থানান্তরগমন যে পরিমাণে হয় দেশান্তরগমন হয় তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে। ইহার প্রধান কারণ বিদেশ সম্পর্কে শ্রমিকদের অজ্ঞতা, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সহিত আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতিতে পার্থক্য, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পার্থক্য এবং কোনো কোনো দেশের অধিবাসীদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধ হইতে বিদেশীদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ। একই দেশের মধ্যে শ্রমিকদের স্থানান্তর গমনেরও বাধা আছে যথা শ্রমিকদের গৃহ-প্রীতি, অপর অঞ্চল সম্পর্কে অজ্ঞতা, যাতায়াতের কষ্ট ও ব্যয় ইত্যাদি।

কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনের বাধা থাকা সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ স্থান-পরিবর্ত্তন হইয়াও থাকে। ইহার একটী কারণ হইল 'সামাজিক'—অর্থাৎ একব্যক্তি পাড়াপড়শীর কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়িলে বা কোনো কুকার্য্য করিলে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিতে পারে। তবে ইহা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল—"অর্থনৈতিক"—যখন একজন শ্রমিকের পক্ষে বিভিন্ন কারণে তাহার গ্রামে বসিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা দুরূহ হইয়া পড়ে অথবা যখন তাহার সম্মুখে স্থানান্তরে যাইবার জন্য কোনো সুনির্দ্দিষ্ট প্রলোভন তুলিয়া ধরা হয়।

(খ) **পেশা-পরিবর্ত্তন** (Occupation Mobility)—একটী পেশা পরিত্যাগ করিয়া একজন ব্যক্তি অপর কোনো পেশা গ্রহণ করিতে পারে ; যথা একজন শ্রমিক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ লইতে পারে অথবা একজন ব্যক্তি ময়রার কাজ পরিত্যাগ করিয়া ছুতারের কাজ গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ পেশা পরিবর্ত্তনেরও অনেকগুলি বাধা আছে। বিভিন্ন পেশার জন্য বিভিন্ন

ধরণের বিশেষ শিক্ষা (special training or knowledge) প্রয়োজন হয়; অনেক পেশার পরিবর্ত্তনকে সামাজিক মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর বলিয়া গণ্য করা হয়; অনেক সময়ে পেশার পরিবর্ত্তনের দ্বারা স্থানপরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও অভাবের চাপে বা বিশেষ প্রলোভনে অনেক সময়েই পেশা পরিবর্ত্তনের মারফৎ শ্রমিকদিগের গতিশীলতা ক্রিয়া করে।

(গ) প্রতিষ্ঠান পরিবর্ত্তন (Institution Mobility)—ইহার দ্বারা বুঝায় একই পেশার মধ্যে থাকিয়া একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ। এই ধরণের গতিশীলতাই শ্রমিকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বিশেষ করিয়া যদি এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা স্থান পরিবর্ত্তন প্রয়োজন না হয়।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় স্থান পরিবর্ত্তন ও পেশাপরিবর্ত্তনের দ্বারা গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত (অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায়) কম এবং প্রতিষ্ঠান পরিবর্ত্তনের দ্বারা গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন ও পেশা পরিবর্ত্তন যতই অধিক হয় ততই শ্রমিকের চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্যবিধান সহজ হয়। সর্ব্বাধিক পরিমাণ সম্পদ উৎপাদনের জন্য এইরূপ সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন।

Questions & Hints

1. Analyse and comment upon the factors that determine the supply of labour in a country (1943) [অণুচ্ছেদ—২]

2. What are the various factors on which the efficiency of labour depends? (1936) [অণুচ্ছেদ—৩]

3. Explain the meaning of mobility of labour and comment on the factors that influence such mobility. [অণুচ্ছেদ—৫]

4. State and explain Malthusian theory of Population [অণুচ্ছেদ—৪]

———

নবম অধ্যায়

পুঁজি—Capital.

(অণুচ্ছেদ—১) পুঁজির অর্থ—*Meaning of Capital.*

মানুষ মেহ্‌নতের দ্বারা যে সম্পদ উৎপাদন করে তাহার কিছু অংশ তাহারা সরাসরি ভোগ করে এবং কিছু অংশ তাহারা সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সঞ্চিত সম্পদ তাহারা দুই ভাবে ব্যবহার করিতে পারে; প্রথমতঃ মালিক ঐ সঞ্চিত সম্পদ তাহার নিজের কাছে মজুদ করিয়া রাখিতে পারে (এক্ষেত্রে উহা অলস ভাবে পড়িয়া রহিল) অথবা উহা অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করিতে পারে। সঞ্চিত সম্পদ যদি পুনরায় সম্পদ উৎপাদনের সহায়ক-রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে উহাকে পুঁজি বলা হইবে। সঞ্চয়কারী স্বয়ং উহা উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে অথবা উহা অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী উহা হইতে উপার্জ্জন করে। সমাজের কাছে এবং যে ব্যক্তি পুঁজিকে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে লাগাইতেছে তাহার কাছে পুঁজি হইল উৎপাদনের উপায়; যদিও যে ব্যক্তি উহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহার কাছে উহা মূলতঃ উপার্জ্জনের উপায়। কিন্তু কোনো সামগ্রী "উৎপাদনের উপায়" হিসাবে ব্যবহৃত না হইলে "উপার্জ্জনের উপায়" হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না; উৎপাদনের মধ্য দিয়াই উপার্জ্জন হইবে,—সে উৎপাদন সঞ্চয়কারী স্বয়ং করুক অথবা অপর কেহই করুক। "উৎপাদনের সহায়ক হইবার যে গুণ পুঁজির রহিয়াছে তাহাই হইল ইহার আসল বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং উপার্জ্জনের উপায় হইবার যে গুণ পুঁজির রহিয়াছে তাহা হইল উহার গৌণ বা প্রাপ্তবৈশিষ্ট্য।"* ভূমিকে পুঁজি বলা হয় না, তাহার কারণ ভূমি মানুষের দ্বারা উৎপাদিত নহে। অতএব, 'মোরল্যাণ্ডের' ভাষায়, পুঁজি বলিতে বুঝায় "ভূমি ব্যতীত সকল সম্পদ যেগুলিকে সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করিতে মনস্থ করা হইয়াছে।" ["We

---

* S. E. Thomas—Economics, p. 112.

may define capital...as all wealth (other than land) which is intended to be used for the production of wealth"] †

(**অণু-২**) **সঞ্চয় ও পুঁজি**—*Saving and Capital.*

সঞ্চিত সম্পদ মাত্রই পুঁজি নহে—কেবলমাত্র সেই সঞ্চিত সম্পদগুলি পুঁজি যে গুলি অপর কোনো সম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং সেই কারণে যে গুলি হইতে উপার্জ্জন আশা করা হয়।

(**অণু-৩**) **সম্পদ ও পুঁজি**—*Wealth and Capital.*

যে সম্পদ উৎপাদন করিয়া সরাসরি ভোগ করিয়া ফেলা হয় তাহা 'পুঁজি' হিসাবে বিবেচ্য নহে। যে সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় এবং উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া উহা হইতে উপার্জ্জন আশা করা হয় তাহাই পুঁজি। একজন চাষী এক মণ ধান উৎপাদন করিল; উহা হইতে ৩০সের ধান সে চাউল তৈয়ারী করিয়া খাইল এবং অবশিষ্ট ১০সের রাখিয়া দিল পরের বৎসর বীজ-ধান হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য; এক্ষেত্রে ৩০সের ধান তাহার সাধারণ ভোগ্য সম্পদ কিন্তু ১০সের ধান হইল পুঁজি। ইহার দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে পুঁজি হইল সম্পদেরই অংশ। সেই জন্য বলা যায় যে পুঁজি মাত্রই সম্পদ; তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে সম্পদ মাত্রই পুঁজি নহে, কারণ ঐ ৩০সের ধান তো আর পুঁজি নহে। ["All capital is wealth, but not all wealth is capital"—THOMAS]

আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অনেক ক্ষেত্রে একই সম্পদ ব্যবহার ভেদে সাধারণ ভোগ সামগ্রী বিবেচিত হইতে পারে অথবা পুঁজি বলিয়া গণ্য হইতে পারে; যেমন উপরোক্ত দৃষ্টান্তে ধান; উহার কিছু অংশ ভোগ সামগ্রী হইল এবং কিছু অংশ 'পুঁজি' হইল। অর্থাৎ ব্যবহার ভেদে একই সম্পদ ভোগসম্পদ হইতে পারে বা পুঁজি হইতে পারে।

তবে ইহাতে এই মনে করা হইবে না যে-যে সম্পদই পুঁজি বলিয়া বিবেচ্য তাহাই ইচ্ছা করিলে সাধারণ ভোগ সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা চলে। অনেক সম্পদ আছে যাহা কেবলমাত্র পুঁজি হিসাবেই ব্যবহার করা চলে—সাধারণ ভোগ সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না—যথা কারখানার যন্ত্রপাতি।

অতএব পুঁজি ও সম্পদের সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনটি বিষয় লক্ষ্যনীয়: (১) "পুঁজি মাত্রই সম্পদ কিন্তু সম্পদ মাত্রই পুঁজি নহে"; * (২) অনেক সম্পদ আছে যেগুলি

† W. H. Moreland—An introduction to Economics, p. 89.

* S. E. Thomas—Elements of Economics. p. 113.

ব্যবহার ভেদে পুঁজি হইতে পারে আবার সাধারণ সম্পদ হিসাবে, অর্থাৎ ভোগসম্পদ হিসাবে, থাকিতে পারে। § (৩) কতকগুলি সম্পদ আছে যেগুলি মাত্র পুঁজি হিসাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে, সাধারণ সম্পদরূপে অন্য কোন ব্যবহার তাহার নাই।

(অণু-৪) পুঁজির শ্রেণীবিভাগ—*Classification of capital.*

পুঁজিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

(১) **স্থির পুঁজি** (*Fixed capital*) এবং **চলতি পুঁজি** (*Circulating capital*)।

যে সকল পুঁজিসামগ্রী অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, যেগুলি একবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করিলেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না, যেগুলি বারবার সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই গুলিকে বলা হয় **স্থির পুঁজি** (fixed capital). "উৎপাদনের মধ্যে ইহার করণীয় কার্য্য ইহা এক বারের অধিক সম্পাদন করিতে পারে এবং একবার মাত্র ব্যবহারের দ্বারাই ইহার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয় না।" ["It can fulfil its office in production more than once and its utility is not exhausted by a single use"—THOMAS] যথা যন্ত্রপাতি, কারখানা, গৃহ, অফিসের আসবাব, ইত্যাদি।

যে পুঁজি সামগ্রীগুলির কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ একবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করিলে উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়,—অর্থাৎ যে সামগ্রীর একই পরিমাণের দ্বারা একই সম্পদ একবার মাত্র উৎপাদিত হইতে পারে, সেইগুলিকে বলা হয় চলতি পুঁজি (Circulating capital)। "যে উৎপাদনের কার্য্যে ইহাকে নিযুক্ত করা হয় উহাতে চলতি পুঁজি ইহার করণীয় কার্য্যের সমস্তটাই একবার ব্যবহারের মারফতেই সম্পাদন করিয়া দেয়।" ["Circulating capital fulfils the whole of its office by a single use in the production in which it is engaged"—THOMAS] যথা—কয়লা, তুলা, কাঠ প্রভৃতি কাঁচা মাল।

'পেন্‌সন্‌' বলেন, "যে পুঁজি তাহার কার্য্য বারবার দিতে সক্ষম তাহাকে বলা হয় স্থির পুঁজি এবং যাহা তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে মাত্র একবার তাহা চলতি পুঁজি।" একজন ছুতার চেয়ার তৈয়ারী করিতেছে। সে যে বাটালি, করাত প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে উহা তাহার স্থির পুঁজি কারণ উহার সাহায্যে সে বারবার অনেক চেয়ার উৎপাদন করিতে পারিবে। কিন্তু যে কাঠ দিয়া সে একখানি চেয়ার

§ The same things may be called wealth or capital according to the use to which they are put—Penson, Economics of Everyday life. p. 38.

উৎপাদন করিল উহা হইল তাহার চল্‌তি পুঁজি কারণ একখানি চেয়ার উৎপাদনের মতন কাঠ দিয়া সে দুইখানি চেয়ার উৎপাদন করিতে পারিবে না।

(২) আটক পুঁজি (*Sunk capital*) **এবং মুক্ত পুঁজি** (*floating capital*)

যে পুঁজি এরূপ ধরণের যে একবার উহাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে শুধু সেই কাজই উহা পারিবে—কোনো ভিন্ন ধরনের কাজের পক্ষে উহা অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে—তাহাকে আটক পুঁজি (sunk capital) বলা হয়।

যে পুঁজি বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভব উহাকে বলা হয় মুক্ত পুঁজি (floating capital) যথা কাঠ, তুলা ইত্যাদি।

(৩) তলব পুঁজি (*remunerative capital*) **এবং সহায়ক পুঁজি** (*Auxiliary capital*)

যে পুঁজির সাহায্যে উৎপাদন শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমিকদের মজুরী প্রদান করা হয় তাহাকে বলা হয় তলব পুঁজি (remunerative capital)। কেহ কেহ ইহাকে ভোগপুঁজি বলিয়া থাকেন (consumers capital)। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিকরা অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে—উৎপাদনের কার্য্যে যে সকল সামগ্রী শ্রমিকদের সহায়তা করে সেগুলিকে বলা হয়,—সহায়ক পুঁজি (Auxiliary capital) ; ইহাকে উৎপাদকের পুঁজি বা যান্ত্রিক পুঁজিও বলা হইয়া থাকে—(Producers' capital or Instrumental capital) ; যথা যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল ইত্যাদি।

(অণু-৫) **কার্য্যকারিতা**—*Functions of capital.*

মানুষের অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাসের প্রথম যুগে তাহার কোনো পুঁজি ছিল না। উৎপাদনের উপায় ছিল মাত্র দুইটি—মানুষের শ্রম ও প্রকৃতিদত্ত ভূমি। একজন লোক তাহার অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য তাহার শ্রম সরাসরিভাবে ভূমিতে প্রয়োগ করিত এবং উহাদ্বারা যাহা উৎপাদন হইত তাহাই ব্যবহার করিত। অচিরে দেখা গেল যে নিছক শ্রম ও ভূমির সাহায্যে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব নহে। তখন সে সরাসরি অভাব তৃপ্তির সরল পথে না গিয়া পুঁজি উৎপাদনে মনোযোগ দিল। পূর্ব্বে একজন লোক মাছ খাইবার অভাব বোধ করিলে জলাশয়ে গিয়া শুধু হাতে যাহা পারিত তাহাই ধরিয়া মাছের অভাব তৃপ্ত করিত ; পরে যখন সে ছিপ্ তৈয়ারী করিতে বসিল তখন তাহার উদ্দেশ্য রহিল একই —অর্থাৎ মাছের অভাব তৃপ্ত করা। কিন্তু ঐ অভাব তৃপ্ত করিবার পদ্ধতি হইল

ঘোরালো—প্রথমে শ্রম নিয়োজিত হইল ছিপ তৈয়ারীর কার্য্যে পরে ঐ ছিপ নিযুক্ত হইল মাছ ধরিবার কার্য্যে। ছিপ হইল পুঁজি। 'চ্যাপ্‌মান্'এর ভাষায় "পুঁজির সাহায্যে উৎপাদন হইল ঘোরালো প্রক্রিয়া।" (Production with capital is a round about process"-CHAPMAN)*। এখন আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে মানুষ সোজাসুজি পদ্ধতিতে উৎপাদন না করিয়া এইরূপ ঘোরালো পদ্ধতিতে উৎপাদন করে কেন ?

প্রথমতঃ অনেকগুলি সামগ্রী আছে যাহা পুঁজি না থাকিলে উৎপাদন করা আদৌ সম্ভব নহে। তুলা না হইলে বস্ত্র উৎপাদন আদৌ সম্ভব নহে। করাত, বাটালি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি না থাকিলে ছুতার একখানি চেয়ারও উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপে যে সামগ্রী, পুঁজি না থাকিলে উৎপাদন করা আদৌ সম্ভব হইবে না, পুঁজির ব্যবহার সেই সামগ্রীর উৎপাদনকে সম্ভব করে।

দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি সামগ্রী আছে যাহা পুঁজি না থাকিলে উৎপাদন করা একেবারে অসম্ভব নহে; কিন্তু ঐ সামগ্রীর সামান্য পরিমাণ উৎপাদনের জন্য এত অধিক পরিমাণ শ্রম করিতে হইত যে উহা উৎপাদন করা পোষাইত না। জাল বা ছিপ না থাকিলেও কোনো সামান্য পরিমাণ জলা জায়গায় শুধু হাত দিয়া মাছ ধরা হয়তো একান্ত অসম্ভব নহে কিন্তু উহাতে এতই কম উৎপাদন হইবে যে পরিশ্রম করা পোষাইবে না। এক্ষেত্রে সামান্য একটু পুঁজি ব্যবহার করিলে উৎপাদন বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ছোটখাটো হাতিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট ও জটিল বহু যন্ত্র মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে; বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা কত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে জনসাধারণ উপার্জ্জনকারী ও ভোগকারী উভয়রূপেই উপকৃত হইয়াছে। কারণ অধিক সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা শ্রমিক হিসাবে জনসাধারণ অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে এবং ভোগকারী হিসাবে জনসাধারণ এরূপ বিভিন্ন সামগ্রী ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে হয়তো কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীরাই ব্যবহার করিতে পারিত।

তৃতীয়তঃ উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হওয়া এবং উহা শেষ হওয়া—এই দুইটীর মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে। যখনই উৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ হইল তখনই উহা শেষ হইয়া গেল না। হয়তো একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে ছয়মাস লাগিবে। এই সময়ে শ্রমিকদের খাইয়া পরিয়া জীবিত ও কর্মক্ষম থাকিতে হইবে; উৎপাদনের জন্যই উহা প্রয়োজন। পুঁজির সাহায্যেই ইহা সম্ভব হয়। উৎপাদনকারী "তলব পুঁজির" সাহায্যে

* Chapman—Outlines of Politicad Economy. p. 78.

উৎপাদন শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমিকদের দিন হিসাবে, সপ্তাহ হিসাবে বা মাস হিসাবে মজুরি দিয়া দেন। এই "তলব পুঁজির" সহায্যে শ্রমিকরা মজুরি পাইয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও ভোগ করিতে পারে—সেইজন্যই কেহ কেহ 'তলব পুঁজি' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা "ভোগ পুঁজি" শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেন। ভোগ কার্য্যও চলিতেছে আবার অধিকতর উৎপাদনের আয়োজনও চলিতেছে—ইহা সম্ভব হয় "ভোগপুঁজি" রূপ পুঁজির সাহায্যে।

ঘোরালো পথে (অর্থাৎ পুঁজি ব্যবহারের দ্বারা) উৎপাদনের পদ্ধতি অবলম্বিত হয় এই কারণে যে ঐ পথে চলিবার পরিশ্রমের তুলনায় পুরস্কার পাওয়া যায় অনেক অধিক এবং ঘোরালো পথে যাইয়া পুঁজির ব্যবহার করা যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি সম্ভবও হয়। ইহাই পুঁজির মূল কার্য্যকারিতা।

(অণু-৬) **পুঁজির বৃদ্ধি**—*Growth of Capital*

সঞ্চয় হইতেই পুঁজির উদ্ভব। ভোগের উপর উৎপাদনের বাড়তিটুকু সঞ্চয় করা হয়—এবং এই সঞ্চয় উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। শুধু এই ভাবেই পুঁজি গঠন ও বৃদ্ধি সম্ভব। অতএব পুঁজির বৃদ্ধি নির্ভর করে (১) সঞ্চয়ের (Saving) উপরে এবং (২) সঞ্চিত সম্পদের বিনিয়োগের (Investment) উপরে।

(১) **সঞ্চয়** নির্ভর করে এই বিষয়গুলির উপরে :—

(ক) সঞ্চয়ের ক্ষমতা—(Power to save) সঞ্চয়ের ক্ষমতার অর্থ হইল যে, ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হইতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে না, তাহার দ্বারা সঞ্চয় হওয়া তো সম্ভব নহেই বরং সে ঋণী হইয়া পড়িবে। আয় ও ব্যয় যদি সমানও হয় তাহা হইলেও সঞ্চয় সম্ভব নহে। অতএব সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য হয় আয়বৃদ্ধি না হয় ব্যয় হ্রাস প্রয়োজন। আয়বৃদ্ধি নির্ভর করে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মকুশলতার উপরে এবং শ্রমিকের ও ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপরে। ব্যয় হ্রাস নির্ভর করে জিনিষপত্রের দামের উপরে এবং জনসাধারণের ভোগ সংযমের উপরে।

(খ) সঞ্চয়ের স্পৃহা (Will to save)—সঞ্চয়ের স্পৃহা না থাকিলে সঞ্চয় সম্ভব নহে কারণ যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয়ের স্পৃহা নাই তাহাদের দ্বারা সঞ্চয় সম্ভব নহে। সঞ্চয়ের স্পৃহা ব্যক্তিগত গুণ ও মানসিক প্রবনতার উপর নির্ভর করে। তবে সধারণতঃ লোকেরা যে সকল কারণে সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে সেগুলি মোটামুটি বিশ্লেষণ করা যায়। (অ) দূরদর্শিতা—মানুষ তাহার দূরদর্শিতার সাহায্যে অনুমান করে যে ভবিষ্যতে তাহার হয়তো কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে বা

নানাপ্রকার বাড়তি অভাব আসিতে পারে ; অতএব বর্ত্তমানে কষ্ট করিতে হইলেও ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা প্রয়োজন। (আ) পারিবারিক স্নেহ—স্ত্রীপুত্র কন্যা ও অন্যান্য আপনজনের প্রতি স্নেহ মানুষকে সঞ্চয়ে অনুপ্রাণিত করে। কারণ কেহই চাহে না যে তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্নেহাস্পদ আপনজন দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। (ই) উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সম্পদশালী হইয়া যাহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চাহে, দশজনের মধ্যে একজন হইয়া পৃথিবীতে একটু সোরগোল করিয়া লইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী—তাহারও এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা অধিকতর সঞ্চয়ে অনুপ্রাণিত হয়।

(গ) **সঞ্চয়ের নিরাপত্তা**—জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। শাসন প্রতিষ্ঠানের অকর্ম্মণ্যতার দরুন যদি দেশে অত্যধিক চোর-ডাকাতের উপদ্রব থাকে তাহা হইলে জনসাধারণ সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত হইবে না। কারণ কষ্টের সঞ্চয় যদি রাখিতে পারা না যায় তাহা হইলে ব্যয়হ্রাস করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে কে ?

(২) **বিনিয়োগ**—Investment

শুধু সঞ্চয় করিলেই পুঁজি হইবে না-পুঁজি হইতে হইলে সঞ্চিত সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা হইতে উপার্জ্জন হয় ; তাহার অর্থ যাহাতে উহা দ্বারা অন্যান্য সম্পদ উৎপাদন হয়, সে উৎপাদন সঞ্চয়কারী স্বয়ং করুক অথবা তাহার নিকট হইতে উহা লইয়া অপর কেহই করুক। সঞ্চয়কে উপার্জ্জন-প্রসূ করিবার নাম বিনিয়োগ (Investment)। "বিনিয়োগ" 'সঞ্চয়'কে পুঁজির পর্য্যায়ে উন্নীত করে। সেইজন্য পুঁজি বিনিয়োগের উপরেও নির্ভর করে।

কি ভাবে কোথায় কোন্ শিল্পে সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহা জনসাধারণ সকল সময়ে জানে না। উহার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় ; এই প্রতিষ্ঠান হইল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী সাধারণের সঞ্চয় গ্রহন করিয়া শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করে —উভয়েই নিরপত্তা দেয় ; উপরন্তু ব্যাঙ্ক দেয় সুদ, বীমা কোম্পানী দেয় বোনাস এবং অনেকটা বাধ্যতা মূলক সঞ্চয়ের সুবিধা। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী ছাড়াও যৌথকারবার প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company) গঠিত হইতে পারে, ইহার দ্বারাও শিল্পে সঞ্চয় বিনিয়োগের সুবিধা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি আরও একভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহারা দেশে শিল্পের উন্নতি (ও সাধারণভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত) করিয়া উৎপাদন খরচা কমাইয়া সামগ্রীর দাম কমাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(অনু-৭) পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা—*Productivity or Efficiency of capital.*

পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা বলিতে বুঝায়, কিরূপ গুণের কতপরিমাণ সম্পদ একটা পুঁজি সামগ্রী কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন করিতে পারে।

পুঁজির নিজস্ব কোন উৎপাদন ক্ষমতা নাই। অধ্যাপক যাইডের ভাষায় কাঁচা মাল বা যন্ত্র হিসাবে পুঁজি নিছক নির্জীব পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং স্বয়ং "ইহা সম্পূর্ণ উৎপাদন বিহীন।"* পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপরে, (১) প্রয়োগ নৈপুন্য এবং (২) ব্যবহারের উৎকর্ষতা।

(১) প্রয়োগ নৈপুন্য—একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঠিক যত পরিমাণ পুঁজি প্রয়োগ করা উচিত ঠিক তত পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ না করিলে উহা হইতে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নহে। পুঁজির প্রয়োগ যদি বেশী হয় তাহা হইলেও খারাপ কারণ সকল পুঁজি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইবে না; অতএব উহাদের উপর যে ব্যয় করা হইয়াছে তাহার তুলনায় আয় হইবে কম। অপর পক্ষে পুঁজির প্রয়োগ যদি কম হয় তাহা হইলে অপরাপর উৎপাদক উপাদান যথা ভূমি ও শ্রম যে পরিমাণে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা পুরাপুরি কাজে লাগানো হইবে না। শুধু পরিমাণের দিকেই নহে, গুণের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিকৃষ্ট কাঁচামাল ব্যবহার করিলে কম পরিমাণ বা নিকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। শিল্প পরিচালককে সকল সময়েই উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে।

(২) ব্যবহারের উৎকর্ষতা—ব্যবহারের উৎকর্ষতার উপরেও পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। যাঁহারা কার্য্যতঃ পুঁজি ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ শ্রমিকগণ,—যদি দক্ষ না হয় তাহা হইলে যন্ত্রপাতিগুলি ও কাঁচামাল ভালো ভাবে ব্যবহার করা হইবে না। সেক্ষেত্রে ঐগুলি হইতে কম পরিমাণ ও নিকৃষ্ট গুণের সামগ্রী উৎপাদিত হইবে।

অতএব প্রথম ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার উপরে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের উপরে পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে।

(অনু-৮) মুদ্রা ও পুঁজি—*Money and capital*

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মুদ্রাকেই পুঁজি বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের

GIDE—Political Economy, p, 120,

মতে মুদ্রা ও পুঁজি অভিন্ন। 'পেন্সনের' এইরূপ অভিমত। তিনি বলেন একজন ব্যক্তির কাছে মুদ্রা হইল চল্তি পুঁজি কারণ যে মুদ্রার দ্বারা একবার কোন সামগ্রী খরিদ করা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যক্তির কাছে নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু জনসমাজের নিকট মুদ্রা হইল স্থির পুঁজি (Fixed capital) কারণ মুদ্রা হইল বহুকাল স্থায়ী এবং একই মুদ্রা বারবার সামগ্রী কিনিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা ও পুঁজিকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা ভুল। অবশ্য একজন ব্যক্তি বা একটী প্রতিষ্ঠান, তাহার কত পুঁজি আছে তাহা হিসাব করিতে হইলে মুদ্রার মারফতেই করিবে এবং অপরের নিকট হইতে পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহা মুদ্রার মাধ্যমেই করিবে। কারণ মুদ্রার মারফতে হিসাব রাখা সুবিধাজনক এবং মুদ্রার দ্বারা যে কোন পুঁজিসামগ্রী খরিদ করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া মুদ্রা ও পুঁজি একই বস্তু হইবে না। একজন ব্যক্তি তাহার সাধারণ ভোগ সম্পদের হিসাব রাখিতে গেলেও মুদ্রার মারফতেই হিসাব রাখিবে; যে কোনো ভোগ সামগ্রীই মুদ্রার মারফৎ খরিদ করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া, মুদ্রা ও ভোগসামগ্রী তো একই বস্তু নহে কারণ মুদ্রা প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ করা সম্ভব নহে। ইহা ভোগ সামগ্রী ক্রয় কবিবার উপকরণ মাত্র।

অনুরূপ কারণে মুদ্রা ও পুঁজি এক বস্তু নহে, মুদ্রা পুঁজি-সামগ্রী ক্রয় করিবার উপকরণ মাত্র। মুদ্রা ও পুঁজি যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে 'মুদ্রা ও ভূমি' অভিন্ন বা 'মুদ্রা ও শ্রম' অভিন্ন; কারণ মুদ্রার বিনিময়ে ভূমি ও শ্রম খরিদ করিতে পারা যায়।

পেনসনের মত, আর এক দিক দিয়া দেখিলে, ক্রটীপূর্ণ বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ, একজন ব্যক্তি কিছু পরিমাণ মুদ্রা ব্যয়ে স্থির পুঁজি—যথা যন্ত্রপাতি ক্রয় করিলে, ঐ পরিমাণ মুদ্রাকে "চল্তি পুঁজি" বলা হইবে কোন্ যুক্তিতে? পেনসন যুক্তি দিলেন যে ঐ পরিমাণ মুদ্রা কেবল একবার মাত্র ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু স্থির পুঁজি বিক্রয় করিয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা যাইতে পারে না কি? দ্বিতীয়তঃ, সমাজের দিক হইতেও মুদ্রাকে স্থিরপুঁজি বলা চলে না; কারণ পুঁজি হইল মূলতঃ সামগ্রী। কেবলমাত্র সামগ্রীর দ্বারা সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে। দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ যদি সহসা বৃদ্ধি পায় তাহার দ্বারা স্থিরপুঁজির কণামাত্রও বৃদ্ধি না হইতে পারে এবং একটী মুদ্রা যদি নষ্ট হইয়া যায়, কণামাত্রও স্থিরপুঁজি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যাইবে না।

Questions & Hints

1. Define Capital. (1931) Distinguish between Fixed Capital and Circulating **Capital** (1931, 1943) [অনুচ্ছেদ ১ এবং ৪ নং অনুচ্ছেদের (১)]

2. **Distinguish** between wealth and Capital. (1938) [অনুচ্ছেদ—৩]

3. Discuss the part played by Capital in production (1943) [অনুচ্ছেদ—৫]

4. **How does Capital originate?** (1926)—or, **Indicate** the Circumstances **that** promote the growth of capital in a country (1940) [অনুচ্ছেদ—৬]

5. Analyse the factors on which the productivity of Capital depends. [অনুচ্ছেদ—৭]

দশম অধ্যায়

ব্যবস্থাপনা

Organisation.

(অণুচ্ছেদ-১) ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন—*Necessity of Organisation.*

শ্রমিক যখন নিজেই মালিক ছিল,—নিজের শ্রম পুঁজি ও ভূমির প্রয়োগে স্বয়ং তাহার সামগ্রী উৎপাদন করিত তখন ব্যবস্থাপনার কোনো স্বতন্ত্র জটিল সমস্যা ছিল না। উৎপাদনকারী নিজের প্রয়োজন মত বা খরিদ্দারের বরাত (order) মত সামান্য পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিত; উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য থাকায় কি পরিমাণে উৎপাদক-উপাদান প্রয়োগ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে জটিল চিন্তা বা পরিশ্রম প্রয়োজন হইত না; যেটুকু চিন্তা বা শ্রম প্রয়োজন হইত তাহা শ্রমের অংশ বলিয়াই গণ্য হইত।

কিন্তু আধুনিক যন্ত্র-যুগে অবস্থার বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহু পরিমাণ পুঁজি ব্যবহৃত হয় এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে। উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণও বিরাট। বহুদূর হইতে একসঙ্গে অনেক কাঁচামাল আনীত হয় আবার দেশ বিদেশের হাজার হাজার বাজারে সেগুলি বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয় হইবে, এই আশায় ও অনুমানে উৎপাদিত হয়। এইরূপে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা ও সুসংগঠিত করা বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনাসাপেক্ষ এবং গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ শ্রমিকদের এই কার্য্য করিবার মতন যোগ্যতা বা সুযোগ নাই। সেইজন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার কার্য্য প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের পদ্ধতি যতই জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে, উৎপাদনের পরিধি যতই বৃহৎ হইতে থাকে—ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপককে একটী পৃথক উৎপাদক-উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। ব্যবস্থাপককে বলা হয় উদ্যোগী (undertaker), ঝুঁকিবাহী

(risk bearer) ও শিল্প পরিচালক। ফরাসী ভাষায় ইহা একটী শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়—"আঁত্রেপ্রনা" (Entrepreneur)।

আঁত্রেপ্রনা শব্দটী বিশেষ তাৎপর্য্যপুর্ণ; ইহার অর্থ হইল এমন একজন ব্যক্তি যিনি শিল্পোৎপাদনের উদ্যোগী, শিল্পের ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও ঝুঁকিবাহী। আমরা আঁত্রেপ্রনা শব্দটী ব্যবহার করিব।

(অণু-২) আঁত্রেপ্রনার কার্য্যকলাপ—*Function of Entrepreneur.*

আঁত্রেপ্রনার কার্য্যকলাপ মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) **ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান**—শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা করিবার দায়িত্ব হইল আঁত্রেপ্রনার। তিনিই স্থির করেন কোন্ সামগ্রী কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে। উহার জন্য যত পরিমাণ ভূমি, পুঁজি ও শ্রমিক প্রয়োজন তাহা তিনিই সংগ্রহ করেন। তিনি যথাযথ শ্রম বিভাগ করিয়া দেন এবং কোন্ শ্রমিক কোন্ কাজ করিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। যথাযথভাবে সকলে কার্য্য করিতেছে কিনা—তাঁহার ব্যবস্থামত সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে কিনা, তাহারও তিনি তত্ত্বাবধান করেন। সামগ্রীগুলি উৎপাদিত হইবার পর সেগুলি কোথায় বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হইবে, কত পরিমাণে পাঠানো হইবে ও কি দামে বিক্রয় হইবে তাহাও তিনি স্থির করেন। তিনি ভূস্বামীকে, শ্রমিককে ও পুঁজিপতিকে তাঁহাদের পারিশ্রমিক দেন। শিল্পের ক্ষেত্রে আঁত্রেপ্রনা হইলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু; এবং অযোগ্যতার সহিত কার্য্য করিলে আধুনিক শিল্পের প্রতিযোগিতা তাঁহাকে মহেশ্বরের ভূমিকা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

(২) **ঝুঁকিবহন** (risk taking)—আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার অনেক ঝুঁকি আছে। একজন উৎপাদনকারী যদি খরিদ্দারের বরাত মতন (according to order) সামগ্রী উৎপাদন করে, তাহা হইলে উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বিক্রয় হইবে কিনা এ সম্বন্ধে কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পূর্ব্ব হইতে খরিদ্দারদের বরাত সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন সুরু করেনা; তাহার খরিদ্দার বহু দেশবিদেশের বাজারে ছড়াইয়া আছে। উৎপাদিত সামগ্রী খরিদ্দারে খরিদ করিবে এই পূর্ব্ব-অনুমানেই সামগ্রী উৎপাদিত হয়। কিন্তু উৎপাদন শেষ হইবার কালে এমন অনেক কিছু ঘটিতে পারে যাহাতে উৎপাদিত সামগ্রী আশানুরূপ বিক্রয় হইল না বা যে দামে বিক্রয় হইল তাহা অনুমিত দাম অপেক্ষা কম। এই সকল ক্ষেত্রে বিস্তর লোকসান হইয়া যাইবে। এই লোকসানের দায়িত্ব আঁত্রেপ্রনাই বহন করিবেন। অপরপক্ষে ব্যবসার বাজার যদি চড়া হয় এবং

উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অপ্রত্যাশিত লাভ হয় তাহা হইলে উহা আঁত্রেপ্রনার প্রাপ্য। এই অপ্রত্যাশিত লাভ লোকসানের দায়িত্বকে বলা হয় ঝুঁকি। আঁত্রেপ্রনার কার্য্য হইল এই ঝুঁকি বহন করা।

(অণু-৩) আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা (বা যোগান)—*Number (or Supply) of Entrepreneurs.*

আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা বা যোগানের উপর একটী দেশের শিল্প-প্রসার প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে। যে দেশে আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা অধিক হয় সেই দেশে শিল্পের প্রসার হয় অধিক এবং যে দেশে ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন দক্ষ আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা অল্প সে দেশে ভূমি, শ্রম, পুঁজি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও উপযুক্ত পরিমাণে শিল্পোন্নতি হইবে না।

আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা কিসের উপর নির্ভর করে তাহার বিচার করিতে হইলে আঁত্রেপ্রনা শ্রেণীকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা বিধেয়; প্রথমতঃ যাঁহারা অসাধারণ ব্যবসায়দক্ষতা সম্পন্ন,—যাঁহাদিগকে প্রতিভা বলা চলে, যথা হেনরি ফোর্ড, রাজেন মুখোপাধ্যায় বা জামশেদজী টাটা; দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা সাধারণ ব্যবসায় দক্ষতা সম্পন্ন।

(১) অসাধারণ ব্যবসায় দক্ষতাসম্পন্ন আঁত্রেপ্রনা, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে যাঁহাদিগকে প্রতিভা (genius) বলা চলে, ইঁহাদের উদ্ভব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ইহা কুলগত গুণ (racial quality) এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে ইহা মোটামুটি ভাবে বলা চলে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা ও সাম্যের অস্তিত্ব থাকিলে—অর্থাৎ ব্যক্তির বুদ্ধি ও গুণ পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকিলে,—জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন প্রতিভার বিকাশ হয় ব্যবসায়ের জগতেও তেমনি প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়। টাউজিগের ভাষায় "আধুনিক সময়ে শ্রেণীস্বার্থ উঠাইয়া দিবার যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল রহিয়াছে, তেমনি উহার প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ফলাফলও রহিয়াছে।"

(২) সাধারণ ব্যবসায় দক্ষতা সম্পন্ন আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা নির্ভর করে দুইটী বিষয়ের উপরে, (ক) শিক্ষা (খ) অভিজ্ঞতা।

(ক) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যতই বিস্তার সাধন করা হয় তত কারবার পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সময়ের বাণিজ্য-শিক্ষা (commerce education) ব্যবসা বাণিজ্যের তত্ত্ব ও তথ্য

সরবরাহ করিয়া ব্যবসা দক্ষতার সৃষ্টি করিতে পারে। (খ) অনেক ব্যক্তি সাধারণ শ্রমিক হইয়া কোনো কারবারে প্রবেশ করিয়া কারবারের খুঁটি-নাটি বিষয় সম্পর্কে ও পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করে। পরে স্বতন্ত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা সে কাজে লাগাইতে পারে। এইভাবে সে নিজেকে আত্রেপ্রনার পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে পারে।

Questions & Hints

1. Assess the importance of the Entrepreneur as a separate factor of production. [অনুচ্ছেদ—১]

2. Explain the nature of the services performed by the Entrepreneur in modern business organisation (1941)—[অনুচ্ছেদ—২]

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের কারবার সংগঠন

Different types of Business Organisation.

(অণুচ্ছেদ-১)—একটী কারবারে যে মাত্র একজন আঁত্রেপ্রনা থাকিবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। কোনো কারবারে একজন আঁত্রেপ্রনা থাকিতে পারেন আবার কোনো কারবারে একজনের অধিক আঁত্রেপ্রনা থাকিতে পারেন। আঁত্রেপ্রনার সংখ্যা অনুযায়ী কারবার সংগঠনের প্রকারভেদ করা হয়।

এক-মালিকানা বা এক আঁত্রেপ্রনা কারবার—Single Proprietorship or Single Entrepreneur system.

(অণু-২) এইরূপ কারবার-ব্যবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যিনি সমগ্র কারবারটির মালিক ও পরিচালক। আঁত্রেপ্রনার যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা তিনি একেলাই সম্পন্ন করেন এবং আঁত্রেপ্রনার যাহা কিছু দায়িত্ব তাহা তিনি একেলাই বহন করেন। এক-মালিকানা ব্যবস্থা হইল শিল্প জগতের রাজতন্ত্র—পরিচালন ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত।

এইরূপ ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে আঁত্রেপ্রনা কারবারের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত থাকেন; কারণ একপক্ষে কারবার হইতে যে লাভ হইবে তাহাতে যেরূপ কেহই অংশীদার নেই, অপর পক্ষে কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সমগ্র লোকসান তাঁহাকে স্বয়ং বহন করিতে হইবে। অতএব উৎপাদনকারী-মালিক যতদূর সম্ভব দক্ষতা ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের দ্বারা যথাসম্ভব অল্প-ব্যয়ে অধিক উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিবেন। উপরন্তু যে সকল সামগ্রীর উৎপাদন খরিদ্দারের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী এবং নূতন নূতন ফ্যাসান অনুযায়ী করিতে হইবে সেই সামগ্রী সম্পর্কীয় কারবারে ছোটো একমালিকানা কারবার বিশেষ ফলপ্রদ; কারণ মালিক সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন।

কিন্তু ইহার ত্রুটীও আছে। আধুনিক যুগ হইল রাশীকৃত উৎপাদনের (mass production) যুগ—বিভিন্ন কারণে একসঙ্গে বহু পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন। একজন মালিকের পক্ষে বৃহদায়তন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্র পুঁজি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না; সম্ভব হইলেও সাহসের অভাব ঘটে,

কারণ কারবারের অসাফল্যেরঝুঁকি সম্পূর্ণ-ভাবে একজনের উপরেই ন্যস্ত থাকে। উপরন্তু বৃহদায়তন শিল্পে আন্ত্রেপ্রনার করণীয় সকল কার্য্য একজনের দ্বারা সম্ভব হইয়া উঠে না—মালিক সকল দিকে নজর দিতে গিয়া কোনো দিকই সামলাইয়া উঠিতে পারেন না।

সহমালিকানা কারবার—Partnership.

(অণু-৩) পরস্পরের মধ্যে পরিচিত জনকয়েক ব্যক্তি একত্রে একটী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিলে উহাকে সহ-মালিকানা কারবার বলা হয়। এই কয়েকজন ব্যক্তি কারবারটীর জন্য আবশ্যকীয় পুঁজি সম্মিলিত ভাবে সরবরাহ করেন, কারবারের পরিচালনায় তাঁহারা সকলেই অংশ গ্রহণ করেন, এবং কারবারের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি তাঁহারা সকলেই বহন করেন; সহমালিকানা কারবারে আন্ত্রেপ্রনার সংখ্যা থাকে একের অধিক কিন্তু বহু নহে—বহু নহে কারণ জনসাধারণের মধ্যে যে কেহ টাকা দিলেই একটী সহমালিকানা কারবারে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সহমালিকানা ব্যবস্থা হইল শিল্প-জগতের অভিজাততন্ত্র—পরিচালন ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে একের অধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত, কিন্তু বহুর মধ্যে প্রসারিত নহে।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে একজন ব্যক্তি যত পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিতে পারেন একাধিক ব্যক্তি একত্রিত ভাবে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করিতে সক্ষম হন। ব্যবস্থাপনার দিক হইতেও দেখা যায় এক একজন সহ-মালিক (partner) উৎপাদন-ব্যবস্থার এক একটী বিশেষ দিকের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। অনেক সময়ে একমালিকানা কারবারের মালিক তাঁহার কোনো দক্ষ কর্ম্মচারীকে তাঁহার সহিত সহমালিক করিয়া লইতে পারেন; ইহাতে দক্ষতা পুরস্কৃত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এইরূপ কারবারের ত্রুটী হইল একজন সহমালিকের ভ্রমের জন্য কারবারটী যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সকল সহমালিকদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। উপরন্তু কারবারটী যদি দেনা করে এবং সেই দেনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ফেল করে তাহা হইলে পাওনাদার প্রথমে অবশ্য কারবারটীর সম্পত্তি,—যথা কারখানাগৃহ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা আদায়ের চেষ্টা করিবে; কিন্তু উহার দ্বারা পাওনাদারের পাওনা যদি সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয় তাহা হইলে পাওনাদার কারবারটীর সহমালিকদের ব্যক্তিগত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে। আইনের ভাষায় বলা

হয় যে কারবারীর জন্য উহার মালিকদিগের প্রত্যেকের "অসীম ঋণ দায়িত্ব" (unlimited liability) আছে। এই "অসীম ঋণদায়িত্ব" বা আনলিমিটেড্ লায়াবিলিটির জন্য লোকে সহমালিকানা কারবারে যোগদান করিতে ভয় পায়।* ইহা ভিন্ন সহমালিকানা কারবারের ধারাবাহিকতা (continuity) থাকে না কারণ একজন সহমালিকের মৃত্যু হইলে সমগ্র কারবারটীকে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। উপরন্তু আধুনিক বৃহৎ শিল্পে যে পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন হয় তাহা মাত্র জনকয়েক ব্যক্তির পক্ষেও সরবরাহ করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

যৌথপুঁজি প্রতিষ্ঠান—Joint Stock Company.

(অণু-৪) যৌথ পুজি কারবারে বহুসংখ্যক ব্যক্তি কিছু কিছু পুঁজি সরবরাহ করেন ও বহুসংখ্যক ব্যক্তি ঐ কারবারের মালিক; কারবারটী নিয়ন্ত্রণ করিবার চূড়ান্ত অধিকার তাঁহাদের সকলেরই আছে এবং তাঁহাদিগের সকলকেই সমবেত-ভাবে কারবারটীর ঝুঁকি বহন করিতে হয়। যৌথ পুঁজি কারবারের স্বত্বাধিকারীগণ সংখ্যায় বহুশত এমন কি বহু সহস্রও হন এবং তাঁহারা একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হইতে পারেন অথবা বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হইতে পারেন। স্বত্বাধিকারীগণ জনকয়েক ব্যক্তিকে পরিচালক (Director) নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। এই পরিচালকদিগকে সমবেতভাবে পরিচালক সঙ্ঘ "Board of Directors" বলা হয়। স্বত্বাধিকারীগণের পক্ষ হইতে কারবারটীর পরিচালনা করিয়া থাকেন এই পরিচালক সঙ্ঘ—অবশ্য তাঁহারা চূড়ান্ত ভাবে স্বত্বাধিকারীগণের নিকট দায়ী থাকেন। যৌথপুঁজি কারবার হইল শিল্প জগতের গণতন্ত্র—ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে বহুর মধ্যে প্রসারিত এবং বহুর পক্ষ হইতে জনকয়েক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত।

(অণু-৫) যৌথপুঁজি কারবারের পুঁজি সংগ্রহের উপায়—*Ways of raising Capital.*

মোটামুটি দুই উপায়ে যৌথপুঁজি কারবার উহার পুঁজি সংগ্রহ করে: (১) ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এবং (২) অংশ বিক্রয় করিয়া।

* অবশ্য একমালিকানা কারবারেও মালিকের অসীম ঋণদায়িত্ব আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে অসীম ঋণ দায়িত্বের ফলাফল কম ব্যাপক। তাহার কারণ সহমালিকানা কারবার আয়তনে বৃহৎ এবং উহার ঋণদায়িত্ব একমালিকানা কারবারের ঋণদায়িত্ব অপেক্ষা বহু গুণ অধিক। উপরন্তু সহমালিকানা কারবার ফেল করিলে সহমালিকগণের অধিকাংশই যদি দেনার ভয়ে পলাইয়া যায় তাহা হইলে পাওনাদার যদি একজন সহ-মালিককেও ধরিতে পারে তাহা হইলে ঐ একজনের নিকট হইতেই তাহার সমস্ত পাওনা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

(১) **ডিবেঞ্চার ক্রেতা** (Debenture holders)—যাঁহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় করেন তাঁহারা যে পরিমাণ অর্থ কারবারকে দেন উহার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পান। কারবারটীর লাভ বেশী হউক বা কম হউক অথবা কোনো বৎসর কোনো লাভ নাই হউক, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য সুদ নির্দ্দিষ্ট হারে পাইবেনই। ইহারা কারবারটীর স্বত্বাধিকারী নন এবং কারবার পরিচালনার ব্যাপারে ইহাদের কোনোই হাত নাই। ইহারা কারবারটীর পাওনাদার—কারবার গুটাইলে আগে ইহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে হইবে।

(২) **অংশীদার** (Share holders)—যাঁহারা অংশপত্র ক্রয় করেন তাঁহারা কারবারকে কিছু পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করিয়া উহার নিদর্শন স্বরূপ একটী অংশ পত্র (share) গ্রহণ করেন। অংশীদারগণই কারবারটীর মালিক। তাঁহারা তাঁহাদের দ্বারা সরবরাহকৃত পুঁজির দরুণ কোনো নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পান না। কারবারের যদি লাভ হয় তাহা হইলেই তাঁহারা লাভের বখ্‌রা পান—ইহাকে মুনাফাবখ্‌রা বা লভ্যাংশ (Dividend) বলা হয়। যে ব্যক্তি যত মুদ্রা সরবরাহ করিয়াছেন অর্থাৎ যত টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছেন সেই অনুযায়ী তিনি লভ্যাংশ পান। কারবার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফেল করে তাহা হইলে কারবারের দেনার জন্য অংশীদারেরা দায়ী থাকেন—অবশ্য যৌথপুঁজি কারবারের মালিকদের ঋণ-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

অংশীদারদিগের মধ্যে দুই পর্য্যায়ের অংশীদার থাকেন: (ক) অগ্রদাবী অংশীদার (Preference Shareholder)—ইহারা কত লভ্যাংশ পাইবেন তাহার হার পূর্ব্ব হইতেই স্থির করা থাকে। কারবারের লাভ হইলে আগে অগ্রদাবী অংশীদারদের লভ্যাংশ নির্দ্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। মোট লাভ হইতে অগ্রদাবী অংশীদারগণকে নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অংশীদারদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাদের বলা হয় (খ) সাধারণ অংশীদার (Ordinary Shareholders); সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশের কোনো নির্দ্দিষ্ট হার নাই। ইহারা কোন্ বৎসরের জন্য কত পরিমাণে লভ্যাংশ পাইবে তাহা নির্ভর করে ঐ বৎসর কারবারটীর কত লাভ হইয়াছে এবং উহা হইতে অগ্রদাবী অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া কত অবশিষ্ট আছে তাহার উপরে; অতএব সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশ খুব বেশীও হইতে পারে আবার খুব কমও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত: ধরা যাউক, একটী কারবারের দুইজন অংশীদার: (ক) অগ্রদাবী

ও (খ) সাধারণ। 'ক' এর সহিত পূর্ব্বেই স্থির করা আছে লাভের মধ্য হইতে প্রতি একশত টাকার অংশের দরুণ সে ৮৲ টাকা পাইবে। বাকী যাহা থাকিবে তাহা (খ) পাইবে। অনুমান করা যাউক'ক' ও 'খ' প্রত্যেকেই ১০০৲ টাকা করিয়া পুঁজি দিয়াছে। এক্ষেত্রে যদি কারবারে লাভ হয় ৮৲ টাকার কম উহার সমস্ত 'ক' পাইবে, 'খ' কিছুই পাইবে না; যদি লাভ হয় ৮৲ টাকা—উহাও সমস্ত 'ক' এর প্রাপ্য 'খ' কিছুই পাইবে না; যদি লাভ হয় ৯৲ টাকা তাহা হইলে 'ক' পাইবে ৮৲ টাকা এবং 'খ' পাইবে ১৲ টাকা; কিন্তু যদি লাভ হয় ২০৲ টাকা তাহা হইলে 'ক' সেই নির্দ্দিষ্ট ৮৲ টাকাই পাইবে কিন্তু 'খ' পাইবে ১২৲ টাকা।

(অনু-৬) যৌথপুঁজি কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা—*Advantages and Disadvantages of Joint Stock Organisasion.*

সুবিধা—(ক) আধুনিক সময়ের সুগঠিত বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যে বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয় তাহা যৌথ পুঁজি ব্যবস্থার দ্বারাই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, বিন্দু বিন্দু জলের একত্রীকরণ হইতে যেমন জলস্রোত সৃষ্ট হইতে পারে তেমনি বহু সংখ্যক ব্যক্তি কিছু কিছু পুঁজি সরবরাহ করিয়া বিপুল পরিমাণ পুঁজি তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি পাইলে আঁত্রেপ্রনাগণ তাঁহাদের দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারেন। (খ) যৌথপুঁজি ব্যবস্থায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা থাকে। কোনো মালিকের অর্থাৎ অংশীদারের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অংশ তাঁহার উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকে। কোনো অংশীদারের মৃত্যু হইলে কারবার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় না। কারবারটীর যেন স্বতন্ত্র নিজস্ব জীবন থাকে। (গ) মালিকের সংখ্যা বহু থাকায় লোকসানের ঝুঁকি বহু ব্যক্তির মধ্যে ছড়াইয়া থাকে; অতএব প্রত্যেককে ঝুঁকির কম অংশই বহন করিতে হয়। উপরন্তু যে টুকু ঝুঁকি একজন মালিক বহন করেন তাহাও আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ কারণ অংশীদারের ঋণ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited liability)। ইহার অর্থ হইল যে কারবার ফেল করিলে কারবারের পাওনাদার কারবারের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন কিন্তু অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ—কেবলমাত্র যে পরিমাণ মুদ্রার দ্বারা তাঁহারা একখানি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন সেই পরিমাণ মুদ্রা, কারবারটী ফেল করিলে তাঁহাদের নষ্ট হইবে। অতএব ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেকের ঝুঁকি অল্প এবং ঋণ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হওয়ায়, যৌথপুঁজি কারবার নূতন ধরণের শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের, এবং উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি গ্রহণের,

অনিশ্চয়তা বহন করিতে পারে। (ঘ) এই কারবার বিভিন্ন উপায়ে পুঁজি সংগ্রহ করে বলিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাহাদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে কারবারে পুঁজি নিয়োগের সুযোগ পায়। যাহারা অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতে রাজী নহে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সুদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করে। যাহারা অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতে রাজী আছে তাহারা অংশ ক্রয় করে। অংশও আবার বিভিন্ন প্রকারের আছে ; যাহারা বেশী অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতে প্রস্তুত আছে তাহারা "সাধারণ-অংশ" ক্রয় করে। যাহারা কম অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতে ইচ্ছুক তাহারা "অগ্রদাবী অংশ" (Preference Share) ক্রয় করে। উপরন্তু এক একখানি অংশের মূল্যও কম যথা ১০৲ টাকা বা ২৫৲ টাকা বা ১০০৲ টাকা ; এক্ষেত্রে যাহার যেমন আর্থিক সঙ্গতি সে তত পরিমাণ অংশই ক্রয় করিতে পারে। অতএব কারবারে বিনিয়োগকারীগণের প্রত্যেকেই তাহার মানসিক প্রবণতা এবং আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী কারবারে টাকা খাটাইবার সুযোগ লাভ করে। ইহাতে জনসাধারণের বিনিয়োগ-স্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয়।

অসুবিধা—(ক) যদিও অংশীদারগণ সমবেতভাবে যৌথপুঁজি কারবারের মালিক তবুও সকল অংশীদার কারবারের পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না। পরিচালক-সজ্ঘই কারবার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এই পরিচালকদের মধ্যে সাধুতার অভাব ঘটিলে তাহারা অংশীদারদিগকে ঠকাইয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারেন এবং কারবারটীকেও ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারেন। (খ) পরিচালকবর্গ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকেন এবং দৈনন্দিন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকে বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের উপরে। কিন্তু মালিক যে যত্নের সহিত শ্রমিকদের কার্য্য ও অন্যান্য ব্যাপার তত্ত্বাবধান করিবেন এই সকল বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা সেই যত্ন লইবেন না। (গ) যৌথপুঁজি কারবারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে না এবং একজন অপরের সুবিধা বুঝে না। সেইজন্য এইরূপ কারবারে শ্রমিক অসন্তোষের অবকাশ থাকে বেশী এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধে উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সমবায় কারবার—Co-operative Business.

(**অণু-৭**) কারবারে শ্রমিকগণ শ্রম দেয় এবং উদ্যোগী ও ব্যবস্থাপকের কার্য্য করেন আর একটী বিশেষ শ্রেণী যাঁহাদের নাম আঁত্রেপ্রনা। অনেক ক্ষেত্রে যাহারা পুঁজি দেয় তাহারাই আঁত্রেপ্রনার কার্য্য করে। একই ব্যক্তি কারবারের

পুঁজিপতি ও আঁত্রেপ্রনা। এক্ষেত্রে সুদ হিসাবে ও মুনাফা হিসাবেই, উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থের অনেকখানি পুঁজিপতি-আঁত্রেপ্রনা (Capitalist-Entrepreneur) গ্রহণ করেন; শ্রমিকদের মজুরী হিসাবে ভাগে পড়ে অল্প।

ইহার প্রতিবাদেই সমবায় কারবার উদ্ভূত হইয়াছিল। এই কারবারে একদল শ্রমিক পরস্পরের সহিত সহযোগিতা দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটী সংসদের দ্বারা কারবারটী পরিচালিত হয়। কারবারের জন্য যে পুঁজি প্রয়োজন তাহা আংশিকভাবে শ্রমিকগণই দেয় এবং আংশিকভাবে তাহারা অপরের নিকট হইতে ঋণ করে। যে এইরূপ ঋণ দেয় কারবারের উপর তাহার কোনরূপ মালিকানা থাকে না—সে শুধু নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পায়। পুঁজিপতি আঁত্রেপ্রনাকে বাদ দেওয়া হইল; শ্রমিকগণ স্বয়ং মালিক ও ব্যবস্থাপক। এইরূপ সমবায় ব্যবস্থার নাম হইল "উৎপাদনে সমবায় (Productive Co-operation)"।

ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার সমবায় আছে, "বণ্টনে সমবায়" (Distributive Co-operation)। ইহাতে ভোগকারী হিসাবে জনকয়েক ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দোকান স্থাপন করে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই দোকান হইতে ক্রয় করে। তাহারাই দোকানের মালিক এবং তাহারাই দোকানের ক্রেতা। মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীকে অর্থাৎ দোকানদারকে যে লাভ তাহারা দিতে বাধ্য হইত সেই লাভ তাহারা নিজেদের কাছেই রাখিতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ পুঁজিপতি-মালিককে বাদ দেয় এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেরাই উৎপাদন পরিচালনা করে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কয়েকজন ভোগকারী দোকানদারকে বাদ দেয় এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভোগ সামগ্রী নিজেরাই সরবরাহ করে। 'সেলিগম্যান' বলেন, "সমবায় বলিতে বুঝায় বণ্টনে ও উৎপাদনে প্রতিযোগিতার পরিহার।"* ইহার সহিত আরো বলিতে হইবে, 'পুঁজিপতি-মালিককে পরিহার।'

সরকারী কারবার—Public Enterprise.

(অণু-৮) অনেক সময়ে দেশের সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কোনো কারবারের স্বত্বাধিকারী হন এবং ঐগুলি পরিচালনা করেন। এই গুলিকে

* "Co-operation......means the abandonment of competition in distribution and in production."—SELIGMAN, Principles of Economics p. 151

বলা হয় সরকারী কারবার। হয় এই কারবারগুলি প্রথম হইতেই সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অথবা ঐগুলি সাধারণ লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পরে সরকার ঐগুলিকে কিনিয়া লইয়াছেন। যে কারবারগুলির কার্য্য সমগ্র সমাজের স্বার্থের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট—যথা রেলওয়ে, ডাক ও তার, জলসরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি,—সেইগুলি সরকারী স্বত্বাধীনে আনীত হয়। এইগুলি সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কারবার হইতে মুনাফা প্রাপ্তিই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না—প্রধান উদ্দেশ্য থাকে জন-কল্যাণ।

Questions & Hints

1. Comment on the **advantages** and limitations of production by joint stock companies. (1939) [অনুচ্ছেদ—৬]

2. What are the various ways in which a typical joint stock company raises its Capital? (1931)—[অনুচ্ছেদ—৫]

3. Describe the features of the joint stock company and discuss its advantages (1950) [অনু- ৪ ও ৬ (সুবিধা)]

দ্বাদশ অধ্যায়

উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা।

Organisation of Production.

(অণুচ্ছেদ-১) আধুনিক শিল্পে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরণ পরিলক্ষিত হয়। ব্যবস্থাপনার এই ধরণগুলি কি ভাবে কতদূর কার্য্যকরী করা সম্ভব হইয়া থাকে বা কতদূর কার্য্যকরী হওয়া বাঞ্ছনীয়, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। আধুনিক কালের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইবার জন্য এইগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রমবিভাগ—*Division of Labour.*

(অণু-২) মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারাই জীবনধারণ করে। 'জন ষ্টুয়ার্ট মিল' মানুষের এই সহযোগিতাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম, সরল (simple) সহযোগিতা, দ্বিতীয়, মিশ্র (complex) সহযোগিতা। সরল সহযোগিতার দ্বারা সেই কাজটী করা হয় যে কাজটী একজন ব্যক্তি একেলা কোনোক্রমেই করিতে পারে না—যথা একটী খুব ভারী জিনিষ একস্থান হইতে অপর স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। অপরপক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে (যথা পরিধেয়ের অভাব তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে একজন লোক জুতা, একজন বস্ত্র, একজন জামা তৈয়ারী করিতেছে) অথবা একাধিক ব্যক্তি যদি একই কার্য্যের বিভিন্ন অংশ সম্পাদন করে (যথা জুতা তৈয়ারীর কার্য্যে একজন ব্যক্তি জুতার তলা তৈয়ারী করে, একজন উপরকার চামড়া কাটে, একজন জিব্ তৈয়ারী করে, একজন ফিতা তৈয়ারী করে)—তাহা হইলে উহাকে মিশ্র সহযোগিতা বলা হয়।

এইরূপ মিশ্র সহযোগিতার নাম শ্রম-বিভাগ। একজন ব্যক্তি তাহার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য্যেই শ্রম নিয়োগ না করিয়া কোনো এক-ধরণের কাজে বা কোনো একটী কাজের একটী বিশেষ অংশে শ্রম নিয়োগ করে। তাহার শ্রম এক-ধরণের কাজে বা একটী মাত্র কাজে প্রযুক্ত হইয়া ঐ কাজ সম্পাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করে। সেই কারণে অর্থনীতিবিদ্‌গণ

শ্রম বিভাগকে "শ্রমের বিশেষত্ব-বিধান" (Specialisation of labour) বলিয়া অভিহিত করেন। আধুনিক শিল্পোন্নতির ভিত্তিই শ্রমের বিশেষত্ব-বিধান বা শ্রম-বিভাগ।

(অণু-৩) শ্রম বিভাগের বিভিন্ন রূপ—*Different forms of Division of Labour.*

শ্রমবিভাগের মোটামুটি চারিটী বিভিন্ন রূপ আছে :—

(ক) শিল্পে, ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে বিভাগ (Division into industries, trades or professions)—এক একজন ব্যক্তি যখন এক একটী পৃথক শিল্পে, ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে তখন উহাকে শ্রম-বিভাগ বলে। এই ধরণের শ্রম-বিভাগ খুব প্রাচীন সমাজেও দেখিতে পাওয়া যায়। একজন লোক হয়তো শুধু ঘর নির্ম্মাণ করে, একজন শুধু কৃষিকার্য্য করে, একজন হয়তো শুধু পশুপালন করে। আবার এক এক শ্রেণীর ব্যক্তির এক এক প্রকার বিশেষ ব্যবসায় বা বৃত্তি থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—এক শ্রেণীর ব্যক্তি যোদ্ধার কাজ করে, এক শ্রেণীর ব্যক্তি চিকিৎসকের কাজ করে, এক শ্রেণীর ব্যক্তি শিক্ষকের কাজ করে।

(খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ (Division into complete processes)—এমন ঘটিতে পারে যে এক একজন ব্যক্তি এক একটী পৃথক কাজে নিযুক্ত আছে কিন্তু প্রত্যেকে এমন সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে যাহা সরাসরিভাবে ভোগ করা যায় না কিন্তু বাজারে বিক্রয় করা যায়। সেই সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিতে পারে, যে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যাহা উৎপাদন করিল অপর এক ব্যক্তি উহারই সাহায্যে অপর একটী সামগ্রী উৎপাদন করিবে। একজন ব্যক্তি তুলা উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, আরেকজন ঐ তুলা কিনিয়া উহা হইতে সূতা কাটে, অপর এক ব্যক্তি ঐ সূতা কিনিয়া উহা হইতে বস্ত্র বয়ন করে। এক্ষেত্রে তুলা উৎপাদনকারী, সূত্রকর্ত্তনকারী ও বস্ত্রবয়নকারী—প্রত্যেকেই উৎপাদনকার্য্যের এক একটী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সাধন করিল। কিন্তু তাহাদের সকলের শ্রম দিয়া একটী মাত্র ভোগসামগ্রী, যথা বস্ত্র, উৎপাদিত হইল।

(গ) অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ (Division into incomplete processes)—একটী সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যখন বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয় কিন্তু কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা একটী সম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদিত হয় না (অর্থাৎ যাহা বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে খরিদ্দার পাওয়া যাইবে না) তখন উহাকে অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রম-বিভাগ বলা হয়। যথা 'এডাম্ স্মিথ্' বলিয়াছিলেন একটী

আলপিন্ তৈয়ারী করিতে আঠারোটী প্রক্রিয়া লাগে। এক্ষেত্রে এক একদল ব্যক্তি এক একটী প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে কিন্তু কোনা দলের প্রক্রিয়া দ্বারা একটী সম্পূর্ণ বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় না।

(ঘ) **আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ** (Territorial division of labour)—বিভিন্ন কারণে বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধা থাকে। এক একটী অঞ্চলের লোকে সেই অঞ্চলের সুবিধাজনক বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়। এই 'অঞ্চল' বলিতে যদি এক একটী রাষ্ট্রকে বুঝায়, তাহা হইলে আঞ্চলিক শ্রম বিভাগকে বলা হয় "আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-বিভাগ",—"প্রত্যেক জাতি বিশেষভাবে সেই সামগ্রীর উৎপাদনে নিযুক্ত হয়—যাহার উৎপাদনের জন্য ঐ দেশের মাটী আবহাওয়া বা তাহার বিশেষ কুলগত গুণ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত"।* যথা পাকিস্থানের পাট, ভারতের চা, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ঘড়ি ইত্যাদি। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক শ্রম বিভাগ হইতে "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য" (International trade) উদ্ভূত। অপর পক্ষে এই 'অঞ্চল' বলিতে যদি একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন এলাকা বুঝায় তাহা হইলে আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ "শিল্পের স্থানিকতার" (localisation of industries) রূপ গ্রহণ করে; যথা কলেজ ষ্ট্রীটে বইয়ের দোকান, বউবাজার ষ্ট্রীটে আসবাবের দোকান, জামসেদপুরে লৌহশিল্প, উত্তর বঙ্গে চা উৎপাদন ইত্যাদি।

(অণু-৪) শ্রম বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া—*Activities involved in division of labour.*

প্রথমতঃ শ্রমবিভাগ বলিতেই কোনো নির্দ্দিষ্ট শিল্পে বা ব্যবসায়ে পারদর্শিতা-লাভ বুঝায়—অর্থাৎ কোন কার্য্যে বিশেষত্বশীলতা (Specialisation)। দ্বিতীয়তঃ এক একটী লোক এক একটী কার্য্যে বা প্রক্রিয়ায় বিশেষত্ব লাভ করিলেও, বিভিন্ন লোকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও থাকা প্রয়োজন। কোন একটী সামগ্রী উৎপাদনের কাজ বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেও, তাহারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা না করিলে একটী সমগ্র ভোগ-সম্পদ উৎপাদিত হইতে পারে না। সেইজন্য অধ্যাপক পেন্‌সন্ বলেন "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা ইহাকে শ্রম সহযোগিতা বা শ্রম-বিভাগ বলিতে পারি।"

*..."each nation devoting itself more specially to the production of what seemed best adapted to its soil, its climate or its peculiar racial characteristics," —GIDE, Political Economy, p. 152.

[“Whether we call the process...Combination of labour or Division of Labour is immaterial. It depends entirely on one's point of view.”—PENSON]। তৃতীয়তঃ শ্রমবিভাগ থাকিলেই বিনিময় থাকিতে হইবে। শ্রমবিভাগ অর্থে একজন লোক মাত্র একপ্রকারের কার্য্যই করে, কিন্তু কোন লোক তো শুধুমাত্র একপ্রকারের সামগ্রীই ব্যবহার করিয়া জীবনধারণ করে না,—তাহার নানাবিধ অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়োজন হয়। সেই জন্য যদিও বিভিন্ন ব্যক্তি পৃথক পৃথক সামগ্রী উৎপাদন করে তবুও ঐ সামগ্রী তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিনিময় করিয়া লইবার প্রয়োজন হয়। ইহার জন্যই ব্যবসা বাণিজ্য প্রয়োজন, সামগ্রীর মূল্য নিরূপন প্রয়োজন, মুদ্রা ব্যবহার ও কর্জ্জের প্রয়োজন, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রয়োজন। সেইজন্য অর্থনীতির মধ্যে শ্রম বিভাগের গুরুত্ব সমধিক।

(অনু-৫) **শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা**—*Advantages and Disadvantages of Division of labour.*

সুবিধা—শ্রম-বিভাগ না করিয়া, জনকয়েক শ্রমিক যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে, শ্রম বিভাগের দ্বারা সেই একই সংখ্যক শ্রমিক একই সময়ের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আদিম যুগ হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত সম্পদ উৎপাদনে যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল কারণ হইল 'শ্রম-বিভাগ'। অতএব শ্রম-বিভাগের প্রধান সুবিধা বা উপযোগিতা হইল যে ইহার দ্বারা **শ্রমের অধিকতর উৎপাদনক্ষমতা** জন্মায়। যে সকল কারণে শ্রম বিভাগের দ্বারা শ্রমের অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা জন্মায় সেগুলি হইল :— (১) একজন লোক বহুপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে কোনো একটী কাজে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মায় না, কিন্তু একজন লোক কেবলমাত্র একপ্রকারের কাজ লইয়া থাকিলেই সে ঐ কার্য্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে পারে। শ্রম-বিভাগের দ্বারা শ্রমিকগণ ক্রমশঃই দক্ষ বা নিপুণ হইয়া উঠে। (২) একটী সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলি যখন বিভিন্ন সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত হয় তখন শ্রমিকদের শারীরিক ক্ষমতা, নৈপুণ্য বা বুদ্ধি অনুযায়ী যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এইভাবে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য-বিধান করা যায়। (৩) শ্রম বিভাগ হইতে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে ; কারণ শ্রম বিভাগ করিতে করিতে এক

একটী কার্য্য এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যখন উহা প্রায় স্বয়ং চালিত প্রক্রিয়ার পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে। তখন যন্ত্র ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সময় আসে (একটী যন্ত্র একপ্রকার মাত্র কাজ করিতে পারে, বিভিন্ন প্রকার কাজ করিতে পারে না)। শ্রম বিভাগের দ্বারা কেবলমাত্র যে যন্ত্র ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সময় আসে, তাহাই নহে,—অনেক সময়ে একঘেয়ে একই প্রকার কার্য্যের বন্দোবস্ত হইতে নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন বোধ আসে। ইহাতে নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। (৪) আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের দ্বারা যে স্থানে যে দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সেই দ্রব্য সেই স্থানে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হয় অধিক। আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির পক্ষপাতিত্বের সহিত নিজের কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য বিধান করে। (৫) শ্রমবিভাগের দ্বারা সময়ের সাশ্রয় হয়। এই সময়ের সাশ্রয় এইভাবে হইতে পারে:—(ক) একটী কাজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয় বলিয়া কাজের জটিলতা কমিয়া যায় এবং একটী প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে শ্রমিকের পক্ষে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু একজন লোক বিভিন্ন প্রকারের কাজ করিলে, ঐ সকল প্রকার কাজ শিক্ষা করিতে তাহার অধিক সময় লাগিত; কিন্তু সে শ্রমবিভাগের দরুণ মাত্র একটী কাজ করে, এবং একটী কাজ শিখিতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে। (খ) একজন ব্যক্তি নানাপ্রকার কাজ করিলে, একটী কাজ ছাড়িয়া অপর কাজে যাইতে, স্থান পরিবর্ত্তন করিতে তাহার অনেক সময় চলিয়া যায়; বা একটী কাজ ছাড়িয়া অপর কাজ ধরিতে যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তনে তাহার অযথা সময় চলিয়া যায়। শ্রম বিভাগে স্থান পরিবর্ত্তন বা যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন।

অসুবিধা—শ্রম বিভাগের গোটাকয়েক কুফলও আছে। এই কুফলগুলি মোটামুটি দুই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, শ্রমিক জীবনে এবং সমাজ জীবনে।

শ্রমিক জীবনে শ্রম-বিভাগের কুফল—(১) একজন শ্রমিক দিনের পর দিন একই সামগ্রী উৎপাদনের একই কার্য্য পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে—ইহাতে তাহার কাছে কাজটী খুবই একঘেয়ে মনে হয়। কাজের মধ্যে কোনো আনন্দ পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব তো হইবেই না, বরং এইরূপ একঘেয়ে কাজের মধ্যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের অবকাশ না থাকায় বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। (২) শ্রম বিভাগের মধ্যে শ্রমিক তাহার নৈপুণ্য ও দায়িত্বজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। একই কার্য্য একই ভাবে করিতে করিতে শ্রমিক যন্ত্রের পর্য্যায়ে

নামিয়া আসে। (৩) কোনো কারণে শ্রমিককে যদি কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, তাহা হইলে অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা তাহার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়া উঠে। কারণ সারাজীবন ধরিয়া সে মাত্র এক-ধরণের কাজই করিয়াছে—অন্য কোন কাজে সে অভ্যস্ত নহে। (৪) শিল্প সামগ্রী শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলক,—সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু শ্রম বিভাগের মধ্যে ইহার অবকাশ থাকেনা; তাই 'শ্রম-বিভাগ শিল্প চাতুর্য্যের এবং শিল্প-চেতনার অবনতি ঘটায়।

শ্রমিকের জীবনে শ্রম বিভাগের এই সকল কুফল থাকায় 'এ্যাডাম্ স্মিথ্' বলিয়াছেন, "অল্প কয়েকটী সরল কার্য্যক্রম সম্পাদনেই যে ব্যক্তির সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছে সে সাধারণতঃ, মানুষের পক্ষে যতখানি হওয়া সম্ভব ততখানি নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ হইয়া যায়।"*

সমাজ জীবনে শ্রম বিভাগের কুফল—(১) মানুষ যেখানে কেবলমাত্র এক প্রকার কাজ করিতে সক্ষম, অন্য কোনো কাজের যোগ্য নহে, সেখানে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। "যে সমাজ তাহার সভ্যদিগকে দিয়া বিভিন্ন কার্য্য করাইতে পারে, সেই সমাজ চলমান ও প্রগতিশীল সমাজ"† এই কথা বলেন, অধ্যাপক 'যাইড্'। তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় প্রগতিশীল দেশের উল্লেখ করিয়া বলেন যে সে দেশে যে সকল ব্যক্তি উচ্চপদে পৌছাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই একাধিক পেশায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। (২) শ্রমিকরা তাহাদের অব্যবহিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কাজ বুঝিয়া লয় এবং তাহার নিকটেই কাজ বুঝাইয়া দেয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শ্রমিক মালিক মনোমালিন্য ঘটে এবং কারখানা বন্ধ বা ধর্ম্মঘটের দ্বারা শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন ব্যাহত হয়।

যন্ত্রের ব্যবহার—*The Use of Machinery.*

(**অণু-৬**) অর্থনৈতিক জীবনের অতি প্রাচীন যুগেও মানুষকে কিছু না কিছু যন্ত্র বা হাতিয়ার ব্যবহার করিতে দেখা যায়। প্রকৃতিকে জয় করিবার মানসে এবং তদ্দারা নিজের সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষ নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে এবং সম্পদ

* "the man whose whole life is spent in performing a few simple operations generally becomes as stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become."—ADAM SMITH, "Wealth of Nations,"

† "To be able to turn its members to manifold uses is the mark of a dynamic and progressive society"—GIDE ; Political Economy.

উৎপাদনের কার্য্যে লাগাইয়াছে। আধুনিক সময়ে উৎপাদন ও ভোগ কার্য্যের প্রতি পদেই যন্ত্রের ব্যবহার হয়; তাই বর্ত্তমান যুগ 'যন্ত্র যুগ' বলিয়া অভিহিত হয়। এক্ষণে উৎপাদনের কার্য্যে যন্ত্র ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(অণু-৭) যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা—*Advantages and Disadvantages of the use of Machinery*

সুবিধা—যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা দুইটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে পারি: উৎপাদনের পক্ষে এবং শ্রমিকদের পক্ষে।

উৎপাদনের পক্ষে সুফল—(১) যে সকল কার্য্য শারীরিক পরিশ্রমে কোনো ক্রমেই সম্পন্ন করা সম্ভব হইত না সেই সকল কার্য্য যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই করা হইয়া থাকে। আধুনিক সময়ে কপিকলের সাহায্যে যে কার্য্য করা হইয়া থাকে হয়তো হাজার শ্রমিকের একত্রিত শ্রম সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত না। (২) উৎপাদনের কার্য্যে যন্ত্র দ্রুত-গতি (speed) দান করিয়াছে। যন্ত্রের কাজ মানুষের কাজ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক দ্রুত। হস্তচালিত ছাপাখানার কাজ এবং শক্তিচালিত আধুনিক সংবাদপত্র ছাপাখানার উৎপাদন তুলনা করিলেই পার্থক্য স্পষ্ট হইবে। আধুনিক সংবাদ পত্র ছাপাখানায় একঘণ্টার ধারাবাহিক দ্রুত কার্য্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কপি ছাপানো সম্ভবপর। (৩) যন্ত্র একই প্রকার কার্য্য বারবার ঠিক একই ভাবে যেরূপে করিয়া যায়, খুব সুদক্ষ কারিগরের পক্ষেও সেইরূপ সম্ভব নহে। সেইজন্য যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা সূক্ষ্ম ও নির্ভুল প্রক্রিয়ায় ঠিক একই প্রকার সামগ্রী বহু পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। (৪) কম খরচায় রাশীকৃত উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। এক সময়ে ছিল যখন হাতুড়ী ও হস্তের সাহায্যে পেরেক তৈয়ারী হইত আর আধুনিক যন্ত্র একদিকে লৌহ তার টানিয়া লয় ও অপর দিকে সম্পূর্ণ পেরেক প্রতি সেকেণ্ডে অনেক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া দেয়। ইহাতে একসঙ্গে লক্ষ পেরেক নির্ম্মান সম্ভব।

শ্রমিকের পক্ষে সুফল—(১) যন্ত্র শ্রমিকদিগকে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম হইতে মুক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে শ্রমিকরা সমগ্র শরীরের শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে কার্য্য না করিতে পারিত তাহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারে নিছক-হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা। বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলি এখন যন্ত্রের সাহায্যেই করা হইয়া থাকে। (২) অত্যধিক শ্রম-বিভাগ হইতে যে একঘেয়ে কাজগুলির উদ্ভব হয় সেগুলি ক্রমশঃ যন্ত্রের সাহায্যেই সমাধা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে, সংবাদপত্র ভাঁ[illegible] একঘেয়ে কাজ ছিল এক্ষনে যন্ত্রের সাহায্যে উহা করা হইয়া থাকে।

(৩) যন্ত্রের সাহায্যে কাজ সকলেই করিতে পারে না। যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে উহার প্রকৃতি ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; উহা ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের এবং বুদ্ধি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়। অতএব শ্রমিকদিগকে যন্ত্র-বিদ্যা গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহার ব্যবহার তাহাদিগকে সজাগ অর্থাৎ সাবহিত (alert) থাকিতে এবং কার্য্যে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে শিখায়। (৪) অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পে প্রায় অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব একজন শ্রমিক একটী শিল্পে কাজ করিয়া অপর শিল্পে যোগদান করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ না ও করিতে পারে। এই দিক হইতে যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমের গতিশীলতাকে (mobility of labour) সাহায্য করে এবং শ্রম বিভাগের অপকারিতা দূরীভূত করে। (৫) যন্ত্রের সাহায্যে অধিক পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদিত হওয়াতে, অধিক বিক্রয়ের দ্বারা অধিক লাভ হয়; অধিক লাভ হইলে শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হারও বৃদ্ধি পায়; অপর দিকে জনসাধারণ বিভিন্ন সামগ্রী ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

অসুবিধা—যন্ত্র ব্যবহারের অসুবিধা সমূহ মোটামুটি দুই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়: উৎপাদনের পক্ষে এবং শ্রমিকদের পক্ষে।

উৎপাদনের পক্ষে কুফল—(১) যন্ত্রের সাহায্যে যে সামগ্রী উৎপাদিত হয় তাহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিবাব উপায থাকে না; কেবল মাত্র শিল্পীর হস্তের দ্বারাই উহা সম্ভব। ইহাতে অনেক কারুশিল্পের অবনতি ঘটে। কোন আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ঢাকাই মসলীন তৈয়ারী করা সম্ভব নহে। (২) অনেক সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে যে সামগ্রী উৎপাদিত হয় তাহা হস্তনির্ম্মিত সামগ্রীর মতন মজবুত বা টেঁকসই হয় না। যথা—হাতের সেলাই অপেক্ষা কলের সেলাই কম স্থায়ী। (৩) যন্ত্রের সাহায্যে রাশীকৃত উৎপাদন করিতে করিতে অতিরিক্ত পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইয়া যায়। উহাতে সামগ্রীর দাম এতই কমিয়া যায় যে উৎপাদনকারীদিগের লোকসান হইতে থাকে। তখন তাঁহারা উৎপাদন হ্রাস করিতে এবং সেহেতু শ্রমিকদিগকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হন। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। সেইরূপ ঘটনাকে বলা হয় সঙ্কট বা crisis.

শ্রমিকের পক্ষে কুফল—(১) একের অধিক ব্যক্তি যে পরিমাণ কাজ করে সেই পরিমাণ কাজ একটীমাত্র যন্ত্র অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারে। দুইজনের দ্বারা চালিত একটী কলের লাঙ্গল দশজনের হস্তচালিত লাঙ্গলের কাজ করিতে পার। সেই জন্য যন্ত্র যতই অধিক ব্যবহার হইবে ততই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বেকার হইবে। (২) যে সকল ব্যক্তি স্বাধীন উপজীবিকা হিসাবে শিল্প

সামগ্রী উৎপাদনে রত থাকে তাহাদের সামগ্রী যন্ত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সেই কারণে এই সকল ব্যক্তির উপজীবিকা ধ্বংস হয়। তাহারা হয়তো কারখানায় চাকুরী পাইতে পারে কিন্তু ইহাতে নিজদিগকে তাহারা ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবে না নিশ্চয়, কারণ কারখানার শ্রমিকদের দক্ষতা নির্ণয় করা হয় উৎপাদিত সামগ্রীর সৌন্দর্য্য দিয়া নহে—উহার পরিমাণ দিয়া। (৩) যন্ত্র শিল্পের ফল হিসাবে যে সকল কারখানা স্থাপিত হয় তাহাতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যন্ত্র, বিরাট ব্যবধান রচনা করে। শ্রমিকদের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের প্রতি মালিক ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন না। (৪) যন্ত্রচালিত কারখানার কাজের জন্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হয়। অল্প পরিসরের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে।

শিল্প-স্থানিকতা—*Localisation of Industries*

(**অণু-৮**) একই সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে বা একই সামগ্রী সম্পর্কে লেনদেন কার্য্য চালাইতেছে এইরূপ অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় একস্থানে অবস্থিত থাকিলে, উহাকে শিল্পের স্থানিকতা (Localisation) বলা হয়। এই স্থানিকতা অল্প পরিসরের মধ্যে হইতে পারে, যথা—কলিকাতার নেতাজী সুভাস রোডে ব্যঙ্কসমূহ বা বহুবাজার ষ্ট্রীটে আসবাবের দোকান সমূহ; আবার বিস্তৃত পরিসরের মধ্যেও হইতে পারে, যথা—বোম্বাই ও আমেদাবাদে তুলাতন্তু শিল্পের স্থানিকতা, পূর্ব্ব পাকিস্থানে পাট চাষের স্থানিকতা ইত্যাদি।

(**অণু-৯**) **শিল্প-স্থানিকতার কারণ সমূহ**—*Causes of Localisation of Industries*

বিভিন্ন কারণে এইরূপ স্থানিকতা ঘটিতে পারে। অবশ্য সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের পক্ষে একইরূপ কারণ থাকে না। কি কারণ বশতঃ কোথায় কোন্ শিল্প স্থানিকতা লাভ করে তাহা ঐ শিল্পের বিশেষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মোটামুটি স্থানিকতার কারণগুলি এইরূপ: (১) **কাঁচা মালের প্রাপ্তিস্থানের সান্নিধ্য**—একটী শিল্পের কাঁচামাল যেস্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় শিল্পটী সেই স্থানের কাছাকাছি গড়িয়া উঠে। যথা—বাঙলা দেশে পাট উৎপন্ন হয় বলিয়া পাট শিল্প বাঙলা দেশে অবস্থিত। (২)—**যন্ত্রচালন শক্তির প্রাপ্তব্যতা**—যে স্থানে যন্ত্র চালনা করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি সহজ প্রাপ্য সেই স্থানেও শিল্প গড়িয়া উঠে। আধুনিক সময়ে যেখানে যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায় সেই সকল স্থানে

কারখানা স্থাপিত হয়। (৩) **শ্রম প্রাপ্তব্যতা**—রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্যান্য কারণে কোন স্থানে এক শ্রেণীর মজুরের একত্রিত বাস দেখিতে পাওয়া যায়। যে শিল্পের জন্য এইরূপ মজুর-শ্রেণীর শ্রম প্রয়োজন সেই শিল্প মজুরের বসবাস স্থানের নিকটে গড়িয়া উঠিতে পারে। (৪) **বাজারের সান্নিধ্য**—শিল্প সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিতে হইবে; অতএব যে স্থানে বা যে স্থান হইতে সহজেই সামগ্রীগুলি বিক্রয় করা যায় সেই স্থানে একই সামগ্রীর বহু কারখানা বা দোকান স্থাপিত হইতে পারে। যথা পূজা অর্চ্চনায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান তীর্থস্থানে বহু পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়। (৫) **ভৌগোলিক ও আবহাওয়ার অবস্থা**—এক এক স্থানে ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী এক এক প্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। যে স্থানে বন্দর নির্মাণের ভৌগোলিক সুবিধা আছে সেই স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় কারণ ঐ স্থানে মালপত্র লইয়া আসা বা চালান দেওয়ার সুবিধা হয়। আবহাওয়ার দরুণও এক এক স্থানে এক এক প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়—যথা আসাম ও উত্তর বঙ্গে চা, পূর্ব্ববঙ্গে পাট ইত্যাদি। (৬) **প্রথম স্থাপনের বেগ**—যে কোন কারণেই হউক একটী অঞ্চলে এক প্রকারের শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপিত হইলে, পরে অনুরূপ শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক লোকে ঐ অঞ্চলে আসিয়া তাহার শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করে। (৭) **শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা** কোনো শাসক কোনো বিশেষ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিলে তাহার রাজধানীর সন্নিকটে ঐ শিল্প গড়িয়া উঠে—যথা মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প।

(অনু-১০) শিল্প স্থানিকতার সুবিধা ও অসুবিধা—*Advantages and Disadvantages of Localisation*

সুবিধা—শিল্প স্থানিকতার গোটাকয়েক সুবিধা আছে। এই সুবিধাগুলি আমরা তিনটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব: উৎপাদক কারবারীর পক্ষে, শ্রমিকদের পক্ষে, ভোগকারীর পক্ষে।

উৎপাদকের পক্ষে সুফল—(১) স্থানিকতার দরুণ এক এক স্থানের শিল্প বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করে, সেইজন্য ঐ স্থানে স্থাপিত যে কোনো কারখানার উৎপাদিত সামগ্রী ঐ সুনামের জোরে ভালো দামে বিক্রয় হয়। (২) একটী বিশেষ শিল্পে কাজ করিতে ইচ্ছুক শ্রমিকরা কোথায় যাইলে কাজ পাওয়া সম্ভব তাহা জানে। সেইজন্য উৎপাদনকারীগণ নিয়মিত শ্রমিকের সরবরাহ পান। (৩) স্থানিক-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায় শিল্প (subsidiary industries) গড়িয়া উঠে এবং ঐ স্থানিক শিল্পটীকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। সহায়ক

শিল্পগুলির উপস্থিতির দরুণ স্থানিক শিল্পগুলির যন্ত্রপাতি খারাপ হইলে সহজেই ঐগুলি মেরামত করিয়া লওয়া যায়। (৪) একই সামগ্রী-সম্পর্কিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত থাকাতে সস্তায় ভালো সামগ্রী উৎপাদিত হইবার নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। উৎপাদনকারীগণ এই পদ্ধতি অবলম্বনে উপকৃত হন। (৫) একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে একত্রিতভাবে অবস্থান করে ব্যাঙ্কগুলি সেই স্থানে শাখা স্থাপন করে। ইহাতে কারবারীদের পক্ষে ঋণ পাওয়াব সুবিধা হয়।

শ্রমিকদের পক্ষে সুফল—(১) অনেক সময়ে কোথায় গেলে চাকুরী পাওয়া যাইবে তাহা সঠিকভাবে না জানা থাকাতে কাজের অভাবে শ্রমিকগণ বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। শিল্প স্থানিকতার দরুণ শ্রমিকগণ কোথায় গেলে তাহাদের উপযুক্ত কাজ পাওয়া সম্ভব তাহা জানিতে পারে। (২) শ্রমিকগণ শিশুবয়স হইতেই প্রায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তির মতন শিল্প-নৈপুণ্য লাভ করে। কারণ শিশুকাল হইতেই তাহারা একটী বিশেষ শিল্পের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়।

ভোগকারীদের পক্ষে সুফল—(১) যে স্থানে যে শিল্পের সর্ব্বাধিক সুবিধা সেই স্থানে সেই শিল্প স্থানিককৃত হয়। ফলে, ঐ শিল্প যতটা সম্ভব সস্তায় সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান যতটা সম্ভব সস্তায় সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। খরিদ্দারেরা সেইজন্য সস্তায় সামগ্রী কিনিতে সক্ষম হয়। (২) কোন্ সামগ্রী কোথায় গেলে কিনিতে পাওয়া যাইবে তাহা জানা থাকাতে ক্রেতাদের অনেক পরিশ্রম কমিয়া যায়।

অসুবিধা—স্থানিকতার অনেকগুলি কুফলও আছে। অনুরূপ তিনটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া কুফলগুলি বিশ্লেষণ করা যাইবে।

উৎপাদকের পক্ষে কুফল—(১) স্থানিকতার সুবিধা পূরাপূরি পাইবার জন্য অনেক উৎপাদনকারী যেস্থানে পূর্ব্ব হইতে অন্যান্য উৎপাদনকারীর ভিড় আছে, সেইস্থানে যাইয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হন। অন্য কোনো স্থানে কারবার প্রতিষ্ঠিত করিলে, স্থানিকতার সুবিধা সমূহ পূরাপূরি না পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা হয়তো সফল হইতে পারিতেন। (২) এক স্থানে একই প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক বাস করাতে তাহারা সহজেই নিজেদের মধ্যে দলবদ্ধ হইতে পারে—এবং সামান্য সামান্য কারণে শ্রমিক বিক্ষোভ হইতে পারে।

শ্রমিকদের পক্ষে কুফল—(১) শিল্পস্থানিকতার দরুণ একটী অঞ্চলে কেবলমাত্র এক ধরণের শ্রমই প্রয়োজন হয়; হয়তো শুধু পুরুষদের শ্রম প্রয়োজন হয়। স্ত্রীলোক বা কিশোরগণ অল্প অল্প বাড়তি আয় করিয়া সমগ্র পরিবারের উপার্জ্জন যে কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিত—তাহার হয়তো সুবিধা থাকে না। (২) কোন কারণে কারবারটীতে মন্দা উপস্থিত হইলে শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে কারণ ঐ স্থানে অপর কোনো কারবার নাই যাহাতে তাহারা চাকুরী পাইবে। (৩) উৎপাদনকারীরা একত্র জোট পাকাইয়া শ্রমিকদের উপর অন্যায় ও অবিচার করিবার সুযোগ পায়।

ভোগকারীদের পক্ষে কুফল—(১) উৎপাদনকারীরা নিজেদের মধ্যে জোট পাকাইয়া একচেটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া কৃত্রিম ভাবে সামগ্রীর দাম চড়া করিয়া রাখিতে পারে। (২) একটী স্থানের সুনামের সুযোগ লইয়া নিকৃষ্ট মাল উৎপাদন করিয়া বাজারে চালাইবার চেষ্টা হয়। খরিদ্দারেরা নাম দেখিয়া সামগ্রী কিনিয়া প্রবঞ্চিত হইতে পারে।

বৃহদায়তন উৎপাদন—*Large-Scale Production*

(অণু-১১) বৃহদায়তন উৎপাদনের অর্থ হইল একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন; ইংরাজীতে ইহার আরেকটী নাম দেওয়া হয়—Mass production—অর্থাৎ "রাশীকৃত উৎপাদন।" উৎপাদনের কার্য্যে যত অধিক শ্রম বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় ততই একই সঙ্গে অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়. কারণ প্রথমতঃ শ্রম বিভাগের জন্য বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় অন্যথায় একটী কাজের সূক্ষ্ম অংশ ভাগ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া চলে না এবং দ্বিতীয়তঃ এক একটী যন্ত্র খরিদ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ এবং উহা হইতে যতটা সম্ভব কাজ আদায় করিয়া না লইলে উহা খরিদ করা পোষায় না।

(অণু-১২) বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা—*Advantages of Large Scale Production.*

বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেকগুলি সুবিধা আছে। মূল ও সর্ব্বপ্রধান সুবিধা হইল যে ইহাতে **অপেক্ষাকৃত কম খরচে অধিক পরিমাণ সামগ্রী** উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণও যত বৃদ্ধি পায় এক একটী সামগ্রী উৎপাদনের খরচাও তত কমিয়া যায়। বিভিন্ন কারণে ইহা সম্ভব হইয়া থাকে।

(১) অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচা-মাল ও যন্ত্রপাতি কিনিতে হয়। একসঙ্গে অধিক পরিমাণ সামগ্রী কিনিলে পাইকারী দরে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম দরে উহা ক্রয় করা যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য কিছু বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই বিক্রয়-বন্দোবস্তের মধ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত ব্যয়সঙ্কোচ হয়। যথা একটি দোকানদার যদি ৫০০টী সামগ্রী বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার ঘরভাড়া এবং অন্যান্য আসবাব-খরচা বাবদ যাহা ব্যয় হয়, ৭০০ বা ৮০০ বা ১০০০টী সামগ্রী বিক্রয় করিতে তাহার উপর হয়তো সামান্যই অধিক ব্যয় হয়। ইহাতে প্রতিটী সামগ্রী বিক্রয়ের খরচা কম হয়। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনের শিল্প এই যে সুবিধাগুলি ভোগ করে—এইগুলিকে "ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যয়-সঙ্কোচ" (Economies of Sale and Purchase) বলিয়া অভিহিত করা হয়। (২) রাশী পরিমাণে সামগ্রীর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অধিক পরিমাণ পুঁজি থাকাতে উহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। এই যন্ত্রকে কোন সময়েই অকারণে অলস ভাবে ফেলিয়া রাখিতে হয় না কারণ দৈনিক যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ এই যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়। বিশেষ বিশেষ কাজের পক্ষে উপযুক্ত বিশেষত্বশীল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়—ইহাতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যন্ত্র-সম্পর্কিত এই সুবিধাগুলিকে "যন্ত্রের ব্যয় সঙ্কোচ" (Economies of machinery) বলা হয়। (৩) বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বলিয়া উৎপাদনের কার্য্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া এক একটী অংশ উহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত শ্রমিকের কাছে দেওয়া হয়। বিশেষ নিপুণ বা বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিককে অধিক মজুরী দিয়াও নিয়োগ করিয়া তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য বা শিক্ষার সুযোগ লওয়া যায়। ইহাকে "শ্রম বিভাগের নৈপুণ্যের ব্যয়সঙ্কোচ" (Economies of division of labour or skill) বলা যায়। (৪) এক একটী বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান নূতন নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি বা উন্নত প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য বা নূতন ও উন্নত ধরনের সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার (research) ও প্রয়োগ পরীক্ষার (experiment) আয়োজন করিতে পারে। কোন ছোটো শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ কোন বিষয়ে অর্থব্যয় করা সম্ভব হয় না।

বৃহদায়তনের উৎপাদন হইতে একটী শিল্প প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত যে সুবিধাগুলি পায় মার্শাল সেইগুলিকে একত্রিতভাবে "আভ্যন্তরীন ব্যয়সঙ্কোচ" বলিয়া

অভিহিত করেন—(Internal Economies)। তিনি বলেন বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান আর এক প্রকারের সুবিধা পায়; ইহার নাম তিনি দেন "বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ" (External Economy)। দেশের মধ্যে এক ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান যত অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে ততই ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইবে। যত অধিক পরিমাণে ঐ যন্ত্র ও সরঞ্জাম সামগ্রীগুলি উৎপাদন করা হইবে ততই ইহাদের উৎপাদনে "আভ্যন্তরীন ব্যয় সঙ্কোচ" হইবে অর্থাৎ ঐ সামগ্রীগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তায় উৎপাদিত হইবে। সেহেতু ইহার দাম সস্তা হইবে। উপরন্তু একই ধরণের গোটাকয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থানিকৃত (localised) হইলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই স্থানিকতার সুবিধাগুলি ভোগ করে। অতএব একটী সামগ্রীর সম্পর্কিত সমগ্র শিল্পটী (কোনো একটী বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানই নহে) যতই বর্দ্ধিত হইবে ততই ঐ সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান (১) সস্তায় যন্ত্র ও সরঞ্জাম কিনিতে পারিবে এবং (২) স্থানিকতার সুবিধা ভোগ করিবে। ইহা হইল ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানটীর "বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ।"

অতএব বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে যতগুলি সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়-(১) আভ্যন্তরীন ব্যয়সঙ্কোচ এবং (২) বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচ। উভয়বিধ সুবিধার মূলকথা একই—কম খরচায় অধিক সামগ্রী উৎপাদন।

বৃহদায়তনের উৎপাদনের গোটাকয়েক অসুবিধাও আছে। নিম্নে অল্পায়তন উৎপাদনের সীমা এবং অল্পায়তন উৎপাদনের নিজস্ব গুণ বলিয়া যাহা বর্ণিত হইল বৃহদায়তন উৎপাদনের সেইগুলি হইল অসুবিধা।

অল্পায়তন উৎপাদন—*Small Scale Production.*

(অণু-১৩) যখন অল্প পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করা হয় তখন সেই উৎপাদনের ব্যবস্থাকে অল্পায়তন উৎপাদন (small scale production) বলা হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অল্প পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করে এইরূপ অনেক উৎপাদনকারী কারবার করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ হইল প্রথমতঃ বৃহদায়তনের উৎপাদনের গোটাকয়েক সীমা আছে (এইগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা) দ্বিতীয়তঃ অল্পায়তন উৎপাদনের গোটাকয়েক নিজস্ব গুণ আছে।

(অণু-১৪) বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা—*Limits to Large Scale Production*

(১) অনেক সামগ্রী আছে যেগুলি ব্যক্তিগত বরাত অনুযায়ী (according to order) উৎপাদন করা প্রয়োজন হয়। এইরূপ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন-যথা দর্জির কারবার, গহনার কারবার ইত্যাদি। এই সকল কারবারে যতদূর ইচ্ছা উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃত করা যায় না—ইহাদের ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্য্যে ব্যক্তিগত রুচি বা পছন্দের সহিত তাল রাখিতে হয়। (২) অধিক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণ উৎপাদক-উপাদান (factors of production) নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ উৎপাদক উপাদান নিয়োগ করিতে করিতে এমন সময় আসিয়া যায় যখন দেখা যায় যে, যে-অনুপাতে পুঁজি বা শ্রম নিয়োগ করা হইয়াছে, সেই অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না · অর্থাৎ "ক্রমিক আয় হ্রাসের" নিয়ম (Law of Diminishing Return) ক্রিয়া করিতেছে। (৩) বাজারে একটী সামগ্রীর যে পরিমাণ চাহিদা উহার দ্বারা ঐ সামগ্রী উৎপাদনের আয়তন সীমাবদ্ধ হইবে। যে সামগ্রীর চাহিদা অল্প সে সামগ্রী রাশীকৃত উৎপাদন করিলে বিক্রয় হইবে না। অতএব বৃহদায়তনে উহার উৎপাদন সম্ভব নহে। (৪) যে সকল কারবারের কাঁচামাল খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় সেই সকল কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব নহে।

(অণু-১৫) অল্পায়তন উৎপাদনের নিজস্ব গুণ—*Intrinsic Merits of Small Scale Production*

(১) স্বল্পায়তনের উৎপাদনকারী তাঁহার কারখানায় নিজেই সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। ইহাতে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান হয় এবং শ্রমিকদের আলস্যের দরুণ কাজে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। (২) অল্পায়তন উৎপাদনকারী খরিদ্দারগণের প্রয়োজনের দিকে ব্যক্তিগত ভাবে মনোযোগ দিতে পারেন এবং খরিদ্দারগণের ইচ্ছা বা ডিজাইনমত সামগ্রী উৎপাদন করিয়া জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন। (৩) যে সকল শিল্প সামগ্রীতে বিশেষ কারুকার্য্য থাকা প্রয়োজন তাহা অল্পায়তন উৎপাদনকারী উত্তমরূপে উৎপাদন করিতে পারেন। নিপুণ শিল্পীর হাতের কার্য্যের জন্য অল্পায়তন উৎপাদন ঠিক উপযোগী। (৪) ইহাতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়—সেইজন্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মনোমালিন্য ও অসন্তুষ্টির অবকাশ থাকে অল্প।

আয়ের নিয়ম সমূহ—Laws of Returns.

(অণু-১৬) উৎপাদক-উপাদানগুলির নিয়োগ হইতে যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হয় তাহাকে আয় (Return) বলা হয়। নিয়োজিত উৎপাদক-উপাদানের পরিমাণ এবং উহা হইতে লব্ধ আয়ের পরিমাণ, এই দুইটীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য তিনটী নিয়ম আছে : (ক) ক্রমিক আয়বৃদ্ধির নিয়ম (খ) সমানুপাত আয়ের নিয়ম ও (গ) আয় হ্রাসের নিয়ম।

(অণু-১৭) ক্রমিক আয়-বৃদ্ধির নিয়ম—*Law of Increasing Returns*

অনেক উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ অধিকতর হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যে অনুপাতে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধি করা হয়, উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে। সাধারণতঃ ইহা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

দৃষ্টান্ত :—একজন আঁত্রেপ্রনা হয়তো ১০৲ টাকা পুঁজি ও দশজন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ১০০টী কলম উৎপাদন করেন। পরের বার হয়তো তিনি আরও ১০৲ টাকা পুঁজি ও আরও দশজন শ্রমিক—মোট ২০৲ টাকা পুঁজি ও কুড়িজন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া,—২৫০টী কলম উৎপাদন করিতে পারিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ করাতে কলমের উৎপাদন হইল দ্বিগুণেরও অধিক। ধরা যাউক, পরের বারে তিনি আরও ১০৲ টাকা পুঁজি এবং আরও দশজন শ্রমিক, মোট ৩০৲ টাকা পুঁজি ও ৩০ জন শ্রমিক,—নিয়োগ করিয়া ৫০০টী কলম উৎপাদন করিতে পারিলেন—এক্ষেত্রেও পুঁজি ও শ্রম যে হারে বৃদ্ধি করা হইল, উৎপাদনের বৃদ্ধি হইল তাহা অপেক্ষা অধিক হারে।

এইরূপ ক্রমিক আয়-বৃদ্ধির কারণ হইল যে উৎপাদন কার্য্যে অধিকতর পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করিলে, অধিকতর শ্রম বিভাগ করা সম্ভব হয়, উৎকৃষ্ট ও আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা যায়, এবং উৎপাদনের পরিধি যতই বিস্তৃত হয় ততই বৃহদায়তন উৎপাদন হইতে লভ্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচগুলি (internal and external economies) পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধিকতর শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে ব্যবস্থাপনা বা সংগঠনের (organisation) উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয় এবং উন্নত ধরণের ব্যবস্থাপনা করা হইলে, শ্রম ও পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি—উন্নত ব্যবস্থাপনা—পুঁজি ও শ্রম অধিকতর উৎপাদনক্ষম=পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধির অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অধিক।

ইহাই হইল ক্রমিক আয়বৃদ্ধির নিয়ম। এই নিয়মটীর মার্শাল এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : "পুঁজির ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা সাধারণতঃ, উন্নততর ব্যবস্থাপনা প্রবর্ত্তিত হয়,—যাহা পুঁজি ও শ্রমের কার্য্যকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম করিয়া তুলে।" ["An increase of capital and labour leads generally to an improved organisation which increases the efficiency of the work of capital and labour"—MARSHALL]

(অণু-১৮) ক্রমিক আয়-বৃদ্ধির নিয়ম=ক্রমিক ব্যয় হ্রাসের নিয়ম *(Law of Diminishing Cost)*

একই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের দ্বারা অধিকতর পবিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হয়,—ইহার অর্থ হইল যে প্রতি মাত্রা সামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

দৃষ্টান্ত : পূর্ব্বের দৃষ্টান্তটী লক্ষ্য করা যাক। ধরা যাক একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক ৯৲ টাকা করিয়া।

(১) আঁত্রেপ্রনা দশজন শ্রমিক ও ১০ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া অর্থাৎ (শ্রমিকের জন্য ৯০৲ টাকা ও পুঁজির ১০৲ টাকা) মোট ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ১০০টী কলম উৎপাদন করিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিটী কলম উৎপাদন করিতে খরচা পড়িল $\left(\frac{১০০৲ \text{ টাকা}}{১০০ \text{ কলম}} =\right)$ ১৲ টাকা।

(২) পরের বার আঁত্রেপ্রনা একই কারখানাতে কুড়ি জন শ্রমিক ও ২০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া অর্থাৎ (শ্রমিকের জন্য ১৮০৲ টাকা ও পুঁজির ২০৲ টাকা) মোট ২০০৲ টাকা খরচা করিয়া কলম উৎপাদন করিলেন ২৫০টী (২০০টী নহে)। এক্ষেত্রে প্রতিটী কলম উৎপাদন করিতে খরচা পড়িল $\left(\frac{২০০৲ \text{ টাকা}}{২৫০ \text{ কলম}} =\right)$ ১২ আনা, ৯$\frac{৩}{৫}$ পাই বা ১৩ আনার কিছু কম।

(৩) তারও পরের বারে আঁত্রেপ্রনা ঐ একই কারখানাতে ত্রিশজন শ্রমিক ও ৩০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া—অর্থাৎ (শ্রমিকের জন্য ২৭০৲ টাকা এবং পুজির ৩০৲ টাকা) মোট ৩০০৲ টাকা খরচা করিয়া ৫০০টী কলম উৎপাদন

করিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিটী কলম উৎপাদনের খরচা পড়িল $\left(\frac{৩০০\text{৲ টাকা}}{৫০০\text{ কলম}} = \right)$৯ আনা ৭২/৩ পাই বা ১০ আনার কিছু কম।

অতএব সামগ্রীর উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত প্রতিমাত্রা উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। সেইজন্য ক্রমিক আয় বৃদ্ধির অর্থ হইল ক্রমিক খরচা হ্রাস।

অণু (১৯)—সমানুপাত আয়ের নিয়ম—*Law of Constant Returns*

অনেক উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ একই হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যে অনুপাতে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধি করা হয় উহা হইতে আয় (উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ) বৃদ্ধি হয় ঠিক সেই অনুপাতে। শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ করিলে উৎপাদন ঠিক দ্বিগুণ হয়—শ্রম ও পুঁজি তিনগুণ করিলে উৎপাদন হয় তিন গুণ—এইভাবে। যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির দ্বারা একদিকে উন্নততর ব্যবস্থাপনা হয় কিন্তু অপর দিকে কোনো না কোনো কারণে ক্রমিক আয়-হ্রাসের কারণ ঘটে, সেক্ষেত্রে ক্রমিক আয় বৃদ্ধি ও ক্রমিক আয় হ্রাসের প্রবনতা, পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি হইয়া সমানুপাত আয়ে পরিণত হয়।

দৃষ্টান্ত : একজন আঁত্রেপ্রনা দশজন শ্রমিক ও ১০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৫০টী কলম উৎপাদন করেন। পরের বারে তিনি কুড়িজন শ্রমিক ও ২০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া ১০০টী কলম উৎপাদন করিলেন। এক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ, এবং উৎপাদনের পরিমাণও ঠিক দ্বিগুণ হইল, কমও নহে বেশীও নহে। ঠিক যে অনুপাতে পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধি হইল উৎপাদন বৃদ্ধি হইল ঠিক সেই অনুপাতে।

ইহাই হইল সমানুপাত আয়ের নিয়ম। মার্শাল বলেন, "ক্রমিক আয় বৃদ্ধি ও ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়মের ক্রিয়ায় যদি ভারসাম্য হয় তাহা হইলে আমরা সমানুপাত আয়বৃদ্ধির নিয়ম পাই এবং বর্দ্ধিত আয় পাওয়া যায় ঠিক সমান অনুপাতে শ্রম ও ত্যাগ বৃদ্ধির দ্বারা।" [If the actions of the laws of increasing and diminishing return are balanced we have the **Law of Constant Return,** and an increased produce is obtained by labour and sacrifice increased just in proportion"—MARSHALL] এস্থলে "শ্রম ও ত্যাগ" (labour and sacrifice) শব্দের দ্বারা মার্শাল "উৎপাদন খরচা"

বুঝাইতেছেন। মার্শাল কম্বল উৎপাদনের উদাহরণের দ্বারা এই নিয়মের ক্রিয়া বুঝাইয়াছেন।

ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম—*Law of Diminishing Return*

(৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

Questions & Hints.

1. What do you understand by division of labour? Indicate the advantages and disadvantages of division of labour (1946)—[অনুচ্ছেদ—২ এবং ৫]

2. What are the different forms of division of labour? [অনুচ্ছেদ—৩]

3. Discuss the effects of the introduction and use of machinery (1940)— [অনুচ্ছেদ—৭]

4. What do you mean by localisation of industry? Analyse the factors that lead to localisation of an industry. (1950) [অনুচ্ছেদ ৮ এবং ৯]

5. Analyse the advantages and disadvantages that follow from the localisation of a particular industry in a particular place [অনুচ্ছেদ—১০]

6. What are the advantages and disadvantages of large scale production. (1928) [অনুচ্ছেদ—১২ এবং ১৪]

7. Compare the relative advantages and disadvantages of Large Scale and Small Scale industries (1945) [অনুচ্ছেদ ১১, ১৪ এবং ১৫]

8. Can a small producer hold his own in the presence of Large Scale manufacturers? (1933) [অনুচ্ছেদ ১৩, ১৪ এবং ১৫]

9. Explain with illustration the law of increasing return (1948) [অনুচ্ছেদ ১৭]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাজার ও মূল্য।

Market and Value.

(অনুচ্ছেদ-১) 'বাজার' অর্থ কি—*Meaning of Market.*

সামগ্রী উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে আর একটী কার্য্য রহিয়াছে; সেটী হইল বিনিময়। বিনিময়ের জন্য বাজারের প্রয়োজন।

সাধারণ ভাষায় 'বাজার' বলিতে আমরা বুঝি একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান যেস্থানে বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। অর্থনীতিতে বাজার বলিতে কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না; বাজার বলিতে বুঝায় একটী নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী যাহার ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে; যথা কাপড়ের বাজার, চাউলের বাজার, স্বর্ণের বাজার ইত্যাদি। চাপমান বলেন "বাজার বলিতে কোনো স্থানকে বুঝায় না, ইহার দ্বারা বুঝায় একটী বা একাধিক সামগ্রী এবং উহার ক্রেতা বা বিক্রেতা যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন।* ["market refers not to a place but to a commodity or commodities and buyers and sellers of the same who are in direct competition with one another"—CHAPMAN]

(অনু-২) বিস্তৃত বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়—*Conditions for wide market*

কোনো কোনো সামগ্রী আছে যাহার বাজার সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ যেস্থানে উৎপাদিত হয় সেই অঞ্চলে অথবা নিকটবর্ত্তী স্থানে বিক্রয় হয়। গ্রামে উৎপন্ন শাকসব্জী গ্রামেই অথবা নিকটবর্ত্তী সহরে বিক্রয় হয়, বিদেশে বিক্রয়ার্থ চালান যায় না। কিন্তু কোনো কোনো সামগ্রী আছে যাহার বাজার বিস্তৃত অর্থাৎ উৎপাদন-স্থান হইতে বহু দূরে গিয়া সেগুলি বিক্রয় হইতে পারে যথা-ভারতের সূতিবস্ত্র আরব দেশগুলিতে বিক্রয় হইতে পারে, পাকিস্থানের পাট দক্ষিণ আমেরিকায় বিক্রয় হইতে

---

* CHAPMAN—Outlines of Political Economy.

পারে। কোনো সামগ্রীর বিস্তৃত বাজার থাকিতে গেলে উহার গোটাকয়েক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন : (১) **বিস্তৃত চাহিদা** (wide demand)—যতই বিস্তৃত এলাকার অধিবাসী অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী একটী সামগ্রীর চাহিদা করিবে ততই ঐ সামগ্রীর বিস্তৃত এলাকা ব্যাপিয়া বেচা কেনার সম্ভাবনা থাকে। 'সম্ভাবনা থাকে' বলার অর্থ হইল যে একটী সামগ্রীর বিস্তৃত চাহিদা থাকিলেই যে উহা উৎপাদন স্থান হইতে বহুদূর যাইয়া বিক্রয় হইবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। উহার জন্য প্রয়োজন হইল—(২) **স্থানান্তরযোগ্যতা** (Portability)—কারণ সামগ্রীটী দূরস্থানে পাঠাইতে না পারিলে তো উহা দূরস্থানে বিক্রয় হইতে পারে না। যে সামগ্রীগুলি সহজে একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করা যায় না সেগুলির বাজার বিস্তৃত হইতে পারে না। এখানে "সহজে" শব্দটীর দ্বারা বুঝানো হয় যে সামগ্রীটীর দামের তুলনায় তাহার বহনী-খরচা (cost of transport) কম হওয়া প্রয়োজন। বোম্বাইয়ে উৎপাদিত ইঁটের বাজার বিদেশে নাই কারণ হাজারখানি ইঁট দূর দেশে পাঠাইতে বহনী খরচা পড়িবে হাজারখানি ইঁটের দাম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু বোম্বাইয়ে উৎপাদিত সূতিবস্ত্র বহু দূর দেশে বিক্রয়ার্থ যাইতে পারে কারণ তাহার দামের তুলনায় বহনী খরচা কম। (৩) **স্থায়িত্ব** (Durability)—দূর স্থানে পাঠাইবার যোগ্য হইতে হইলে একটী সামগ্রীর স্থায়িত্ব থাকা দরকার। দূর দেশে পাঠাইতে যে সময় লাগিবে তাহার মধ্যে সামগ্রীটী যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে বিস্তৃত বাজার থাকিতে পারে না। (৪) **গুণানুপাতে শ্রেণী নির্দ্ধারণ** (Grading)—একই সামগ্রী বিভিন্ন ধরণের বা বিভিন্ন গুণের উৎপাদিত হইতে পারে, যথা কয়লার মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণের কয়লা আছে নিকৃষ্ট গুণের কয়লা আছে, আবার তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গুণের কয়লা আছে। দূর অঞ্চলের ক্রেতা সামগ্রীর গুণ যাচাই না করিয়া, কোন্ গুণের বা কি ধরণের সামগ্রী চাহে তাহা না বুঝিয়া উহা খরিদ করিতে পারিবে না। অথচ অনেক দূর হইতে উৎপাদন স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং সামগ্রী দেখিয়া যাওয়াও সকল সময় সম্ভব হয় না। অতএব একটী সামগ্রীর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা যায়; এই শ্রেণী বিভাগ হইবে সামগ্রীর গুণ অনুযায়ী এবং এক এক শ্রেণীর এক একটী গুণ নির্দ্ধারক নাম থাকিতে পারে—যথা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণী। এক্ষেত্রে ক্রেতা যে গুণের মাল চাহেন দূর হইতে উহার শ্রেণী উল্লেখ করিয়া উহা উৎপাদনকারীকে পাঠাইতে বলিয়া দেন। এইরূপ গুণানুপাতে শ্রেণী নির্দ্ধারণ হইতে পারে যে সামগ্রীর, উহার বাজার বিস্তৃত হইতে পারে। (৫) **নমুনা করণ** (Sampling)—অনেক সামগ্রী আছে যাহার অল্প পরিমাণ নমুনা হিসাবে বিভিন্ন

স্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে—যথা বস্ত্রের নমুনা। এক্ষেত্রে খরিদ্দার ঐ নমুনা দেখিয়া সামগ্রীর বরাত (order) দিতে পারেন। ইহাতে ঐ সামগ্রীর বাজার বিস্তৃত হয়।

(অণু-৩) মূল্য—*Value*

সাধারণ কথাবার্ত্তায় মূল্য শব্দটী নানাভাবে এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যথা বন্ধুত্বের মূল্য, বাতাসের মূল্য, চাউলের মূল্য, ইত্যাদি। অর্থনীতিতে 'মূল্য' শব্দটীর তাৎপর্য্য সীমাবদ্ধ এবং সুনির্দ্দিষ্ট। সাধারণ কথাবার্ত্তায় মূল্য শব্দটী যত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় সেইগুলিকে মোটামুটি দুইটী পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, কোনো বস্তু বা সামগ্রীর ব্যবহার হইতে আমরা যে উপকারিতা পাই তাহাকে উহার মূল্য বলি যথা শিক্ষার মূল্য, রৌদ্রের মূল্য ইত্যাদি; দ্বিতীয়তঃ, কোনো সামগ্রীকে বিনিময়-অর্থাৎ বিক্রয়, করিয়া অপর যে সামগ্রী আমরা পাই তাহাই প্রথম সামগ্রীটীর মূল্য বলিয়া উল্লেখ করি; যথা একটী চেয়ার বিনিময় করিয়া যদি একমণ চাউল পাই তাহা হইলে একটী চেয়ারের মূল্য একমণ চাউল বলা যায়; অথবা আমি যদি কাহাকেও এই প্রশ্ন করি, "তুমি যে এত পরিশ্রম করিতেছ, ইহার মূল্য কি ?" তাহা হইলে আমি জানিতে চাহিতেছি "তোমার এ পরিশ্রমের বিনিময়ে কি পাইবে ?"

প্রথম ক্ষেত্রে মূল্য বলিতে বুঝাইতেছে—"ব্যবহার মূল্য" (Value in use) ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল্য বলিতে বুঝাইতেছে "বিনিময়-মূল্য" (Value in exchange)।

অর্থনীতিতে মূল্য বলিতে বিনিময়-মূল্যকেই বুঝায়। কেবলমাত্র যে সামগ্রীর বিনিময়ে অপর কোনো সামগ্রী পাওয়া যাইবে তাহারই মূল্য (Value) আছে বলা হইবে।

(অণু-৪) দাম—*Price*

কোনো সামগ্রীর বিনিময় মূল্য যখন মুদ্রার হিসাবে প্রকাশ করা হয় তখন উহাকে বলা হয় দাম (price)। একমণ চাউলের বিনিময় মূল্য যদি কুড়িটাকা হয়—তাহা হইলে কুড়ি টাকাকে বলা হইবে একমণ চাউলের দাম। অতএব

সাধারণ কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত শব্দ "মূল্য" { ব্যবহার মূল্য
বিনিময় মূল্য = অর্থনীতিতে ব্যবহৃত মূল্য (value)

মুদ্রার হিসাবে ↓

দাম (price)

একটী সামগ্রীর কতদাম (price) তাহা জানিলেই উহার মূল্য (value) কত তাহা জানা হইবে, কারণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক সামগ্রীই বিনিময় করা যায়। অতএব একটী সামগ্রীর দাম কিভাবে স্থির হয় তাহা দেখিলেই উহার মূল্য কিভাবে নির্দ্ধারিত হয় তাহা দেখা হইবে।

(অণু·৫) দাম বা মূল্য কিভাবে নির্দ্ধারিত হয়—*How Price (or Value) is Determined.*

কোনো সামগ্রীর দাম নিরূপিত হইতে হইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় থাকা প্রয়োজন—অর্থাৎ একদিকে ঐ সামগ্রীটীর ক্রেতা থাকিবে অপর দিকে থাকিবে বিক্রেতা। ক্রেতা সামগ্রীর চাহিদা করে, বিক্রেতা উহার যোগান দেয়। অতএব কোন সামগ্রীর দাম নিরুপণের জন্য প্রয়োজন যে উহার চাহিদা থাকিবে এবং উহার যোগান থাকিবে।

যোগানকারী যে দাম চাহিবে, চাহিদাকারী যদি সেই দাম দিয়াই সামগ্রী কিনিয়া লয়, তাহা হইলে দাম নিরূপণে কোনো জটিলতা থাকে না, কারণ এক্ষেত্রে বলা চলে, দাম নির্দ্ধারিত হয় যোগানকারীর খেয়ালখুশীর দ্বারা। অথবা একটী সামগ্রীর জন্য চহিদাকারী যে দাম দিতে ইচ্ছুক, যোগানকারী যদি সেই দামেই সামগ্রীটী বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহা হইলেও দাম নিরূপণের কোনো হাঙ্গামা থাকে না, কারণ বলা চলে, দাম নির্দ্ধারিত হয় চাহিদাকারীর খেয়ালখুশীর দ্বারা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ঘটে না। চাহিদাকারী যে দামই দিতে চাহিবে যোগানকারী সেই দামেই মাল ছাড়িয়া দিবে না। অথবা যোগানকারী তাহার সামগ্রীর জন্য যে দামই দাবী করিবে সেই দামই চাহিদাকারী দিয়া তাহার সামগ্রীগুলি কিনিয়া লইবে না। কারণ যোগানকারী ও চাহিদাকারীর স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ।

একটী সামগ্রী হইতে ক্রেতা (চাহিদাকারী) যতখানি প্রয়োজনীয়তা (utility) পাইবে বলিয়া আশা করে তাহার বেশী দাম সে সামগ্রীটীর জন্য কখনই দিবে না। উহা হইল ক্রেতার দ্বারা দেয় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সম্ভাব্য দাম (maximum possible price); 'সম্ভাব্য' (possible) শব্দটীর অর্থ হইল যে ঐ দামই যে ক্রেতা দিবে (এবং বিক্রেতা যতগুলি ঐ সামগ্রী বিক্রয় করিবে সবগুলি ঐ দামে কিনিয়া লইবে) তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। কারণ যত কম দাম দিয়া পারা যায় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা ক্রেতা করিবে। (যতই কম দাম দিয়া ক্রেতা সামগ্রীটী কিনিতে পারিবে ততই সে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পাইবে বেশী।)

অপরপক্ষে একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে যত পরিমাণ খরচা হইয়াছে

তাহার কম দামে বিক্রেতা ঐ সামগ্রীটী বিক্রয় করিবে না। ঐ উৎপাদন খরচা হইল বিক্রেতার দ্বারা গ্রহণযোগ্য সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ সম্ভাব্য দাম (minimum possible price); এক্ষেত্রেও সম্ভাব্য শব্দটীর অর্থ হইল যে ঐ দামেই যে বিক্রেতা মালটী বিক্রয় করিবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। কারণ যত বেশী দাম আদায় করিতে পারা যায় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা বিক্রেতা করিবে। (যতই বেশী দামে সামগ্রীটী বিক্রয় করা যাইবে ততই বিক্রেতা অধিক মুনাফা অর্থাৎ লাভ পাইবে।)

অতএব ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষি (bargain) হইবে। এই দর কষাকষির মধ্যে যাহার গরজ অপেক্ষাকৃত বেশী, দাম তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে। ক্রেতার কিনিবার গরজ যদি বেশী হয়, দাম 'সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সম্ভাব্য দামের' নিকটবর্ত্তী হইবে ; ইহা ক্রেতার পক্ষে অসুবিধাজনক। অপর পক্ষে বিক্রেতার গরজ যদি বেশী হয় তাহা হইলে দাম 'সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ সম্ভাব্য দামের' নিকটবর্ত্তী হইবে ইহা বিক্রেতার পক্ষে অসুবিধাজনক। অতএব দরকষাকষিতে প্রত্যেকেই দেখাইতে চেষ্টা করিবে তাহার গরজ কম। এই গরজের লড়াই যতই চলিতে থাকিবে দাম ততই দ্রুত গতিতে উঠিবে পড়িবে।

দাম যখন দরকষাকষির দ্বারা দ্রুতগতিতে উঠিতেছে পড়িতেছে—সেই সঙ্গেই এমন একটী বিষয় ক্রিয়া করিতেছে যাহার দ্বারা দাম অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। সেই বিষয়টী হইল, দাম যখন কমিতেছে বাড়িতেছে তখন (চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী) চাহিদার পরিবর্ত্তন হইবে আবার (যোগানের নিয়ম অনুযায়ী) যোগানেরও পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু দাম পরিবর্ত্তন হইলে চাহিদার পরিবর্ত্তন যে দিকে হইবে যোগানের পরিবর্ত্তন হইবে তাহার বিপরীত দিকে। দামের পরিবর্ত্তনের দ্বারা চাহিদা ও যোগান বিপরীত মুখে অগ্রসর হইতে হইতে একস্থানে পরস্পরকে অতিক্রম করিবে।* ঐস্থানে বলা হয় ভারসাম্য উপস্থিত হইল—অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য (Equilibrium of Demand and Supply) উপস্থিত হইল। যে দামটীতে এইরূপ যোগান ও চাহিদার সমতা উপস্থিত হয়, সেই দামই ঐ সামগ্রীটীর দাম হিসাবে নির্দ্ধারিত হইল।

* যথা একটী রেলগাড়ী কলিকাতা হইতে খুলনা যাইতেছে আর একটী রেলগাড়ী খুলনা হইতে কলিকাতা আসিতেছে। তাহাদের গতি বিপরীতমুখী। দাম হইল যেন ট্রেণের লাইন। লাইন বরাবর দুইটী রেলগাড়ী বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে একস্থানে আসিবেই যখন তাহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবে।

দৃষ্টান্ত :—পূর্ব্বে আমরা যে চাহিদা তালিকা (পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য) এবং যোগান তালিকা (পৃষ্ঠা ৪৮ দ্রষ্টব্য) দিয়াছি সে দুইটী একত্রিত করিয়া সাজাইলে এইরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

ধুতির দাম যখন ৪৲ টাকা, তখন চাহিদা হইবে ৫০ খানি ধুতির কিন্তু যোগান হইবে ৩ খানি।

,, ,, ,, ৭৲ ,, ,, ,, ,, ৩৫ ,, ,, ,, ,, ,, ৭ ,,

,, ,, ,, ১০৲ ,, ,, ,, ,, ২৪ ,, ,, ,, ,, ,, ১২ ,,

,, ,, ,, ১৩৲ ,, ,, ,, ,, ১৭ ,, ,, ,, ,, ,, ১৭ ,,

,, ,, ,, ১৬৲ ,, ,, ,, ,, ১২ ,, ,, ,, ,, ,, ২৫ ,,

,, ,, ,, ২০৲ ,, ,, ,, ,, ৫ ,, ,, ,, ,, ,, ৪০ ,,

এখানে দেখা যাইবে ধুতির দাম যত বাড়িতেছে উহার চাহিদা তত কমিতেছে, কিন্তু যোগান বাড়িতেছে অথবা (নিচে হইতে উপরের দিকে পাঠ করিলে) দাম যত কমিতেছে চাহিদা তত বাড়িতেছে কিন্তু যোগান কমিতেছে। এবং দাম অনুযায়ী চাহিদা-যোগানের বিপরীতমুখী পরিবর্ত্তনের দ্বারা এমন এক স্থান উপস্থিত হইল যখন ঐ দামে ঠিক যতগুলি বস্ত্রের চাহিদা ঠিক ততগুলি বস্ত্রের যোগান। ১৩৲ টাকায় ১৭টী বস্ত্রের চাহিদা এবং ১৭টী বস্ত্রের যোগান। ১৩৲ টাকা বস্ত্রের দাম নির্দ্ধারিত হইল। ইহার নাম বাজার দাম (Market Price)।

অতএব পেনসন বলিলেন, "কোনো কিছুর দাম (অর্থাৎ মুদ্রানুযায়ী মূল্য) যোগান ও চাহিদা এই দুইটী শক্তির অন্যোন্যক্রিয়ার দ্বারা নিরূপিত' হয়। এই দুইটী শক্তি দাম পরিবর্ত্তনের মারফৎ পরস্পরের উপরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটী ভারসাম্যে পৌঁছানো হয়।" [The price of anything (i.e. its money value) is determined by the interaction of two forces, supply and demand, which act and re-act on one another through the medium of price changes, until a state of equilibrium is reached"—PENSON] যে দামের দ্বারা এইরূপ ভারসাম্যের অবস্থা আসে সেই দামটী ভারসাম্যের দাম (equilibrium price) বা বাজার দাম (market price)।

(অনু ৬) বাজার দামের সহিত প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সম্পর্ক—*Market price in Relation to Marginal utility and Marginal cost*

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে ১৩৲ টাকা দামে ১৭ খানি বস্ত্র বিক্রয়

হইতেছে। ১৩৲ টাকার বেশী দামে বিক্রয় হইতেছে না কেন? তাহার কারণ হইল, যাহারা ১৩৲ টাকা দামেও বস্ত্র খরিদ করিল না তাহাদের নিকট ধুতির প্রয়োজনীয়তা ১৩৲ টাকা অপেক্ষাও কম। যাহারা ১৩৲ টাকা দামে বস্ত্র ক্রয় করিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ থাকিতে পারে যাহাদের কাছে বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব অধিক এবং সেহেতু তাহারা বস্ত্রের জন্য ১৩৲ টাকার বেশী দাম দিতেও হয়তো রাজী হইত। কিন্তু কেবলমাত্র তাহারাই বস্ত্র ক্রয় করিলে ১৭ খানি বস্ত্র বিক্রয় হইত না। কিন্তু যাহারা কিনিবে কি কিনিবে না এইরূপ সন্দেহাকুল চিত্তে কিনিবার সিদ্ধান্ত করিল—তাহারা কিনিল বলিয়াই ১৭ খানি ধুতি বিক্রয় হইল—তাহারা বস্ত্রের প্রান্তিক ক্রেতা; তাহাদের নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ১৩৲ টাকার অধিক নহে। সপ্তদশ বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা ১৩৲ টাকা। উহা হইল সমষ্টিগতভাবে ক্রেতাদিগের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা। অতএব যে দামে সামগ্রীটী বিক্রয় হইল উহা প্রকৃত ক্রেতাদিগের সমষ্টিগতভাবে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার সমান।

অপর পক্ষে ১৩৲ টাকার কম দামে বিক্রয় হইল না কেন? তাহার কারণ বস্ত্র বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ছিল যাহাদের কাছে এক এক খানি বস্ত্র উৎপাদনের খরচা ১৩৲ টাকা অপেক্ষা কম এবং তাহারা হয়তো ১৩৲ টাকার কমে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিত কিন্তু কেবলমাত্র তাহারাই বস্ত্র বিক্রয় করিলে ১৭ খানির কম বস্ত্র বিক্রয় হইত। কিন্তু খরিদ্দাররা চাহে ১৭ খানি বস্ত্র। যাহারা বস্ত্র বিক্রয় করিল বলিয়া ১৭ খানির কম বস্ত্র বিক্রয় হইল না তাহারা ধুতির প্রান্তিক বিক্রেতা বা উৎপাদক (marginal sellers or producers)। তাহাদের কাছে বস্ত্রের উৎপাদন খরচা ১৩৲ টাকার কম নহে। দাম যদি ১৩৲ টাকার কম হইত তাহা হইলে এই প্রান্তিক উৎপাদকগণ বস্ত্র বিক্রয় করিত না এবং ১৭ খানি বস্ত্রের যোগান হইত না। অর্থাৎ সপ্তদশ বস্ত্রটী কিনিতে পাওয়া যাইত না। ১৩৲ টাকা হইল সমষ্টিগতভাবে উৎপাদকদিগের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা (marginal cost of production)। অতএব যে দামে সামগ্রীটী বিক্রয় হইল উহা প্রকৃত বিক্রেতা বা উৎপাদকদিগের সমষ্টিগতভাবে প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান।

সেইজন্য পেনসন বলিলেন "ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম কোনো একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে—যাহারা সবেমাত্র কিনিতে প্রণোদিত হইয়াছে তাহাদের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রান্তিক বিক্রেতাদের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা—উভয়কেই পরিমাপ করে।" ["The equilibrium or market price measures at the given time and place both the marginal utility to those

just induced to buy and the cost of production to the marginal sellers"—PENSON]

(অনু-৭) যোগান চাহিদার নিয়ম—*Law of Supply and Demand.*

বাজার দাম নিরূপিত হইবার যে প্রক্রিয়া আমরা দেখিলাম উহা হইতে আরেকটী নিয়মের সন্ধান পাই। উহার নাম যোগান চাহিদার নিয়ম (Law of Supply and Demand)।

যে পরিমাণ সামগ্রীর যোগান করা হয় চাহিদার পরিমাণ যদি তাহা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বলিতে হয় বিক্রেতার বিক্রয় করিবার গরজের অপেক্ষা ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ বেশী। এক্ষেত্রে জিনিষের দাম বৃদ্ধি পায়। (If demand is greater than supply price will rise)

অপর পক্ষে একটী সামগ্রীর যে পরিমাণ চাহিদা আছে যোগানের পরিমাণ যদি তাহা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বলিতে হয় ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজের অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয় করিবার গরজ বেশী। এক্ষেত্রে জিনিষটীর দাম কমিয়া যাইবে। (If supply is greater than demand price will fall)

ইহাই হইল যোগান চাহিদার নিয়ম।

অতএব যোগান চাহিদার নিয়ম বলিতে বুঝায় যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক পরিমাণের উপর সামগ্রীর দাম নির্ভর করে। এই নিয়মটীর সহিত দাম নিরূপণ পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন দরকষাকষি করে তখন 'গরজের লড়াই' হইতে দ্রুতগতিতে দামের উঠ্‌তি-পড়তি হয় বলা হইয়াছে; উহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে এই "যোগান-চাহিদার নিয়ম" অনুযায়ীই দামের দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। দামের সেই উঠতি-পড়তি তখন পৃথকভাবে যোগান ও চাহিদার উপর বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সেই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া হইতেই কোনো একটী দামে যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হয়। সেই ভার-সাম্যের দাম হইল বাজার দাম।

(অণু-৮) নিয়মিত দাম (ও বাজার দাম)—*Normal Value* (and Market Value)

দাম নিরূপণের যে পদ্ধতির আলোচনা করা হইল উহার দ্বারা যে দাম নিরূপিত হয় তাহা স্থায়ী হয় না। উহা সাময়িক—সেইজন্য উহার নাম বাজার-দাম (Market Price)। ইহা স্থায়ী হয় না এই কারণে যে যোগান ও

চাহিদার যে ভারসাম্যের দ্বারা বাজার দাম নির্দ্ধারিত হয় সেই ভারসাম্য অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কারণ বাজার দামে সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে সকল উৎপাদনকারীর অধিক লাভ হইতেছে তাহারা অধিক মুনাফা পাইবার লোভে ঐ সামগ্রী অধিক উৎপাদন করিবে এবং অধিক পরিমাণে যোগান করিবে। যখন ঐ সামগ্রী অধিক যোগান হইবে তখন, চাহিদা অপেক্ষা যোগান হইবে বেশী এবং "যোগান চাহিদার নিয়ম" অনুযায়ী দাম কমিয়া যাইবে—পূর্ব্বের ভারসাম্যের দামে থাকিবে না। ধরা যাউক একটী কলমের বাজার দাম ১০৲ টাকা—উহার যোগান ১০০টী এবং চাহিদা ১০০টী। ১০৲ টাকা দামে কলম বিক্রয় করিয়া যে সকল উৎপাদনকারী উৎপাদন খরচার উপর লাভ করিতেছে তাহারা বেশী কলম উৎপাদন ও যোগান করিয়া বেশী আয় করিতে প্রলোভিত হইবে। ফলে কলমের যোগান হয়তো ১২৫ হইল। এক্ষেত্রে ক্রেতা ১০০টির কিন্তু বিক্রেতা ১২৫টীর। তখন আর দাম দশ টাকায় থাকিবে না—উহা কমিয়া যাইবে।

কমিয়া কোথায় দাঁড়াইবে? কমিয়া ঐ সামগ্রীটীর যাহা উৎপাদন খরচা তাহার সমান হইবে। ধরা যাউক কলমটীর উৎপাদন খরচা ৭৲ টাকা। কলমটীর দাম যতক্ষণ ৭৲ টাকার উপর থাকিবে ততক্ষণ উৎপাদনকারীরা লাভের প্রলোভনে ঐ সামগ্রীর অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও যোগান করিতে থাকিবে। চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হইবে এবং দাম কমিতে কমিতে উৎপাদন-খরচার সমান হইবে।

কিন্তু সামগ্রীটী উৎপাদন করিতে যে খরচা পড়িয়াছে ঐখানে আসিয়া দাম কমার শেষ হইবে কেন? কারণ, দাম যদি উৎপাদন খরচা অপেক্ষাও কমিয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনকারীদের লাভ তো থাকিবেই না, বরং লোকসান হইবে। কলমের দাম যদি ৬৲ টাকা হয় কিন্তু উহা উৎপাদন করিতে ৭৲ টাকা খরচা হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীদের প্রতি কলমে ১৲ টাকা করিয়া লোকসান, লাভ থাকা তো দূরের কথা; তখন কলম উৎপাদনকারীগণ কলম উৎপাদন করা ছাড়িয়া দিবে। এক্ষেত্রে কলমের যোগান কমিয়া যাইবে, এবং চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম হইলে "যোগান চাহিদার নিয়ম" অনুযায়ী কলমের দাম বাড়িতে থাকিবে। বাড়িয়া উহা কলমের উৎপাদন খরচার সমান হইবে। উহার উপরে যাইতে পারিবে না, কারণ—পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ যোগান বৃদ্ধি ও হ্রাস সময়-সাপেক্ষ। কারণ সামগ্রী উৎপাদন হইতে সময় লাগে—উৎপাদন শেষ না হইলে যোগান বৃদ্ধি হইতে পারে না।

অপর পক্ষে যে সামগ্রীগুলি উৎপাদিত হইয়া গিয়াছে সেগুলির যোগান করিতেই হইবে। সেইগুলি যতদিন না ফুরাইতেছে ততদিন যোগান কমিবে না।

কিন্তু দীর্ঘ সময়ের দিক হইতে একটী সামগ্রীর দাম উৎপাদন খরচার উপরে থাকিলে, উহার যোগান বৃদ্ধি হওয়া এবং সেই কারণে দাম কমিয়া আসিয়া উৎপাদন খরচার সমান হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এবং দাম উৎপাদন খরচার কম হইলে ঐ সামগ্রীর যোগান হ্রাস পাওয়া এবং সেই কারণে দাম বাড়িয়া আসিয়া উৎপাদন খরচার সমান হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সময়ের ব্যবধানে, যোগানের পরিবর্ত্তনের দ্বারা যে দাম বাড়িয়া বা কমিয়া, উৎপাদন খরচার সমান হয় তাহাই হইল নিয়মিত দাম (Normal price)। নিয়মিত দামের ক্ষেত্রেও চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য হয় কিন্তু ইহাতে চাহিদা স্থির থাকে, যোগান নিজেকে চাহিদার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়। কিন্তু বাজার দাম (Market Price) হইল সেই দাম যাহা সাময়িকভাবে যোগান চাহিদার ভারসাম্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এবং যাহা উৎপাদন খরচা অপেক্ষা অধিক বা অল্প। এই বাজার দামের প্রবণতা দেখা যায় নিয়মিত দামের দিকে অগ্রসর হইবার।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আমরা যে পদ্ধতিতে 'বাজার-দাম' ও 'নিয়মিত-দাম' নির্দ্ধারিত হইতে দেখিলাম, সেই পদ্ধতিতে উহারা নির্দ্ধারিত হয় তখন যখন নাকি বাজারে "সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা" বিদ্যমান। বাজারে যখন "প্রতিযোগিতা" থাকে না তখন তাহাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয় (Monopoly)। একচেটীয়া কারবারের ক্ষেত্রে সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত হয় অন্য পদ্ধতিতে।

(অণু-৯) প্রতিযোগিতার অর্থ—*Meaning of Competition*

অর্থনীতিতে "প্রতিযোগিতা" বলিতে এইরূপ বুঝায় :—

(১) বিক্রেতাগণের মধ্যে কোনোরূপ জোট পাকাইবার প্রচেষ্টা নাই—অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া যোগান বা দাম কৃত্রিম ভাবে বাঁধিয়া রাখিবার কোনো প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে নাই। তাহাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে খরিদ্দারগণকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা করিবার উপায় হইল তাহার পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি দাম কমাইয়া।

(২) ক্রেতাদের মধ্যেও কোনোরূপ জোট পাকাইবার প্রচেষ্টা নাই—অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া চাহিদা বাঁধিয়া রাখিবার বা দাম বাঁধিয়া রাখিবার

কোনো আয়োজন তাহাদের মধ্যে নাই। প্রত্যেক ক্রেতাই বিক্রেতাগণকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা করিবার উপায় হইল যতখানি সম্ভব ততখানি দাম বৃদ্ধি করিয়া।

বিক্রেতাগণ সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে যতখানি প্রতিযোগিতা করিতেছে ক্রেতারা যদি উহা ক্রয় করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বেশী প্রতিযোগিতা করে তাহা হইলে বলা হয়—ক্রেতাদের গরজ বিক্রেতাদের গরজ অপেক্ষা বেশী। অপর পক্ষে ক্রেতারা নিজেদের মধ্যে যতখানি প্রতিযোগিতা করিতেছে, বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে যদি তাহা অপেক্ষা বেশী প্রতিযোগিতা করে, তাহা হইলে বলা হয়, বিক্রেতাদের গরজ ক্রেতাদের গরজ অপেক্ষা বেশী।

প্রথম ক্ষেত্রে সামগ্রীর দাম বাড়িবার প্রবণতা থাকিবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা কমিবার প্রবণতা থাকিবে। ঠিক যে দামে,—বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে যতখানি প্রতিযোগিতা করিতেছে, ক্রেতারাও ঠিক ততখানি প্রতিযোগিতা করিতেছে, এইরূপ হইবে—সেই দামে সেই সময়ের জন্য ক্রেতার গরজ ও বিক্রেতার গরজে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। উহা হইবে বাজার দাম।

একটী স্থানে একই সামগ্রীর বাজার দাম একই হইতে বাধ্য। একই সামগ্রী একই সময়ে একই স্থানে একজন বিক্রেতা ৪৲ টাকায় বিক্রয় করিল আর একজন বিক্রেতা ৬৲ টাকায় বিক্রয় করিল—এইরূপ হইতে পারে না। চ্যাপম্যানের ভাষায়, "প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একই সময়ে একই স্থানে একই সামগ্রীর জন্য একটী মাত্র দাম পাওয়া যাইতে পারে।"*

(অনু-১০) একচেটিয়া দাম—*Monopoly Price*

যে সামগ্রীর উৎপাদনে বা যোগানে প্রতিযোগিতা নাই অর্থাৎ উহার যোগান একজন ব্যক্তি বা একটী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেই সামগ্রীতে একচেটিয়া কারবার আছে বলা হয়; ঐ সামগ্রীর যোগান, যাহার বা যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন তাহাকে একচেটিয়াদার (Monopolist) বলা হয়। একচেটিয়াদার তাহার সামগ্রী যে দামে বিক্রয় করে তাহা হইল একচেটিয়া দাম (Monopoly price)।

একচেটিয়া কারবার অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার রূপ। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একদিকে ক্রেতাদের মধ্যে এবং অপরদিকে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে;

* "Under Competition one price only can be charged for the same commodity at the same time in the same place"—CHAPMAN Outlines of Political Economy

একচেটিয়া কারবারে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে কিন্তু বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে না।

সেই জন্য ঠিক যে উপায়ে বাজার দাম নির্দ্ধারিত হয়, সেই উপায়ে একচেটিয়া দাম নির্দ্ধারিত হয় না। যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ভারসাম্য উপস্থিত হয় যে দামে, উহাই বাজার দাম; এবং যোগানকারী ঐ দামে সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা পাইবে সেই মুনাফার পরিমাণ তাহার পরিকল্পনা অনুসারে নির্দ্ধারিত নহে। এমন কি অবস্থা বিশেষে কোনো মুনাফা নাও থাকিতে পারে। মুনাফা পাইলেও, যোগানকারী পূর্ব্ব হইতেই সুচিন্তিতভাবে এমন ব্যবস্থা করিতে পারে না যাহাতে তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা হইবে।

কিন্তু ঠিক এই জিনিষটাই একচেটিয়াদার করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। সামগ্রীর যোগানের উপর একচেটিয়াদারের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, অতএব একচেটিয়াদার তাহার সামগ্রীর যোগান কখনও কমাইয়া (যোগান কমিলে, চাহিদা যদি ঠিক থাকে, দাম বাড়িবে) কখনও বাড়াইয়া (যোগান বাড়িলে, চাহিদা যদি ঠিক থাকে, দাম কমিবে) উহার দাম এমন এক জায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইবে—যে দামে তাহার "সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নীট আয়" (maximum net income) হইবে। উহা অপেক্ষা দাম বাড়াইলেও "নীট আয়" কমিয়া যাইবে, আবার উহা অপেক্ষা দাম কমাইলেও তাহার "নীট আয়" কমিয়া যাইবে। ঠিক যে দামটী রাখিলে, একচেটিয়াদারের "সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নীট আয়" হইবে ঠিক সেই দামটী একচেটিয়াদার রাখিয়া দিবে এবং উহাই হইবে একচেটিয়া দাম।

দৃষ্টান্ত :—ধরা যাউক হরিকান্ত বাবু এক নূতন ধরণের কলম উৎপাদন করিয়াছেন যাহা অন্য কেহ পারে না। হরিকান্ত বাবু ঐ কলমের একচেটিয়াদার (monopolist)। ধরা যাউক ঐ **কলম প্রতিটী উৎপাদন করিতে ৫৲ টাকা খরচ**। তিনি ৮৲ টাকা কলমের দাম ধার্য্য করিয়া বাজারে কলম ছাড়িলেন। বিক্রয় হইল ১০টী কলম। তাঁহার মোট আয় হইল (১০×৮৲)=৮০৲ টাকা; ১০টী কলমে তাঁহার খরচা পড়িয়াছিল (১০×৫৲)=৫০৲ টাকা। মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (৮০৲ টাকা) হইতে যতগুলি কলম বিক্রয় হইল তাহার মোট উৎপাদন খরচা (৫০৲ টাকা) বাদ দিলে যাহা রহিল তাহাই হইল, হরিকান্ত বাবুর "নীট আয়।" **অতএব নীট আয় হইল ৩০৲ টাকা।**

ধরা যাউক তিনি সামগ্রীর দাম ৮৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকায় নামাইলেন (হয় সোজাসুজী বলিয়া দিলেন, "আমার সামগ্রী এবার ৭৲ টাকায় বিক্রয় করিব"— অথবা কিছুই না বলিয়া যোগান বাড়াইয়া দিলেন, কারণ তিনি জানেন চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইলেই দাম কমিবে)। ৭৲ টাকা দামে হয়তো কলমের চাহিদা হইল ১৬টী। তাঁহার মোট আয় হইল (১৬×৭৲)=১১২৲ টাকা। ১৬টী সামগ্রী উৎপাদন করিতে তাঁহার খরচা পড়িয়াছিল (১৬×৫৲)=৮০৲ টাকা। অতএব ১৬টী সামগ্রী বিক্রয় হওয়াতে তাঁহার **"নীট আয়" হইল (১১২৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা বাদ দিয়া) ৩২৲ টাকা।**

ধরা যাউক তিনি সামগ্রীর দাম আবার কমাইয়া ৬৲ টাকায় দাড় করাইলেন। ৬৲ টাকা দামে হয়তো কলমের চাহিদা হইল ২২টী। তাঁহার মোট আয় হইল (২২×৬৲)=১৩২৲ টাকা। ২২টী কলম উৎপাদন করিতে তাঁহার খরচা পড়িয়াছিল (২২×৫৲)=১১০৲ টাকা। অতএব ২২টী কলম বিক্রয় হইতে তাঁহার **"নীট আয়" হইল (১৩২৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা বাদ দিয়া) ২২৲ টাকা।**

সামগ্রীটীর কত দাম হইলে তাঁহার নীট আয় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইবে? সামগ্রীটীর দাম যদি ৭৲ টাকা হয় তাহা হইলে তাঁহার নীট আয় হইবে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ। কারণ ৭৲ টাকা দামে নীট আয় হইল ৩২৲ টাকা কিন্তু ৮৲ টাকা দামে নীট আয় ৩০৲ টাকা ও ৬ টাকা দামে নীট আয় ২২৲ টাকা। অতএব ঐ সামগ্রীটীর দাম ৭৲ টাকাতেই নির্দ্ধারিত হইবে।

Questions & Hints

1. What is meant by "markets" in Economics? What are the conditions that govern the extent of a market? (1940) [অনু—১ এবং ২]

   Distinguish between value and price.

2. Show that price depends on the interaction of the forces of demand and supply (1945) [অনু—৪, ৫, এবং ৬]

   Explain how market value is determined under conditions of competition. (1946). How is value determined? [অনু—৫]

3. Distinguish between market value and normal value (1932) [অনু—৮]

4. What do you mean by competition? [অনু—৯]

5. How is monopoly price determined? (1939) [অনু—১০]

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিনিময় ও বিনিময়ের বাহণ (মুদ্রা)

Exchange and Medium of Exchange (Money).

(অণুচ্ছেদ-১) বিনিময়—*Exchange*

একটী সামগ্রী দিয়া উহার পরিবর্ত্তে অপর একটী সামগ্রী যখন আমরা লই তখন ঐ কাজকে বিনিময় বলা হয়।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে যে-ব্যক্তি কোনো সামগ্রী বিনিময় করিবে সে সকল অবস্থাতেই উহা করিবে না। বিনিময়ের দ্বারা যদি সে লাভবান হয় তবেই সে বিনিময়ে অগ্রসর হইবে। বিনিময়ে রত ব্যক্তি যে সামগ্রীটী গ্রহণ করিল উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা, যে সামগ্রীটী সে প্রদান করিল, উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা যদি অধিক বোধ করে তাহা হইলে বিনিময়েব দ্বারা সে লাভবান হইবে এবং বিনিময়ে অগ্রসর হইবে। যে সামগ্রীটী একজন ব্যক্তি লইতে চাহে এবং উহার পরিবর্ত্তে যে সামগ্রীটী সে দিতে চাহে—উহাদেব উভয়েব প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যদি তাহার নিকট সমানই হয়, তাহা হইলে সামগ্রী দুইটীর মধ্যে বিনিময় করিতে সে অগ্রসর হইবে না, কারণ বিনিময় করিবার প্রয়োজন কি? এক্ষেত্রে সামগ্রী দুইটীর মধ্যে বিনিময় হইবে না।

ধরা যাউক হরি একজন চাউল উৎপাদনকারী এবং যদু একজন বস্ত্র উৎপাদনকারী। হরি যদুকে একমণ চাউল প্রদান করিতে চাহিল এবং পরিবর্ত্তে যদুর নিকট হইতে একজোড়া বস্ত্র চাহিল। কিন্তু কখন হরি উহা চাহিবে? হরি উহা চাহিবে যখন সে মনে করিবে যে তাহার নিকট একমণ চাউলের অপেক্ষা এক জোড়া বস্ত্রের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অধিক। হরি যদি মনে করে যে তাহার নিকট চাউলের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা একজোডা বস্ত্রের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কম তাহা হইলে ঐ দুইটী সামগ্রীর বিনিময়ের কথা সে চিন্তাই করিবে না। সে যদি মনে করে তাহার নিকট একমণ চাউলের ও একজোড়া বস্ত্রের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা সমান, তাহা হইলেও সে ঐ বিনিময়ে অগ্রসর হইবে না কারণ বিনিময় করিবার পরিশ্রম নিরর্থক।

(অণু-২) সামগ্রী বিনিময় ও ইহার অসুবিধা—*Barter and its disadvantages.*

যখন মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই, তখন সামগ্রীর পরিবর্তে সামগ্রী বিক্রয় করা হইত—যথা একটী বলদ দিয়া দুইমণ ধান, বা একসের লবণ দিয়া আধসের ডাল ইত্যাদি। ইহাকে বলা হয় সামগ্রী বিনিময় (barter)। এইরূপ সামগ্রীর দ্বারা সামগ্রী বিনিময়ের মধ্যে কতকগুলি অসুবিধা ছিল।

(১) **অভাবের পাল্টাপাল্টি মিল হয় না** (absence of coincidence of want) একজন ব্যক্তি তাহার যে সামগ্রীটী দিতে চাহে, আর একজন ব্যক্তি হয়তো সেই সামগ্রীটী লইতে পারে কিন্তু প্রথম ব্যক্তি যে সামগ্রীটী পরিবর্তে চাহে, তাহা হয়তো অপর ব্যক্তি দিতে পারে না। যথা যদু একজোড়া বস্ত্র দিয়া এক মণ চাউল চাহে; রাম হয়তো বস্ত্র লইতে পারে কিন্তু পরিবর্তে চাউল দিতে পারে না—হয়তো জামা দিতে পারে। এক্ষেত্রে তাহাদের অভাবের পাল্টাপাল্টি মিল হয় না। যদু চাউল পায় না, রামও বস্ত্র পায় না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলে এইরূপ অসুবিধা হয় না। যদু তাহার বস্ত্র বাজারে বিক্রয় করিয়া মুদ্রা পাইবে এবং মুদ্রার দ্বারা বস্ত্র কিনিবে; রামও তাহার জামা মুদ্রার পরিবর্তে বিক্রয় করিয়া ঐ মুদ্রা দিয়া চাউল কিনিবে। (২) **মূল্যের সাধারণ গ্রাহ্য পরিমাপ নাই** (Absence of a common measure of value)—একটী সামগ্রীর সহিত অপর যতপ্রকার সামগ্রী যে পরিমাণে বিনিময় হইতে পারে ঐ সামগ্রীর মূল্য হিসাব করিতে তত প্রকার অপর সামগ্রীর ও তাহাদের পরিমাণের উল্লেখ করিতে হইবে। যথা একমণ চাউলের সহিত একজোড়া বস্ত্রের বিনিময় হইতে পারে **অথবা** দুইটী চেয়ারের বিনিময় হইতে পারে **অথবা** একটী ফাউণ্টেনপেনের বিনিময় হইতে পারে। এক্ষেত্রে একমণ চাউলের মূল্য বলিতে হইবে, একজোড়া বস্ত্র **অথবা** দুইটী চেয়ার **অথবা** একটী ফাউণ্টেনপেন। কোনো একটী মাত্র বস্তুর দ্বারা একমণ চাউলের দাম ব্যক্ত করা যাইবে না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলে এইরূপ অসুবিধা থাকে না—মুদ্রার হিসাবে একমণ চাউলের দাম ব্যক্ত করা সহজ, যথা—ধরা যাউক ২০৲ টাকা। এবং চাউলের অনুপাতে অন্য সকল সামগ্রীর কিরূপ মূল্য তাহা ঐ সামগ্রীগুলির মুদ্রার হিসাবে দাম দেখিলেই বাহির করা সহজ। (৩) **প্রবিভাজনের উপায় থাকেনা** (absence of the means of sub-division)—কোনো কোনো সামগ্রী আছে যাহাকে ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইলে অনেকখানি অপচয় হয় অথবা ঠিক সেই সামগ্রীটী আর

থাকে না; অথচ উহার পরিবর্ত্তে যে সামগ্রী পাওয়া যাইবে তাহার মূল্য উহা অপেক্ষা কম—অতএব বিনিময় করিতে পূরাপূরি দিয়া দেওয়া যায় না। যথা, একজনের হয়তো একটী ঘোড়া আছে—সে একটী ঘড়ি কিনিতে চাহে; হয়তো ঘোড়াটীর মূল্য ঘড়ির মূল্যের দ্বিগুণ। এক্ষেত্রে হয় সমগ্র ঘোড়াটী দিয়া দিতে হয় অথবা উহাকে অর্দ্ধেক করিতে হয়, কিন্তু কোনোটীই সম্ভব নহে। সেইজন্য বিনিময় হইল না। কিন্তু মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে ঘোড়ার মালিক অনায়াসে তাহার সমগ্র ঘোড়াটী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ মুদ্রা পাইত তাহার অর্দ্ধেক নিজের কাছে রাখিয়া দিত এবং অর্দ্ধেক দিয়া ঘড়ি কিনিতে পারিত। এক্ষেত্রে বিনিময়ের কাজটীও হইল অথচ যে সামগ্রীর দ্বারা বিনিময় করা হইল তাহার মূল্যের কোনো অপচয় হইল না। (৪) **মূল্যবান দ্রব্যের সঞ্চয় সম্ভব হয় না**—(absence of a store of value)—ভবিষ্যতের জন্য অনেকেই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চায়—কিন্তু একজন লোক তাহার উপার্জ্জিত সামগ্রীর মধ্যে যত মূল্যবান সামগ্রীই সঞ্চয় করিয়া রাখুক তাহা অধিকদিন স্থায়ী হয় না। একজন লোক তাহার বৃদ্ধ বয়সের সংস্থানের জন্য চাউল, লবণ, তৈল, গরু, ছাগল ইত্যাদি সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না কারণ ঐগুলি অধিকদিন স্থায়ী হইবে না। এইজন্য সামগ্রী-বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে মূল্যের সঞ্চয় সম্ভব হয় না। কিন্তু মুদ্রার প্রচলন থাকিলে ইহা সম্ভব হয়। কারণ, মুদ্রা সাধারণ সামগ্রীর তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী, সঞ্চয়কারী তাহার বর্ত্তমানে উপার্জ্জিত সামগ্রীর মধ্যে যে মূল্যের সামগ্রী সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে তাহা ঐ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া মুদ্রায় পরিণত করিতে পারে; এবং সেই মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারে।

(অণু-৩) মুদ্রা,—বিনিময়ের বাহন—*Money,—the Medium of Exchange*

সামগ্রী বিনিময়ের অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য মানুষ মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করে। মুদ্রা হইল এমন একটী সামগ্রী যাহার মারফৎ সকল বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিই কোনো সামগ্রী ক্রয় করে বা বিক্রয় করে সে ঐ সামগ্রী মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় বা বিক্রয় করে। উপরন্তু একজন ব্যক্তি অপরের নিকট কোনো দেনা করিয়া থাকিলে যে পরিমাণ মূল্য দেনা করিয়াছে সেই মূল্যের মুদ্রা সে প্রদান করিলে পাওনাদার দেনা পরিশোধ হইল বলিয়া বিবেচনা করে। প্রত্যেক বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া এবং প্রত্যেক পাওনাদার দেনাদারের নিকট হইতে উহা গ্রহণ

করিয়া তাহারা যে লেনদেনের * (transaction) সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা সম্পূর্ণ হইল বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব মুদ্রা হইল এমন একটী সামগ্রী যাহা সকল ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে বা দেনা পাওনার কার্য্যে জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হয়।

(অণু-৪) মুদ্রার কার্য্যকারিতা—*Functions of Money*

মুদ্রার মোটামুটি চারি প্রকার কার্য্য আছে :—†

(১) **মুদ্রা বিনিময়ের বাহনরূপে** (medium of exchange) **কার্য্য করে**—ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিনিময় করিয়া লয়। ইহাই হইল মুদ্রার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। একজন দোকানদার গোটাকয়েক মুদ্রা লইয়া তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেয় অথচ সে ভালভাবেই জানে যে এই মুদ্রাগুলি সরাসরি ভোগকার্য্যে আসিবে না—মুদ্রা খাওয়া যাইবে না, পরিধান করা যাইবে না। তবুও দোকানদার যে মুদ্রা গ্রহণ করে তাহার কারণ, সে জানে যে তাহার ভোগকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনায়াসেই মুদ্রাব সাহায্যে কিনিয়া লওয়া যাইবে। এই ভাবে প্রত্যেকেই তাহার উৎপাদিত সামগ্রী মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে এবং ঐ মুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণে যে সামগ্রী তাহার প্রয়োজন তাহা খরিদ করিয়া লয়।

(২) **ইহা মূল্যের সাধারণ পরিমাপ** (measure of value) **হিসাবে কার্য্য করে**—বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য মুদ্রার সাহায্যে পরিমাপ করা হইযা থাকে। ঠিক যেমন গজ বা ফুট দিয়া আমরা কোনো সামগ্রীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ পরিমাপ করি—অর্থাৎ গজ বা ফুট হইল দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপিবার সাধারণ গ্রাহ্য পরিমাপ—ঠিক তেমনি মুদ্রার সাহায্যে আমরা অক্লেশে সকল সামগ্রীর মূল্য পরিমাপ করিতে পারি, অর্থাৎ মুদ্রা হইল সামগ্রীর মূল্য মাপিবার সাধারণ গ্রাহ্য পরিমাপ। ইহার দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য তুলনা করা সম্ভব—যেমন গজ বা ফুট দিয়া বিভিন্ন সামগ্রীর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ তুলনা করা যায়। সেই জন্য একজন ব্যক্তি তাহার উৎপাদিত সামগ্রীর পরিবর্ত্তে তাহার প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী কত পরিমাণে পাইবে তাহা মুদ্রার হিসাব করিয়া পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া লইতে পারে।

---

* সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় এক প্রকার লেনদেন—আবার ঋণ দেওয়া ও নেওয়া ও একপ্রকার লেনদেন (Transaction)।

† "মুদ্রার ব্যবহারে চার কাজ হয়,
বাহন ও পরিমাপ, মান, সঞ্চয়।"

"Money is a matter of functions four
A medium, a measure, a standard, a store."

(৩) **ইহা ভবিষ্যতে পরিশোধ্য ঋণের মান** (standard of deferred payments) **হিসাবে কার্য্য করে**—সাধারণতঃ মুদ্রার মূল্য অর্থাৎ একটী মুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ সামগ্রী খরিদ করা যায় তাহা স্থিরই থাকে—কিন্তু অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য তাহাদের যোগান চাহিদার পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এক্ষেত্রে দেনাপাওনার লেনদেন যদি মুদ্রার মাধ্যমে হয় তাহা হইলে ঋণ গ্রহণের সময়ে এক ব্যক্তি যে পরিমাণ মূল্যের সামগ্রী লইয়াছিল, ঋণ পরিশোধের সময়ে সে সমপরিমাণ মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে পারে।

(৪) **মুদ্রার দ্বারা মূল্যবান সামগ্রীর সঞ্চয়** (store of value) **সম্ভব হয়**—সাধারণ সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিলে উহা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু মুদ্রা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। অতএব সঞ্চয়ের জন্য নির্দ্ধারিত সাধারণ সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিয়া উহাদের পরিবর্ত্তে লভ্য মুদ্রাগুলি সঞ্চয় করিলে, সামগ্রীর মূল্য বহুদিন যাবৎ সঞ্চয় করিয়া রাখা সম্ভব হয়।

এই চারিটী কার্য্যের মধ্যে মুখ্যতঃ প্রথম দুইটী কার্য্য পাইবার উদ্দেশ্যেই মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল।* প্রচলন হইবার পর শেষের দুইটী পর্য্যায়ের কার্য্যকারিতাও ইহার রহিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইল। সেই কারণে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ্ এই চারিটী কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়া বলেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় কার্য্য দুইটী মুদ্রার অবশ্য করনীয় বা আদিম কার্য্যকারিতা (essential or original functions) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্য্যায়ের কার্য্য দুইটী উহার উদ্ভূত কার্য্যকারিতা (derived functions)।

(অনু-৫) উৎকৃষ্ট মুদ্রার গুণ—*Qualities of Good Money*

মানুষ একটী সাধারণ বিনিময়ের বাহনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, এরূপ নহে। অনেক দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বসাধারণেই ব্যবহার করে এইরূপ কোনো প্রয়োজনীয় সাধারণ সামগ্রী লোকে বিনিময়-বাহণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। প্রাচীন গ্রীসে বলদ, তিব্বতে চা, জাপানে চাউল, মধ্য আফ্রিকায় লবণ এইভাবে ব্যবহৃত হইত।

* সেইজন্য টমাস্ মুদ্রার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: "মুদ্রা হইল এমন একটী বস্তু যাহা, মূল্যের পরিমাপ রূপে এবং অন্যান্য সকল সামগ্রীর মধ্যে বিনিময়ের উপায়রূপে কাজ করিবার জন্য সাধারণ সম্মতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে।" ["Money is a commodity chosen by common consent to be a measure of value and a means of exchange between all other commodities"—S. E. THOMAS,—Elements of Economics.]

ঐ সকল দেশে ঐ সামগ্রীগুলি মুদ্রার কাজ করিত। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ দেখা গেল এই সাধারণ সামগ্রীগুলি মুদ্রা হইবার অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। তখন, মুদ্রার কার্য্যকারিতা যথাযথ সম্পাদনের জন্য কোন্ সামগ্রী সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, মানুষ তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। এই সন্ধানের ফলস্বরূপ তাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুইটী মূল্যবান ধাতুকে মুদ্রা হইবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিল। যে গুণগুলি থাকিবার জন্য এই ধাতুদ্বয়-নির্ম্মিত মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলিএইরূপ : (১) **গ্রহণযোগ্যতা** (Acceptability)—যে সামগ্রী মুদ্রার কার্য্য করিবে উহা সকলেই সকল সময়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে কোনো একটী সামগ্রীর পরিবর্ত্তে নিজের সামগ্রী দিয়া দিবে, ঐ সামগ্রীটী তত অধিক-মাত্রায় মুদ্রা হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। (২) **স্থায়িত্ব** (Durability) —সামগ্রীটী লোকের হাতে হাতে ঘুরিবে এবং উহা মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে কাজ করিবে। সেইজন্য যে বস্তুর দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মিত হইবে তাহার স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। (৩) **স্থানান্তরযোগ্যতা** (Portability)—ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয় ; অতএব মুদ্রাকে একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়। অতএব মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত বস্তুটীকে সহজেই স্থানান্তরযোগ্য হইতে হইবে। 'সহজেই' শব্দটীর অর্থ হইল যে ঐ বস্তুর অল্প পরিমাণ বহন করিলেই অনেকখানি দামী সামগ্রী বহন করা হইল, এইরূপ হইবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই গুণ আছে। (৪) **অভিজ্ঞেয়তা** (Cognisability)—সহজেই যাহাকে চিনিতে পারা যায় তাহার গুণকে বলা হয় অভিজ্ঞেয়তা। মুদ্রার অভিজ্ঞেয়তা থাকা প্রয়োজন, কারণ যে বস্তুকে সহজেই চিনিতে পারা যায় না, যাহা আসল কি নকল এই সন্দেহের অবকাশ থাকে, তাহাকে জনসাধারণ অবাধে গ্রহণ করিবে না। (৫) **বিভাজ্যতা ও আনুগুণ্য** (Divisibility and Homogeniety) অল্পদামের সামগ্রী যাহাতে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহার জন্য মুদ্রার বিভাজ্যতা থাকা প্রয়োজন ; অর্থাৎ উহা এমন হওয়া উচিত যাহাকে অল্প মূল্যের অনুপাতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। উপরন্তু এক একটী মুদ্রা সমান গুণের হওয়া উচিত (অর্থাৎ অনুগুণ হইবে) কারণ মুদ্রাখণ্ডগুলির মধ্যে গুণের তারতম্য থাকিলে, এক একখানি মুদ্রার এক এক প্রকার দাম হইবে। উহাতে মুদ্রার সাধারণ গ্রহণ-যোগ্যতা ব্যাহত হইবে। (৬) **তাড়ণবর্দ্ধনীয়তা** (Malleability) যে সামগ্রীকে আঘাত করিয়া আয়তনে বড় করা যায় তাহাকে 'তাড়ন বর্দ্ধনীয়' বলা হয়। মুদ্রার পক্ষে উপযোগী বলিয়া

নির্ব্বাচিত বস্তুকে তাড়নবর্দ্ধনীয় হইতে হইবে। কারণ, ইহাকে অভিজ্ঞেয়তা দিবার জন্য, বিভাজ্যতা ও আনুগুণ্য দিবার জন্য, গলাইয়া, পিটাইয়া, ছাঁচে ফেলিয়া সমান ওজণ ও আকারের মুদ্রাখণ্ডে পরিণত করিতে হইবে।

(অণু-৬) মুদ্রার প্রকার ভেদ—*Classification of Money*

বিভিন্ন ভিত্তিতে কয়েকটী পর্য্যায়ে মুদ্রার প্রকার ভেদ করা হয়

(১) **ধাতুমুদ্রা** (*Coins*) **ও কাগজী মুদ্রা** (*Paper Money*)—

আকৃতি, গুণ ও ওজনে সমান, প্রত্যেকখানি একটী নিদ্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের সমান, রাষ্ট্রের দ্বারা মোহরাঙ্কিত এবং রাষ্ট্রের দ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত—এইরূপ ধাতুখণ্ডগুলিকে ধাতুমুদ্রা বলা হয়। যথা আমাদের দেশের পয়সা, সিকি, টাকা প্রভৃতি।

আধুনিক সময়ে ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যতীতও আর এক প্রকারের মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, ইহা কাগজ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাকে বলা হয় কাগজী মুদ্রা (Paper Money)। রাষ্ট্র যেমন ধাতুমুদ্রা প্রচার করে তেমনি কাগজী মুদ্রাও প্রচার করিতে পারে; আবার রাষ্ট্র ব্যতীত আর এক প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে যাহার দ্বারা কাগজী মুদ্রা প্রচারিত হয়; উহা হইল ব্যাঙ্ক্ (Bank); তবে সাধারণ ব্যাঙ্ক্ নহে, দেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক্ (Central Bank) নামে যে বিশেষ ব্যাঙ্ক থাকে তাহা। আমাদের দেশে একটাকার 'নোট' প্রচার করে রাষ্ট্র এবং উহার উর্দ্ধমূল্যের (যথা ২৲, ৫৲, ১০৲, ১০০৲ টাকা) নোট প্রচার করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

(২) **আইন চালু মুদ্রা—সসীম ও অসীম**—*Legal Tender Money—Limited and Unlimited.*

কোনো কোনো সামগ্রী আছে যেগুলি সাধারণতঃ বিনিময়ের বাহনরূপে লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয় কিন্তু কেহই তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। এইরূপ সামগ্রীকে অনেক অর্থনীতিবিদ্ "মুদ্রা" আখ্যা দেন কিন্তু সেই সঙ্গেই বলেন যে এই মুদ্রাগুলি আইন-নিরপেক্ষ মুদ্রা (Non-legal Tender Money)। যথা—ব্যাঙ্কের চেক্ (Cheque)।

কিন্তু কোনো কোনো মুদ্রা থাকে যেগুলি একটী রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ তাহাদের সামগ্রীর বিনিময়ে দাম লইবার সময়, গ্রহণ করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের আইন প্রত্যেক নাগরিককে এই মুদ্রা লইতে বাধ্য করে। ইহাকে বলা হয় আইন চালু মুদ্রা (Legal Tender Money)। আমাদের দেশে নোট, টাকা, আধুলি, সিকি, দোয়ানি, আনি ও পয়সা হইল আইন-চালু মুদ্রা।

আইন-চালুমুদ্রা আবার দুই প্রকারের হইতে পারে (ক) সসীম আইন-চালু (Limited legal tender)—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি লইতে বাধ্য কিন্তু কত মূল্যের পরিমাণে লইতে বাধ্য তাহা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে পয়সা, আনি, দুয়ানী, সিকি—এইগুলি হইল সসীম আইন-চালু—ইহাদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ গ্রহণ যোগ্যতা ১৬ আনায় সীমাবদ্ধ। (খ) অসীম আইন-চালু (Unlimited legal tender)—যাহা প্রত্যেকেই যে কোনো পরিমাণে লইতে বাধ্য। একজন লোক তাহার প্রাপ্য দামের কতখানি এই মুদ্রার দ্বারা লইতে বাধ্য তাহার কোনো পরিমাণ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নাই। যথা আমাদের দেশের আধুলি, টাকা, নোট।

(৩) **মান-মুদ্রা** (*Standard Money*) **ও নিদর্শক মুদ্রা** (*Token Money*)

মান মুদ্রা বলিতে সেইরূপ মুদ্রাকে বুঝায় যাহার উপরিভাগে লিখিত মূল্য ও অন্তর্নিহিত মূল্য সমান। অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিলে উহার যে দাম, যে বস্তু দ্বারা উহা নিৰ্ম্মিত সেই বস্তু হিসাবে বিক্রয় করিলেও উহার সেই দাম।

ইহা ব্যতীত মান-মুদ্রার আরো কয়েকটী বৈশিষ্ট্য আছে। সকল ব্যক্তি ও সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব এই মুদ্রার মাধ্যমে রাখে। দেশের মধ্যে অন্যান্য যে সকল মুদ্রা থাকে তাহাদের মূল্য মানমুদ্রার অনুপাতে বিভক্ত করা থাকে—অর্থাৎ অন্যান্য মুদ্রার বিনিময় যোগ্যতা কত তাহা এই মান মুদ্রার হিসাবে নির্দ্ধারিত। যথা আমরা আমাদের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখি টাকার মাধ্যমে আবার আধুলি, সিকি, দুয়ানী, নোট প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে ঐ টাকার হিসাবে। ইহার আর একটী বৈশিষ্ট্য হইল যে যে-ব্যক্তি যত মূল্যেরই দ্রব্য ক্রয় করুক সে ঐ মূল্যের সমস্তটাই এই মুদ্রার সাহায্যে পরিশোধ করিতে পারে। বিক্রেতা এই মুদ্রা যে-কোনো পরিমাণে লইতে বাধ্য। অর্থাৎ মানমুদ্রা অসীম আইন চালু।

অতএব মানমুদ্রা হইল সেই প্রকার মুদ্রা যাহার উপরে লিখিত মূল্য ও অন্তর্নিহিত মূল্য সমান, যাহার মাধ্যমে সকল ব্যক্তি আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে ও যাহার অনুপাতে দেশের অপর সকল মুদ্রার বিনিময় মূল্য ধার্য্য থাকে এবং যাহা অসীম আইন চালু। যথা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে প্রচলিত পাউণ্ড সভরেন।

নিদর্শক মুদ্রা (token money) বলিতে সেইরূপ মুদ্রাকে বুঝায় যাহার নিছক বস্তু হিসাবে যে মূল্য, উহা অপেক্ষা উপরিভাগে লিখিত মূল্য, অর্থাৎ বিনিময় মূল্য, অধিক। ইহাদের মূল্য ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা, নির্ভর করে রাষ্ট্রের

হুকুমের উপরে। রাষ্ট্র এই মুদ্রার উপরে একটী মূল্য লিখিয়া দেন এবং ঘোষণা করেন যে উহার অন্তর্নিহিত মূল্য যাহাই হউক, উপরিভাগে লিখিত মূল্য অনুযায়ীই সকলে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। সেইজন্য নিদর্শক মুদ্রাকে হুকুম-মুদ্রা (fiat-money) বলাও হয়। তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহারা সসীম আইন চালু (limited legal tender)। একটী পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে উহার উপরে কোনো ব্যক্তি তাহার পাওনা নিদর্শক মুদ্রার মাধ্যমে গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। সকল প্রকার কাগজী মুদ্রাই নিদর্শক মুদ্রা; আবার অল্প মূল্যের সামগ্রী বেচা কেনার জন্য মানমুদ্রা অপেক্ষা অল্প মূল্যের যে সকল ধাতু মুদ্রা থাকে (যথা সিকি দুয়ানী প্রভৃতি) সেগুলিও নিদর্শক মুদ্রা।

(অণু ৭) টাকা—মানমুদ্রা না নিদর্শকমুদ্রা? *Rupee—Standard or Token money?*

ইংলণ্ডের যেমন পাউণ্ড, আমেরিকার যেমন ডলার, ফ্রান্সের যেমন ফ্রাঁঙ্ক আমাদের দেশের প্রধান মুদ্রার নাম তেমনি টাকা বা রূপ্যয়া। টাকা একটী বিশেষ ধরণের মুদ্রা। মানমুদ্রার গোটা কয়েক বৈশিষ্ট্য ইহার আছে অথচ ইহা খাঁটি মানমুদ্রা নহে; অপর পক্ষে নিদর্শক মুদ্রার গোটাকয়েক বৈশিষ্ট্য ইহার আছে অথচ ইহা পূরাপূরি নিদর্শক মুদ্রাও নহে।

আমরা টাকার মাধ্যমেই আমাদের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং অপর যে সকল মুদ্রা আছে তাহাদের বিনিময় মূল্য টাকার অনুপাতেই নির্দ্ধারিত হয়। যথা একটী সিকির মূল্য এক টাকার এক চতুর্থাংশ বা একটী পাঁচটাকার নোটের মূল্য এক টাকার পাঁচ গুণ। উপরন্তু টাকা হইল অসীম আইন-চালু। এই পর্য্যন্ত মানমুদ্রার সহিত টাকার সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু টাকার উপরিভাগে লিখিত মূল্য উহার অন্তর্নিহিত মূল্য অপেক্ষা অধিক। একটী টাকা গলাইয়া উহার ধাতুটীকে বিক্রয় করিলে ষোল আনার সমান মূল্য পাওয়া যাইবে না। উহার মূল্য নির্ভর করে রাষ্ট্রের হুকুমের উপরে।

অতএব আমাদের দেশের টাকা বা রূপ্যয়াকে **কৃত্রিম মান-মুদ্রা** (artificial standard money) বলা চলে যদিও অর্থনীতি বিজ্ঞানে এইরূপ কোনো নাম নাই।

(অণু-৮) কাগজী মুদ্রার প্রকার ভেদ—*Classification of paper money*

কাগজী মুদ্রাকে দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা চলে—

(১) **পরিশোধনীয়** (*Convertible*)—যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে যে-কোনো

ব্যক্তি মুদ্রা-প্রচারক কর্তৃপক্ষের নিকট কাগজী মুদ্রা উপস্থাপিত করিলে, কর্তৃপক্ষ তাহাকে ঐ কাগজী মুদ্রার সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু বা ধাতু মুদ্রা প্রদান করিবেন, তাহা হইলে ঐ কাগজী মুদ্রাকে বলা হয় "পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা"।

(২) **অপরিশোধনীয়** (*Inconvertible*)—যখন কোনো কাগজী মুদ্রা ধাতু অথবা ধাতু-মুদ্রাতে পরিবর্ত্তন করা যাইবে না বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়া দেন তখন ঐ কাগজী মুদ্রাকে "অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা" বলে।

(অণু-৯) কাগজী-মুদ্রার গুণাপগুণ—*Merits and Demerits of Paper Money.*

গুণ—(১) উৎকৃষ্ট মুদ্রার যে সকল গুণ থাকা উচিত সেই সকল গুণ অধিকতর পরিমাণে কাগজী মুদ্রার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গ্রহণযোগ্যতা আছে, রাষ্ট্রের হুকুমে ইহা গ্রহণ করিতে জনসাধারণ আরম্ভ করে, পরে ইহা গ্রহণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া যায়। ইহা অনেক সামগ্রী অপেক্ষা স্থায়ী কারণ, ব্যবহার করিতে করিতে একটী নোট বা কাগজীমুদ্রা খারাপ হইয়া গেলে কর্তৃপক্ষ উহার পরিবর্ত্তে একখানি নূতন কাগজী মুদ্রা দিয়া দেন। ইহা ধাতু অপেক্ষা লঘুভার এবং কর্তৃপক্ষ একখানি কাগজী মুদ্রাকে যে কোনো মূল্যের সমান বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। অতএব অল্প পরিমাণের মধ্যেই ইহার অধিক দাম থাকে এবং ধাতুমুদ্রা অপেক্ষা ইহা সহজে বহনযোগ্য। অধিক মূল্যের সামগ্রী কিনিলে, ধাতুমুদ্রা অপেক্ষা কাগজীমুদ্রাতে দাম দেওয়া অনেক বেশী সুবিধাজনক। ইহাদের অভিজ্ঞেয়তা (cognisability) ও আনুগুণ্যও (homogeniety) বর্ত্তমান। ধাতুর পক্ষে যেমন তাড়নবর্দ্ধনীয়তা (malleability) ইহার পক্ষে তেমনি মুদ্রণ-যোগ্যতা (Printable quality) বর্ত্তমান। (২) কাগজীমুদ্রার ব্যবহার অনেক ব্যয়-সঙ্কোচজনক (economical)। মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু সংগ্রহ করা ব্যয় সাপেক্ষ—উহার তুলনায় কাগজের দাম খুবই কম। উপরন্তু ধাতু ব্যবহার করিতে করিতে যে ক্ষয় হয় তাহার মূল্য সমগ্র সমাজের পক্ষে প্রচুর। কাগজীমুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়ের মূল্য খুবই কম। (৩) দেশের মধ্যে উৎপাদন, ভোগকার্য্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি (অর্থাৎ লোকেদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ) যতই বৃদ্ধি পায় ততই বিনিময় কার্য্যের প্রয়োজন হয় বেশী—অর্থাৎ অধিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। কাগজী মুদ্রা থাকিলে প্রয়োজনমত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজ—কারণ স্বর্ণরৌপ্যের মতন কাগজ দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নহে। পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার এই গুণ বহুপরিমাণে আছে—যদিও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে কারণ পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা

ছাড়িলে ধাতু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু অপরিশোধনীয় কাগজী-মুদ্রার এইগুণ সম্পূর্ণ পরিমাণে রহিয়াছে।

অপগুণ—(১) খুব অল্পমূল্যের কাগজীমুদ্রাগুলি ব্যবহার করা বিশেষ অসুবিধাজনক—যথা আমাদের দেশের একটাকার নোট। এইগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের কার্য্যে কতবার যে হাতে হাতে ঘুরে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং খুব শীঘ্রই এইগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলির পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা থাকে রাজধানীতে বা বৃহৎ সহরে। অতএব গ্রামের লোকেদের পক্ষে একখানি দুখানি কম মূল্যের কাগজীমুদ্রা পরিবর্ত্তনের জন্য সহরে যাওয়া সম্ভব হয় না। ইহাতে ক্রয় বিক্রয়ে অসুবিধা ঘটে এবং কোনো কোনো নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) অনেক সময়ে আমাদিগকে বিদেশীদের নিকট হইতে অনেক সামগ্রী কিনিতে হয় এবং উহার জন্য তাহাদিগকে মূল্য প্রদান করিতে হয়। কিন্তু বিদেশীরা আমাদের দেশের কাগজীমুদ্রা গ্রহণ করিবে না; কারণ মুদ্রা হিসাবে উহা তাহাদের দেশে চলিবে না আবার বস্তু হিসাবে উহার কোনোই দাম নাই। ধাতুমুদ্রা হইলে বস্তু হিসাবে উহার দাম থাকিত এবং বিদেশীরা উহা লইত। (৩) কাগজ মুদ্রণ করা অল্পই ব্যয়সাধ্য; অতএব কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পরিমাণ কাগজী মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া ফেলিতে পারেন। লোকেরা মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী ক্রয় করে উহার (অর্থাৎ জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বা ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর) পরিমাণ যদি বৃদ্ধি না পায় অথচ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িয়া যায়। কাগজী মুদ্রা থাকিলে এইরূপ ঘটা খুব সহজ।

পরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রাতে এই অসুবিধাগুলি কম পরিমাণে বিদ্যমান। কারণ উহার পরিবর্ত্তে ধাতুমুদ্রা পাওয়া যায়। অতএব প্রথমতঃ যে অল্প মূল্যের ক্রয়বিক্রয় কার্য্যে কাগজী মুদ্রার ব্যবহার অসুবিধাজনক উহাতে ধাতু মুদ্রা ব্যবহার করা যায়; দ্বিতীয়তঃ বিদেশীদের দাম দিবার সময়ে কাগজী মুদ্রা ধাতুতে পরিবর্ত্তন করিয়া ধাতু প্রদান করা যায়। তৃতীয়তঃ, মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত কাগজীমুদ্রা ছাপাইতে পারেন কিন্তু যত ইচ্ছা তত নহে। কারণ পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রাতে কিছু পরিমাণ ধাতু বা ধাতু মুদ্রা সংরক্ষণ করিতে হয়।

অপরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রার ক্ষেত্রে এই অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ বিদ্যমান।

(অণু-১০) ধাতু মুদ্রাঙ্কন—*Coinage*

ধাতু হইতে মুদ্রা নির্ম্মাণ করাকে ধাতু মুদ্রাঙ্কন (coinage) বলে। মুদ্রা হিসাবে ধাতুর ব্যবহারের প্রথম যুগে টুকরা বা খণ্ড হিসাবে ধাতু ব্যবহৃত

হইত এবং ওজন হিসাবে ইহা চলিত। ইহারা সমগুণ বিশিষ্ট হইত না। ইহাতে অনেক অসুবিধা হইত। অতএব জনস্বার্থের খাতিরে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার ধাতু হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার একচেটিয়া দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র সরকারই ধাতু মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারেন। কাগজী মুদ্রা কেন্দ্রব্যাঙ্ক প্রস্তুত করিতে পারে। সাধারণ কোনো লোক ধাতুমুদ্রা বা কাগজী মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারে না।

(অনু-১১) অবাধ মুদ্রাঙ্কন—*Free Coinage*

ইহার দ্বারা বুঝায় যে কোনো ব্যক্তি ধাতুখণ্ড লইয়া সরকারের টাঁকশালে যাইলে সরকার ঐ ধাতুখণ্ড হইতে তাহাকে সম-মূল্যের ধাতুমুদ্রা তৈয়ারী করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সরকার যদি ইহার জন্য কোনো মজুরী গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ইহাকে বলা হয় "মজুরীরহিত ধাতুমুদ্রাঙ্কণ" (Gratuitous Coinage)। সরকার যদি ধাতুখণ্ডকে মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য কোনো মজুরী গ্রহণ করেন এবং এই মজুরী যদি ঐ কাজটী করিতে যেরূপ খরচা ঠিক তাহার সমান হয়—অর্থাৎ সরকার যদি কোনো লাভ না করেন,—তাহা হইলে এই মজুরীকে বলা হয় "খরচ-মাশুল" (Brassage)। অপর পক্ষে একখণ্ড ধাতুকে সমমূল্যের মুদ্রায় পরিণত করিতে সরকারের যে খরচা হইবে সরকার যদি তাহা অপেক্ষা অধিক মজুরী গ্রহণ করেন অর্থাৎ সরকার যদি লাভ রাখেন, তাহা হইল এই মজুরীকে বলা হয় "মুদ্রা-বানি" (Seigniorage)।

(অনু-১২) মুদ্রামান—*Monetary Standard*

মান মুদ্রা যদি কেবলমাত্র একপ্রকার ধাতু হইতেই নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে উহাকে "এক ধাতুমান" (Monometallism) বলা হয়। ধাতুটী যদি স্বর্ণ হয় তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাকে বলা হয় স্বর্ণমান (Gold Standard); আর ধাতুটী যদি রৌপ্য হয় তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাকে রৌপ্যমান (Silver Standard) বলা হয়।

কখনো কখনো এমন হইতে পারে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য—এই দুই প্রকার ধাতুর দ্বারা দুই প্রকার ধাতুমুদ্রা নির্ম্মিত হয়। দুই প্রকার মুদ্রাই দেশের মান-মুদ্রা বলিয়া বিবেচিত। দুই প্রকার মুদ্রার মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পর্ক (ratio) থাকে; অর্থাৎ কয়টী রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রার সমান তাহা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকে "দ্বিধাতুমান" (Bimetallism) বলা হয়।

(অণু-১৩) "নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করে" (গ্রেশামের নিয়ম)—*"Bad money drives out good"* (*Gresham's Law*)

একটী দেশে যদি দুই প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত থাকে—যাহাদের এক প্রকারকে বলা যায় উৎকৃষ্ট মুদ্রা (good money) এবং আর এক প্রকারকে বলা যায় নিকৃষ্ট মুদ্রা (bad money) তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যাইবে যে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং কেবলমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই লেনদেনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। যেন বোধহয় নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলি উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলিকে প্রচলন হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। অধ্যাপক যাইডের ভাষায়, যেখানে দুই প্রকারের আইন সঙ্গত মুদ্রা প্রচলিত আছে এইরূপ প্রত্যেক দেশে, নিকৃষ্ট মুদ্রা সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করে ["In every country where two kinds of legal money are in circulation bad money always drives out good"—GIDE] এই বিষয়টী গ্রেশামের নিয়ম নামে অভিহিত।

এ সম্পর্কে আমাদের আলোচ্য বিষয় দুইটী, প্রথমতঃ কি ধরণের মুদ্রা নিকৃষ্ট এবং কি ধরণের মুদ্রা উৎকৃষ্ট হিসাবে গণ্য, দ্বিতীয়তঃ কি উপায়ে উৎকৃষ্ট মুদ্রা অন্তর্হিত হয় এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা থাকিয়া যায়।

উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভেদ (১) একই ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দুইটী সম মূল্যের মুদ্রার মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট ও আরেকটী নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। একটী ধাতুমুদ্রা যদি নূতন হয় এবং কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া যদি ওজনে সমান থাকে তাহা হইলে উহা উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং উহার সমমূল্যের যে মুদ্রাটী পুরাতন এবং ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ওজনে হালকা হইয়া গিয়াছে উহা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। (২) দুইটী সমমূল্যের কাগজীমুদ্রার মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট ও একটী নিকৃষ্ট মুদ্রা হইতে পারে। যে কাগজীমুদ্রাটী সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে এবং কোনরূপ অপরিষ্কার বা বিকৃত হয় নাই উহা উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং যে কাগজী মুদ্রাটী বহুবার ব্যবহৃত হইবার দরুণ অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার ও বিকৃত হইয়াছে উহা নিকৃষ্ট মুদ্রা। (৩) একটী কাগজী মুদ্রা ও একটী ধাতু মুদ্রার মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট পার্থক্য করা যাইতে পারে। কাগজী মুদ্রা অতিরিক্ত পরিমাণে মুদ্রিত করিলে সকল বস্তুর দাম বাড়িয়া যায়। ধাতুর দামও বাড়িয়া যায় কারণ ধাতুও একটী বস্তু। ধাতুর দাম বাড়িলে ধাতু মুদ্রারও দাম বাড়িবে অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার অনুপাতে ধাতু মুদ্রার দাম বাড়িয়া যাইবে। যথা—ধরা যাউক এক তোলা স্বর্ণের দাম ৩০৲ টাকা : তাহা হইলে এক তোলা স্বর্ণে নির্ম্মিত

একখানি স্বর্ণ মুদ্রা ৩খানি দশ টাকার নোটের (অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার) বিনিময়ে পাওয়া যাইবে। ধরা যাউক এক তোলা স্বর্ণের দাম বাড়িয়া ১০০৲ টাকা হইল। এক্ষেত্রে একতোলা স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত একখানি মুদ্রা কয়খানি দশ টাকার নোটের বিনিময়ে পাওয়া যাইবে? উহা এখন পাইতে হইলে দশখানি দশটাকার নোটের প্রয়োজন। একই স্বর্ণমুদ্রা পূর্ব্বে ৩খানি কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া যাইত এখন উহার জন্য দশখানি কাগজীমুদ্রা দিতে হইবে। এক্ষেত্রে যে মুদ্রাটীর দাম অপরটীর অনুপাতে বাড়িল (স্বর্ণমুদ্রাটী) তাহা উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং অপর মুদ্রাটী, অর্থাৎ মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত কাগজী মুদ্রাটী (Depreciated Paper Money) নিকৃষ্ট মুদ্রা।

উৎকৃষ্ট মুদ্রা অন্তর্হিত হইবার পদ্ধতি (১) গলাইয়া বিক্রয়ের দ্বারা— উৎকৃষ্ট ধাতু মুদ্রা গলাইয়া ধাতু হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হইবে, কারণ উহা হইতে অধিক দাম পাওয়া যাইবে। (২) বিদেশীদের দাম পরিশোধের দ্বারা বা রপ্তানীর দ্বারা—বিদেশীদের নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিলে তাহাদিগকে যে দাম দিতে হইবে তাহা কাগজী মুদ্রার দ্বারা দেওয়া চলিবে না, কারণ একদেশের কাগজী মুদ্রার অন্য দেশে কোনোই দাম নাই। অতএব ঐ মূল্য প্রদান করা চলিবে ধাতুমুদ্রা দিয়া। কিন্তু ধাতুমুদ্রা বিদেশীদের দ্বারা মুদ্রা হিসাবে গৃহীত হইবে না, নিছক ধাতু হিসাবে গৃহীত হইবে। কারণ কাগজীমুদ্রা যেমন বিদেশে চলিবে না তেমনি ধাতুমুদ্রাও বিদেশে চলিবে না। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি তাহাদিগকে দিলে অধিক পরিমাণ ধাতু দেওয়া হইল, অর্থাৎ নিকৃষ্ট মুদ্রার তুলনায় কম সংখ্যক উৎকৃষ্ট মুদ্রাতেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দাম দিয়া দেওয়া হইবে; কারণ, নিকৃষ্ট মুদ্রা ওজনে হালকা। (৩) সঞ্চয়ের দ্বারা—যাহারা মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চাহে তাহারা উৎকৃষ্ট মুদ্রা সঞ্চয় করিবে নিকৃষ্ট মুদ্রা সঞ্চয় করিবে না। বরং নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলি প্রত্যেকেই যত তাড়াতাড়ি পারে অপরের নিকট চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে।

গ্রেশামের নিয়ম সকল সময়েই ক্রিয়া করিতে পারে না। দুই অবস্থার মধ্যে গ্রেশাম নিয়ম অচল হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ দোকানদার ও পাওনাদারগণ

* সার টমাস গ্রেশাম ছিলেন রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং লণ্ডনের অধুনা বিখ্যাত রয়্যাল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। এলিজাবেথের পিতা অষ্টম হেনরীর আমলে ইংলণ্ডের ধাতু মুদ্রাগুলি নানা কারণে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ ধাতুমুদ্রার প্রচলন উদীয়মান জাতির পক্ষে শ্লাঘাজনক মনে করিয়া এলিজাবেথ ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ নূতন মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া বাজারে প্রচলিত করিবার জন্য ছাড়িলেন কিন্তু বারবার তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন নূতন মুদ্রাগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে—পূর্ব্বেকার সেই পুরাতন মুদ্রাগুলিই প্রচলিত রহিয়াছে। তখন তাঁহারা

যদি নিকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে যাহারা উৎকৃষ্ট মুদ্রা অন্য কাজে লাগাইবার জন্য রাখিয়া দিয়াছে, বাধ্য হইয়া তাহারা উহা বাহির করিয়া দিবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে মোট যত পরিমাণ মুদ্রা প্রয়োজন, শুধু নিকৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ যদি তাহা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট মুদ্রারও প্রচলন থাকিতে বাধ্য।

(অণু-১৪) মুদ্রা-ব্যবহারের দ্বারা সমাজের উপকারিতা—*Benefits to Society from the Use of Money*

সমাজের উপকারিতার অর্থ সমাজে বসবাসকারী অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপে নিযুক্ত লোকেদের উপকারিতা। এইরূপ লোকদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) ভোগকারী (২) সঞ্চয়কারী ও (৩) উৎপাদনকারী।

(১) **ভোগকারীদের পক্ষে উপকারিতা**—প্রত্যেক ব্যক্তিই চাহে যে তাহার উপার্জ্জনের দ্বারা ঠিক যে সামগ্রী যে পরিমাণে তাহার প্রয়োজন ঠিক সেই সামগ্রী সেই পরিমাণেই সে কিনিবে। মুদ্রার ব্যবস্থা না থাকিলে জনসাধারণ তাহাদের মজুরী পাইত সামগ্রীর দ্বারা—কিন্তু সকল সামগ্রীর পক্ষে ব্যক্তিগত পছন্দ এক নহে। কেহ হয়তো একটী সামগ্রী বেশী করিয়া চাহে কিন্তু তাহা সে পাইল না; কেহ হয়তো একটী সামগ্রী যে পবিমাণে তাহাকে দেওয়া হইল সে পরিমাণে চাহে না, কিন্তু বাধ্য হইয়া লইতে হইল। অতএব একজন ব্যক্তি ভোগকারী হিসাবে তাহার উপার্জ্জন ব্যবহারের দ্বারা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি* (maximum satisfaction) পায় না। মুদ্রা এই অসুবিধা দূর করে। প্রত্যেকেই তাহার উপার্জ্জিত মুদ্রা ব্যয় করিয়া যতখানি তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব ততখানি তৃপ্তি পাইতে পারে। রবার্টসনের ভাষায় "মুদ্রার দ্বারা একজন লোক ভোগকারী হিসাবে তাহার ক্রয়ক্ষমতাকে সাধারণ রূপ দিতে সক্ষম হয়।"† ["It enables man as consumer to generalise his purchasing power"]

টমাশ গ্রেশামের পরামর্শ চাহিলেন। গ্রেশাম এই সম্পর্কে এলিজাবেথকে যে বিবরণী প্রদান করেন তাহাতে তিনি আমাদের আলোচ্য এই নিয়মটী ব্যাখ্যা করেন। সেইজন্য এই নিয়মটী তাঁহার নামেই প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে এই নিয়মটী গ্রেশামের বহু পূর্ব্বেও অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু গ্রেশাম তাঁহার প্রদত্ত বিবরণীতে এই বিষয়টী বিশ্লেষণ করিয়া খুব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন।

* ৪১......পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ROBERTSON, Money, p. 4.

(২) **সঞ্চয়কারীদের পক্ষে উপকারিতা**—সাধারণ সামগ্রী সঞ্চয় করিলে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইত না,—নষ্ট হইয়া যাইত। ইহাতে সঞ্চয় করা সম্ভব হইত না এবং লোকেও সঞ্চয় করিতে প্রণোদিত হইত না। মুদ্রা দীর্ঘকাল স্থায়ী। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অল্পকাল স্থায়ী সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিয়া মুদ্রায় পরিণত করিতে পারে এবং উহার দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে।

(৩) **উৎপাদনকারীদের পক্ষে উপকারিতা**—মুদ্রা ব্যবহারের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদনকার্য্যে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। (ক) উৎপাদনকার্য্যে পুঁজি একটী অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান। পুঁজি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপরে। মুদ্রার ব্যবহারের দ্বারা অধিক পরিমাণ সঞ্চয় সম্ভব হয়। (খ) উৎপাদনকারী অপরের সঞ্চিত পুঁজি ঋণ করিয়া উৎপাদন কার্য্যে প্রয়োগ করে—উহার জন্য পুঁজির মালিককে সুদ প্রদান করে এবং পরে আসল পরিশোধ করে। এই কর্জ্জের লেন দেন করা মুদ্রা-ব্যবহারের দ্বারা খুব সুবিধাজনক হয়। (গ) উৎপাদনকারী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অপর সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিতে কোনো অসুবিধা বোধ করে না, কারণ ঐ সকল সামগ্রী মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া যায়; অপর পক্ষে মুদ্রার দ্বারা শ্রমিকদিগকে মজুরী প্রদান করা উৎপাদনকারীর পক্ষে সহজ হয়। (ঘ) উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিতে কোনো অসুবিধা হয় না, অবশ্য ঐ সামগ্রীর যদি চাহিদা থাকে। মুদ্রা-ব্যবস্থা না থাকিলে সামগ্রী বিক্রয় করিতে উৎপাদনকারীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। ঠিক সময়ে সামগ্রী বিনিময় না করিলে কোনো কোনো সামগ্রী নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকিত। মোট কথা মুদ্রা ব্যবস্থা থাকার দরুণ উৎপাদনকারীর অনেক মেহনৎ ও ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এবং সে প্রকৃত উৎপাদনের কার্য্যে সকল মনোযোগ প্রয়োগ করিতে পারে। রবার্টসনের ভাষায়, "ইহার দ্বারা একজন লোক উৎপাদনকারীরূপে তাহার সমগ্র মনোযোগ নিজ-কার্য্যে একাগ্রভাবে প্রয়োগ করিতে পারে।"* ["It enables man as producer to concentrate his attention on his own job."

উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ, সঞ্চয়—এবং সেই সঞ্চয় উৎপাদনে প্রয়োগ—ইহাই সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চক্র। এই চক্র চালনায় মুদ্রা প্রভূত বেগ (speed) দান করিয়াছে—ঐ সকল কার্য্য মুদ্রার মাধ্যমে সম্পন্ন

* ROBERTSON Money, p. 6.

হয় বলিয়া ঐগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। অতএব মার্শাল যখন বলেন, "মুদ্রাকে কেন্দ্র করিয়াই অর্থনীতিবিজ্ঞান অবস্থিত"† তখন তাঁহার কথার তাৎপর্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

Questions & Hints

1. Discuss the difficulties and inconveniences attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcomed by the introduction of money. (1934). [অণুচ্ছেদ-২]

2. Define Money. [অণুচ্ছেদ-৩]

3. Describe the functions of money. How is production facilitated by the use of money ? (1941)

[অণুচ্ছেদ-৪ এবং ১৪নং অণুচ্ছেদের শেষাংশ, (উৎপাদনকারীদের পক্ষে উপকারিতা)।]

4. What are the characteristics and qualities to be looked for in the commodity selected as money ? Explain why precious metals came to be chosen as money. (1938) [অণুচ্ছেদ-৫]

5. Distinguish between standard money and token money. Illustrate your answer with examples (1937) [৬নং অণুচ্ছেদের (৩) নিদর্শক ও মানমুদ্রা,] Illustrate your answer with reference to the Indian Rupee (1928) [অণুচ্ছেদ-৭]

6. Discuss the merits and demerits of Paper Money. (1943) [অণুচ্ছেদ ৯]

7. Describe the disadvantages of the issue of inconvertible paper currency (1936). [এই প্রশ্নের উত্তর হুবহু 'উপরের প্রশ্নটীর অর্থাৎ ৬নং প্রশ্নটীর উত্তরের সমান হইবে' না। প্রথমতঃ ইহাতে কেবল disadvantages চাওয়া হইয়াছে, অতএব ৯নং অণুচ্ছেদের শুধু অপগুণ লিখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই অপগুণ লিখিবার সময়ে convertible paper money-র অসুবিধা একটু কম, এইরূপ কোনো ইঙ্গিত দিবার প্রয়োজন হইবে না।]

8. Bad money always drives good money out of circulation. Name and explain the law. How does the good money disappear ? (1933) *or*, "Bad money drives out good" Amplify the statement (1939) *or* State and explain Gresham's law (1937) [অণুচ্ছেদ-১৩]

9. What benefits have been conferred upon society by the use of money ? [অণুচ্ছেদ-১৪]

† "Money is the centre round which economic science clusters"—MARSHALL.

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুদ্রামূল্য ও দাম-স্তর

Value of Money and Price-level

(অণু-১) **মুদ্রা-মূল্যের অর্থ**—*Meaning of Value of Money.*

মুদ্রা-মূল্যের অর্থ হইল মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা। একটী মুদ্রার দ্বারা অন্যান্য সামগ্রী যত পরিমাণে ক্রয় করা যায় তাহাই হইল মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা। এখানে মুদ্রা বলিতে বুঝায় দেশের মান মুদ্রাকে (Standard Money)। একটী মাত্র মুদ্রার বিনিময়ে অন্যান্য সকল সামগ্রী যে পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহাই হইল মুদ্রা-মূল্য। রবার্টসন বলেন, "রুটী বা বস্ত্র, এইরূপ অন্য যে কোনো জিনিষেরই মূল্য বলিতে যাহা বুঝি, মুদ্রার মূল্য বলিতেও ঠিক তাহার অনুরূপ কিছুই বুঝি,—অর্থাৎ এক মাত্রা মুদ্রার বিনিময়ে যে সাধারণ সামগ্রীগুলি দেওয়া হইবে।"

["By the value of Money we mean something exactly analogous to what we mean by the value of anything else, say bread or cloth : that is to say, we mean the amount of things in general which will be given in exchange for a unit of money." ROBERTSON-Money.]

(অণু-২) **"মুদ্রা-মূল্য" পরিবর্ত্তন**—*Changes in the "Value of Money".*

মুদ্রার মূল্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে—অর্থাৎ কখনও বাড়িতে পারে আবার কখনও কমিতে পারে।

কখনও দেখিতে পাওয়া যায় একটী মুদ্রার দ্বারা অধিক পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে পারা যাইতেছে আবার কখনও হয়তো দেখা যায় একটী মুদ্রার বিনিময়ে অল্প পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে পারা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক টাকায় দশ সের চাউল কিনিতে পারা যাইত এখন এক টাকায় হয়তো দুই সের মাত্র চাউল কিনিতে পাওয়া যায়।

একটী মুদ্রার দ্বারা যখন বেশী পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে পারা যায়, তখন বলা হয় মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয়—Appreciation of Money, অর্থাৎ **মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি**। অপর পক্ষে একটী মুদ্রার বিনিময়ে যখন কম পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে পারা যায়, তখন বলা হয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় "Depreciation of Money"—অর্থাৎ **মুদ্রামূল্য হ্রাস**।

(অণু-৩) **মুদ্রা-মূল্য ও দাম-স্তর**—*Value of Money and Price level.*

মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে জিনিষপত্রের দামের উপরে। মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে জিনিষের দাম কমিয়াছে; কারণ মুদ্রামূল্যবৃদ্ধির অর্থ হইল যে একটী মুদ্রা অধিক পরিমাণে জিনিষ ক্রয় করিতে পারে; জিনিষের দাম কমিলে তবেই একটী মুদ্রা অধিক পরিমাণে সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে। অতএব মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি = সামগ্রীর দাম হ্রাস।

অপর পক্ষে মুদ্রার মূল্য কমিয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছে। কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাসের অর্থ হইল যে একটী মুদ্রা কম পরিমাণে জিনিষ ক্রয় করিবে। অতএব মুদ্রামূল্যহ্রাস = সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি।

কিন্তু একটী দুইটী সামগ্রীর দাম বাড়িলে বা কমিলে, মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি হইল কি হ্রাস হইল তাহা বলা যায় না। কারণ মুদ্রাতো একটী দুইটী সামগ্রীর ক্রয়ে ব্যবহৃত হয় না। আমাদের ব্যবহার্য্য সকল সামগ্রীই মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়। অতএব সকল সামগ্রীর দাম কমিলে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি হইল বলা চলে এবং সকল সামগ্রীর দাম বাড়িলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইল বলা চলে।

কিন্তু সকল সামগ্রীর দাম একই পরিমাণে বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে—কোনো সামগ্রীর দাম বেশী বাড়িল, কোনো সামগ্রীর দাম ততটা বেশী বাড়িল না। অপর পক্ষে সকল সামগ্রীর দাম একই পরিমাণে হ্রাস নাও পাইতে পারে; কোনো সামগ্রী অত্যধিক হ্রাস পাইল কোনো সামগ্রী ততটা হ্রাস পাইল না। সেই জন্য আমরা মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় যোগ্য সাধারণ সামগ্রীগুলির গড়পড়তা দাম বাহির করি। অর্থাৎ প্রত্যেক সামগ্রীর দাম যোগ করিয়া সামগ্রীগুলির সংখ্যা দিয়া ভাগ করি। এই ভাগফল হইল দামস্তর (Price-level)। যথা ধরা যাউক আমরা সাধারণ পাঁচটী সামগ্রী মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করি। ঐ সামগ্রীগুলি এবং উহাদের প্রত্যেকের দাম

এইরূপঃ চাউল মণ ২০৲ টাকা, তৈল মণ ৭৫৲ টাকা, ডাইল মণ ১৫৲ টাকা, বস্ত্র জোড়া ১৬৲ টাকা, চিনি মণ ৩৪৲ টাকা। এক্ষেত্রে ৫টী জিনিষের মোট দাম ১৬০৲ টাকা। এক একটী সামগ্রীর গড়পড়তা দাম (average price হইল $\left(\frac{১৬০৲}{৫} = ৩২৲ \text{ টাকা।}\right)$ এই গড়পড়তা দামকে বলা হয় "দামস্তর" (Price level)।

এই দাম স্তরের যখন পরিবর্ত্তন হইবে তখনই মুদ্রার মূল্যের পরিবর্ত্তন হইবে বলা যাইবে। তবে মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন বিপরীতমুখী। একটি বাড়িল মানেই অপরটী কমিল এবং একটী কমিল মানেই অপরটী বাড়িল।

উপরে বলা হইয়াছে, মুদ্রামূল্যবৃদ্ধি = সামগ্রীর দামহ্রাস এবং মুদ্রামূল্যহ্রাস = সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি। ইহার প্রকৃত অর্থ হইল, এবং সঠিক ভাবে বলিলে এইভাবে বলিতে হইবে যে,

মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি = দামস্তরের হ্রাস। মুদ্রামূল্য হ্রাস = দাম স্তরের বৃদ্ধি।

(অণু-৪) মুদ্রামূল্য পরিবর্ত্তনের ফলাফল—*Effects of changes in the Value of Money*

মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা অথবা উহার হ্রাসের দ্বারা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফলাফল ঘটে। মুদ্রামূল্য পরিবর্ত্তনের এই অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি পর্য্যালোচনা প্রয়োজন।

(১) **মুদ্রামূল্য হ্রাসের (দামস্তরবৃদ্ধির) ফলাফল**—সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। অতএব ইহার দ্বারা আঁত্রেপ্রনা ও ব্যবসায়ীরা লাভবান হন।

সামগ্রী উৎপাদন করিয়া অধিক মুনাফা হয় বলিয়া আঁত্রেপ্রনাগণ অর্থাৎ উৎপাদনকারীগণ অধিক পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন। অধিক পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল, পুঁজি ও শ্রম প্রয়োজন হয়। অতএব যাহারা কাঁচামাল বিক্রয় করে ও যাহারা পুঁজি সরবরাহ করিতে পারে তাহারা উহার দরুণ বেশী দাম পায়। অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন। অতএব জনসাধারণের চাকুরীর সংস্থান হয়।

যে সকল ব্যক্তি স্বাধীন পেশাজীবী যথা উকিল, ঠিকাদার—ইহাদের আয়ও বৃদ্ধি হয়। কারণ লোকে বেশী করিয়া চাকুরী পায় বলিয়া এবং কৃষিজাত সামগ্রীর

দাম বৃদ্ধি পায় বলিয়া জনসাধারণের হাতে পয়সা থাকে বেশী এবং তাহারা ইহাদের কার্য্য অধিক করিয়া ক্রয় করে।

দেনাদারগণ উপকৃত হয় কারণ তাহারা সম পরিমাণ মুদ্রা পরিশোধ করিলেও, সামগ্রীর হিসাবে কম পরিমাণ সামগ্রীর দ্বারাই সম পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। যথা, একজন ব্যবসাদার ১০০৲ টাকা ধার করিয়া কলম উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করিয়াছিল। সেই সময়ে প্রতি কলমের দাম ছিল ৫৲ টাকা। কলম উৎপাদন করিয়া ঐগুলির মধ্যে গোটাকয়েক কলম বিক্রয় করিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করা হইবে বলিয়া ব্যবসাদার স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কলমের দাম যদি ৫৲ টাকাতেই থাকিত তাহা হইলে ঐ ব্যবসাদারকে ২০টী কলম বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে হইত। কিন্তু ধরা যাক মুদ্রামূল্য হ্রাস হইয়া—অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি হইয়া প্রতিটী কলমের দাম ২০৲ টাকায় দাঁড়াইল। তখন মাত্র ৫টী কলম বিক্রয় করিয়া ব্যবসাদার তাহার দেনা পরিশোধ করিতে পারিবে।

তবে যে সকল ব্যক্তির উপার্জ্জন একেবারে নির্দ্দিষ্ট যাহারা মাস-মাহিয়ানা পায়, যাহাদের উপার্জ্জন বৃদ্ধি হয় না বা হইলেও খুব কম পরিমাণে, তাহারা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির দরুণ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যথা শিক্ষক, কেরানী ইত্যাদি।

(২) **মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির (দামস্তর হ্রাসের) ফলাফল**—যে সকল ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ মাস মাহিয়ানা, যথা শিক্ষক, কেরানী প্রভৃতি—ইহারা সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে লাভবান হন; কারণ একই পরিমাণ মুদ্রার সাহায্যে তাঁহারা অধিক পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে পারেন অথচ তাঁহাদের আয়ও কমিয়া যায় না।

দেনাদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ সামগ্রীর দাম কমিয়া যাইবার দরুণ, একই পরিমাণ মুদ্রা পরিশোধ করিলেও সামগ্রীর অনুপাতে বেশী পরিমাণ মূল্য তাহারা দেয়; কিন্তু পাওনাদারগণ লাভবান হয় কারণ একই পরিমাণ মুদ্রা পাইলেও সামগ্রীর অনুপাতে বেশী পরিমাণ মূল্য তাহারা পায়।

জিনিষের মূল্য কমিলে উৎপাদনকারীদের লাভ কমিয়া যায় এবং সময়ে সময়ে কিছুমাত্র লাভ থাকে না। তখন তাহারা সামগ্রীর উৎপাদন কমাইয়া দেয়। সামগ্রীর উৎপাদন কমাইয়া দিলে কাঁচামাল, শ্রমিক, পুঁজি ইত্যাদির চাহিদা কমিয়া যায়। কৃষকরা কৃষিজাত সামগ্রী, যেগুলি শিল্পের কাঁচামাল, বিক্রয় করিতে পারে না; বহু শ্রমিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। যে সকল শ্রমিককে চাকুরীতে বাহাল রাখা হয় তাহাদের মজুরীর হার কমাইয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে জনসাধারণের উপার্জ্জন কমিয়া যায়। উপার্জ্জন কমিয়া গেলে ব্যয় করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। সেইজন্য উকিল, ডাক্তার, ঠিকাদার প্রভৃতি স্বাধীন পেশাজীবী ব্যক্তিদেরও আয় কমিয়া যায়, কারণ ইহাদের কাজ ক্রয় করিবার মত ক্ষমতা জনসাধারণের থাকে না।

(অণু-৫) মুদ্রা মূল্য কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয়—*How Value of Money is determined.*

যে কোনো সাধারণ সামগ্রীর মূল্য যে রকম উহার যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে, মুদ্রার মূল্যও সেইরূপ উহার যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের দ্বারা উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। মুদ্রার যোগান যদি উহার চাহিদা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাইবে। মুদ্রার যোগান যদি উহার চাহিদা অপেক্ষা অল্প হয়, তাহা হইলে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মুদ্রার চাহিদা এবং যোগান বলিতে কি বুঝায় এবং কিসের উপর উহারা নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মুদ্রার চাহিদা—সাধারণ সামগ্রীর ন্যায় মুদ্রা সরাসরি ভোগ করা সম্ভব নহে বটে কিন্তু মুদ্রার মাধ্যমেই আমরা অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করি। মুদ্রার কাজ হইল সামগ্রী সমূহকে বিনিময় করিয়া দেওয়া—ইহার জন্যই মুদ্রার চাহিদা। আমরা যদি সামগ্রী-বিনিময় (Barter) ব্যবস্থা রাখিতাম তাহা হইলে মুদ্রার কোনোই চাহিদা থাকিত না, কারণ কোনো বিনিময় কার্য্যের জন্যই উহার প্রয়োজন হইত না। অথবা যদি অধিকাংশ সামগ্রী সরাসরি বিনিময় করা হইত (অর্থাৎ অধিকাংশ সামগ্রীর ক্ষেত্রে "বার্টার" ব্যবস্থা থাকিত) এবং অল্প কয়েকটি সামগ্রী মুদ্রার দ্বারা বিনিময় করিতাম, তাহা হইলে বলা যাইত মুদ্রার চাহিদা আছে কিন্তু উহা অল্প। যত অধিক সংখ্যক সামগ্রী মুদ্রার দ্বারা বিনিময় করা হইবে মুদ্রার চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব মুদ্রার চাহিদা বলিতে বুঝায়, মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় করা হইবে, এইরূপ সামগ্রীর সংখ্যা বা পরিমাণ।

'মুদ্রার চাহিদা সমান আছে' বলিতে বুঝায় মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়-সাপেক্ষ সামগ্রীর সংখ্যা সমানই আছে; 'মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়াছে' বলিতে বুঝায়,—মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়-সাপেক্ষ সামগ্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। অপরপক্ষে 'মুদ্রার চাহিদা কমিয়াছে' বলিতে বুঝায় ঠিক উহার বিপরীত।

অতএব মুদ্রার চাহিদা=মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়-সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ।

মুদ্রার যোগান—যে কোনো ব্যক্তি মুদ্রা তৈয়ারী করিতে পারে না; মুদ্রা তৈয়ারী করিতে পারেন কেবলমাত্র রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)। রাষ্ট্র মান-মুদ্রা ও অন্যান্য ধাতু মুদ্রা নির্মাণ করেন এবং কাগজী মুদ্রা তৈয়ারী করেন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, অবশ্য এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর রাষ্ট্রের অল্প বিস্তর নিয়ন্ত্রণ থাকিতে পারে। অতএব রাষ্ট্রের দ্বারা এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা যত মুদ্রা তৈয়ারী ও প্রচারিত হয় সবগুলিকে একত্রিত ভাবে 'মুদ্রার মোট পরিমাণ' বলা হইবে।

মুদ্রার যোগান মুদ্রার মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে; কিন্তু উহা ভিন্ন আর একটী বিষয়ের উপরেও মুদ্রার যোগান নির্ভব করে। উহার নাম মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation)। মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা বলিতে বুঝায়—এক একটী মুদ্রা গড়ে কতবার বিনিময় কার্য্য করিতেছে—তাহা। একটী মুদ্রা হয়তো মাত্র একবার হাত-বদল করিল—অর্থাৎ বিনিময়কার্য্য সম্পন্ন করিল, আর একটী মুদ্রা হয়তো পাঁচ বার হাত বদল করিল—অর্থাৎ পাঁচবার বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিল। এক্ষেত্রে দুইটি মুদ্রা মোট ছয় বার—অর্থাৎ প্রতিটী মুদ্রা গড়ে তিনবার—বিনিময় কার্য্য করিয়াছে। সংখ্যার দিক হইতে যদিও দুইটী মুদ্রা—তবুও কাজের দিক হইতে (এবং এই বিনিময় কাজের জন্যই মুদ্রার প্রয়োজন) ছয়টী মুদ্রা আছে বলা চলে; কারণ প্রতিটী মুদ্রা গড়ে তিনবার বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

অতএব মুদ্রার যোগান বলিতে বুঝায় (১) রাষ্ট্রের দ্বারা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রস্তুত এবং প্রচারিত মুদ্রার সংখ্যা এবং (২) প্রতিটী মুদ্রার গড় হাতবদল। এই গড় হাতবদলকে বলা হয় মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation)। একটী দেশে রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত মুদ্রার সংখ্যা যদি হয় ৫০ কোটী এবং এক একটি মুদ্রার গড় হাতবদল যদি হয় চারিবার—তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে ঐ দেশের মুদ্রার যোগান হইল (৫০ × ৪) = ২০০ কোটী।

অতএব, মুদ্রার যোগান=মুদ্রার সংখ্যা × প্রচলন ক্ষিপ্রতা।

এক্ষণে মোট মুদ্রার যোগানকে মুদ্রার চাহিদা দ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে উহা হইল এক একটী সামগ্রীর গড়পড়তা দাম—অর্থাৎ দামস্তর (Price Level)। দামস্তর পাওয়া যাইলেই মুদ্রার মূল্য পাওয়া গেল—কারণ দামস্তর দিয়াই মুদ্রার মূল্য বিচার করা হয়। দামস্তর যদি কম হয় তবে মুদ্রা-মূল্য বেশী বলা হইবে—দামস্তর যদি বেশী হয় মুদ্রা-মূল্য অল্প বলা হইবে। যথা, মুদ্রার সংখ্যা হয়তো ২০০ কোটী

এবং বিনিময়যোগ্য-সামগ্রীর সংখ্যা (মুদ্রার চাহিদা) হয়তো ১০০ কোটী ; এক্ষেত্রে ২০০ কোটী মুদ্রা ১০০ কোটী সামগ্রীর বিনিময় করিবে—অর্থাৎ গড়ে দুইটী মুদ্রা একটী সামগ্রীর জন্য বিনিময় হইবে। অতএব দামস্তর হইল ২৲ টাকা।

মুদ্রামূল্যের (অর্থাৎ দামস্তরের) তারতম্য (Variation) ঘটিতে পারে—মুদ্রামূল্য বাড়িতে পারে অথবা কমিতে পারে। মুদ্রার যোগান যদি চাহিদা অপেক্ষা বেশী হয়—অর্থাৎ মুদ্রার সংখ্যা এবং প্রচলন ক্ষিপ্রতা যদি বাড়িয়া যায় কিন্তু বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর সংখ্যা যদি সমানই থাকে—তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ মুদ্রামূল্য কমিবে। যথা উপরোক্ত দৃষ্টান্তে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর সংখ্যা যদি ১০০ কোটীই থাকে কিন্তু মুদ্রার যোগান (সংখ্যা × প্রচলন ক্ষিপ্রতা) ২০০ কোটী হইতে ৩০০ কোটীতে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দামস্তর ২৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৲ টাকা হইবে।

অপর পক্ষে মুদ্রার যোগান যদি সমান থাকে কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ বিনিময়সাপেক্ষ সামগ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়,—তাহা হইলে একই পরিমাণ মুদ্রা অধিক পরিমাণে সামগ্রীর বিনিময়ে প্রয়োগ হইবে। এক্ষেত্রে দামস্তর হ্রাস পাইবে। যথা—মুদ্রার যোগান যদি ২০০ কোটীই থাকে কিন্তু বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর সংখ্যা যদি ১০০ কোটী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ কোটীতে দাঁড়ায়—তাহা হইলে দামস্তর ২৲ টাকা হইতে নামিয়া ১৲ টাকায় দাঁড়াইবে। এইভাবে হয় মুদ্রার যোগানের পরিবর্ত্তনের দ্বারা অথবা বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিবর্ত্তনের দ্বারা দামস্তর (Price level or General prices) উঠা নামা করিতে পারে।

(অনু ৬) মুদ্রার পরিমাণ বাদ—*Quantity Theory of Money*

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ্ মুদ্রামূল্য নিরূপণের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করিতে মুদ্রার যোগানের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "অন্যান্য বিষয়গুলি সমান থাকিলে, প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইলেই উহার দ্বারা ঠিক উহার অনুপাতে সরাসরিভাবে দাম-সমূহের পরিবর্ত্তন হয়।" [Every change in the quantity of money in circulation produces, other things being equal, a directly proportional change in prices"] এস্থলে দাম-সমূহের (Prices) দ্বারা দামস্তরকেই বুঝায়। এই মতবাদের নাম মুদ্রার পরিমাণ বাদ (Quantity Theory of Money)। এই মতবাদ অনুযায়ী, সামগ্রী বিনিময়ের জন্য যে পরিমাণ মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহার পরিবর্ত্তনের দ্বারা ঠিক প্রত্যক্ষভাবে এবং সমান অনুপাতে দামস্তর পরিবর্ত্তন হইবে। কোন এক সময়ে মুদ্রার

পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে দামস্তর দ্বিগুণ হইবে—মুদ্রার পরিমাণ যদি তিনগুণ হয়, তাহা হইলে দামস্তর তিনগুণ হইবে; অপর পক্ষে মুদ্রার পরিমাণ যদি কমিয়া অর্দ্ধেক হয় দামস্তর অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে, মুদ্রার পরিমাণ যদি কমিয়া পূর্ব্বের এক চতুর্থাংশে দাঁড়ায়, তাহা হইলে দামস্তরও কমিয়া পূর্ব্বের এক চতুর্থাংশে দাঁড়াইবে। মুদ্রার পরিমাণ বলিতে বুঝাইতেছে মোটমুদ্রার সংখ্যা এবং প্রতিটী মুদ্রার গড়পড়তা প্রচলনক্ষিপ্রতা।

এস্থলে, ইহাই অনুমান করা হইতেছে যে মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ সমানই থাকিবে—অর্থাৎ বিনিময়সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইবে না। এইজন্যই উপরোক্ত সংজ্ঞাটিতে "অন্যান্য বিষয়গুলি সমান থাকিলে", এই শব্দগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে মুদ্রার দ্বারা বিনিময় করা হইবে এইরূপ সামগ্রীর পরিমাণ (মুদ্রার চাহিদা) যদি সমান থাকে, তাহা হইলেই মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে (অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য সেই অনুপাতে কমিবে) এবং মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে কমিবে দামস্তরও সেই অনুপাতে কমিবে (অর্থাৎ মুদ্রামূল্য সেই অনুপাতে বাড়িবে)।

যথা—ধরা যাউক বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর সংখ্যা ৫০ কোটী এবং মুদ্রার পরিমাণ ২০০ কোটী টাকা। এক্ষেত্রে দামস্তর হইবে ৪ মুদ্রা টাকা। ধরা যাউক বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর সংখ্যা ৫০ কোটী থাকিবে। তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণ যদি ৪০০ কোটী টাকা হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে দামস্তর হইবে ৮৲ টাকা; অপর পক্ষে মুদ্রার পরিমাণ যদি কমিয়া একশত কোটীতে দাঁড়ায়—অর্থাৎ অর্দ্ধেক হয়, তাহা হইলে দামস্তর হইবে ২৲ টাকা অর্থাৎ (৪৲ টাকার) অর্দ্ধেক।

$$\text{অতএব দামস্তর} = \frac{\text{মুদ্রার পরিমাণ}}{\text{বিনিময়সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ}}$$

এই বিষয়টী 'ফিশার' একটী সমীকরণের (Equation) দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

$$\text{P (Price level)} = \frac{\text{MV (Quantity of Money \& Velocity of Circulation)}}{\text{T (Volume of Trade)}}$$

এস্থলে 'T' (Volume of Trade) দ্বারা বুঝায় বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ। ইহা যদি সমান থাকে তাহা হইলে 'MV' বৃদ্ধি পাইলে, ঠিক সেই অনুপাতে 'P' বৃদ্ধি পাইবে; 'MV' কমিলে ঠিক সেই অনুপাতে 'P' কমিবে।

'P' (দামস্তর) কমিবার অর্থ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি, এবং 'P' বাড়িবার অর্থ মুদ্রার মূল্য হ্রাস।

(অণু-৭) 'মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সঙ্কোচ—*Inflation and Deflation*

বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ যদি বৃদ্ধি না পায় কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহাকে "মুদ্রাস্ফীতি" (Inflation) বলা হয়। আমাদের দেশে গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৭৮ কোটী টাকার মুদ্রার প্রচলন ছিল ; যুদ্ধের সময়ে গভর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে মুদ্রা ছাড়িয়াছিলেন ; ১৯৪৯-৫০ সালে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১১০৮ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। এই কারণে যুদ্ধের পূর্ব্বে সামগ্রী সমূহের যে দাম ছিল তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাকে Inflation বা মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

অপরপক্ষে, বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ যদি সমান থাকে এবং মুদ্রার পরিমাণ যদি কমাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই কারণে দামস্তর কমে, তাহা হইলে উহাকে মুদ্রাসঙ্কোচ বা Deflation বলা হয়।

Questions and Hints.

1. What is meant by the Value of money? Explain the causes of Variations in the Value of money in a country (1946)—(অণু-১)। মুদ্রার মূল্যের তারতম্য কিভাবে ঘটে তাহার উত্তর দিতে হইলে Quantity theory of money বর্ণনা করিলেই চলিবে না। কারণ Quantity theory বলে যে মুদ্রার চাহিদা ঠিক থাকিলে উহার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা মুদ্রার মূল্যের তারতম্য ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে শুধু-মাত্র উহার চাহিদার দ্বারাই নহে—উহার যোগানের দ্বারাও। এক্ষেত্রে বলিতে হইবে, মুদ্রার মূল্যের পরিবর্ত্তন (Variation) ঘটে মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা। ইহার উত্তর দিতে হইলে, ৫নং অণুচ্ছেদের শেষাংশ "মুদ্রামূল্যের (অর্থাৎ দামস্তরের) তারতম্য ঘটিতে পারে" এইস্থান হইতে "দামস্তর উঠানামা করিতে পারে"—এই পর্য্যন্ত লিখিতে হইবে। তাহার পর মুদ্রার যোগান ও মুদ্রার চাহিদা ৫নং অণুচ্ছেদে যেরূপ আছে তাহা বর্ণনা করিতে হইবে। অবশেষে খুব সংক্ষেপে তিন চার পংক্তিতে মুদ্রার পরিমাণবাদের উল্লেখ করিতে হইবে।

2. Explain why general prices rise and fall within the country (1942)—[উপরে ১নং প্রশ্নের উত্তরে ৫নং অণুচ্ছেদের বর্ণনা যে ভাবে সাজাইয়া উত্তর দিতে হইবে বলা হইল, এই প্রশ্নের উত্তরও ঠিক ঐ ভাবে দিতে হইবে।]

3. State and explain the quantity theory of money (1945) [অণুচ্ছেদ—৬]

4. Explain the effects of rising and falling prices. [অণু—৪]

5. How is value of money determined ? [অণু—৫]

6. Examine the causes of a rise or fall of general prices. How are businessmen and wage earners affected by rising and falling prices ? (1949)

[উপরে প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দ্রষ্টব্য। অণু—৪]

ষোড়শ অধ্যায়

কর্জ্জ ও ব্যাঙ্কব্যবসায়

Credit and Banking

(অণুচ্ছেদ-১) 'কর্জ্জ' কাহাকে বলে ?—*What Credit is ?*

একজন লোক যখন অপর একজনকে সামগ্রী বিক্রয় করিল কিন্তু ঐ সামগ্রীর দাম বিক্রেতা কিছুকাল পরে পাইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল তখন ঐ লেনদেনটী (transaction) হইল এইরূপ যে বিক্রেতা ভবিষ্যতে সম্পদ পাইবে এই আশায় বর্ত্তমানের সম্পদ প্রদান করিল। ইহা কর্জ্জ লেনদেন। আবার, একজন লোক আর একজনকে কিছু পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিল এবং যে উহা গ্রহণ করিল সে কিছুকাল পরে ঐ পরিমাণ মুদ্রা প্রথম ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত রহিল। এক্ষেত্রেও একজন ব্যক্তি বর্ত্তমান সম্পদের মালিকানা পরিত্যাগ করিল ভবিষ্যতে সম্পদের মালিকানা পাইবে এই বন্দোবস্তে। ইহাও কর্জ্জ-লেনদেন। অতএব কর্জ্জ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে বর্ত্তমান সম্পদের মালিকানা প্রদান।

কর্জ্জকারী (Debtor) কর্জ্জ দাতাকে কর্জ্জের পরিমাণ সম্পদ, যথা—মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য রহিয়াছেন—এই চিহ্ন যে কাগজের খণ্ড বহন করে তাহাকে কর্জ্জপত্র (Credit Instrument) বলা হয়। ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুইপ্রকার কর্জ্জপত্রের বৈশিষ্ট্য আমরা পর্য্যালোচনা করিব—(১) চেক্—(Cheque) (২) হুণ্ডি—(Bill of Exchange)

(অণু-২) চেক্ * *Cheque.*

কোনো ব্যক্তি ব্যাঙ্কে মুদ্রা আমানত রাখিলে, চেক দ্বারা উহা উঠাইয়া লইতে পারে; ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীদের এই চেক কাগজ সরবরাহ করে।

---

* চেকপত্র এইরূপ হয়।

No...... ..　　　　Date.........

The Calcutta Bank Ltd.

Pay...(যাহাকে টাকা দেওয়া হইবে তাহার নাম) ... ... or Bearer

Rupees.........(টাকার পরিমাণ অক্ষরে যথা Rupees forty only)

Rs.........(টাকার পরিমাণ সংখ্যায় যথা Rs 40/-)

আমানতকারীর সহি।

আমানতকারী একখানি চেক্ কাগজের উপরে কত মুদ্রা ফিরত চাহে তাহা লিখিয়া নাম সহি করিয়া দেয়। চেকে একটী ঘর থাকে যেখানে আমানতকারী লিখিয়া দেয় ঐ মুদ্রা কাহাকে ব্যাঙ্ক্ প্রদান করিবে। যাহারই নাম লিখিত থাকুক ঐ চেক্ ব্যাঙ্কে যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে অর্থাৎ যাহার নিকট হইতেই ব্যাঙ্ক ঐ চেক্-কাগজখানি পাইবে তাহাকেই ব্যাঙ্ক উহাতে লিখিত পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবে—যদি ঐ পরিমাণ মুদ্রা আমানতকারীর ব্যাঙ্কে আমানত থাকে। "চেক্ হইল চাহিবামাত্রই একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দিয়া দিবার জন্য আমানতকারীর দ্বারা ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত নির্দ্দেশ"—এইরূপে পেন্‌সন্ চেকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [The cheque is an order to the banker to pay a certain sum on demand."—PENSON

(অণু-৩) চেক্ কি মুদ্রা হিসাবে গণ্য ? *Is Cheque Money ?*

অনেক সময়ে একজন আর এক জনকে প্রদেয় মুদ্রা চেকের দ্বারা প্রদান করিতে পারে। চেকের প্রাপক ব্যাঙ্কে উহা উপস্থিত করিলেই ব্যাঙ্ক তাহাকে লিখিত মত মুদ্রা দিয়া দিবে। সেইজন্য চেক ও মুদ্রার মধ্যে অনেক সময়ে সমতা দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চেক্ ও মুদ্রা এক জিনিষ নহে, কারণ (১) কোনো সামগ্রীর দাম গ্রহণ করিবার সময়ে মুদ্রা বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত হইবে—ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত পরিচিত হউক বা অপরিচিত হউক : কিন্তু চেক্ গৃহীত হইবে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে চেক্ প্রদাতার উপরে চেক্-প্রাপকের আস্থা আছে। চেক্ প্রাপক চেক্ গ্রহণ করিয়া একটী ঝুঁকি লয় কারণ চেকপ্রদাতার ঐ পরিমাণ মুদ্রা ব্যাঙ্কে আমানত আছে তাহার নিশ্চয়তা কি ? সেইজন্য চেক প্রদাতার উপর আস্থা না থাকিলে চেক গৃহীত হইবে না। (২) পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে হইলেও চেকের দ্বারা লেনদেন কার্য্যটী সম্পূর্ণ হইল না। কারণ চেকটী ব্যাঙ্কের নিকট দিয়া নগদ মুদ্রা লইতে হইবে। (৩) মুদ্রা আইন চালু ; যে ব্যক্তিকে মুদ্রা প্রদান করা হইবে সে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য ; কিন্তু চেক্ আইন চালু নহে—যে ব্যক্তিকে চেক্ প্রদান করা হইবে সে উহা লইতে বাধ্য নহে।

(অণু-৪) চেকের কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা—*Functions and utility of cheques*

চেকের দ্বারা মূল্য প্রদান করা সুবিধাজনক।

(১) চেক ব্যবহার করিলে হাতের কাছে নগদ মুদ্রা রাখিবার দরকার করে না। মুদ্রা থাকে ব্যাঙ্কে, শুধু চেকের উপরে সহি করিয়া যে কোনো পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করা যায়। অতএব চুরি ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা কম। শুধু চেকখানি চুরি গেলেই কোনো ক্ষতি নাই; উহাতে যতক্ষণ না সহি করা হইতেছে ততক্ষণ উহার কোনো দাম নাই। (২) উহার দ্বারা যে কোনো পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করা যায়। একখানি মাত্র কাগজ দ্বারা যত পরিমাণ প্রয়োজন মুদ্রা প্রদান করা যায়; অতএব একসাথে বেশী মুদ্রা বহন না করিয়া একখানি ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড বহন করিলেই কাজ হইয়া যায়। (৩) চেকের দ্বারা সঠিক পরিমাণ মুদ্রা দেওয়া চলে—অর্থাৎ একেবারে টাকা আনা পাই হিসাব করিয়া একখানি কাগজের দ্বারাই দিয়া দেওয়া চলে। খুচরা সংগ্রহের জন্য কোনো প্রয়াস করিতে হয় না। (৪) চেকদ্বারা মূল্য প্রদানে হিসাব রাখার সুবিধা হয়। প্রত্যেক চেকের সহিত হিসাব রাখিবার ক্ষুদ্র একটুকরা কাগজ থাকে; ইহাকে বলা হয় চেক্‌মুড়ি (Counterfoil)। যখন যাহার নামে একখানি চেক্ দেওয়া হইল তখনই উহা চেক্‌মুড়িতে লিখিয়া রাখিলেই আপনা আপনি হিসাব রাখা হইয়া যায়। (৫) দূরস্থানে নিরাপদে এবং অল্প খরচায় চেকের দ্বারা মুদ্রা প্রেরণ করা যায়।

চেকের ব্যবহারের দ্বারা মূল্যবান ধাতু মুদ্রার ব্যবহার কমিয়া যায় এবং সেহেতু মুদ্রা প্রচলনের ব্যয়-সঙ্কোচ হয়। ধরা যাউক রামবাবুর টাকা আছে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে এবং মধুবাবুর টাকা আছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে। কোনো কারণে রামবাবু মধুবাবুকে ৫,০০০৲ টাকার চেক দিলেন। মধুবাবু সেই চেকখানি নিজনামে ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিলেন। অপর পক্ষে ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে টাকা রাখে এইরূপ একজন লোক বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে টাকা রাখে এইরূপ একজন লোককে কোনো কারণে ৪,০০০৲ টাকার একটী চেক দিল। সেই চেক্‌প্রাপক চেক্‌খানি তাহার ব্যাঙ্কে অর্থাৎ বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। এক্ষেত্রে দেখা যাইবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫০০০৲ টাকা চাহিবে আবার বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৪,০০০৲ টাকা চাহিবে। অতএব পরস্পরের মধ্যে দাবী-খণ্ডন হইয়া এইরূপ দাঁড়াইবে যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নীট ১,০০০টী মুদ্রা বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাইবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১০০০টী টাকা বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট যাইবে এইভাবে মূল্যবান মুদ্রা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কমিয়া যাইবে।

(অণু-৫) হুণ্ডি*— *Bill of Exchange*

অনেক ব্যবসাদার তাহাদের মাল ধারে বিক্রয় করে। খরিদ্দারের সহিত বন্দোবস্ত থাকে যে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মালের দাম সে পরিশোধ করিয়া দিবে। মালের বিক্রেতা একটী দলিলে এই লেনদেনটী লিপিবদ্ধ করে এবং উহাতে লিখিয়া দেয় যে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরে, খরিদ্দার কাহাকে ঐ পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিলে সে (অর্থাৎ মালের বিক্রেতা) নিজের পাওনা আদায় হইল বলিয়া বিবেচনা করিবে। সেই স্থলে বিক্রেতা নিজের নাম বসাইতে পারে বা অপর কাহারও নাম বসাইতে পারে; আবার "বাহক" শব্দটীও যোগ করিয়া দেয়-অর্থাৎ যে এই দলিলটী খরিদ্দারের নিকট উপস্থাপিত করিবে খরিদ্দার তাহাকেই ঐ দলিলে লিখিত পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবে। অতঃপর খরিদ্দার দলিলটী সহি করিয়া উহা স্বীকার করিয়া লইল। দলিলটী মালের বিক্রেতার কাছে রহিল। বিক্রেতা ঐ দলিলটী অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দিতে পারে বা দান করিয়া দিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর যে ব্যক্তিই দলিলটী উহাতে স্বাক্ষরকারী দেনাদারের কাছে লইয়া যাইবে দেনাদার তাহাকেই মুদ্রা দিয়া দিবে। এই দলিলটীর নাম হুণ্ডি।

কোনো নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা যেন প্রদান করা হয় এই মর্ম্মে মালক্রয়কারীর উপরে মাল বিক্রয়কারীর নির্দ্দেশ সম্বলিত দলিলকে হুণ্ডি (Bill of Exchange) বলা হয়। ক্রয়কারী ও বিক্রয়কারী উভয়েই একই দেশের অধিবাসী হইলে উহাকে বলা হয় একদেশীয় হুণ্ডি (Inland Bill) এবং দুইজনে যদি দুইটী ভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে উহাকে বলা হয় বৈদেশিক হুণ্ডি (Foreign Bill)।

(অণু-৬) হুণ্ডির ক্রিয়াপদ্ধতি—*Operation of a Bill of Exchange*

হুণ্ডির ক্রিয়াপদ্ধতি হইল যে, যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে

---

*একটী হুণ্ডি এইরূপ হয়:—

Date......

Ninety days after date, we jointly and severally promise to pay ... ... or Order the sum of Rs... ... (Rupees... ... only) for value received in cash.

N. K. Roy
L. M. Bose

মাল চলাচল করে তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের * দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে হুণ্ডি চলাচল করে এবং উহার দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মুদ্রা চলাচল অনাবশ্যক হয়।

ধরা যাউক ঢাকার আকবর আলি কলিকাতার নবীন ঘোষকে ২,০০০৲ টাকার পাট প্রেরণ করিয়াছেন। আকবর আলি (পাওনাদার) ২০০০৲ টাকার হুণ্ডি কাটিলেন এবং নবীন ঘোষ (দেনাদার) উহা সহি করিয়া আকবর আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর নবীন ঘোষ কলিকাতা হইতে ঢাকায় ২,০০০৲ টাকা পাঠাইবেন।

এক্ষেত্রে কলিকাতা হইতে ২,০০০৲ টাকা যাইবে ঢাকায়।
(নবীন ঘোষ) (আকবর আলি)
—দেনাদার— —পাওনাদার—ইঁহার কাছে হুণ্ডিখানি রহিয়াছে

অপর পক্ষে, ঢাকার অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা কলিকাতার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মাল কিনিতেছেন। ধরা যাউক এইরূপে কলিকাতার কৈলাস মিত্র ঢাকার গিয়াস্‌উদ্দিনকে ২,০০০৲ টাকার বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছেন। ঢাকার গিয়াস্‌উদ্দিন (দেনাদার) কলিকাতার কৈলাস মিত্রকে (পাওনাদার) ২,০০০৲ টাকা পাঠাইবেন।

এক্ষেত্রে কলিকাতায় ২০০০৲ টাকা আসিবে ঢাকা হইতে
(কৈলাস মিত্র) (গিয়াসউদ্দিন)
—পাওনাদার— —দেনাদার—

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে একই হুণ্ডির দ্বারা দুইটী পৃথক লেনদেন কার্য্য সম্পন্ন হইবে অথচ কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে কোনো মুদ্রা চলাচল করিবে না। গিয়াসউদ্দিন (দেনাদার) ও আকবর আলি (পাওনাদার) উভয়েই ঢাকার অধিবাসী—গিয়াসউদ্দিন ঢাকায় বসিয়াই আকবর আলিকে ২০০০৲ টাকা প্রদান করিলেন এবং আকবর আলি উহার পরিবর্ত্তে গিয়াসউদ্দিনকে হুণ্ডিখানি (নবীন ঘোষ যাহা স্বাক্ষর করিয়াছেন) দিলেন। অর্থাৎ, গিয়াসউদ্দিন আকবর আলির নিকট হইতে হুণ্ডিখানি ২০০০৲ টাকা দামে ক্রয় করিলেন।

অতঃপর গিয়াসউদ্দিন সেই হুণ্ডি কাগজখানি ডাকযোগে ঢাকা হইতে কলিকাতায় কৈলাস মিত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। হুণ্ডিতে লিখিত আছে কলিকাতারই

---

* এস্থলে অঞ্চল বলিতে একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন অংশকে বুঝায় আবার বিভিন্ন দেশকেও বুঝায়।

একজন অধিবাসী অর্থাৎ নবীন ঘোষ অঙ্গীকারবদ্ধ রহিয়াছেন যে ঢাকার আকবর আলি অথবা যে কোনো বাহক (Bearer) হুণ্ডিটী তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি তাঁহাকেই একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে ২০০০৲ টাকা দিবেন। অতএব ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর কলিকাতার কৈলাস মিত্র যে কোনো বাহক (Bearer) হিসাবে নবীন ঘোষের নিকট হুণ্ডিটী লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ২০০০৲ টাকা পাইবেন।

একটী হুণ্ডির সাহায্যে দুইটী বিভিন্ন লেনদেনের প্রত্যেক পাওনদার তাঁহার সহরে বসিয়াই পাওনা আদায় পাইলেন এবং প্রত্যেক দেনাদার তাহার সহরে তাঁহার দেনা পরিশোধ করিলেন।

(অণু-৭) কি বিষয়ের দ্বারা হুণ্ডির দাম নিরূপিত হয়—*(Factors determining the price of Bill*

হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রী। যে ব্যক্তি সামগ্রী বিক্রয় করিয়া হুণ্ডি কাটে সে হুণ্ডিটীকেও বিক্রয় করিয়া দিয়া নগদ দাম তুলিয়া লইতে পারে। ঐ স্থানেরই যে ব্যক্তি অপর স্থান হইতে মাল আমদানী করিয়াছে সে ঐ হুণ্ডিটী ক্রয় করিতে পারে। আমাদের উপরোক্ত দৃষ্টান্তে হুণ্ডির বিক্রেতা হইলেন আকবর আলি এবং উহার ক্রেতা হইলেন গিয়াসউদ্দিন।

যে সামগ্রীর বেচাকেনা হইবে তাহার একটী দাম থাকিবে। এক্ষণে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা ইহার দাম নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রথমতঃ হুণ্ডির বিক্রেতা যত মূল্যের সামগ্রী হুণ্ডিতে স্বাক্ষরকারীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন তত পরিমাণ মূল্য ঐ হুণ্ডিটীর জন্য দিতে হুণ্ডির ক্রেতা প্রণোদিত হইবে। অতএব হুণ্ডিটীর উপর যত পরিমাণ মূল্য লিখিত থাকে উহা হুণ্ডির দাম নির্দ্ধারক বিষয়গুলির মধ্যে একটী। উহা হইল হুণ্ডির "সমহার মূল্য" (Par value) কিন্তু ঐ দামেই যে হুণ্ডিটী বিক্রয় হইবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। হুণ্ডিটী প্রকৃতপক্ষে যে দামে বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে উহার চাহিদা এবং যোগানের উপর। হুণ্ডির চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ঐ হুণ্ডির প্রকৃত দাম "সমহার মূল্য" অপেক্ষা অধিক হইবে। অপর পক্ষে হুণ্ডিটীর যোগান যদি চাহিদা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে হুণ্ডির দাম "সমহার মূল্যের" কম হইবে।

অতএব হুণ্ডির মূল্য নির্দ্ধারক বিষয় হইল তিনটী ; প্রথমতঃ উহার উপরে যে মূল্য লিখিত আছে—উহার "সমহার মূল্য", দ্বিতীয় উহার যোগান ; তৃতীয়, উহার চাহিদা।

(অনু-৮) হুণ্ডির অর্থনৈতিক সুবিধা—*Economic Benefits of Bills of Exchange*

হুণ্ডির দ্বারা নানাপ্রকারে বিশেষ অর্থনৈতিক উপকার সাধিত হয়: (১) **বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই** এই উপকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়। একটী দেশের অধিবাসী অপর কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট হইতে মাল আমদানী করিলে—তাহার পক্ষে বৈদেশিক বিক্রেতাকে মালের মূল্য প্রদান করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে তাহাকে দুইটী সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক মুদ্রা থাকে। একটী রাষ্ট্রের মধ্যে যে মুদ্রার প্রচলন অপর রাষ্ট্রে সে মুদ্রা চলিবে না। বিদেশী বিক্রেতাকে তাহা হইলে কিভাবে মূল্য প্রদান করা যায়? উহা করা যায় স্বর্ণ পাঠাইয়া, কারণ বিদেশী বিক্রেতাকে স্বর্ণ পাঠাইলে সে উহা নিজের দেশে বিক্রয় করিয়া নিজের দেশের মুদ্রা পাইবে। কিন্তু ক্রেতার পক্ষে এইখানে দ্বিতীয় সমস্যা। স্বর্ণ পাঠানো ঝুঁকিসাপেক্ষ (risky) এবং ব্যয়সাপেক্ষ। যে জাহাজে বা অন্য যানে করিয়া স্বর্ণ পাঠানো হইবে তাহার মালিক উহার ভাড়া লইবে। ঐ জাহাজ বা যানের কোনো বিপদ (accident) ঘটিলে স্বর্ণ হারাইয়া যাইতে পারে, অথবা চুরি ডাকাতিও হইতে পারে। অনেক কিছু ঘটিতে পারে যাহাতে স্বর্ণ পাঠানো হইল কিন্তু বৈদেশিক বিক্রেতার নিকট পৌঁছাইল না।

একটী দেশের ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিলে তাহাকে এই সমস্যা দুইটীর সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সমস্যা সমাধান না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব হয় না। সম্ভব হইলেও উহার যথাযোগ্য প্রসার হয় না। হুণ্ডির ব্যবহার এই সমস্যার চমৎকার সমাধান করিয়া দেয়। আমদানীকারক যে দেশ হইতে আমদানী করিল, তাহার স্বদেশবাসীদের মধ্যে যদি কেহ সেই দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে এবং হুণ্ডি কাটিয়া থাকে, উহার নিকট হইতে সেই হুণ্ডিটী আমদানীকারক কিনিয়া লয় এবং তাহার পাওনাদারকে পাঠাইয়া দেয়। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদান করা হয়।

(২) **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও** একই দেশের বিভিন্ন এলাকার অধিবাসী হুণ্ডির সাহায্যে কোনো মুদ্রা প্রেরণের ঝুঁকি বা ব্যয় না বহন করিয়া সহজেই মূল্য প্রদান করিতে পারে।

(৩) **ইহার দ্বারা খুচরা ব্যবসায়ীরা** তাহাদের ব্যবসা চালাইবার সুযোগ পায়। খুচরা কারবারীগণ মহাজনের নিকট হইতে পাইকারী দরে মাল কিনিয়া

তাহা বাজারে খুচরা বিক্রয় করে। তাহাদের হাতে নগদ মুদ্রা এমন নাও থাকিতে পারে যে মহাজনের নিকট মাল কিনিয়াই সঙ্গে সঙ্গে দাম দিয়া দিবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা মাল খুচরা বিক্রয় করিয়া যে আয় করিবে তাহা হইতে মহাজনের মালের দাম দিয়া দিবে এই ইচ্ছা করে। খুচরা বিক্রয় সময়সাপেক্ষ; সেইজন্য খুচরা ব্যবসায়ী মহাজনকে হুণ্ডি কাটিয়া দেয়। উহাতে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লিখিত থাকে ;—ঐ সময় অতিবাহিত হইবার পর খুচরা মালের মূল্য পরিশোধ করে। এই সময়-সাপেক্ষ মূল্য-পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া হুণ্ডি খুচরা কারবারীর প্রভূত উপকার করে।

(অণু-৯) ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে—*What 'Bank' means*

জনসাধারণ যে প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের সঞ্চিত মুদ্রা গচ্ছিত রাখে এবং যাহার নিকট হইতে জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। সেইজন্য ব্যাঙ্ককে কর্জ্জের বিলিব্যবস্থাকারক বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(অণু-১০) ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ—*Functions of a Bank*

(১) জনসাধারণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক মুদ্রা গচ্ছিত লয়। জনসাধারণের দ্বারা ব্যাঙ্কের নিকট মুদ্রা গচ্ছিত রাখাকে আমানত (Deposit) বলা হয়। আমানতকারীরা ব্যাঙ্কের পাওনাদার; ব্যাঙ্ক তাঁহাদের কাছে দেনাদার। ব্যাঙ্কের আমানতের টাকা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে—তবে ইহা পরিশোধ করিবার পদ্ধতির পার্থক্য আছে। মোটামুটি দুই প্রকারের পদ্ধতি আছে—(ক) কোনো কোনো আমানত, একটী নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর, ব্যাঙ্ক পরিশোধ করিবে। এই ধরণের আমানতকে বলা হয় সময় নির্দ্ধারিত বা স্থায়ী আমানত (Time or Fixed Deposit) ; (খ) আর এক প্রকারের আমানত আছে যাহা আমানতকারী যখন ইচ্ছা উঠাইয়া লইতে পারেন। ইহা আমানতকারী দাবী করিলেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুত থাকে। ইহাকে চলতি বা দাবী আমানত (Current or Demand Deposit) বলা হয়। (২) জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জ ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিয়া থাকে। অবশ্য যে ব্যক্তিই চাহিবে তাহাকেই ঋণ দিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য নহে—উহার মতে যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম তাহাকে ইচ্ছামত ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে। ব্যাঙ্কের দ্বারা ঋণ দিবার পদ্ধতি আছে তিন প্রকার; (ক) কোনো মূল্যবান সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে। ইহাকে বলা হয়—**বন্ধকী দাদন** (Advance on securities) (খ) একজন লোক ব্যাঙ্কে যত পরিমাণ মুদ্রা আমানত রাখিয়াছে

ব্যাঙ্ক তাহাকে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মুদ্রা উঠাইতে অনুমতি দিতে পারে। এই বাড়তি পরিমাণ মুদ্রা যাহা ঐ ব্যক্তি আমানত রাখে নাই কিন্তু ব্যাঙ্ক তাহাকে উঠাইতে দিল—ইহা ঐ ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ করিল। ইহাকে বলে **বাড়তি টান** (Overdraft); (গ) ব্যাঙ্ক হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়াও ঋণ দিয়া থাকে। ব্যবসায়ের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মাল বিক্রেতাগণ মাল ক্রয়-কারীকে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, ধারে মাল বিক্রয় করে। অর্থাৎ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর মাল-ক্রয়কারী বিক্রেতাকে উহার মূল্য প্রদান করিবে। মালক্রয়কারী যে রসিদে সহি করিয়া মালবিক্রেতার নিকট হইতে এইরূপ ধারে মাল কিনে তাহাকে বলা হয় হুণ্ডি। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই মাল বিক্রেতার যদি মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে উহা ব্যাঙ্কের নিকট লইয়া যায়। ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডিটী রাখিয়া ঐ পরিমাণ মুদ্রা তাহাকে দিয়া দেয়। তবে সমগ্র পরিমাণ মুদ্রা তাহাকে দেয় না—উহা হইতে কিছু কাটিয়া রাখে। এই বাদ দেওয়া অংশটুকু হইল ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সুদ। ইহাকে বলা হয় বাট্টার হার (Rate of Discount)। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরে ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডিটী মালক্রয়কারীর নিকট উপস্থাপিত করিয়া সমগ্র পরিমাণ মুদ্রা আদায় করে। (৩) ব্যাঙ্কের আর একটী কার্য্য হইল কাগজী মুদ্রা বা 'নোট' প্রচার করা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রসারের প্রথম যুগে সকল ব্যাঙ্কই এইরূপ নোট প্রচার করিত কিন্তু উহাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হওয়াতে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট নোট প্রচারের ক্ষমতা দেশের একটী মাত্র ব্যাঙ্কের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেন। ইহার নাম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)। (৪) এই কাজগুলি ভিন্নও ব্যাঙ্ক কয়েকটী বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করে—যথা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়-বিক্রয় করা, গভর্ণমেণ্টের ঋণপত্র ক্রয় করা, জনসাধারণের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করা ইত্যাদি।

এইস্থানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে জনসাধারণ ও ব্যাঙ্কের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ আবর্ত্তিত। ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জনসাধারণ উহার নিকট নিজেদের সঞ্চয় ও মূল্যবান সামগ্রী গচ্ছিত রাখে। অপর পক্ষে যাহারা ঋণ চাহে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস রাখিয়া ব্যাঙ্ক অপরকে কর্জ্জ দেয়। যে ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের যত বেশী আস্থা সেই ব্যাঙ্কের নোট বা চেক জনসাধারণ ততই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিবে। এই বিশ্বাসের উপর বাজার সুনাম প্রতিষ্ঠিত।

ইংরাজিতে Credit শব্দটীর দুইটী অর্থ—(১) ঋণ বা কর্জ্জ (২) বাজার সুনাম। সেইজন্য যখন বলা হয় Bankers are dealers in credit তাহার অর্থ হয় যে, ব্যাঙ্ক কর্জ্জ-কারবারী অথবা উহা বাজার-সুনামের কারবারী। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যারই তাৎপর্য্য এক।

(অনু-১১) ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক উপকার—*Economic Benefits of Banks*

সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কসমূহ নানাভাবে প্রভূত মঙ্গল সাধন করে। প্রথমতঃ, সঞ্চিত মুদ্রা ব্যাঙ্কে নিরাপদে গচ্ছিত রাখা যায় এবং নিজ ইচ্ছামত তাহা ফেরৎ পাইবার বন্দোবস্ত করা যায়; উপরন্তু গচ্ছিত মুদ্রার উপরে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ সুদ দিয়া থাকে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা জাগরূক হয় এবং জনসাধারণ মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে প্রণোদিত হয়। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়-বৃদ্ধির পরিপোষক। দ্বিতীয়তঃ অনেক ব্যক্তি থাকে যাহারা ধনবান, যাহাদের সঞ্চয় আছে কিন্তু ব্যবসায়বুদ্ধি নাই। সেহেতু ইহাদের সঞ্চয় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না হইয়া অলস সঞ্চয় হিসাবেই থাকিয়া যায়। আবার অনেক ব্যক্তি আছে যাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধি আছে এবং উৎপাদনকারীর কার্য্যে নামিলে সাফল্যলাভ করিতে পারে কিন্তু কারবারে নিয়োগ করিবার মতন পুঁজি তাহাদের নাই; এক্ষেত্রে দেশে পুঁজি হিসাবে নিয়োগ করিবার মত সঞ্চয় থাকে এবং আন্ত্রেপ্রনার গুণ সমন্বিত লোকও থাকে কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাহা সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্ক এইরূপ অবস্থার অবসান ঘটায়। সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আসে আমানতরূপে এবং ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হয় পুঁজি-রূপে দেশকে শিল্পে ও কৃষিতে সুসমৃদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। তৃতীয়তঃ শিল্পসম্পদই হউক বা কৃষিসম্পদই হউক—সম্পদ শুধু উৎপাদন করিলেই চলিবেনা—উহার বিক্রয় বন্দোবস্ত একটী সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানেও ব্যাঙ্ক প্রভূত সাহায্য করে। উৎপাদনকারী অথবা পাইকারী ব্যবসায়ী হুণ্ডির মাধ্যমে পণ্যবিক্রয় করে বলিয়া খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষে ভোগকারীদের নিকট উৎপাদিত সামগ্রী পৌছাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। ইহাতে উৎপাদনকারী, পাইকারী ব্যবসায়ী ও খুচরা ব্যবসায়ী সকলেই লাভবান হয়; কারণ সকল উৎপাদন কার্য্য ও ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্যই হইল যে জনসাধারণ উৎপাদিত ও মজুদকৃত সামগ্রী ক্রয় করিবে। ব্যাঙ্ক এই কার্য্যে সহায়তা করে কারণ ব্যাঙ্কের নিকট হুণ্ডি লইয়া গেলে উহাতে লিখিত নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, হুণ্ডির পরিমাণ মুদ্রা কিছু সুদ বাদে

ব্যাঙ্ক হুণ্ডির মালিককে (মাল বিক্রেতাকে) প্রদান করে। ইহাতে হুণ্ডির মাধ্যমে মাল বিক্রয় করিতে ব্যবসায়ীগণ অভ্যস্ত হইয়াছে। চতুর্থতঃ ব্যাঙ্কের চেক্ দ্বারা মূল্য প্রদান করা জনপ্রিয় হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের উপস্থিতি দ্বারাই জনসাধারণ চেক্-ব্যবহারের সকল সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে।

এইভাবে জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিয়া, সেই সঞ্চয় পুঁজি হিসাবে শিল্পে ও কৃষিকার্য্যে বিনিয়োগের জন্য সরবরাহ করিয়া, হুণ্ডির দ্বারা বিক্রয় ব্যবস্থাকে ব্যবসায়-জগতে জনপ্রিয় করিয়া, বহু প্রকারে সুবিধাজনক চেক ব্যবহারে জনসাধারণকে অভ্যস্ত করিয়া—ব্যাঙ্ক সম্পদ উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের কার্য্যে প্রভূত সহায়তা করে। তাই জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ব্যাঙ্কের অবদান প্রচুর।

কিন্তু ব্যাঙ্ক যাহাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ দক্ষতা, বিবেচনা ও সাবধানতার সহিত ব্যাঙ্ক পরিচালিত হওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যাঙ্ক সাধারণ ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা বিশেষভাবেই জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এবং একটী ব্যাঙ্কের উত্থান পতনের সহিত দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর অর্থনৈতিক ভাগ্য বিজড়িত।

Questions & Hints

1. What is a cheque ? [অনু—২]

2. "A cheque is not money"—Explain. (1935) [অনু—৩]

3. What is a bill of exchange ? Indicate the factors that determine its price—(1944) [অনু—৫ ; অনু—৭]

4. Describe a Bill of Exchange and the economic service it renders (1936) [অনু—৫ ; অনু—৮]

5. Give an account of the functions and utility of the following credit instruments ; (a) Cheque ; (b) Bill of Exchange. (1949) [অনু—৪ ; অনু—৮]

6. Describe the advantages of a bill of exchange as used in foreign trade (1946)

[অনুচ্ছেদ ৮ এর "এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যপ্রদান করা হয়" পর্য্যন্ত এবং অনু—৬ সম্পূর্ণ।]

7. Banks are dispensers of Credit—Discuss: this statement (1941). [অনু—১০]

8. Describe the economic functions of Banks. Show how a good banking system can further the economic well-being of a country, [১০নং অণুচ্ছেদের প্রথম হইতে "জনসাধারণের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করা" পর্য্যন্ত এবং ১১নং অণুচ্ছেদ সম্পূর্ণ।]

9. Discuss the services performed by Banks to trade and industry. (1942) [অনু—১১]

সপ্তদশ অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

(অণুচ্ছেদ-১) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অর্থ—*Meaning of International Trade*

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ যখন রাষ্ট্র-সীমানা অতিক্রম করিয়া মাল ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে তখন উহাকে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। কোন একটী রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ বাণিজ্যকে বলা হয় বহির্ব্বাণিজ্য.(Foreign Trade) ; বহির্ব্বাণিজ্যের দুইটী অংশ আছে, আমদানী এবং রপ্তানী। একটী রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ অপর রাষ্ট্র হইতে যে সামগ্রী আনয়ন করে, অর্থাৎ অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের নিকট হইতে যে সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনে, তাহা ঐ রাষ্ট্রের আমদানী (Import)। একটী রাষ্ট্রের অধিবাসী অপর রাষ্ট্রে যে সামগ্রী প্রেরণ করে, অর্থাৎ অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের নিকট যে সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য পাঠায়, তাহা হইল ঐ রাষ্ট্রের রপ্তানী (Export)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামগ্রীর আমদানী ও রপ্তানী হইল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য।

(অণু-২) বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা—*Advantages and Disadvantages of Foreign Trade*

সুবিধা—একটী রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ যে অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সহিত বাণিজ্যে (অর্থাৎ বহির্ব্বাণিজ্যে) লিপ্ত হয় তাহার কারণ হইল যে এইরূপ বাণিজ্য হইতে গোটাকয়েক বিশেষ সুবিধা ভোগ সম্ভব হয়। (১) বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্য থাকার দরুণ, সকল প্রকার সামগ্রী সকল দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। যে দেশে কোনো একটী সামগ্রী এই কারণে উৎপাদিত হয় না সে দেশের অধিবাসীগণ ঐ সামগ্রী ভোগ করিবার সুযোগ

পায়, যদি তাহারা বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হয়—অর্থাৎ যদি তাহারা ঐ সামগ্রী উৎপাদনকারী দেশ হইতে আমদানী করিয়া লইতে পারে। যথা ভারতে চা উৎপন্ন হয়, ফ্রান্স্ বা ইটালিতে উহা উৎপন্ন হয় না কিন্তু ঐ সকল দেশের অধিবাসীগণ ভারতের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে চা পানের সুযোগ পায়। (২) এমন হইতে পারে যে কোনো একটী দেশে কোনো একটী নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে অত্যধিক খরচা পড়িবে—অথচ উৎকৃষ্ট ধরণের ঐ সামগ্রীই হয়তো অল্প খরচে অন্য কোনো দেশে উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে, প্রথম দেশের অধিবাসীগণ যে দেশে ঐ সামগ্রী সস্তায় উৎপাদিত হয় সেই দেশ হইতে উহা আমদানী করিলে লাভবান হইবে। (৩) একটী দেশের অধিবাসীগণ যে সামগ্রী উৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষ, সেই সামগ্রীর উৎপাদনেই তাহারা ব্যাপৃত থাকে এবং সেই সামগ্রীর বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করিয়া লয়। ইহাই আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ (Territorial division of labour) ; ইহার দ্বারা সমগ্র জগতে মোট উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। (৪) ইহাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় ; কারণ বহির্ব্বাণিজ্যে রত দেশের অধিবাসীগণ অপরাপর দেশে উৎপাদিত বহু প্রকারের সম্পদ ভোগ করিবার সুযোগ পায় এবং নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা যে সামগ্রী সমূহের উৎপাদন সহজ হয় সেগুলি দেশ-দেশান্তরের অধিবাসীদের নিকট পৌছিয়া যায়। (৫) বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারা বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া তাহারা পরস্পরের জীবনযাত্রার পদ্ধতি লক্ষ্য করিতে পারে এবং নূতন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া নিজেদের জীবনযাত্রা ঐ সকল ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত করাইবার সুযোগ পায়।

অসুবিধা : (১) বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সস্তা সামগ্রী ভোগ করা অনেক সময়ে একটী দেশের অধিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। (২) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া একটী দেশ যে সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়াস করে নাই, আকস্মিক কারণে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হইলে, ঐ দেশের অধিবাসীরা ঐ সামগ্রী হইতে সহসা বঞ্চিত হইয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে। (৩) শিল্পোন্নত দেশগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগের জন্য রাশীকৃত উৎপাদন করে ; কিন্তু উহার জন্য প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং প্রচুর পরিমাণ সামগ্রীর বৈদেশিক বাজার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়। এই সকল দেশের প্রত্যেকেই বিদেশে উৎপাদিত সামগ্রী

বিক্রয় করিবার জন্য এবং বিদেশ হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য রেষারেষি করে। বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের ইহাই অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

(অনু-৩) বাণিজ্য-নিরিখ—*Balance of Trade.*

একটী দেশের আমদানীকৃত মালের মূল্য এবং রপ্তানীকৃত মালের মূল্য—এই দুইটীর তুলনামূলক হিসাবকে "বাণিজ্য-নিরিখ" (Balance of Trade) বলা হয়। প্রত্যেক দেশ, বিদেশে বহুপ্রকার সামগ্রী রপ্তানী করে এবং বিদেশ হইতে নানাপ্রকার মাল আমদানী করে। যথা ভারতবর্ষ বিদেশে চা, তুলা, পাট ইত্যাদি রপ্তানী করে এবং বিদেশসমূহ হইতে কাগজ, ঔষধ, যন্ত্রপাত ইত্যাদি মাল আমদানী করে। উভয় পর্য্যায়ভুক্ত মালের মূল্যের তুলনামূলক হিসাব হইল "বাণিজ্য-নিরিখ"।

একটী দেশ বিদেশে যে মাল রপ্তানী করে সেই মালের মূল্য উহা বিদেশগুলির নিকট হইতে পাইবে। অর্থাৎ নিজের রপ্তানীর পরিমাণ অনুযায়ী একটী দেশ বিদেশ সমূহের পাওনাদার (creditor)। অপর পক্ষে একটী দেশ বিদেশ হইতে যে মাল আমদানী করে সেই মালের মূল্য উহা বিদেশগুলিকে প্রদান করিবে। অর্থাৎ নিজের আমদানীর পরিমাণ অনুযায়ী একটী দেশ বিদেশ সমূহের নিকট দেনাদার (debtor)।

একটী দেশের বাণিজ্য নিরিখের দ্বারা যদি উহার পাওনা ও দেনা সম্পূর্ণ খণ্ডন হইয়া যায় তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের বাণিজ্য-নিরিখ সমতুল (Even Balance of Trade)। যে ক্ষেত্রে একটী দেশ ঠিক যত মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে ঠিক সেই মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে সেক্ষেত্রে উহার বাণিজ্য-নিরিখ সমতুল হয়। যথা ভারত যদি বিদেশে ৩০ কোটী টাকা মূল্যের মাল রপ্তানী করে ও বিদেশ হইতে ঠিক ৩০ কোটী টাকা মূল্যের মাল আমদানী করে তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্য-নিরিখ হইবে সমতুল।

অপর পক্ষে একটী দেশের পাওনা ও দেনা সম্পূর্ণ খণ্ডিত না হইয়া, উহার পাওনা যদি দেনা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের বাণিজ্য নিরিখ অনুকূল (Favourable Balance of Trade)। যেক্ষেত্রে একটী দেশ যত মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে সেক্ষেত্রে উহার অনুকূল বাণিজ্য নিরিখ হয়। যথা ভারত যদি বিদেশে ৩০ কোটী টাকা মূল্যের মাল রপ্তানী করে এবং বিদেশ হইতে ২৭ কোটী টাকা মূল্যের মাল আমদানী করে তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্য নিরিখ ৩ কোটী টাকার মতন অনুকূল।

আবার, একটী দেশের পাওনা অপেক্ষা যদি দেনা অধিক হয় তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের বাণিজ্য নিরিখ প্রতিকূল (Unfavourable Balance of Trade)। যে-ক্ষেত্রে একটী দেশ যত মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কম মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে সেক্ষেত্রে উহার প্রতিকূল বাণিজ্য-নিরিখ হয়। যথা ভারত যদি বিদেশে মাল রপ্তানী করিয়া থাকে ৩০ কোটী টাকা মূল্যের কিন্তু বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিয়া থাকে ৩৩ কোটী টাকা মূল্যের তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্য-নিরিখ ৩ কোটী টাকার মতন প্রতিকূল।

(অণু-৪) হিসাব (বা মূল্যপ্রদানের) নিরিখ—*Balance of Account (or Payment)*

একটী দেশ অপর দেশকে শুধুই যে **মাল** বিক্রয় করে এবং অপর দেশ হইতে শুধুই যে **মাল** ক্রয় করে তাহা নহে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আরও একপ্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের উপকরণ আছে—ইহাকে বলা হয় **কাজ বা সাহায্য**—ইংরাজিতে বলা হয় *Services.* একটী দেশের অধিবাসী অপর দেশের অধিবাসী-দিগের নিকট হইতে নানাভাবে এইরূপে কাজ বা সাহায্য ক্রয় করে। অপর দেশের জাহাজে মাল আমদানী করিলে বা অপর দেশের ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর কাজ গ্রহণ করিলে বা অপর কোনো দেশের শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভ করিতে গেলে,—একটী দেশের অধিবাসীরা অপর দেশের জাহাজ কোম্পানীর কাজের জন্য, ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর কাজের জন্য অথবা বিদেশী শিক্ষায়তনের সাহায্য গ্রহণের জন্য ঐ সকল দেশকে মূল্য প্রদান করিবে। যে দেশ এই ধরণের **কাজ** অপর দেশকে দিয়াছে উহা ঐ অপর দেশের নিকট হইতে ঐ কাজের দরুণ মূল্য পাইবে। এই কাজ বা 'সার্ভিস'ও আমদানী-রপ্তানী করা হইল। কিন্তু এইরূপ **কাজ বা সাহায্যের** আমদানী-রপ্তানী কোনো বস্তু সামগ্রীতে রূপায়িত হয় না—সেই জন্য ইহাকে অদৃশ্য আমদানী বা রপ্তানী (Invisible Import or Export) বলা হয় ; এবং ইহার সহিত পার্থক্য করিবার জন্য **মালের** আমদানী ও রপ্তানীকে দৃশ্য আমদানী ও রপ্তানী (Visible Import and Export) বলা হয়।

একটী দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে মোট পাওনার পরিমাণ হইল—দৃশ্য এবং অদৃশ্য রপ্তানীর মূল্য ; এবং উহার মোট দেনার পরিমাণ হইল, দৃশ্য এবং অদৃশ্য আমদানীর মূল্য। একটী দেশের মোট রপ্তানী হইতে মোট

পাওনা এবং মোট আমদানী হইতে মোট দেনা যে হিসাবে প্রথিত হয়—তাহাকে হিসাব-নিরিখ (Balance of Account) বা মূল্যপ্রদানের নিরিখ (Balance of Payments) বলা হয়।

বাণিজ্য-নিরিখ হইতে একটী দেশের **শুধুমাত্র মালের** আমদানী ও রপ্তানী হইতে দেনাপাওনার হিসাব পাওয়া যায়। হিসাব-নিরিখ হইতে একটী দেশের **সকল প্রকার** আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব পাওয়া যায়।

(অণু-৫) আমদানী ও রপ্তানীর সমতা—*Equality of Imports and Exports*

অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে একটী দেশের আমদানী এবং রপ্তানী সমান হইবে। একটী দেশ বিদেশ হইতে যত মূল্যের আমদানী করিবে ঠিক সম-মূল্যের রপ্তানী উহা বিদেশগুলিতে করিবে। এক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানী বলিতে মাল এবং কার্য্য,—উভয়েরই আমদানী ও রপ্তানী বুঝাইতেছে। আরও সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে একটী দেশের **বাণিজ্য-নিরিখ** সমতুল অথবা অনুকূল অথবা প্রতিকূল হইতে পারে—কিন্তু উহার **হিসাব নিরিখ** সকল সময়েই সমতুল হইবে।

এইরূপ হইবার কারণ মোটামুটি দুইদিক হইতে বিশ্লেষণ করা চলে :—

(১) ধরা যাউক একটী গ্রামে দুইটী মাত্র লোক বাস করে। একজন লোক চাউল উৎপাদন করে এবং কেবলমাত্র চাউলের দ্বারা জীবন ধারণ করে; অপর লোক কলা উৎপাদন করে এবং কেবলমাত্র কলার দ্বারা জীবন ধারণ করে; একদিন চাউল-উৎপাদনকারী কলা-উৎপাদনকারীর নিকট ৫ সের চাউল বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল—উহার দাম ২৲ টাকা। কলা-উৎপাদনকারী রাজী হইল; কিন্তু সে চাউলের মূল্য কোথা হইতে পাইবে? তাহার বাড়তি-কলা যদি চাউল উৎপাদনকারী ক্রয় করে—শুধু তাহাই নহে—ঠিক ২৲ টাকা পরিমাণের কলা যদি চাউল উৎপাদনকারী ক্রয় করে—তাহা হইলেই কলা উৎপাদনকারী চাউল কিনিতে পারিবে। একটী দেশের বহির্বাণিজ্য ঠিক এইরূপ। একটী দেশ বিদেশগুলি হইতে যত মূল্যের সামগ্রী (মাল এবং কাজ) আমদানী করিতে পারে তাহা নির্ভর করে বিদেশগুলি যত মূল্যের সামগ্রী (মাল এবং কাজ) উহার নিকট হইতে লইতে প্রস্তুত থাকিবে তাহার উপর। একটী দেশ বিদেশ সমূহে ঠিক যে মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী করিতে পারে, ঠিক সেই মূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করিবার মতন তাহার ক্ষমতা জন্মায়। প্রত্যেক দেশের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য অতএব প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানী সমান হইবে।

(২) যখন একটী দেশের বাণিজ্য-নিরিখ অনুকূল হয় তখন উহার অর্থ হইল যে বিদেশ-সমূহ উহার কাছে ঋণী। এই ঋণ বিদেশগুলি পরিশোধ করিতে পারে দুই উপায়ে—যে পরিমাণে ঐ দেশের বাণিজ্য-নিরিখ অনুকূল সেই পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ পাঠাইয়া অথবা হুণ্ডি পাঠাইয়া। এই স্বর্ণ বা হুণ্ডি হইল ঐ দেশের আমদানী। ইহা আসিবার পর ঐ দেশের আমদানী ও রপ্তানী সমান হইবে। অপর পক্ষে একটী দেশের বাণিজ্য-নিরিখ যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে উহা বিদেশ সমূহের নিকট ঋণী। এই ঋণ পরিশোধের জন্য ঐ দেশ, বিদেশে স্বর্ণ বা হুণ্ডি পাঠাইতে বাধ্য। স্বর্ণ বা হুণ্ডি প্রেরণ হইল ঐ দেশের রপ্তানী এবং ঐ রপ্তানী হইবার পর ঐ দেশের আমদানী ও রপ্তানী সমান হইবে।

সেইজন্য বলা হয়, "চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য হইল এক ধরণের সামগ্রী-বিনিময়।" ["International Trade is, in the last analysis, a kind of barter."]

(অণু-৬) অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—*Free Trade and Protection*

একটী রাষ্ট্র তাহার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে—অর্থাৎ কোনো সামগ্রীর আমদানীতে বা রপ্তানীতে কোনো উৎসাহও দেয় না বা কোনো প্রতিবন্ধকও দেয় না, তখন উহার বহির্ব্বাণিজ্যকে বলা হয় অবাধ বাণিজ্য (Free Trade)।

একটী রাষ্ট্র তাহার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যকে কৃত্রিম ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন শিল্পকে অন্য দেশের শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা—অথবা অন্য দেশের শিল্পের সহিত টক্কর দিবার যোগ্য করিয়া তুলা। ইহাকে বলা হয় "সংরক্ষণ" (Protection)—অর্থাৎ দেশজ শিল্পের সংরক্ষণ। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহির্ব্বাণিজ্যকে সাধারণতঃ যে উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাহা হইল, আমদানীকৃত সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত* শুল্ক ধার্য্য করা। আমদানীকৃত সামগ্রীর উপরে অতিরিক্ত শুল্ক বসাইলে, দেশের বাজারে ঐ সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়—কারণ আমদানীকারক যে শুল্ক

* "অতিরিক্ত" শব্দটীর অর্থ হইল এই যে অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একটী দেশের গভর্ণমেণ্ট আমদানীর উপর শুল্ক বসাইতে পারেন। কিন্তু এই শুল্কের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আয় করা। এই শুল্কের হার অধিক হয় না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করেন তখন অবাধ বাণিজ্যের আওতায় যে পরিমাণ শুল্ক ধার্য্য থাকে তাহা অপেক্ষা অধিক হারেই শুল্ক ধার্য্য করা হয়।

প্রদান করিয়া থাকে তাহা সামগ্রীর দামের সহিত যোগ করে। আমদানীকৃত সামগ্রীর মূল্য বাড়িলে দেশে প্রস্তুত সামগ্রীর বেশী কাটতি হইবে এবং ঐ শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে।

(অণু-৭) সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—*Arguments for Protection*

সংরক্ষণ নীতির পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে:—(১) দেশে উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর বিদেশে কিরূপ বাজার হইবে তাহা অনিশ্চিত; অতএব দেশের মধ্যেই যাহাতে দেশজ পণ্যের বাজার অক্ষুণ্ণ থাকে,—বিদেশী মালের প্রতিযোগিতায় দেশের বাজারকে যাহাতে দেশজ পণ্য হারাইয়া না ফেলে, সময় থাকিতে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। (২) রাষ্ট্রকে আত্মপর্য্যাপ্ত (Self sufficient) হইতে হইবে। রাষ্ট্রের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অবশ্য প্রয়োজন সে সকল সামগ্রী যাহাতে দেশের মধ্যেই প্রস্তুত হয় সেই উদ্দেশ্যে দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্প-সামগ্রীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ এইগুলি যদি দেশের মধ্যে উৎপাদিত না হইতে পারে এবং সেই কারণে ঐগুলির জন্য যদি রাষ্ট্রকে চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে আকস্মিক কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হইলে রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। (৩) যথাযথ অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের শিল্পের বৈচিত্র্য বিধান (Diversification of Industries) প্রয়োজন। একটী রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কেবল একই-প্রকার শিল্প থাকে তাহা হইলে ঐ দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন ঐ একপ্রকার শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকিবে। ইহার বিপদ হইল যে ঐ বিশেষ শিল্পে কোনো কারণে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে—দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। দেশে অন্য শিল্প না থাকিলে একটী শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হইলে ঐ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বেকার হইবে—অন্য শিল্প না থাকার দরুণ তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোনো পথ থাকে না। বিশেষ করিয়া যে দেশ কৃষিসামগ্রী উৎপাদনের উপর অধিক নির্ভরশীল তাহার উচিত শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া শিল্পের বৈচিত্র্য বিধান করা; (৪) কোনো দেশে কোনো একটী সামগ্রী কখনও কখনও অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া যায়। উহার যোগান অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবার দরুণ উহার দাম খুব কমিয়া যায়। উৎপাদনকারী তখন নিজের দেশে উহা বিক্রয় না করিয়া বিদেশে চালান করিয়া দেয়। ইহাতে দুই কাজ হয়, প্রথম, নিজের দেশের বাজার নষ্ট করা হইল না (দেশের ক্রেতারা সস্তায় জিনিষ কিনিতে অভ্যস্ত হইলে উৎপাদনকারীর বাজার নষ্ট হয়)

দ্বিতীয়, বৈদেশিক বাজার জিতিয়া লওয়া যায়। এইরূপ কাজকে বলা হয় ডাম্পিং (dumping) এবং ঐ সামগ্রীকে ডাম্প সামগ্রী (dumped goods) বলা হয়। কিন্তু যে দেশে এইরূপ ডাম্প সামগ্রী বিদেশ হইতে আসে সেই দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই দেশ ঐ ডাম্প সামগ্রীর উপরে অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া দেশজ শিল্পকে সংরক্ষণ করিলে তাহা সমর্থনযোগ্য। (৫) কোনো কোনো দেশ শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর নহে কিন্তু শিল্পোন্নতির জন্য যে যে উপাদান প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই উহার মধ্যে বর্ত্তমান। অপরদিকে শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি হইতে যে মাল আমদানী করা হয় তাহার দাম সস্তা এবং উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেশীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের মতন দক্ষতা সহকারে উৎপাদন করিতে পারে না; অতএব বিদেশী সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের ন্যায় সস্তায় সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে না। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকে শিশু শিল্প বলা চলে। শিশুকে যেভাবে বিবিধ প্রয়াসের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করিলে উত্তরকালে সে স্বাবলম্বী হইতে পারে সেইরূপ নবপ্রতিষ্ঠিত বা শিশু শিল্পকে সংরক্ষণ নীতির দ্বারা বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিলে উত্তরকালে উহা স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। যতই দিন যাইবে ততই তাহারা দক্ষতা অর্জ্জন করিবে এবং উন্নততর ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করিতে শিখিয়া কম খরচায় অধিক উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। তখন উহা সংরক্ষণ ব্যতীতই বৈদেশিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। ইহাতে দেশের অতি দ্রুত শিল্পোন্নতি হইবে। সংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তিটীকে বলা হয় শিশুশিল্পের যুক্তি (Infant Industries Argument)

(অণু-৮) অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—*Arguments for Free Trade.*

অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনকারীগণ সংরক্ষণের কুফল বিশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের পক্ষের যুক্তি সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন (১) বিদেশী সামগ্রীর দেশের মধ্যে বিক্রয় হইতে বাধা দিলে বিদেশগুলিও ঐ দেশের সামগ্রী তাহাদের দেশে বিক্রয় হইতে বাধা দিবে—সেহেতু ঐ দেশের রপ্তানী হ্রাস পাইবে। অতএব একদিকে যেমন শিল্প গড়িয়া উঠিবে অপরদিকে তেমনি যে সকল শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় হইত সেই সকল শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। (২) বিদেশজাত সামগ্রীর আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইলে ক্রেতাদিগকে

একই সামগ্রী অধিক দামে ক্রয় করিতে হয়। ইহাতে মালিক-শ্রেণী লাভবান হয়। অবাধ বাণিজ্য থাকিলে সস্তাদরে মাল ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়া জনসাধারণ উপকৃত হয়। (৩) সংরক্ষণের দ্বারা কৃত্রিম ভাবে প্রতিযোগিতা ব্যাহত করা হয়; সেই কারণে কম খরচে উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শিল্পপতিগণ যথাসাধ্য চেষ্টিত থাকেন না। তাঁহারা যে সামগ্রী উৎপাদন করিবেন তাহাই বিক্রয় হইবে—উহার প্রতিযোগী নাই। অবাধবাণিজ্যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়—এবং সেইজন্য শিল্পপতিগণ সকল সময়েই সজাগ বা সচেষ্ট থাকিয়া যতদূর সম্ভব দক্ষতা সহকারে উৎপাদন কার্য্য পরিচালন করেন। (৪) অবাধ বাণিজ্যের আওতায় প্রকৃত আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব প্রসার লাভ করে।

(অণু-৯) উপসংহার—অবাধ-বাণিজ্যই প্রকৃত লক্ষ্য হিসাবে থাকা উচিত এবং দুইটী ক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতির দাবী স্বীকৃত হওয়া সম্ভব, প্রথম শিল্পে অনগ্রসর কিন্তু শিল্প-সম্ভাবনাপূর্ণ দেশের শিশু শিল্পকে উন্নত করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় ডাম্প-সামগ্রীর প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য। উভয়-ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সময় থাকিবে সীমাবদ্ধ। শিশুশিল্প সংরক্ষণের আওতায় বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইলে এবং ডাম্প সামগ্রীর আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে সংরক্ষণ অপসারণ করা কর্ত্তব্য।

Questions & Hints

1. What are the advantages which a country derives from foreign trade? (1945) [অণুচ্ছেদ—২ সুবিধা।]

2. What is meant by the expression 'balance of trade"? (1945) [অণুচ্ছেদ—৩]

3. State the infant industry argument for protection (1941)

[৭নং অণুচ্ছেদের শেষাংশ,—"কোনো কোনো দেশ" হইতে "বলা হয় শিশুশিল্পের যুক্তি (infant industries argument)" পর্য্যন্ত।]

4. Do you advocate Protection or Free Trade? [অণুচ্ছেদ ৭, ৮, ৯]

5. "International Trade is, in the last analysis, a kind of barter." Elucidate this statement. (1948) [অণুচ্ছেদ—৫]

অষ্টাদশ অধ্যায়

বণ্টন ও জাতীয় বণ্টন ভাণ্ডার

Distribution and National Dividend.

(অণুচ্ছেদ-১) বণ্টনের অর্থ—*Meaning of Distribution.*

উৎপাদনের প্রক্রিয়া যখন সরল ছিল বণ্টনের প্রশ্ন তখন ছিল না বলিলেই হয়। উৎপাদনকারী নিজের ভূমি ও পুঁজির দ্বারা নিজের পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে যখন উৎপাদন করিত, পণ্য বিক্রয় হইতে লব্ধ সমগ্র আয় তখন সে স্বয়ং গ্রহণ করিত। এখন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের মালিক বিভিন্ন লোক—তাহাদের সকলের সহযোগিতায় একটী সামগ্রী কিছু পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এই সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয়ের মালিক হইল উৎপাদক—উপাদানগুলির মালিক সকলেই। উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয় ইহাদের প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত বণ্টনের প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িত। অধ্যাপক ঘোষের ভাষায়, "বণ্টন বলিতে বুঝায় সেই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে যাহার দ্বারা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু ও উপাদানগুলির সরবরাহকারীগণ তাহাদের পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে। [Distribution is the economic process by which the suppliers of the different factors and commodities earn their remuneration"—GHOSH]

(অণু-২) কোন্ জিনিষটীকে বণ্টন করা হইবে—*What is to be Distributed ?*

একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভূমি, পুঁজি, শ্রম ও ব্যবস্থাপনার সংযোগে মোট যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইল—উহা হইল সাকল্য উৎপাদন (Gross Product)। এই সাকল্য উৎপাদন বণ্টন করা হইবে না। ইহা হইতে একটী জিনিষ বাদ দিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসর উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া পুঁজি-সামগ্রীর ক্ষয় হইয়া থাকে বা ক্ষতিও হইতে পারে। ইহার জন্য মেরামতী প্রয়োজন ও ক্ষয়ের পূরণের জন্যও পৃথক করিয়া কিছু মূল্য রাখিয়া

দেওয়া প্রয়োজন। ইহাকে বলা যায় ক্ষয়-ক্ষতি-পূরণ খরচা। প্রত্যেক বৎসর উৎপাদন কার্য্য শেষ হইলে ঐ বৎসরের দরুণ পুঁজির ক্ষয়-ক্ষতি-পূরণের খরচা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

"সাকল্য উৎপাদন" (Gross Product) হইতে পুঁজির ক্ষয়-ক্ষতি-পূরণের খরচা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল "নীট-উৎপাদন (Net Product). এই নীট-উৎপাদন বণ্টন করা হইবে ; ইহাই হইল বণ্টনযোগ্য পরিমাণ।

একটী দেশের মধ্যে যতপ্রকার শিল্প আছে—সকল শিল্প হইতে যাহা "নীট উৎপাদন" হয় তাহাদের একত্রিত পরিমাণকে বলা হয় "জাতীয় বণ্টন ভাণ্ডার" (National Dividend)। একটী বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলিতে হয় যে উহার "নীট-উৎপাদন" হইল বণ্টনযোগ্য পরিমাণ ; এবং একটী দেশের পক্ষে সমগ্রভাবে বলা যায় যে উহার "জাতীয় বণ্টনভাণ্ডার" হইল, বণ্টনযোগ্য পরিমাণ।

(অণু-৩) বণ্টন,—কাহাদিগের মধ্যে ? *Distribution—among whom ?*

সম্পদ উৎপাদনের জন্য যাহাদিগের সাহায্য প্রয়োজন তাহাদিগের মধ্যেই "নীট উৎপাদন" বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। নীট উৎপাদনের বণ্টন হইতেই উৎপাদনের সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের উপার্জ্জন পাইয়া থাকে—এই উপার্জ্জন না পাইলে তাহাদের কার্য্য তাহারা দিবে না। সম্পদ উৎপাদনের জন্য মোট চারিপ্রকার উপাদান প্রয়োজন—যথা ভূমি, পুঁজি, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা (ঝুঁকিবহন সমেত)। এই চারিটী উপাদান যাঁহারা সরবরাহ করেন তাঁহাদের মধ্যেই নীট উৎপাদন বণ্টন করা হয়। ভূস্বামীদিগকে খাজনা দেওয়া হয়, শ্রমিকগণ মজুরী পান, পুঁজিপতিদিগকে স্থদ প্রদান করা হয় এবং ব্যবস্থাপক পান মুনাফা।

এখানে ভূস্বামী, শ্রমিক, পুঁজিপতি ও ব্যবস্থাপক ইহাদিগকে যেন এক একটী শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের মোট জাতীয় ভাণ্ডার দেশের চারিটী শ্রেণীর মধ্যে থোক্ হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় না। দেশের সকল শিল্পের সকল উৎপাদন হইতে নীট উৎপাদন কার্য্যতঃ কখনও একত্রিত করা হয় না এবং সকল উপার্জ্জনকারীকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এক এক শ্রেণীর মধ্যে এক এক থোক মুদ্রা ফেলিয়া দেওয়া হয় না। এক একটী পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পৃথক ভাবে বণ্টন-কার্য্য

সম্পন্ন করা হয় এবং একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নীট উৎপাদন, উৎপাদনে সাহায্যকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে বণ্টন করা হয়। 'পেনসনের' ভাষায় "বণ্টনকার্য্যের দ্বারা ব্যক্তিদের উপার্জ্জন নির্দ্ধারিত হয়, শ্রেণীদের নহে।" ["Distribution is the determination of the income of the individuals and not of classes"—PENSON]

(অণু-৪) বণ্টনের পদ্ধতি—*Method of Distribution*

উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা যিনি করেন বণ্টনের দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পিত। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আধুনিক রাশীকৃত উৎপাদনের আওতায়, সামগ্রী উৎপাদিত হইতে অনেক সময় লাগে—সম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদন শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে হয়। অতএব নীট উৎপাদনের একটা অনুমান করিয়া লইয়া সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থাপক অন্যান্য সকল উৎপাদক উপাদানের সরবরাহকারীগণকে তাহাদের প্রাপ্য বণ্টন করিয়া দেন। অপর সকলের প্রাপ্য বণ্টন করিয়া দিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হইল ব্যবস্থাপকের প্রাপ্য—ইহার নাম মুনাফা।

কিন্তু অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির যাহা প্রাপ্য তাহা কি ব্যবস্থাপক নিজের খেয়ালখুশীমত স্থির করেন? না, তাহা হইতে পারে না, ঠিক যেমন একজন ক্রেতা তাহার ইচ্ছামত কোনো একটী সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত করিতে পারে না। ব্যবস্থাপক হইলেন উৎপাদক উপাদানগুলির কার্য্যের ক্রেতা এবং উৎপাদক-উপাদানগুলির প্রাপ্য হইল তাহাদের কার্য্যের দাম।

যে পদ্ধতিতে সাধারণ সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত হয় সেই ভাবেই একটী উৎপাদক-উপাদানের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত হয়—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা।

উৎপাদক-উপাদানের চাহিদাকারী হইলেন ব্যবস্থাপক। তিনি নীট উৎপাদনের একটী পূর্ব্ব-অনুমান করিয়া লন এবং একটী উৎপাদক-উপাদান নীট উৎপাদনের কতখানি অংশ উৎপাদন করিবে তাহার অনুমান করেন। ইহা হইল তাঁহার চাহিদা দাম—অর্থাৎ একটী উৎপাদক-উপাদান যতখানি পারিশ্রমিক পাইতে পারে তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ। কিন্তু আঁত্রেপ্রনা ঠিক এই পরিমাণ পারিশ্রমিক যে ঐ উৎপাদক উপাদানকে দিবেন তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই,—উহা অপেক্ষা যতটা কম পারিশ্রমিক দিতে পারা যায় তাহার

চেষ্টা করিবেন। কারণ অন্যান্য উৎপাদক-উপাদানকে যতই কম পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে—আঁত্রেপ্রনার মুনাফা হইবে ততই বেশী। অপরপক্ষে উৎপাদক উপাদানের মালিকগণ মনে মনে একটী ন্যূনতম দাম স্থির করিয়া রাখেন যাহার কমে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের যোগান দিবেন না। তাঁহাদের কার্য্য অপর কাহাকেও দিতে কি পরিমাণে তাঁহাদের কষ্ট বা অসুবিধা হইতে পারে বা ঐ কার্য্যে যোগ্য হইবার জন্য তাঁহাদের যে পরিমাণ খরচা হইয়াছে, উহার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের ন্যূনতম দাম স্থির করেন। কিন্তু উহা অপেক্ষা যতটা সম্ভব অধিক দাম আদায়ের জন্য তাঁহারা চেষ্টিত হন।

এই উর্দ্ধতম ও ন্যূনতম দামের মধ্যে দরকষাকষির দ্বারা যে দামে একটী উৎপাদক-উপাদানের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হয়—সেই দাম ঐ উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য পারিশ্রমিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

Questions & Hints.

1. Explain what is meant by Distribution and National Dividend, (1929)

[অণুচ্ছেদ—১ এবং ২]

2. What are the general principles determining the rate of remuneration for the services of a factor ? [অণুচ্ছেদ—৪]

ঊনবিংশ অধ্যায়

খাজনা

Rent

(অণুচ্ছেদ-১) খাজনার অর্থ—*Meaning of Rent*

অর্থনীতিতে খাজনা বলিতে বুঝায় নিছক ভূমির ব্যবহারের জন্য ভূস্বামীকে প্রদেয় দাম। ইংরাজিতে 'খাজনা' এবং 'ভাড়া' উভয় অর্থেই Rent শব্দটী প্রযুক্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাজনা এবং ভাড়া (যথা বাড়ীভাড়া) এক বস্তু নহে। ভাড়ার মধ্যে পুঁজি এবং ভূমি উভয়ের জন্যই প্রদেয় দাম অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু খাজনার মধ্যে কেবলমাত্র ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম থাকে। অর্থনীতিতে যখন ইংরাজি rent শব্দটী ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থ হইল 'খাজনা'—ভাড়া নহে।

দুই দিক হইতে বিচার করিয়া খাজনাকে দুইটী পর্য্যায়ে বিভাগ করা যায়। (১) অর্থনৈতিক খাজনা (২) চুক্তি-খাজনা।

(অণু ২) অর্থনৈতিক খাজনা—*Economic Rent*

একখণ্ড ভূমিতে উৎপাদন করিবার পর খরচা বাদে যে উদ্বৃত্ত আয় থাকে উহাকে অর্থনৈতিক খাজনা বা economic rent বলা হয়। উৎপাদকের পরিশ্রমের দরুণ যে ন্যায্য আয় তাহার হওয়া উচিত উহাও উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ধরা যাউক একজন ব্যক্তি একখণ্ড ভূমিতে চাষ করিয়া ১০০ মণ শস্য পাইয়াছেন এবং ৫৲ টাকা মণ দরে উহা বিক্রয় করিয়া ৫০০৲ টাকা আয় করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি শ্রমিকের মজুরী ৩০০৲ এবং পুঁজির সুদ ২৫৲ টাকা প্রদান করিলেন এবং নিজের ব্যবস্থাপনার পরিশ্রমের দরুণ ১০০৲ টাকা প্রাপ্য ধরিলেন। এই ৪২৫৲ টাকা তাঁহার উৎপাদনের খরচা। উৎপাদনের মোট আয় হইতে এই খরচা বাদে যে ৭৫৲ টাকা থাকিল উহা হইল ভূমি চাষ হইতে উৎপাদনকারীর লভ্য উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত হইল অর্থনৈতিক খাজনা। 'পেন্‌সন্‌' বলেন, "চাষের সকল খরচা প্রদান করিবার পর এবং নিজের উৎপাদন প্রচেষ্টার দরুণ

পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার পর কৃষকের নিকট যে উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা।*

(অণু-৩) চুক্তি খাজনা—*Conrtact Rent*

ভূস্বামী স্বয়ং যদি একখণ্ড ভূমির চাষ করেন তাহা হইলে, সকল খরচা বাদে উৎপাদন হইতে যে উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা সম্পূর্ণ পরিমাণে তিনি পাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যদি ভূমিটুকু অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন—অর্থাৎ রায়তকে—তাহা হইলে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ঐ অপরব্যক্তি (রায়ত) গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভূস্বামী উহা রায়তকে লইতে দিবেন কেন? তাহার কারণ রায়ত ভূমিটী ব্যবহার করিয়া উহা হইতে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত স্বয়ং গ্রহণ করিবে বটে কিন্তু উহার দরুণ সে ভূস্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিবে। কত ক্ষতিপূরণ রায়ত দিবে—তাহা ভূস্বামী ও রায়তের মধ্যে একটী চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। এই চুক্তি লিখিত হইতে পারে বা মৌখিকও হইতে পারে। ইহাকে বলা হয় চুক্তি খাজনা (contract rent)।

অর্থনৈতিক খাজনা এবং চুক্তি খাজনার সম্পর্ক ও পার্থক্য অধ্যাপক 'পেন্‌সন্' খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমরা সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিষটীকে খাজনা বলিয়া ব্যক্ত করি—অর্থাৎ রায়তের দ্বারা ভূস্বামীকে প্রদেয় দাম,—অর্থনৈতিক খাজনা তাহা নহে। ইহা (অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনা) হইল সেই—উদ্বৃত্তটুকু যাহা উৎপাদনকারীর কাছেই থাকিয়া যায় এবং যাহার দরুণ, সে (অর্থাৎ উৎপাদনকারী) যদি রায়ত হয়, তাহা হইলে ভূস্বামীকে চুক্তি খাজনা দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে"†।

(অণু-৪) রিকার্ডো-প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞা—*Ricardo's Definition of Rent.*

প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ 'ডেভিড রিকার্ডো' খাজনার এইরূপ সংজ্ঞা

---

* "It (i.e., economic rent) is the surplus which remains to the cultivator after he has paid all expenses of cultivation and has remunerated himself for his own productive effort" PENSON.

† The economic rent is not that payment by a tenant to his landlord which in ordinary life we speak of as rent but it is the surplus which remains to the producer, for which if he is a tenant, he pays a compensation in form of a contract rent."—PENSON.

প্রদান করিয়াছেন, "মাটীর আদিম ও অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য ভূমি হইতে উৎপাদনের যে অংশটুকু ভূস্বামীকে প্রদান করা হয় তাহাকেই খাজনা বলে।" ["Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil"—RICARDO] রিকার্ডোর দ্বারা প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটীর মধ্যে গোটাকয়েক ত্রুটি আছে: (১) প্রাচীন দেশে যেখানে একখণ্ড ভূমি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বহুবার পুঁজি নিয়োগের দ্বারা যাহার উন্নতি বিধান করা হইয়াছে—সেক্ষেত্রে ভূমির কতখানি আদিম ক্ষমতা ছিল তাহা হিসাব করিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। অতএব ভূমির ব্যবহারের মূল্যের মধ্যে কতখানি মূল্য ভূমির আদিম শক্তির দরুণ এবং কতখানি উহার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত পুঁজির দরুণ প্রদেয়—তাহা হিসাব করা সম্ভব নহে। (২) মাটীর শক্তি অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি অক্ষয় নহে। মাটীর মধ্যে যে রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্বের দরুণ উহার উর্ব্বরতা—তাহা ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব খাজনা মাটীর অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় মূল্য বলা চলে না। (৩) 'রিকার্ডো' 'ভূমি ও মাটী' একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। খাজনা হইল ভূমির ব্যবহার হইতে আয় এবং অর্থনীতিতে ভূমি বলিতে কেবলমাত্র মাটী বুঝায় না—যাহা কিছু প্রকৃতির দান তাহাই 'ভূমি'।

'রিকার্ডো'র প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে একটী গুণও ছিল। তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে খাজনার মধ্যে পুঁজির ব্যবহারের জন্য মূল্য অর্থাৎ সুদ অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অনেক লেখক এই ভুলটীই করিতেন; তাঁহারা খাজনার মধ্যে ভূমিতে নিয়োজিত পুঁজির জন্য প্রদেয় মূল্যও অন্তর্ভুক্ত করিতেন। 'রিকার্ডো'র প্রদত্ত সংজ্ঞার ত্রুটিগুলি পরিহার করিয়া এবং উহার গুণটী গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক 'মার্শাল' খাজনার সংজ্ঞাস্বরূপ বলিলেন, "ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দানের মালিকানা হইতে যে আয় হয় তাহাকে সাধারণতঃ খাজনা বলে।" ["The income derived from land and other free gifts of nature is commonly called rent"—MARSHALL]

(অনু-৫) রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব—*Ricardo's Theory of Rent*

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব, বণ্টন-তত্ত্বের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব দুইটী পর্য্যায়ে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার অভিমত আমরা সঠিক বুঝিতে পারিব। (১) রিকার্ডোর

খাজনাতত্ত্বের **স্থিতিশীল দিক** (Static aspect) এবং (২) উহার **গতিশীল দিক** (Dynamic aspect)।

(১) রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের **স্থিতিশীল দিক** বলিতে বুঝায় তাঁহার সেই আলোচনা যাহার দ্বারা তিনি খাজনা কি এবং উহা কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন।

রিকার্ডো বলেন যে খাজনা হইল জমির আদিম ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম। ইহার মধ্যে পুঁজি-ব্যবহারের জন্য প্রাপ্তব্য আয় বা প্রদেয় দাম অন্তর্ভুক্ত নহে। নিছক জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় এই দাম অর্থাৎ খাজনা নির্দ্ধারিত হয় বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ উর্ব্বরতার পার্থক্যের দ্বারা। একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভূখণ্ডের উৎপাদিকা শক্তির (উর্ব্বরতার) পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের দরুণ দুই খণ্ড সমপরিমাণ জমিতে একই পরিমাণ খরচা দ্বারা (অর্থাৎ সমপরিমাণ শ্রম ও পুঁজির দ্বারা) বিভিন্ন পরিমাণের শস্য উৎপাদন হয়। একই খরচায় উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক উৎপাদন হয় এবং নিকৃষ্ট জমিতে তাহা অপেক্ষা কম উৎপাদন হয়। যে জমিতে কম উৎপাদন হইল সেই জমিতে প্রতিমাত্রা সামগ্রীর উৎপাদন খরচা অধিক। ধরা যাউক শ্রম ও পুঁজির দরুণ ১০০৲ টাকা ব্যয়ের দ্বারা উৎকৃষ্ট জমিতে ৫০ মণ শস্য এবং সমপরিমাণ নিকৃষ্ট জমিতে ৪০ মণ শস্য উৎপাদিত হয়; এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমিতে প্রতিমণ শস্য উৎপাদনের খরচা হইল ২৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট জমিতে প্রতিমণ শস্য উৎপাদনের খরচা হইল ২॥০ আনা। সমাজের যদি এমন প্রয়োজন থাকে যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—উভয় জমিতেই চাষ করা হইবে (অর্থাৎ সমাজে শস্যের চাহিদা যদি ৯০ মণ হয়) তাহা হইলে প্রতিমণ শস্যের দাম হইবে ২॥০—অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচার সমান।* নচেৎ নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবে না। কিন্তু শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচার ঠিক সমান হইলে চাষী চাষ করিবে কেন? তাহার কারণ শ্রমিকের মজুরী ও পুঁজির সুদ যেমন উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত, তেমনি উৎপাদকের ন্যায্য প্রাপ্য মুনাফা—অর্থাৎ তাহার ব্যবস্থাপনার জন্য পারিশ্রমিকও, উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

* "The exchangeable value of all commodities is always regulated by... the greater quantity of labour necessarily bestowed on their production...by those who continue to produce them under the most unfavourable circumstances."

—RICARDO.

একই বাজারে একই সামগ্রীর একই দাম হইবে। নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদিত শস্য যে দরে বিক্রয় হইবে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদিত শস্যও সেই দরেই বিক্রয় হইবে। অতএব নিকৃষ্ট জমিতে মোট উৎপাদিত শস্য বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে (উপরোক্ত দৃষ্টান্তে ৪০ মণ শস্য আড়াই টাকা দরে বিক্রয় করিয়া আয় হইল ১০০৲ টাকা) উৎকৃষ্ট জমিতে মোট উৎপাদিত শস্য বিক্রয় করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আয় হইবে (৫০ মণ শস্য আড়াই টাকা দরে বিক্রয় করিয়া আয় হইল ৫০ × ২॥০ = ১২৫৲ টাকা)—কারণ শস্যের দর একই কিন্তু উর্বরতার পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন ভূখণ্ডে উৎপাদনের পরিমাণে পার্থক্য রহিয়াছে। নিকৃষ্ট জমির আয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমির আয়ের এই আধিক্য (উৎকৃষ্ট জমির বাড়তি আয় রহিয়াছে ২৫৲ টাকা) হইল "খাজনা"*। চাষীরা সকলেই উৎকৃষ্ট জমিটা চাহিবে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া ঐ বাড়তি আয় জমির মালিককে প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

(২) রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের **গতিশীল দিক** বলিতে বুঝায় তাঁহার সেই আলোচনা যাহার দ্বারা তিনি, খাজনার কি ভাবে উদ্ভব হয় এবং বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ খাজনার উদ্ভব হয় এবং বৃদ্ধি হয়। লোকসংখ্যা যখন খুব কম থাকে তখন শস্যের চাহিদা থাকে কম; অল্প পরিমাণ জমিতেই চাষ হয়—সে তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির প্রাচুর্য্য থাকে; প্রয়োজনের তুলনায় যাহার প্রাচুর্য্য আছে তাহার ব্যবহারের জন্য কেহই কাহাকেও খাজনা দেয় না। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে উৎকৃষ্ট জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয় তাহাতে কুলায় না, সেইজন্য নিকৃষ্ট জমি চাষের প্রয়োজন হয়। শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান হইতে হইবে—সেক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমির শস্যও ঐ দামেই বিক্রয় হইবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদনের পরিমাণ অধিক—অতএব উৎকৃষ্ট জমি হইতে বাড়তি আয় অর্থাৎ খাজনার উদ্ভব হইল জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা শুধুই যে খাজনার উদ্ভব হয় তাহাই নহে—ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাজনার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে **অধিকতর নিকৃষ্ট** জমি চাষ করিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ঠিক যেমন উৎকৃষ্ট জমি (ইহাকে বলা যাউক ১নং জমি)

* "Rent is always the difference between the produce obtained by the employment of two equal quantities of capital and labour"—RICARDO.

অপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিতে (ইহাকে বলা যাউক ২নং জমি) উর্ব্বরতা কম থাকিবার জন্য কম পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি ঐ নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে (ইহাকে বলা যাউক ৩নং জমি) আরও কম পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে। ২নং জমিতে ১০০৲ টাকা ব্যয়ে যদি ৪০ মণ শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে ৩নং জমিতে ধরা যাউক ১০০৲ টাকা ব্যয়ে ২৫ মণ শস্য উৎপাদিত হইল—অর্থাৎ ৩নং জমিতে প্রতি মণ শস্য উৎপাদনের খরচা ৪৲ টাকা। বাজারে শস্যের দাম ৪৲ টাকা হইবেই নচেৎ ৩নং জমিতে চাষ হইবে না এবং বর্দ্ধিত জনসংখ্যা বাঁচিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে সকল শস্যের দামই ৪৲ টাকা হইবে।

এক্ষণে ১নং জমি হইতে মোট আয় হইবে ২০০৲ টাকা,—৫০ মণ শস্য ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া। ২নং জমিতে মোট আয় হইবে ১৬০৲ টাকা,—৪০ মণ শস্য ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া। ৩নং জমিতে মোট আয় হইবে ১০০৲ টাকা,—২৫ মণ শস্য ৪৲ দরে বিক্রয় করিয়া; এই ৩নং জমির উৎপাদন খরচা ও আয় সমান, কোনো উদ্বৃত্ত নাই; অতএব এই জমি হইতে কেহ খাজনা পাইতে পারে না। ৩নং জমি চাষ হইবার পূর্ব্বে ২নং জমির এইরূপ অবস্থা ছিল—শস্যের দাম ছিল **ইহার** উৎপাদন খরচার সমান এবং ইহার কোন উদ্বৃত্ত ছিল না। এক্ষণে ইহার ৬০৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইল। অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ ৩নং জমিতে চাষ করিবার প্রয়োজন হওয়ায় ইহার (২নং জমির) ৬০৲ টাকা খাজনার উদ্ভব হইল। আর ১নং জমির কি হইল? উহার খাজনা পূর্ব্বে ২নং জমির আয়ের সহিত ইহার আয়ের পার্থক্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত—এক্ষণে ইহার খাজনা ইহার (১নং) আয়ের সহিত ৩নং জমির আয়ের পার্থক্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। অর্থাৎ ১নং জমির খাজনা পূর্ব্বে ছিল, ২৫৲ টাকা, এখন উহা ১০০৲ টাকায় বর্দ্ধিত হইবে।

রিকার্ডো বলিলেন, "জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি পদক্ষেপেই একটী দেশ যখন উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নিকৃষ্ট গুণের জমি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে, তখন অপর যে সকল জমি উহা অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি পাইবে।" *

---

* "With every step in the progress of population, which shall oblige a country to have recourse to land of a worse quality, to enable it to raise its supply of food, rent, on all the more fertile land, will rise"—RICARDO.

রিকার্ডো আরও একটী বিষয় দেখাইলেন। শস্তের দাম যে জমির উৎপাদন খরচার সমান, সেই জমির কোনো উদ্বৃত্ত নাই—অর্থাৎ খাজনা নাই। অতএব শস্তের দামের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভূক্ত নাই। শস্তের দাম বাড়িয়াছে, **যেহেতু** খাজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—ইহা বলা চলেনা। শস্যের দাম বাড়িয়াছে, **সেহেতু** খাজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলা চলে।

(অণু-৬) চুক্তি খাজনা নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে?—*How is Contract Rent determined ?*

একজন চাষী যদি চাষ করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ভূস্বামীর নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি ব্যবহারের অনুমতি চাহে তাহা হইলে, ভূমিটী ইজারা দিবার সময়েই,—অর্থাৎ উহাতে উৎপাদন কার্য্য সুরু হইবার পূর্ব্বেই,—চাষী ও ভূস্বামীর মধ্যে চুক্তি-দ্বারা ভূস্বামীর প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। ইহাকে আমরা চুক্তি খাজনা বলিয়া অভিহিত করি—ইহা ভূমি ব্যবহারের জন্য উহার মালিককে প্রদেয় দাম। অন্যান্য সামগ্রীর দাম যে বিষয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, এই দামও অর্থাৎ চুক্তি খাজনাও সেই বিষয়ের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়—যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত ভারসাম্যের দ্বারা।

ভূমির চাহিদা—চাহিদা নির্ভর করে উৎপাদন ক্ষমতার উপরে। রায়ত একটী জমি ইজারা লয় কারণ সে মনে করে যে ঐ জমিতে পুঁজি, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করিয়া তাহার যে আয় হইবে, তাহা হইতে পুঁজির জন্য সুদ, শ্রমের জন্য মজুরী এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ লভ্য মুনাফা বাদ দিয়াও, তাহার কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। অর্থাৎ রায়ত জমির ব্যবহার হইতে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আশা করে। যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় সে আশা করে সেই পরিমাণ খাজনা সে দিতে সক্ষম—উহা তাহার দ্বারা প্রদেয় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা; কিন্তু এই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণই যে সে প্রকৃতপক্ষে দিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। উহা অপেক্ষা যতটা কম দিয়া সে পারে তাহার চেষ্টা করিবে।

ভূমির যোগান—আধুনিক যে কোন দেশে সহজ প্রাপ্য এবং উৎপাদনযোগ্য জমির কেহ না কেহ মালিক থাকে। মালিকদের জমি ইজারা দিবার ইচ্ছার উপরে জমির যোগান নির্ভর করে। ভূস্বামী জমি ইজারা দিবার পূর্ব্বে একটী ন্যূনতম খাজনা প্রত্যাশা করিয়া রাখে—যাহার কমে অন্য কাহাকেও জমিটী ব্যবহার করিতে দেওয়া তাহার পোষাইবে না বলিয়া সে মনে করে। সে নিজে তাহার জমিতে উৎপাদন করিলে খরচা বাদে যে উদ্বৃত্ত আয় করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে,

তাহার সেই অনুমিত উদ্বৃত্ত হইবে তাহার প্রত্যাশিত ন্যূনতম খাজনা। ভূস্বামী স্বয়ং চাষের দ্বারা যে উদ্বৃত্ত আশা করে তাহা রায়তের অনুমিত উদ্বৃত্ত অপেক্ষা অনেক কম। কারণ ভূস্বামী জানে পেশাদার চাষী অপেক্ষা তাহার উৎপাদন দক্ষতা অনেক কম অথবা ভূস্বামী কোনো ঝঞ্ঝাটে না গিয়া বসিয়া বসিয়া নির্দ্দিষ্ট আয় কামনা করে অথবা হয়তো সে একখণ্ড ভূমির অধিকারী হইয়াও অপর কোনো পেশায় নিযুক্ত আছে এবং ভূমি চাষের দিকে মন দিলে অন্যান্য কার্য্য হইতে তাহার মোট আয় কমিয়া যাইতে পারে।

অতএব রায়তের একটী উর্দ্ধতম খাজনার আন্দাজ থাকে এবং ভূস্বামীর একটী ন্যূনতম খাজনার আন্দাজ থাকে। যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা এই দুইটী সীমার মধ্যে যেখানে যোগান ও চাহিদার ভার-সাম্য উপস্থিত হইবে—সেই স্থানেই চুক্তি খাজনা নির্দ্ধারিত হইবে।

কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ভূমির পরিমাণ প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্ধারিত এবং যে পরিমাণ ভূমি সহজে প্রাপ্য এবং উৎপাদনযোগ্য তাহার অনুপাতে যে কোনো প্রাচীন দেশেই ভূমির চাহিদা অধিক। যোগান অপেক্ষা ভূমির চাহিদার আধিক্য বিদ্যমান; কারণ, যেহেতু ভূমিতে মানুষের প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় এবং শিল্প সামগ্রীর কাঁচামাল উৎপাদিত হয়, সেহেতু ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের চাহিদা চিরন্তন।

জমির চাহিদার আধিক্যের দরুণ, ভূস্বামীর ভূমি ইজারা দিবার গরজ অপেক্ষা রায়তের জমি ইজারা লইবার গরজ অধিক। ভূস্বামীগণ ভূমি ইজারা **দিবার** জন্য নিজেদের মধ্যে যে পরিমাণ প্রতিযোগিতা করে, রায়তগণ ভূমি ইজারা **লইবার** জন্য নিজেদের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রতিযোগিতা করে। সেই কারণে রায়তের দ্বারা প্রদেয় খাজনা তাহার উৎপাদনের উদ্বৃত্তের প্রায় কাছাকাছি যায়। পেন্‌সন বলেন, "ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দামের (অর্থাৎ খাজনার) এই প্রবণতা দেখা যায় যে উহা উৎপাদকের উদ্বৃত্তের—অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনার সন্নিহিত হইতে চাহে।" [The price paid for its use tends to approximate to the producers' surplus i. e. to the economic rent"—PENSON]

(অণু-৭) অনর্জ্জিত বৃদ্ধি—*Unearned Increment*

কখন কখন ভূমির দাম বৃদ্ধি পাইয়া যায় কিন্তু যে কারণে এইরূপ বৃদ্ধি পায় তাহার মধ্যে ভূস্বামীর কোনোই প্রচেষ্টা থাকে না। ভূস্বামী স্বয়ং তাহার

ভূমির উন্নতির জন্য কোনোরূপ চেষ্টা করে না অথচ তাহার ভূমির চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যায়। উহার দরুণ ভূমি বিক্রয় করিলে উহার দাম—অথবা ভূমি ভাড়া দিলে উহার খাজনা পূর্ব্বের তুলনায় বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে দেখা যায়। ভূস্বামী যদি মেহনৎ বা খরচা করিত এবং সেই কারণে ভূমির দাম বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে ঐ বৃদ্ধিকে তাহার চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জিত বৃদ্ধি বলা যাইত। কিন্তু এখানে যেরূপ বৃদ্ধির কথা বলা হইতেছে তাহাতে ভূস্বামীর এইরূপ কোনো প্রচেষ্টা থাকে না। সেই জন্য ইহাকে বলা হয় অনর্জ্জিত বৃদ্ধি।

এইরূপ বৃদ্ধি বিভিন্ন কারণে ঘটিতে পারে: (১) একটী অঞ্চলকে বেষ্টন করিয়া যদি সহর গড়িয়া উঠিতে থাকে অথবা সহর বিস্তৃত হইয়া ঐ এলাকার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ এলাকার জমির দাম ও খাজনার অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি হয়। (২) কোনো একটী স্থানের সহিত যদি বড় সহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বা যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়—তাহা হইলে ঐ এলাকার ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং উহার দাম ও খাজনা বৃদ্ধি পায়। (৩) একটী এলাকায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির উপার্জ্জন হইতে পারে এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে বাহির হইতে লোক আগমনের দ্বারা ঐ এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং জমির দাম অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পায়। (৪) অন্য কোনো এলাকায় যুদ্ধ বা সামাজিক অশান্তি বা মহামারীর জন্য যদি দলে দলে লোক কোনো একটী বিশেষ অঞ্চলে চলিয়া আসে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের ভূস্বামীগণ অনর্জ্জিত বৃদ্ধি ভোগ করে।*

Questions & Hints

1. Define economic rent. (1948) [অণুচ্ছেদ-২]
2. Explain Ricardo's theory of rent (1939) [অণুচ্ছেদ-৫]
3. Examine the effect of the pressure of population on the rent of land. (1945)

[৫নং অণুচ্ছেদের—'(২) গতিশীল দিক' এই পর্য্যায়ের "লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ খাজনার উদ্ভব" এই শব্দগুলির দ্বারা আরম্ভ করিতে হইবে ও "তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি পাইবে" এই শব্দগুলির দ্বারা শেষ করিতে হইবে।

* খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধির যে তত্ত্ব রিকার্ডো প্রদান করিয়াছেন তাহা পূরাপুরি গ্রহণ করিলে বলিতে পারা যায় যে খাজনা মাত্রই অনর্জ্জিত বৃদ্ধি। তাঁহার মতে, উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার উদ্ভব হয়, কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত নিকৃষ্ট জমিতে চাষের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমির মালিক, খাজনা পাইবার জন্য, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার এবং অপরের জমির উর্ব্বরতা হ্রাস করিবার জন্য মেহনৎ করিয়াছেন—তাহা তো সম্ভব নহে। অতএব তিনি যে খাজনা পাইলেন উহা তাঁহার অনর্জ্জিত।

4. "The price paid for the use of land tends to approximate to the producers' surplus i. e. to the economic rent"—Elucidate the proposition. (1946)

[এই প্রশ্নটীর সঠিক তাৎপর্য্য হইল যে খাজনা (price paid for the use of land) যে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের, অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনার, ঠিক সমান হইবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। একজন চাষী একখণ্ড জমির জন্য যে খাজনা প্রদান করিবে (চুক্তিখাজনা) তাহা এবং অর্থনৈতিক খাজনা যে একই জিনিষ এরূপ ধারণা করিবার কোনো কারণ নাই। লক্ষ্য কর যে এখানে এমন কথা বলিতেছে না যে price paid for the use of land is equal to (অথবা কেবলমাত্র approximates to) the producers' surplus ; এখানে বলা হইতেছে যে উহা *tends to* approximate to the producers' surplus—অর্থাৎ producers' surplus এর কাছাকাছি যায়।

[ইহার উত্তর হইবে অণুচ্ছেদ-৬ সম্পূর্ণ]

5. Explain the term "unearned increment." Show how it arises (1948)

[অণুচ্ছেদ-৭]

বিংশ অধ্যায়

মজুরী

Wages

(অণুচ্ছেদ-১) মজুরীর অর্থ—*Meaning of Wages*

আঁত্রেপ্রনা ভাড়া করিয়াছেন এবং নিযুক্ত করিয়াছেন এইরূপ শ্রমিককে তাহার শ্রমের জন্য প্রদেয় দামকে বলা হয় মজুরী। অতএব স্বাধীন উৎপাদনকারীর (যথা দোকানদার বা অন্য স্বাধীন ব্যবসাদার) আয় অথবা স্বাধীন পেশাজীবীর আয় (যথা উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি) মজুরী পদবাচ্য নহে।

তবে যে শ্রমের জন্য মজুরী দেওয়া হয় তাহা মস্তিষ্কজীবীর শ্রম হইতে পারে অথবা নিছক কায়িক শ্রমজীবীর শ্রমও হইতে পারে। যখনই কোনো শ্রমিকের শ্রম কোনো আঁত্রেপ্রনা ভাড়া করেন ও নিযুক্ত করেন তখন তাহার শ্রমের দামকে মজুরী বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

(অণু-২) আপাত মজুরী ও প্রকৃত মজুরী—*Nominal wages and Real wages*

শ্রমিকগণ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরী হিসাবে কিছু পরিমাণ মুদ্রা পাইয়া থাকে। যে পরিমাণ মুদ্রা তাহারা পাইয়া থাকে তাহাকে বলা হয় আপাত মজুরী (Nominal wages) বা মুদ্রা-মজুরী (Money wages)।

কিন্তু শ্রমিকগণ যে পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া থাকে উহা তাহাদের প্রকৃত মজুরী নহে। উপার্জ্জিত মুদ্রার বিনিময়ে শ্রমিকগণ যতপরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে উহাই হইল তাহাদের প্রকৃত মজুরী। এই দিক হইতে দেখিলে প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে জিনিষের সাধারণ দামের উপরে, যাহাকে বলা হয় দাম-স্তর বা প্রাইস্-লেভেল। দাম-স্তর, অর্থাৎ জিনিষের সাধারণ দাম, যদি বাড়িয়া যায় এবং সেই অনুপাতে মুদ্রা-মজুরী যদি না বাড়ে তাহা হইলে তাহাদের উপার্জ্জনের দ্বারা

শ্রমিকগণ কম পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে পারিবে; তাহাদের প্রকৃত মজুরী হইবে কম। অপর পক্ষে দাম স্তর যদি কমে কিন্তু মুদ্রা মজুরী না কমে, তাহা হইলে শ্রমিকদের আপাত মজুরী বেশী হইবে।

উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঁত্রেপ্রনা শ্রমিকদিগকে মুদ্রা ব্যতীতও গোটাকয়েক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা স্থবিধা দিয়া থাকেন; ঐগুলি শ্রমিকদিগকে হয়তো আপাত মজুরী খরচা করিয়া ক্রয় করিতে হইত অথবা ঐগুলির ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত। যথা একজন শ্রমিক হয়তো মুদ্রা-মজুরীর উপরেও বিনা ভাড়ায় অথবা কম ভাড়ায় বাসস্থান পায়, অথবা বিনা দামে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ বা ভৃত্যের সেবা বা খাদ্য সামগ্রী পায়। তাহার প্রকৃত মজুরী হিসাব করিতে হইলে এই সকল আনুষঙ্গিক স্থবিধাগুলি হিসাব করিতে হইবে কারণ এইগুলি সে শ্রমের বিনিময়ে উপার্জ্জন করে।

অতএব আপাত মজুরী হইল মুদ্রার হিসাবে প্রাপ্ত মজুরী এবং প্রকৃত মজুরী হইল মোট যে পরিমাণ সামগ্রী ও স্থবিধা শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে ভোগ করিবার অধিকারী হয়। প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে (১) তাহার আপাত মজুরীর বিনিময়ে যে পরিমাণ সামগ্রী শ্রমিক ক্রয় করিতে পারে তাহার উপরে এবং (২) মুদ্রামজুরীর উপরেও, শ্রমিক তাহার নিয়োগকারীর নিকট হইতে যে বাড়তি সামগ্রী বা স্থবিধা পায় তাহার উপরে। এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শ্রমিকের প্রকৃত আয় নির্ভর করে প্রকৃত মজুরীর উপরে কারণ আয় হইল মোট লভ্য তৃপ্তি। সেই জন্য 'এ্যাডাম স্মিথ্' বলিয়াছেন, "শ্রমিক ধনী অথবা দরিদ্র হয়, উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট পারিশ্রামিক পায়, তাহার শ্রমলব্ধ প্রকৃত মজুরীর অনুপাতে,—আপাত মজুরীর অনুপাতে নহে।" ["The labourer is rich or poor is well or ill rewarded in proportion to the real and not the nominal wages of his labour"—ADAM SMITH]

(অণু-৩) মজুরী নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে—*How wages are determined*

মজুরী হইল শ্রমের দাম। শ্রমের যোগান ও চাহিদার দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রমের চাহিদা—শ্রমের চাহিদা দুইটী বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, প্রথম শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা এবং দ্বিতীয় উৎপাদিত সামগ্রীর দাম। একজন শ্রমিককে নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে আঁত্রেপ্রনা মনে মনে হিসাব করেন যে ঐ শ্রমিকের শ্রমের

দ্বারা তাঁহার মোট উৎপাদন কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অাঁত্রেপ্রনা পূর্ব্বেই যে সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার উপর আর একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিলে, ঐ নব নিযুক্ত শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক (marginal labourer) বলা হয় এবং এই প্রান্তিক শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা ঐ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। একজন শ্রমিককে নিয়োগ করিবার সময়ে অাঁত্রেপ্রনা তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার (marginal productivity of labour) আনুমাণিক হিসাব করেন। ধরা যাউক পূর্ব্বে নিযুক্ত একশত জন শ্রমিকের দ্বারা অাঁত্রেপ্রনা ১০০০ টী সামগ্রীর উৎপাদন পাইতেছেন। তিনি অনুমান করেন যে উহার উপর আর একজন শ্রমিক অতিরিক্ত নিয়োগ করিলে তাঁহার মোট উৎপাদন হইবে ১০৩০ টী। অতএব অতিরিক্ত শ্রমিকটীর উৎপাদন ক্ষমতা (অর্থাৎ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা) হইল ৩০টী সামগ্রী। এই ৩০টী সামগ্রীর বেশী মজুরী তিনি ঐ শ্রমিককে দিতে পারেন না।

কিন্তু অাঁত্রেপ্রনা তো সামগ্রীর দ্বারা শ্রমিককে মজুরী প্রদান করিবেন না—উহা করিবেন মুদ্রার দ্বারা। অতএব অাঁত্রেপ্রনাকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা হিসাব করিলেই চলিবে না—ঐ উৎপাদিত সামগ্রী কত দামে বিক্রয় হইতে পারে তাহারও আনুমানিক হিসাব তাঁহাকে করিতে হইবে। সামগ্রীর দাম বেশী হইলে তিনি বেশী মজুরী প্রদান করিতে পারেন, দাম কম হইলে তিনি কম মজুরী প্রদান করিবেন।

অতএব শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর দাম—এই দুইটী বিষয়ের সংযোগে একজন শ্রমিককে অাঁত্রেপ্রনা কত মজুরী দিতে পারেন তাহার হিসাব করেন। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন হইল ৩০টী সামগ্রী; ধরা যাউক প্রতিটী সামগ্রীর দাম ৫৲ টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে ৩০ × ৫৲ = ১৫০৲ টাকা মজুরী অাঁত্রেপ্রনা শ্রমিকটীকে প্রদান **করিতে পারেন**। কিন্তু ঠিক এই পরিমাণ মজুরী যে তিনি ঐ শ্রমিককে প্রদান **করিবেন তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই**। ইহা হইল সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মজুরী যাহা অাঁত্রেপ্রনা শ্রমিককে প্রদান করিতে পারেন—কিন্তু ইহা অপেক্ষা যতটা সম্ভব কম মজুরী দিয়া শ্রমিক নিয়োগ করা যায় তাহা তিনি চেষ্টা করিবেন।

শ্রমের যোগান—একটী দেশে কাজ করিবার মতন বয়স হইয়াছে এইরূপ যত লোক বাস করে তাহাদের সংখ্যা হইল ঐ দেশের শ্রমিক-যোগানের উর্দ্ধতম পরিমাণ। অবশ্য মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতার জন্য যাহারা কাজের অনুপযুক্ত

তাহাদিগকে বাদ দিতে হইবে। এইভাবে মোট জনসংখ্যার মধ্য হইতে, যে সংখ্যা দাঁড়াইবে উহা হইবে মোট কার্য্যক্ষম লোকের সংখ্যা বা মোট শ্রমের যোগান।

তবে এই স্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। কোনো কোনো কার্য্যে বিশেষ জ্ঞান বা নৈপুন্য না থাকিলেও শুধু শারীরিক শ্রমের দ্বারাই উহা সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কোনো কোনো কার্য্য আছে যাহা শুধু শারীরিক শ্রমের দ্বারা সম্পাদন করা যায় না; উহাতে বিশেষ বিদ্যা বা নৈপুণ্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এই বিদ্যা বা নৈপুণ্য বিভিন্ন প্রকারের আছে—যথা ছুতার মিস্ত্রীর নৈপুণ্য, কারখানা শ্রমিকের যন্ত্রবিদ্যা, কেরাণীর কার্য্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যা, ডাক্তারের চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। অপর পক্ষে শারীরিক শ্রম কোনো কার্য্যে বেশী প্রয়োজন হয়, কোনো কার্য্যে কম প্রয়োজন হয়।

অতএব বিভিন্ন কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক শ্রম, বিদ্যা বা নৈপুণ্য অনুযায়ী শ্রমিকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। শ্রমিকের যোগান বলিতে বুঝায় এক একটী স্তরের অন্তর্ভূক্ত শ্রমিকের যোগান। শ্রমিকদের এইভাবে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিবার অর্থ হইল যে বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকের ন্যূনতম যোগান দাম থাকে এক এক প্রকার—যাহার কমে ঐ স্তরের শ্রমিকদের যোগান হইবে না।

এক এক স্তরের অন্তর্ভূক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম যোগান দাম নির্ভর করে (১) ঐ স্তরের শ্রমিকগণ যে জীবন যাত্রার মানে অভ্যস্ত ঐ মানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে খরচা পড়ে—অথবা ঐ মান যতটা কমানো সম্ভব ততটা কমাইয়াও যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার উপরে এবং (২) ঐ স্তরের শ্রমিকদের যে বিশেষ নৈপুণ্য বা বিদ্যা প্রয়োজন হয় সেই নৈপুণ্য বা বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যে মেহনৎ ও খরচা হয় তাহার উপরে।

অতএব শ্রমিকের চাহিদার একটী উর্দ্ধতম দাম থাকে এবং যোগানের একটী ন্যূনতম দাম থাকে। আঁত্রেপ্রনা চেষ্টা করেন ঐ উর্দ্ধতম দাম অপেক্ষা যতটা সম্ভব কম মজুরী প্রদান করিতে এবং শ্রমিক চেষ্টা করে ঐ ন্যূনতম দাম অপেক্ষা যতটা সম্ভব বেশী মজুরী পাইতে। এইভাবে দর কষাকষির দ্বারা যে দামে শ্রমের চাহিদার ও যোগানের ভারসাম্য উপস্থিত হয় উহাই শ্রমিকের মজুরীর হার বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

(অনু-৪) মজুরীর হারের তারতম্য—*Variation of the Rate of Wages*•

কার্য্য অনুযায়ী শ্রমিককুল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন

শ্রমিকের মজুরীর তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ কম কেহ বা বেশী মজুরী পায়। এইরূপ তারতম্যের বিভিন্ন কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) কোনো কোনো কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জ্জন করিতে অধিক সময়, মেহনৎ বা অর্থব্যয় হয় এবং কোনো কোনো কার্য্যের প্রয়োজনীয় পারদর্শিতা অর্জ্জন অল্প সময়, মেহনৎ বা অর্থব্যয়েই সম্ভব হয়। প্রথম ক্ষেত্রে,প্রদেয় মজুরী দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অপেক্ষা অধিক হইবে নচেৎ ঐ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত শ্রমিকের যোগান হইবে না। (২) কয়েক প্রকার কার্য্যে শ্রমিকের কর্ম্মক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে—যথা জাহাজ বা রেলগাড়ীর এঞ্জিন চালনা। এইরূপ কার্য্যে রত শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত অধিক হারে মজুরী দেওয়া অপরিহার্য্য ; অন্যথায় শ্রমিকগণ এইরূপ কার্য্য করিতে আগাইয়া আসিবে না। (৩) যে সকল কার্য্য বৎসরে বারোমাস ব্যাপিয়াই করিবার প্রয়োজন হয় সেই সকল কার্য্যের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মজুরীতে লোক পাওয়া যাইবে। কিন্তু এমন গোটাকয়েক কার্য্য আছে যাহা বৎসরে বারোমাস ব্যাপিয়া করিবার উপায় থাকে না ; নিয়োগকারী এইরূপ কার্য্য করাইবার জন্য শ্রমিককে বারোমাস চাকুরী দিতে পারে না। এক্ষেত্রে যেহেতু শ্রমিক সারাবৎসর উপার্জ্জন করিতে পারিবে না সেহেতু শ্রমিককে অধিক মজুরীর দ্বারা আকর্ষণ করিতে হইবে। তবে ইহা সকল সময়ে সত্য হয় না, কারণ একটী কার্য্য করিতে সক্ষম এইরূপ বহু বেকার ব্যক্তির উপস্থিতি থাকিলে অল্প মজুরীতেও অস্থায়ী চাকুরীর জন্য সস্তায় লোক পাওয়া যায়। (৪) এক প্রকারের কাজ আছে যেগুলি করা সহজসাধ্য না হইলেও মনোরম বা আনন্দদায়ক অথবা যেগুলি হইতে সামাজিক সম্মান বা মর্য্যাদা পাওয়া যায়। এই কাজ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম মজুরীতেও প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যাইবে। (৫) যে সকল কাজ কষ্টকর বা বিতৃষ্ণা উৎপাদনকারী সেই সকল কাজ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী মজুরী দিতে হয়। (৬) কোনো এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক এক পর্য্যায়ের শ্রমিকের কাজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশী প্রয়োজন হইয়া উঠে। ঐ পর্য্যায়ের শ্রমিক তখন অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় অধিক হারে মজুরী পায়।

(অণু-৫) দর কষাকষিতে শ্রমিকের দুর্ব্বলতা—*Bargaining Weakness of Labourers*

শ্রমিক ও আঁত্রেপ্রনার মধ্যে দর কষাকষির দ্বারা মজুরীর হার নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এই দরকষাকষির কার্য্যে আঁত্রেপ্রনা গোটাকয়েক সুবিধা ভোগ করেন যেগুলি শ্রমিকদের নাই। দরকষাকষির কাজ সেইজন্য প্রায়শঃই একতরফা হয়—শ্রমিকগণ

আঁত্রেপ্রনার সহিত সমান মর্য্যাদা ও জোরের সহিত দরকষাকষি করিতে পারে না। সেইজন্য মজুরীর হার হয় খুবই অল্প এবং শ্রমিকগণ উহার বিনিময়েই শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। প্রথমতঃ উৎপাদনকারী সংখ্যায় অল্প কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা অধিক। ইহাতে শুধুই যে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী তাহাই নহে—ইহার দ্বারা আঁত্রেপ্রনাগণ সহজেই জোট পাকাইতে পারে এবং কেহই একটী নির্দ্দিষ্ট স্তরের শ্রমিকের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মজুরীর অধিক দিবে না এইরূপ সঙ্কল্প করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আঁত্রেপ্রনাগণ শিক্ষিত এবং কারবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কিন্তু শ্রমিকগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ—অতএব নিজেদের উৎপাদনক্ষমতা কতখানি হইতে পারে এবং তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া কত লাভ হয় শ্রমিকরা তাহার সঠিক ধারণা করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ ঐ সম্পর্কে ধারণা করিতে পারিলেও শ্রমিকরা অধিক মজুরীর জন্য আঁত্রেপ্রনার উপর চাপ দিতে পারে না। কারণ আঁত্রেপ্রনা-শ্রেণী ধনী—কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকিলে তাঁহারা অনাহারে মরিবেন না; কিন্তু শ্রমিকগণ দরিদ্র এবং তাহাদের পণ্য (অর্থাৎ শ্রম) খুব ক্ষণস্থায়ী। যেদিনটীতে শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করিল না সেই দিনের শ্রম হইতে আর কখনও সে আয় করিতে পারিবে না। উপার্জ্জনহীন প্রতিটী দিন শ্রমিকের কাছে যতটা কষ্টকর আঁত্রেপ্রনার কাছে ততটা নহে। তাই আঁত্রেপ্রনা ও শ্রমিকের গরজের লড়াইতে আঁত্রেপ্রনার জয় এবং শ্রমিকের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রমিকদের এই পরাজয়ের ফল শুধুই যে অতি অল্প মজুরীর হারে প্রতিফলিত হয় তাহাই নহে,—ইহার দরুণ শ্রমিকদের পরিশ্রম করিতে হয় অত্যধিক এবং বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পন্ন মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত অবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। এই অবস্থার নিরসনের জন্য **শ্রমিক সঙ্ঘের** প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

(অণু-৬) শ্রমিক সঙ্ঘ—ইহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী—*Trade Union, its Aims and Methods*

শ্রমিকদের সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহাদের দ্বারা গঠিত এবং তাহাদের নিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত সঙ্ঘকে **শ্রমিক সঙ্ঘ** আখ্যা দেওয়া হয়। এই সঙ্ঘ স্থায়ীভাবে গঠিত হয়—অর্থাৎ অল্প কয়েকদিনের জন্য কোন একটী বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই ইহার বিলোপ সাধন করা হয় না। ইহার কার্য্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাইয়া যাওয়া হয়, কারণ শ্রমিকজীবন ও তাহার সমস্যা নিরবচ্ছিন্ন। ওয়েব

দম্পতির ভাষায়,— "শ্রমিকদিগের নিযোগের সর্ত্তাদি রক্ষা করা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্ঘবদ্ধতাকে শ্রমিক-সঙ্ঘ বলা হয়।"*

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক শ্রমিক, ধনী ও প্রভাবশালী নিয়োগকারীর সহিত সমান জোরের সহিত দরকষাকষি করিতে পারে না; কিন্তু শ্রমিকসঙ্ঘ গঠনের দ্বারা পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমবেত-ভাবে দাঁড়াইলে তাহারা মালিকের সহিত সমান মর্য্যাদার সহিত দরকষাকষি করিতে পারে। শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মালিকদের নিকট হইতে ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করা শ্রমিকসঙ্ঘের একটী উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ শুধুমাত্র মজুরীর হারের উপরেই শ্রমিকজীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে না। অন্যান্য কিরূপ সর্ত্তে এবং কিরূপ অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে কাজ করিতে হয় ও বাস করিতে হয় তাহার উপরেও তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এইরূপ বিষয় সম্পর্কে মালিকদের নিকট হইতে ন্যায্য সুযোগ সুবিধা আদায় করা—যথা—দৈনিক পরিশ্রমের ন্যায়সঙ্গত সময় নির্দ্ধারণ, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা, ছুটীর ব্যবস্থা, কার্য্যে রত অবস্থায় অঙ্গহানি হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি শ্রমিকসঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মোট কথা, ক্রীতদাস প্রথা দেহত্যাগ করিলেও উহার অশরীরী আত্মা শিল্প-বাণিজ্যের জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, কারণ ক্রীতদাস প্রথার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই (মালিকের হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ত্তনের দ্বারা উহার প্রচলন বন্ধ হয় নাই)—উহার ঘটিয়াছিল অপমৃত্যু (অধিক উৎপাদন পাইবার জন্য নিজেদের স্বার্থেই মালিকগণ ঐ প্রথা উঠাইতে সম্মত হইয়াছিলেন)। আধুনিক সভ্য মালিক শ্রমিকের চামড়ায় কষাঘাত করেন না—কষাঘাত করেন, আরও সূক্ষ্মভাবে,—তাহার ধমনীর প্রতি রক্তবিন্দুর উপর, আর তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনের উপর শ্রমিক-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইল ক্রীতদাস প্রথার যথোচিত সপিণ্ডকরণ সম্পাদন এবং মালিকের এই সূক্ষ্ম চাবুক ভস্মীভূত করা।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী—ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে কার্য্য-প্রণালী শ্রমিক সঙ্ঘসমূহ অনুসরণ করিয়া থাকে সেগুলিকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; (১) **সংস্কারমূলক** এবং (২) **বিপ্লবাত্মক**।

(১) সংস্কারমূলক কার্য্যপ্রণালী (Reformist methods)—(ক) নিয়োগকারী শ্রমিকদের সহিত আলাপ আলোচনায় সঙ্ঘকে যাহাতে মাধ্যম

---

* "Continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving their condition of employment"—SYDNEY AND BEATRICE WEBB.

হিসাবে গ্রহণ করে এবং দলবদ্ধ দরকষাকষির নীতি স্বীকার করে—শ্রমিক সঙ্ঘ তাহার চেষ্টা করে। (খ) একটী ন্যূনতম মজুরীর হার (সকল শিল্পেই মজুরীর হার যে সমান হইবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই) নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘ উহার যৌক্তিকতা মালিকদিগকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টিত হয় এবং শ্রমিকদিগকে উহার কমে কাজ গ্রহণ না করিতে অনুপ্রাণিত করে। (গ) শ্রমিকরা যে কোনো মজুরীর হারে কাজ গ্রহণ করিতে যাহাতে বাধ্য না হয়—সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ 'বেকারনাশন বীমা তহ্‌বিল' (Unemployment Insurance Fund) এবং 'শ্রম ব্যুরো' (Labour Bureaux) গঠন করে (ঘ) শ্রমিকগণ যাহাতে শিক্ষিত ও দক্ষ হয় সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক সঙ্ঘ শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা ও পাঠাগার স্থাপন করে। শ্রমিকগণকে শিক্ষিত ও দক্ষ করাইতে পারিলে, মালিকদের কাছে তাহাদের দাবীদাওয়ার যাথার্থ্য প্রমাণিত করা সহজ হয়। (ঙ) প্রচার কার্য্য পরিচালনার দ্বারা সঙ্ঘ মালিকদের কাছে ও জনসাধারণের কাছে শ্রমিকদের সমস্যা উপস্থাপিত করে ও উহার সমাধানের জন্য নৈতিক চাপ দেয়। (চ) মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইলে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে মীমাংসায় (conciliation) উপনীত হইবার জন্য সঙ্ঘ মালিকদের সহিত আলোচনা করে।

বিপ্লবাত্মক কার্য্যপ্রণালী—(Revolutionary Methods)—(ক) শ্রমিকগণ চাকুরীতে ইস্তফা না দিয়া সম্মিলিত ভাবে তাহাদের কার্য্য সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া দেয়, যাহাতে উৎপাদন স্থগিত থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে মালিকগণ তাহাদের দাবী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। ইহাকে বলা হয় ধর্ম্মঘট (strike)। 'ওয়াকার' ধর্ম্মঘটকে "শ্রমের-বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন বিদ্রোহের গুণাপগুণ ইহার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।* (খ) ধর্ম্মঘটের সহিত পিকেটিং থাকিতে পারে—অর্থাৎ যে সকল শ্রমিক তাহাদের সঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া কার্য্যে যোগদান করিতে চাহে তাহাদের বাধা দান। (গ) শ্রমিক সঙ্ঘ সাবোটেজের (Sabotage) কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াও থাকে—অর্থাৎ কারখানার কলকব্জা বিগড়াইয়া দিয়া মালিককে ক্ষতিগ্রস্ত করা। (ঘ) সঙ্ঘ বয়কট (Boycott)

---

* "Strikes are the insurrections of labour...They have no creative power, no healing virtue, yet, as insurrections have played a most important part in the political evolution of down trodden people...so strikes may exert a most powerful and salutary influence in breaking up a crust of custom...or in breaking through the combinations of employers to withstand a legitimate advance of wages"—

WALKER (Political Economy)

নীতিও গ্রহণ করিতে পারে; শ্রমিকগণ যখন কোনো একটী শিল্পের মালিকের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং ঐ মালিকের কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় না করিতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্য করে তাহাকে বলা হয় বয়কট। (ঙ) শ্রমিক সঙ্ঘ এই সকল কার্য্যের দ্বারা অনেক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক জীবন অচল করিয়া উৎপাদনের মালিকানা ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী দুই পর্য্যায়ে বিভাগযোগ্য হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে একটী বিশেষ সঙ্ঘ উভয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভূক্ত কার্য্যক্রমই প্রয়োজন অনুযায়ী অনুসরণ করিয়া থাকে।

Questions & Hints

1. Distinguish between money wages and real wages (1936)

[এই প্রশ্নটী অপর একটী প্রশ্নের সহিত একত্রে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। এস্থলে ইহার উত্তর হইবে সংক্ষিপ্ত—অণুচ্ছেদ-২]

2. "The labourer is rich or poor, is well or ill rewarded in proportion to the real, not the nominal wages of his labour." Elucidate the statement and show how wages are determined. (1940) [অণুচ্ছেদ-২ সম্পূর্ণ এবং অণুচ্ছেদ-৩ সম্পূর্ণটাই, তবে আরও সংক্ষিপ্তভাবে]

3. Show how the rate of wages is determined [এক্ষেত্রে অণুচ্ছেদ-৩ যেরূপ রহিয়াছে ঐরূপ বিস্তারিত-ভাবেই লিখিতে হইবে]

4. Explain why wage rates vary in different occupations within a country. (1937)— [অণুচ্ছেদ—৪]

5. What is a Trade Union ? (1933) Discuss the aims and methods of Trade Unions. (1934) [অণুচ্ছেদ—৬ সম্পূর্ণ]

———

একবিংশ অধ্যায়

সুদ

Interest

(অণুচ্ছেদ-১) সুদ কাহাকে বলে—*What Interest is*

উৎপাদনের কার্য্যে পুঁজির ব্যবহারের দরুণ যে দাম প্রদান করিতে হয়, তাহাকেই বলা হয় 'সুদ'।

(অণু-২) সাকুল্য সুদ ও নীট সুদ—*Interest and Net Interest*

কখনো কখনো পুঁজি ধার দিলে পাওনাদারকে উহার জন্য কিছু **অনিশ্চয়তার** মধ্যে থাকিতে হয় যথা—দেনাদার ঠিকমত তাহার দেনা পরিশোধ করিতে পারিবে কিনা অথবা পাওনা আদায় করিতে নানারূপ বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে কিনা ইত্যাদি। কখনো কখনো পাওনাদারকে দেনাপাওনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাড়তি **পরিশ্রম** করিতে হয়—নিশ্চিন্ত মনে পুঁজি ধার দিল এবং নির্ঝঞ্ঝাটে তাহার সুদ নিয়মিত সময়ে পাইল এবং যথাসময়ে আসল ফিরাইয়া পাইল এইরূপ হয় না। পক্ষান্তরে পাওনাদারকে দেনাপাওনা সংক্রান্ত সকল হিসাব রাখিতে হয়, দেনাদারকে উহা বুঝাইয়া দিতে হয় অথবা দেনাদারের কাছে স্বয়ং যাইয়া অথবা পত্রযোগে পাওনাদারের পক্ষে দেনা আদায়ের তাগিদ দেওয়া প্রয়োজন হয়।

যে দেনার ক্ষেত্রে পাওনাদারের পক্ষে কোনো অনিশ্চয়তা নাই (অর্থাৎ আসল ফিরত পাওয়া সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা নাই) এবং পাওনাদারকে কোনোই পরিশ্রম করিতে হয় না (অর্থাৎ দেনাদারের অক্ষমতার দরুণ পাওনাদারকে জটিল হিসাব রাখিতে হয় না বা সুদ ও আসল পাইবার জন্য তাগিদ দিতে হয় না)—সেই দেনার দরুণ পাওনাদারকে যে সুদ দেওয়া হয় তাহাকে বলা হয় নীট সুদ। সাকুল্য সুদ হইল নীট সুদ এবং অনিশ্চয়তা বহনের জন্য ও পরিশ্রম করিবার দরুণ পাওনাদারের প্রাপ্য কিছু বাড়তি দাম। অর্থাৎ সাকুল্য সুদ = নীট সুদ + অনিশ্চয়তার দাম + বাড়তি পরিশ্রম বা ঝঞ্ঝাটের দাম।

নীট সুদ হইল প্রকৃত সুদ। ইহার আর একটী নাম হইল "অর্থ নৈতিক সুদ (Economic Interest)".

(অণু-৩) সুদের হার নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে ?—*How is the Rate of Interest Determined ?.*

সুদ হইল পুঁজির ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম; পুঁজির যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয়।

পুঁজির চাহিদা—একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজির চাহিদা নির্ভর করে পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতার উপরে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর দামের উপরে। আঁত্রেপ্রনা পুঁজির চাহিদা করে কারণ পুঁজির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজির ব্যবহার হইতে মোট উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইল ঐ পরিমাণ পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা। ধরা যাউক একজন উৎপাদনকারী পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমি, শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়াছে তাহা ঠিকই রাখিয়া ১০০৲ টাকার মতন অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ করিল। পূর্ব্বে হয়তো ১০০০টী সামগ্রী উৎপাদিত হইত। এখন বাড়তি ১০০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগের পর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১০০৩টীতে দাঁড়াইল। এক্ষেত্রে ১০০৲ টাকা পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা হইল ৩টী সামগ্রী। এইবার ঐ সামগ্রীর বিক্রয় দাম হিসাব করিতে হইবে। ধরা যাউক প্রতি সামগ্রীর দাম ৩৲ টাকা। তাহা হইলে ১০০৲ টাকা বাড়তি পুঁজি নিয়োগের দ্বারা আঁত্রেপ্রনার বাড়তি আয় হইল (৩×৩৲=)৯৲ টাকা। এই বাড়তি আয় হইল উৎপাদকের কাছে পুঁজির চাহিদা দাম (demand price); কিন্তু আঁত্রেপ্রনা তাহার চাহিদা দাম অনুযায়ীই যে পুঁজির প্রকৃত দাম—অর্থাৎ সুদ প্রদান করিবে তাহার কোনোই স্থিরতা নাই। ইহা হইল সুদ হিসাবে প্রদেয় উর্দ্ধতম পরিমাণ—কিন্তু আঁত্রেপ্রনা চেষ্টা করিবে উহা অপেক্ষা যতটা সম্ভব কম দিবার জন্য।

পুঁজির যোগান—পুঁজি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপরে। একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ আয় করে তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ভোগকার্য্যের জন্য ব্যয় করিলে তবেই সঞ্চয় হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ভোগ করিবার ইচ্ছাই সকলের মধ্যে প্রবল। অতএব বর্ত্তমান আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইলে ভোগসংযম প্রয়োজন। ভোগসংযম বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে—ভোগসংযমের হ্রাস হইলে সঞ্চয়ের হ্রাস হইবে। কিন্তু ভোগসংযম কষ্টকর—লোকে ইহা করিবে কেন? অনেকেই অবশ্য থাকে যাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য—নিজের বা আত্মীয় স্বজনের

ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার জন্য ভোগসংযম করে। কিন্তু ইহাদের সঞ্চয় বর্ত্তমানে শিল্প ব্যবসায়ে পুঁজির চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। তাই সঞ্চয়কারীদের অধিকতর ভোগসংযমে প্রণোদিত করিতে হয়—উহার জন্য একটী দাম প্রদান করিয়া।

সঞ্চয় উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার না করিলে উহা পুঁজি হইল না। সকলেই কৃচ্ছ্রসাধনের সঞ্চয় নিজের কাছেই রাখিয়া দিতে চাহে, অথবা নিরাপত্তার জন্য অপরের নিকট রাখিলেও উহা এমন ভাবে রাখিতে চাহে যাহাতে চাহিবামাত্রই ফিরত পাওয়া যায়। কেহ তাহার সঞ্চয় সুদীর্ঘকালের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে চাহে না। সঞ্চয়কে নগদ হিসাবে রাখিবার জন্য প্রত্যেকের আসক্তি আছে, কারণ কখন কি আপদ, বিপদ বা প্রয়োজন হইতে পারে তাহার কোনোই স্থিরতা নাই।

একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি যোগানের জন্য পুঁজির যোগানকারী একটী ন্যূনতম দাম আন্দাজ করিয়া রাখে—যাহার কমে ঐ পরিমাণ পুঁজি সে সরবরাহ করিবে না। এই ন্যূনতম দাম নির্ভর করে (১) যে দাম পাইলে সঞ্চয়কারী ঐ পরিমাণ সঞ্চয় করিতে প্রণোদিত হইবে এবং (২) যে দাম পাইলে উহার ক্ষেত্রে নগদ আসক্তি (liquidity-preference) অতিক্রম করিয়া উহা উৎপাদনকার্য্যে বিনিয়োগের জন্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইবে,—এই দুইটী বিষয়ের উপরে। এই দুইটীর সংযোগে সঞ্চয়কারী যে ন্যূনতম দাম তাহার অবশ্যপ্রাপ্য বলিয়া মনে করিবে—তাহা হইল যোগানকারীর পক্ষ হইতে ঐ পরিমাণ পুঁজির ন্যূনতম যোগান দাম (supply price)—যাহার কমে উহার যোগান হইবেই না। তবে পুঁজির যোগানকারী ইহা অপেক্ষা যতটা সম্ভব অধিক সুদ পাইবার জন্য চেষ্টিত হইবে।

পুঁজির যোগান ও চাহিদাকারীর মধ্যে দর কষাকষির দ্বারা যে দামে পুঁজির যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে—সেই দামটীই সুদ হিসাবে গণ্য হইবে।

(অণু-৪) সুদের হারের পার্থক্য ও ইহার কারণ—*Difference in Interest Rates and its Causes*

একই দেশের মধ্যে একই সময়ে বিভিন্ন সুদের হার দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক সমূহ শতকরা ৪।৫ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দেয়, কোম্পানীর কাগজে গভর্ণমেণ্ট শতকরা ২৷৷০ বা ৩৲ টাকা সুদ প্রদান করেন, গ্রামে মহাজন শতকরা ১৫।২০ টাকা সুদ লয়, কাবুলীওয়ালা সুদ লয় শতকরা ১০০।২০০ টাকা।

দেনার সুদের হারের পার্থক্যের জন্য গোটা কয়েক কারণ নির্ণয় করা যায়। (১) প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সঞ্চয় নগদ মুদ্রাতেই রাখিতে চাহে—যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই যাহাতে উহা ব্যবহার করা যায়। সঞ্চয়কারীর নিকট কোনো ব্যক্তি

যদি মাত্র অল্প কয়েকদিনের মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে সঞ্চয়কারী তাহাকে অল্প সুদ লইয়া ঐ ঋণ দিতে পারে; এক্ষেত্রে তাহাকে নগদ মুদ্রা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু সঞ্চয়কারীকে যত অধিক সময়ের জন্য নগদ মুদ্রা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে—ততই অধিক পরিমাণ সুদ সে দাবী করিবে। অতএব ঋণের মেয়াদ সুদের হারের পার্থক্যের অন্যতম কারণ। (২) ঋণ হইল ভবিষ্যতে সম্পাদন-যোগ্য বাধ্য-বাধকতা অর্থাৎ ঋণের মুদ্রা ভবিষ্যতে পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে দেনাদারের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে সে সম্বন্ধে বহু অনিশ্চয়তা থাকে। দেনা পরিশোধ করিবার মতন অবস্থা দেনাদারের নাও থাকিতে পারে অথবা বিভিন্ন কারণে সে তাহার ঋণ পরিশোধে গাফিলতী করিতে পারে। অতএব ঋণ দিলেই প্রত্যেক পাওনাদারকে এই অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয় যে তাহার পাওনা ঠিকমত পরিশোধ নাও হইতে পারে। এইরূপ অনিশ্চয়তা যেক্ষেত্রে থাকে কম (যথা গভর্ণমেণ্টকে ঋণ দিলে) সেক্ষেত্রে উত্তমর্ণ অল্প সুদেই কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত থাকে। অনিশ্চয়তা যত অধিক হয় উত্তমর্ণ ততই অধিক হারে সুদ দাবী করিতে বাধ্য হয়। অতএব ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার দরুণও সুদের হারের পার্থক্য হয়। (৩) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওনাদার ঋণ দিলে কোনো কষ্ট বা পরিশ্রম না করিয়াই নিয়মিত সুদ পায় এবং আসলও ফেরত পায়। উহার জন্য তাহাকে কোনোই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। এক্ষেত্রে পাওনাদার কম-সুদেই ঋণ প্রদান করিতে রাজী হয়। কিন্তু অনেক দেনাপাওনা আছে—যে সকল ক্ষেত্রে উত্তমর্ণকে দেনা-সংক্রান্ত অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়—যথা তাহাকে হিসাব রাখিতে হয়, দেনাদারকে তাহার পক্ষে হিসাব বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয়—হয়ত সুদ এবং আসল পাইবার জন্য বারবার তাগিদ দিতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক সুদ না পাইলে ঋণ দেওয়া তাহার পোষাইবে না। অতএব উত্তমর্ণের পক্ষে বাড়তি পরিশ্রম বা ঝঞ্ঝাট অনুযায়ী সুদের হারের পার্থক্য ঘটে।

Questions & Hints

1. Distinguish between gross interest and net interest. Show how the latter is determined (1941) [২ নং অনুচ্ছেদের—"যে দেনার ক্ষেত্রে পাওনাদারের পক্ষে কোনো" হইতে "ইহার আর একটী নাম হইল অর্থনৈতিক সুদ (economic rent)"—এই পর্য্যন্ত এবং অনুচ্ছেদ-৩ সম্পূর্ণ]।

2. "The interaction of the forces which influence borrowers and lenders results in a price for the service of capital—the rate of interest"—Elucidate this statement (1938) [অনু-৩]

3. Explain how interest rate is determined. How is it that there is not one rate of interest in a country? [অনুচ্ছেদ—৩ ও ৪]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

Profit

(অণুচ্ছেদ-১) মুনাফা কাহাকে বলে—*Meaning of Profits*

উৎপাদনের কার্য্যে আঁত্রেপ্রনা যে অংশ গ্রহণ করেন উহার দরুণ তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিককে বলা হয় মুনাফা। মুনাফা হইল অবশিষ্টাংশ। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া আঁত্রেপ্রনা মোট যে পরিমাণ মুদ্রা পান উহা হইতে অন্য তিনটী উৎপাদক-উপাদানের প্রাপ্য দাম (খাজনা, মজুরী, সুদ) মিটাইয়া দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আঁত্রেপ্রনার প্রাপ্য এবং মুনাফা নামে অভিহিত। মোট উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উৎপাদন খরচা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মুনাফা।

(অণু-২) সাকূল্য মুনাফা ও নীট মুনাফা—*Gross Profits and Net Profits*

কোনো আঁত্রেপ্রনা নিজের পুঁজি এবং ভূমি উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করেন ; এই পুঁজির সুদ এবং ভূমির খাজনা তিনি অপর কাহাকেও প্রদান করেন না—উহা তাঁহার নিজের কাছেই থাকিয়া যায়। অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে যদি তিনি পুঁজি বা ভূমি লইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাদিগকে তিনি সুদ বা খাজনা প্রদান করেন। অতএব খরচা বাদে যাহা অবশিষ্ট রহিল উহার মধ্যে আঁত্রেপ্রনার নিজের ভূমি বা পুঁজি হইতে আয় অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়, কারণ উহা তিনি উৎপাদনের খরচা হিসাবে অপর কাহাকেও প্রদান করেন নাই। আঁত্রেপ্রনার এইরূপ আয়,—অর্থাৎ যাহার মধ্যে তাঁহার নিজের পুঁজি বা ভূমির দরুণ প্রাপ্য আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে উহা হইল সাকুল্য-মুনাফা (*Gross Profits*)। সাকুল্য-মুনাফা হইতে আঁত্রেপ্রনার নিজের ভূমি বা পুঁজি হইতে আয় বাদ দিলে,—অর্থাৎ তাঁহার ভূমি বা পুঁজি অপর

কাহাকেও দিলে উহার দরুণ যে খাজনা বা সুদ তিনি পাইতে পারিতেন তাহা বাদ দিলে—যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল তাঁহার নীট মুনাফা (*Net Profits*)।

মুনাফা বলিতে নীট মুনাফাকেই বুঝায়।

(অণু-৩) মুনাফার গঠনকারী উপাদান—*Constituent Elements of (Net)Profits*

আঁত্রেপ্রনার নীট আয় অর্থাৎ মুনাফার মধ্যে মোটামুটী দুই পর্য্যায়ের আয় দেখা যায়: (১) নিয়মিত মুনাফা (*Normal Profits*) এবং (২) ফাল্‌তো মুনাফা (*Abnormal Profits or Chance Gain*)।

নিয়মিত মুনাফা—নিয়মিত মুনাফা হইল আঁত্রেপ্রনার স্বাভাবিক বা নিয়মিত উপার্জ্জন যাহা না পাইলে তিনি উৎপাদন কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ দাম হইতে উৎপাদন খরচা বাদে এমন অবশিষ্ট থাকিতেই হইবে যাহাতে আঁত্রেপ্রনা এই নিয়মিত মুনাফা পান। নিয়মিত মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার দ্বারা আঁত্রেপ্রনা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে প্রণোদিত হন না। 'কীনেস' বলেন, "আঁত্রেপ্রনাদের নিয়মিত উপার্জ্জন বলিতে সেই পারিশ্রমিকের হারকে বুঝায় যাহা তাঁহাদের কারবারের পরিধি বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিতে প্রণোদিত করে না। [that rate of remuneration which...would leave them under no motive either to increase or decrease their scale of operations"—KEYNES] নিয়মিত মুনাফার মধ্যে তিনটী বিষয় থাকে। প্রথমতঃ আঁত্রেপ্রনা শিল্পের উদ্যোগী ও ব্যবস্থাপক। তাঁহার এই শিল্প স্থাপনা ও ব্যবস্থাপনার কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ পারিশ্রমিক তিনি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন উহা তাঁহার নিয়মিত মুনাফার অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক কারবারের মধ্যে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি আছে। আঁত্রেপনা যে সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করিয়াছেন তাহা আশানুরূপ বিক্রয় না হইতেও পারে—অথচ ঐ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় তিনি পূর্ব্বেই করিয়াছেন অথবা করিতে চুক্তিবদ্ধ আছেন। এইরূপ ঝুঁকি বহনের জন্য কিছু পরিমাণ পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রনা তাঁহার নিয়মিত উপার্জ্জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিবেন নচেৎ তিনি ঝুঁকি বহন করিতে অগ্রসর হইবেন না। তৃতীয়তঃ গোটা কয়েক কারবার বা ব্যবসায় আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কোনো একটী সামগ্রী উৎপাদনে (বা যোগানে) বিভিন্ন উৎপাদনকারী (বা যোগানকারীর) মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই; উহা একজন উৎপাদনকারী (বা যোগানকারীর) আয়ত্তাধীন। ইহাকে একচেটিয়া কারবার বা ব্যবসায় বলা হয়। সাধারণ কারবারী অপেক্ষা একচেটিয়াদার

(monopolist) কিছু অধিক উপার্জ্জন তাঁহার নিয়মিত উপার্জ্জনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিবেন। ইহার কারণ এই বাড়তিটুকু না পাইলে ঐ একচেটিয়া কারবারে নিযুক্ত থাকিবার কোনো প্রয়োজন একচেটিয়াদারের থাকিবে না।

অতিরিক্ত মুনাফা—সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে উৎপাদনের খরচা এবং আঁত্রেপ্রনার নীট মুনাফা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে ঐ অবশিষ্ট অংশটুকুকে অতিরিক্ত মুনাফা বলে। অতিরিক্ত মুনাফা হইল ফালতো লাভ (windfall)—ইহার মধ্যে আঁত্রেপ্রনার কোনো প্রচেষ্টা থাকে না। ইহা দুই প্রকারে ঘটিতে পারে : (১) সামগ্রীর যেরূপ দাম অনুমান করিয়া আঁত্রেপ্রনা উৎপাদন সুরু করিয়াছিলেন, কোনো অপ্রত্যাশিত কারণে অকস্মাৎ চাহিদা-বৃদ্ধির দ্বারা বাজারে ঐ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাতে আঁত্রেপ্রনার নিয়মিত মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় হইবে (২) সামগ্রীর দাম যদি সমানও থাকে কোনো অপ্রত্যাশিত কারণে আঁত্রেপ্রনার উৎপাদন খরচা হ্রাস পাইলে তাঁহার অতিরিক্ত মুনাফা হইবে। যথা ব্যাঙ্ক যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সুদে পুঁজি সরবরাহ করে তাহা হইলে আঁত্রেপ্রনার সুদ বাবদ যে খরচা ছিল তাহা কমিয়া গেল এবং তাঁহার বাড়তি লাভ রহিল।

অতিরিক্ত মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদনকারী অতিরিক্ত মুনাফা পাইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হয় এই অতিরিক্ত মুনাফার সহিত। গতিশীল অর্থনীতিতে অতিরিক্ত মুনাফার সমধিক গুরুত্ব।*

Questions & Hints

1. Indicate the different elements of profit. [অনু-৩]

* আধুনিক ব্যক্তিমালিকানা আওতার ধনতান্ত্রিক সমাজে, গভর্ণমেণ্ট যদি অধিক উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করেন তাহা হইলে উৎপাদনকারীদের অতিরিক্ত মুনাফার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট উৎপাদন খরচা কমাইয়া—যথা সুদের হার কমাইয়া বা মজুরী বৃদ্ধির দাবী প্রতিরোধ করিয়া—ইহা করিতে পারেন। অন্যথায় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরাট যন্ত্রদানব শত আবেদন নিবেদনে তিলমাত্রও নড়িবে না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থা

Public Finance

(অণুচ্ছেদ-১) রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার অর্থ—*Meaning of Public Finance*

সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য এবং জনকল্যাণকর বিবিধ কার্য্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রকে অর্থব্যয় করিতে হয়। উহার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে আয় করাও প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের এই আয় ও ব্যয়ের কার্য্যকে "রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা" (Public Finance) বলা হয়।

(অণু-২) রাষ্ট্রের আয়ের (রাজস্বের) উপায় সমূহ—*Sources of State-Income (or Revenues)*

বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্র তাহার আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে : (১) রাষ্ট্রের সরাসরি দখলে বা কর্তৃত্বাধীনে সম্পত্তি থাকিতে পারে। ঐ সম্পত্তি ভাড়া দিয়া অথবা উহা হইতে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া (যথা বনজ সামগ্রী) রাষ্ট্র আয় করিতে পারে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তি মালিকানার অধীনে নহে সে সকলই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। (২) রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার কারবারে লিপ্ত থাকিতে পারে ; এই সকল কারবার সাধারণতঃ রাষ্ট্রের একচেটিয়া কারবার হইয়া থাকে, যথা পোষ্ট-অফিস, রেলপথ ইত্যাদি। এইরূপ কারবার হইতে রাষ্ট্র আয় করিয়া থাকে ; (৩) যে সকল ভূমি ব্যক্তি মালিকানার অধীন সেইগুলি হইতে মালিকদিগের যে আয় হয় তাহার কিছু অংশ অর্থাৎ খাজনা রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে ভূমি রাজস্ব (land revenue) বলা হয়। (৪) রাষ্ট্র জনসাধারণের উপরে কর ধার্য্য করিয়া আয় করিয়া থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র কর ধার্য্য করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় করিয়া থাকে।

(অণু-৩) কর কাহাকে বলে ?—*What is a Tax ?*

রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্যাবলীর জন্য উহার অধিবাসীরা তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পদের যে অংশ রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করে তাহাকেই কর বলা হয়। করের দুইটী বৈশিষ্ট্য আছে; প্রথমতঃ করের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের আদেশ; কর প্রদান করিতে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য থাকে। উহা প্রদান করিবে কিনা তাহা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নহে। দ্বিতীয়তঃ সমাজের সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্যের জন্য রাষ্ট্র কর আদায় করে বটে কিন্তু কর-লব্ধ অর্থ কি ভাবে ব্যয় করা হইবে সে সম্বন্ধে কোনো বিশেষ করদাতার সহিত চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র আবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিবিশেষের একটী বিশেষ উপকার সাধন বা তাহাকে সুবিধাদান করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র তাহার নিকট কর আদায় করে না।

(অণু-৪) প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর—*Direct and Indirect Taxes*

রাষ্ট্র যে করসমূহ আদায় করে ঐগুলি দুইটী পর্য্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে। (১) প্রত্যক্ষ কর (Direct Taxes) এবং (২) পরোক্ষ কর (Indirect Taxes)।

যে কর প্রদানের ক্ষেত্রে করপ্রদানকারী এবং প্রকৃত কর-ভার-বহনকারী একই ব্যক্তি সেই করকে বলা হয় **প্রত্যক্ষ কর**। করপ্রদানকারী তাহার উপর ধার্য্য কর অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। যথা রাষ্ট্র যদি কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার আয়ের একটী অংশ কর হিসাবে গ্রহণ করে এবং ঐ ব্যক্তি ঐ পরিমাণ মুদ্রা তাহার আয় হইতেই প্রদান করে কিন্তু অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া না লইতে পারে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি শুধুমাত্র আপাত দৃষ্টিতে ঐ করের প্রদাতা নহে, প্রকৃতপক্ষেও সে ঐ করের প্রদাতা। এই ধরণের করকে প্রত্যক্ষ কর (Direct Taxes) বলা হয়।

যে কর প্রদানের ক্ষেত্রে করপ্রদানকারী এবং প্রকৃত করভার বহনকারী একই ব্যক্তি নহে সেই করকে **পরোক্ষ কর** বলা হয়। এক্ষেত্রে কর প্রদানকারী তাহার উপর ধার্য্য কর প্রথমে নিজেই প্রদান করে কিন্তু পরে ঐ পরিমাণ অর্থ সে কোনো উপায়ে অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হয়। যাহার নিকট হইতে করপ্রদানকারী করের পরিমাণ অর্থ আদায় করিয়া লইল প্রকৃতপক্ষে সেই ঐ করভার বহন করিতেছে। যথা রাষ্ট্র দোকানদারদিগের নিকট হইতে বিক্রয় কর (Sales tax) আদায় করে কিন্তু দোকানদার উহা

সামগ্রীর দামের সহিত ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করে। এক্ষেত্রে দোকানদার হইল আপাতদৃষ্টিতে করপ্রদানকারী কিন্তু প্রকৃত করপ্রদানকারী হইল ক্রেতাগণ। ইহা পরোক্ষ কর (Indirect Taxes)।

(অনু-৫) প্রত্যক্ষ করের গুণাপগুণ—*Merits and Demerits of Direct Taxes*

গুণ—প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত ভাবে কর ধার্য্য করা সম্ভব হয়। যাহাদের আয় কম তাহাদিগকে কম হারে কর দিতে বলা হয়, যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগের উপর অধিক হারে কর ধার্য্য করা হয়। আবার যাহারা করভার বহনে অক্ষম এইরূপ দরিদ্র বলিয়া বিবেচিত তাহাদিগকে করভার হইতে অব্যাহতি দেওয়াও সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, পরোক্ষ কর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ করের সাহায্যে রাষ্ট্রের পক্ষে অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্বের হ্রাস-বৃদ্ধি করা প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমেই অধিকতর সুবিধাজনক। তৃতীয়তঃ, কত পরিমাণ কর করপ্রদানকারীগণ দিতেছে সে সম্বন্ধে তাহারা সম্যক অবগত থাকে এবং কর বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুণ সুবিধা অসুবিধা সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। অতএব নিজেদের কর-বোঝা সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত এবং সচেতন থাকে। ইহাতে তাহাদের পৌরচেতনা জাগরূক হয়।

অপগুণ—প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে সুফল ভোগ করিয়া থাকে এবং সেহেতু সকলকেই সাধ্যমত কিছু কিছু কর প্রদান করিয়া দেশ-শাসনের ব্যয়বহনে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। কারণ প্রত্যেকের নিকট হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে রাষ্ট্রের খরচা হয় অত্যধিক। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোক তাহার আর্থিক সুবিধা-অসুবিধা হইতে তাহার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ধারণা করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে কাহারও নিকট হইতে অধিক পরিমাণে কর আদায় করা হইলে সে মনে করিবে যে রাষ্ট্র তাহার উপর অত্যধিক জুলুম করিতেছে। ইহাতে জনগণের মধ্যে সহজেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে।

(অনু-৬) পরোক্ষ করের গুণাপগুণ—*Merits and Demerits of Indirect Taxes*

গুণ—প্রথমতঃ, একটী রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে

উপকৃত হয়। অতএব, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ও তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্ভব করিবার জন্য জনসাধারণের সকলেই কিছু কিছু কর প্রদান করিবে—ইহা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত। নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপরে বিক্রয় কর, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি বসাইলে জনসাধারণের সকলকেই এইরূপ পরোক্ষ করের মারফৎ রাষ্ট্রকে কিছু কিছু কর প্রদান করিতে বাধ্য করানো সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, পরোক্ষ করের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট সমাজকল্যাণকর কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারে। যে সকল সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণের শারীরিক বা নৈতিক অবনতি ঘটে ঐ সকল সামগ্রীর উৎপাদক বা বিক্রেতাদের উপরে করভার চাপাইলে তাহারা ক্রেতাদের নিকট হইতে ঐ কর উশুল করিবার জন্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করিয়া দিবে। ইহাতে জনসাধারণ ঐ সামগ্রীর ক্রয় হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহারা পরোক্ষ কর দেয় তাহারা সকল সময়ে উপলব্ধিও করে না যে তাহারা কর দিতেছে; ক্রেতারা মনে করে যে তাহারা শুধুমাত্র সামগ্রীর দামই প্রদান করিতেছে। ইহাতে সুবিধা হয় এই যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি সহসা আসিতে পারে না।

অপগুণ—প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে কর ধার্য্য করা সম্ভব হয় না। ধনীদের কর প্রদানের সামর্থ্য থাকে অধিক এবং দরিদ্রদের করপ্রদানের সামর্থ্য থাকে অল্প। জনগণের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সামগ্রী ক্রয়েব মারফতে যে সকল পরোক্ষ কর আমরা দিয়া থাকি উহা আমরা ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে অর্থাৎ সামর্থ্য-নিরপেক্ষভাবে সকলেই সমান হারে প্রদান করিতে বাধ্য হই। বরং যাহাকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় তাহাকে অধিক পরিমাণেই কর দিতে হয় কারণ যে সকল সাধারণ ব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপরে পরোক্ষ কর থাকে, সেগুলি ঐ ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার দ্বারা পৌরচেতনার উন্মেষ ব্যাহত হয়। জনসাধারণ তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে কিনা তাহা জানিতে না পারিলে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বা ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না; ফলে তাহারা অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত না হইবার অধিকার রক্ষার জন্য ব্যগ্র হয় না।

(অনু-৭) কর-ধার্য্যের মূল সূত্র—*Canons of Taxation*

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'এ্যাডাম্‌স্মিথ' গোটাকয়েক মূলসূত্র উল্লেখ করেন এবং বলেন এই মূল সূত্র অনুযায়ী কর ধার্য্য করা হইলে তবেই উৎকৃষ্ট কর

ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সম্ভব ; মূলসূত্রগুলি হইল এইরূপ : (১) **সমতার সূত্র** (Canon of equality)—কর প্রদানকারীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা উচিত এবং ইহা সম্ভব হয় প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার উপর কর ধার্য্য করিলে। 'সামর্থ্য' শব্দটী ব্যাখ্যা করিয়া 'এ্যাডামস্মিথ' বলিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপার্জ্জনের অনুপাতে কর প্রদান করিতে হইবে। যাহার অধিক উপার্জ্জন সে কর দিবে অধিক যাহার অল্প উপার্জ্জন সে কর দিবে অল্প। এইভাবে বিভিন্ন কর প্রদানকারীদিগের মধ্যে সমতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। (২) **নিশ্চয়তার সূত্র** (Canon of certainty)—কর-প্রদান ব্যবস্থার মধ্যে যত বেশী অনিশ্চয়তা থাকিবে করদাতার অসুবিধা হইবে ততই অধিক এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় হইবে ততই অল্প। অতএব কর ব্যবস্থার মধ্যে অনিশ্চয়তার অবকাশ যেন না থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন্ সময়ে কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়া উহা দিতে হইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে—এ সম্বন্ধে করদাতাকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। (৩) **সুবিধার সূত্র**-(Canon of convenience)—করদাতাকে যে কর দিতে হইবে উহা গ্রহণ করিবার সময় ও পদ্ধতি এরূপভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতার কর প্রদান করিতে যথাসম্ভব সুবিধা হয়। যথা অনেক লোক আছে যাহাদের বৎসরের কোনো এক নির্দ্দিষ্ট সময় হইল ব্যয়ের সময় এবং অপর এক নির্দ্দিষ্ট সময় হইল আয়ের সময়, যথা কৃষক। এক্ষেত্রে সরকারের এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যে যখন করদাতার আয়ের সময় ঠিক তখনই যেন কর আদায় করা হয়। (৪) **ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র** (Canon of economy)—কর আদায় করিতে সরকারকে ব্যয় করিতে হয়—যথা কর্ম্মচারী নিয়োগ, অফিস স্থাপন ইত্যাদি বাবদ। কর-ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যেন কর আদায় করিবার খরচা অত্যধিক না হয়। জনসাধারণের নিকট হইতে যে পরিমাণ মুদ্রা কর হিসাবে আদায় করা হয় উহার মধ্যে যতটা সম্ভব অধিক পরিমাণ সরকারের তহবিলে জমা হওয়া উচিত। অর্থাৎ কর আদায়ের খরচা যথাসম্ভব কম যাহাতে হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ইহার সহিত আরও দুইটী সূত্র যোগ করেন। তাঁহারা বলেন, প্রথমতঃ কর সমূহ **সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম** (elastic) হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের অধিক রাজস্বের প্রয়োজন হইলে করের হার (rate) বৃদ্ধি করিলেই অধিক রাজস্ব হইবে এইরূপ কর থাকা উচিত; আবার রাষ্ট্র তাহার ব্যয় কমিয়াছে বলিয়া জনসাধারণের উপরে করভার লাঘব করা যাইতে পারে মনে করিলে, করের হার কমাইলেই যেন ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব সহজেই হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়

এইরূপ ধরণের কর ধার্য্য করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ অধিক রাজস্ব উৎপাদনে সক্ষম এইরূপ কর ধার্য্য করা উচিত—অর্থাৎ যেগুলির অল্প কয়েকটীর দ্বারাই অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইতে পারে। যত অধিক সংখ্যক কর বসানো হইবে ততই অধিক রাজস্ব আদায় হইবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই।* অতএব সংখ্যার দিক হইতে বিচার না করিয়া রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিয়া কর ধার্য্য করা উচিত।

(অণু ৮) কর ধার্য্যের মধ্যে ন্যায় ব্যবহার—*Equity in Taxation*

রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার পার্থক্য থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে সমপরিমাণ মুদ্রা আদায় করিলে জনসাধারণের মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর উপরে অত্যধিক চাপ দেওয়া হয়। ইহা সঙ্গত নহে। বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার ব্যক্তির মধ্যে কর ধার্য্যের কার্য্যে ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ ন্যায় ব্যবহার করা অম্ভব হয় তখন যখন লোকেদের নিকট হইতে তাহাদের কর প্রদান করিবার সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হয়।

কিন্তু তখন সমস্যা দাঁড়ায় এই যে কি পদ্ধতি অনুযায়ী কর আদায় করিলে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে! 'জন ষ্টুয়ার্ট মিল' বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেকের আয় হইতে একটী সমান অনুপাতে (সমান পরিমাণে নহে) কর আদায় করিলে প্রত্যেকের উপর সমান ভার অর্পণ করা হয় এবং প্রত্যেককে সমান ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করা হয়—এবং এইভাবে কর ব্যবস্থায় ন্যায় ব্যবহার কার্য্যকরী করা চলে। সমান-অনুপাতে কর ধার্য্যের এই নিয়মকে "আনুপাতিক কর ধার্য্যের নীতি" (Principle of Proportional Taxation) বলা চলে। এই নীতি অনুযায়ী ১০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারী এক ব্যক্তিকে যদি ১০৲ টাকা কর দিতে হয় তাহা হইলে ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিকে ১০০৲ টাকা কর দিতে হইবে, কারণ ১০৲ টাকা ১০০৲ টাকার যে অনুপাত ১০০০৲ টাকার সেই অনুপাত হইল ১০০৲ টাকা।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে সকলের নিকট হইতে সমান **পরিমাণ**

---

* ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্যার 'রবার্ট পীল' ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইবার পর সহস্রাধিক সামগ্রীর উপর বাণিজ্যশুল্ক হ্রাস করেন এবং ৬০৫টী সামগ্রীর উপর হইতে কর উঠাইয়া দেন কিন্তু উহাতে মোট রাজস্বের পরিমাণ খুব কমই হ্রাস পায়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় ঐরূপ নগণ্য রাজস্ব উৎপাদনকারী বহুসংখ্যক কর যাঁহারা ধার্য্য করিয়াছিলেন তাঁহারা অযৌক্তিক কাজ করিয়াছিলেন; কারণ এইগুলি সরকারের রাজস্ব আনিয়াছিল কম কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যকে ব্যাহত করিয়াছিল খুব বেশী।

কর আদায় করিলে, ন্যায়-ব্যবহার করা তো হয়ই না, আবার সমান **অনুপাতে** কর ধার্য্য করিলেও ন্যায় ব্যবহার হয় না। তাঁহারা বলেন যে আনুপাতিক কর ধার্য্যের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তিকে সমান ভার বহন করিতে বা সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা সম্ভব নহে। ১০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারীর ১০৲ টাকা কর প্রদান করিতে যে কষ্ট হইবে, ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারীর ১০০৲ টাকা কর প্রদান করিতে তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইবে, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা **পরিমাণে** অধিক অর্থ দিতেছে। ইহার কারণ হইল যে যাহার অধিক আয় তাহার জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার পরেও উদ্বৃত্ত থাকে অধিক। অতএব যাহার অধিক আয় সে, আনুপাতিক করের আওতায় অল্প উপার্জ্জনকারী ব্যক্তি অপেক্ষা পরিমাণে অধিক প্রদান করে বটে কিন্তু উহার দ্বারা সে যে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিল বা অধিক ভার বহন করিল এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। সেই কারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের মতে আনুপাতিক কর ধার্য্যের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় ব্যবহার করা হয় না। ইহার জন্য "ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর ধার্য্যের নীতি" (Principle of Progressive Taxation) অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই নীতি অনুযায়ী অল্প উপার্জ্জনকারী যে হারে কর দিবে অধিক উপার্জ্জনকারী তাহা অপেক্ষা অধিক হারে কর প্রদান করিবে—যথা ১০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারী যদি শতকরা দশ টাকা কর দেয় তাহা হইলে ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারী হয়তো শতকরা ১৫৲ টাকা হারে কর দিবে, ২০০০৲ টাকা উপার্জ্জনকারী শতকরা ২০৲ টাকা হারে কর দিবে। এইভাবে করদাতাদের মধ্যে ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়, কারণ অধ্যাপক 'রবিনসনের' ভাষায় "ধনীদের বিস্তৃত স্কন্ধই যে জাতীয় করভারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার অংশ বহন করিবে—ইহাই ন্যায় সঙ্গত।"*

(অনু-৯) রাষ্ট্রীয় ব্যয়—*Expenditure of the State*

যে সকল বিষয়ের উপরে রাষ্ট্র তাহার রাজস্ব ব্যয় করে অর্থনৈতিক বিচারে সেগুলিকে দুইটী পর্য্যায়ে ভাগ করা চলে: (১) উৎপাদনশীল ব্যয় (productive expenditure) এবং (২) অনুৎপাদনশীল ব্যয় (unproductive expenditure)।

(১) **উৎপাদনশীল ব্যয়**—অনেকগুলি ব্যয় আছে যেগুলি রাষ্ট্র নির্ব্বাহ করিলে উহার দ্বারা দেশের উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি বিশেষ এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করিতে সক্ষম হয় না বা আগাইয়া আসে না। আপাততঃ এইরূপ ব্যয়

* ROBINSON—Public Finance.

হইতে হয়তো সুফল পাওয়া যায় না কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থাৎ যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর দেখা যায় যে উহার দ্বারা জনসাধারণের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা কৃষিভূমিতে সেচ ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করিলে শস্যের ফলন বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্র কৃষকের বর্দ্ধিত আয় হইতে বাড়তি কর গ্রহণ করিয়া যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছিল তাহা তুলিয়া লইতে পারে। এই ধরণের ব্যয়কে উৎপাদনশীল ব্যয় বলে। কৃষির উন্নতি, শিল্পোন্নতি, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি বাবদ ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যয়ের পর্য্যায়ভুক্ত।

(২) **অনুৎপাদনশীল ব্যয়**—অনেকগুলি ব্যয় আছে যেগুলির দ্বারা দেশের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না। এই ব্যয়ের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হয় না। যুদ্ধ, বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন-প্রদান ইত্যাদি বাবদ খরচা এই পর্য্যায়-ভুক্ত। এই ধরণের ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলা হয়। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইহাদিগকে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলিতে এইরূপ বুঝায় না যে রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ ব্যয় অন্যায়। কারণ অর্থনৈতিক উপকার আনয়ন করে না কিন্তু রাজনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক উপকার দর্শায় এরূপ অনেক কার্য্য রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পাদন করা প্রয়োজন হয়।

(অণু-১০) সরকারী ঋণ—*Public Debt*

সাধারণ ব্যক্তি যেমন ঋণ গ্রহণ করে সরকারও তেমনি অনেক সময়ে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধারণের স্বার্থের জন্যই এইরূপ ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত এই সকল ঋণকে সরকারী ঋণ বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন কারণে সরকারের ঋণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। প্রথমতঃ অকস্মাৎ কোন ব্যয় করিবার প্রয়োজন অসিয়া পড়িতে পারে এবং সরকার জনসাধারণের উপরে কর ভার বৃদ্ধি করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা না করিয়া ঋণ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান করিতে না পারিলে ঋণ গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ, যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে এইরূপ পুঁজি-সামগ্রী নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় করিবার নিমিত্ত সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন—যথা রাস্তা নির্ম্মাণ, রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ। চতুর্থতঃ সরকারের রাজস্ব আদায় করিবার জন্য যে সময় লাগে সেই সময়টুকু উত্তীর্ণ হইবার জন্য অল্পকালের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। রাজস্ব আদায় হইলেই উহা দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়।

সময়ের দিক হইতে সরকারী ঋণকে দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী এই দুই পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। যে সকল ঋণ দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে গৃহীত হয় সেগুলিকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ (Funded Debt) বলে ; যথা আমাদের দেশের কোম্পানীর কাগজ (Government Paper)। অপর পক্ষে অল্পকাল পরে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে সরকার যে ঋণ গ্রহণ করেন উহাকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ (Unfunded Debt) বলা হয় ; যথা আমাদের দেশের খাজাঞ্চী-পত্র (Treasury Bills)।

ব্যবহারের দিক হইতে সরকারী ঋণকে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল এই দুই পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। উত্তরকালে অধিকতর সম্পদ উৎপাদিত হইবে এইরূপ কার্য্যে ব্যবহারের জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করেন তাহাকে উৎপাদনশীল ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। আমাদের দেশে রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য বা সেচকার্য্যের উন্নতিকল্পে সরকার যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলা চলে। অপর পক্ষে সরকার যদি এমন কোনো কার্য্যে ব্যবহারের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন যাহার দ্বারা এমন কোনো কার্য্য হইবে না যাহা হইতে ভবিষ্যতে আয় হয়—তাহা হইলে ঐ ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা চলে। যুদ্ধ-ঋণকে এইরূপ অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা চলে।

(অনু-১১) সরকারী ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি—*Methods of Repayment of Public Debt*

সরকারী ঋণ পরিশোধের মোটামুটি দুইটী পদ্ধতি আছে।

(১) সরকার তাঁহাদের বাৎসরিক রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ আয় পৃথক করিয়া একটী হিসাবে রাখিয়া দিতে পারেন। ইহাকে বলা হয় **পরিশোধ তহবিল** (Sinking Fund)। বাৎসরিক আয়ের কিছু কিছু পরিমাণ এইভাবে সঞ্চয় করিয়া যখন ঋণের সমান অর্থ সঞ্চিত হয় তখন উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়।

(২) সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের সম্পত্তির উপরে সরকার একটী বিশেষ ঋণ-পরিশোধ-জনক কর ধার্য্য করিয়া এককালীন অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন এবং ইহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন। ইহাকে বলা হয় পুঁজি-কর (Capital levy)। কিন্তু বারবার ঋণ করিয়া বারবার এইরূপ পুঁজি কর আরোপ করা চলে না—কারণ উহার দ্বারা দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে।

Questions and Hints

1. Distinguish between direct and indirect taxes. Discuss the merits and defects of each of these classes of taxes (1938) [অণুচ্ছেদ ৪, ৫ ও ৬]

2. Compare the advantages of direct and indirect taxation. Illustrate your answer with Indian examples. (1940) [৫ নং অণুচ্ছেদের গুণ এবং ৬ নং অণুচ্ছেদের গুণ। উদাহরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ দেওয়া চলে 'আয়কর' এবং পরোক্ষ করের উদাহরণ দেওয়া যায় 'বিক্রয় কর'।]

3. Consider the merits and defects of indirect taxes. Illustrate your answer with Indian examples (1945)—[অণুচ্ছেদ—৬। গুণের মধ্যে প্রথম গুণের উদাহরণে 'লবণ-কর' উল্লেখ করিয়া বলা চলে যে সরকার উহার সমর্থনে বলিতেন যে ইহার দ্বারা জনসাধারণের সকলের নিকট হইতে কর আদায় করা সম্ভব হইত। দ্বিতীয় গুণ বিশিষ্ট পরোক্ষ করের উদাহরণ প্রদান করা চলে, মদ, গাঁজা প্রভৃতি 'মাদক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক' উল্লেখ করিয়া। তৃতীয় গুণের উদাহরণ দেওয়া যায়—কেরোসীন দিয়াশলাই ইত্যাদির উপর 'আবগারী শুল্ক'।

অপগুণের আলোচনায়—'বিক্রয় করের' উল্লেখ করা যায়]

4. What is equity in taxation? Should the rich pay more in taxes than the poor? [অণুচ্ছেদ ৮]

5. Define tax. What are the other sources of State revenue ? [অণুচ্ছেদ ৩ এবং ২]

6. What is Public Debt ? Why is such debt contracted ? How is Public Debt repaid ? [অণুচ্ছেদ-১০ এবং ১১]

7. Define a Tax. How should the burden of taxes be distributed among the people ? (1949)— [অণু-৩ ও অণু-৮]

8. State the advantages and disadvantages of direct taxes, (1950) [অণু ৬]

ভারতীয় অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক পারিপার্শ্ব ও সঙ্গতি

Natural Environment and Resources

(অনুচ্ছেদ-১) ভৌগোলিক অবস্থান—*Geographical Situation*

আসমুদ্র-হিমাচল ভারত পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ছিল ২,৫০০ শত মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ২০০০ মাইল। ইহার স্থল সীমানা ছিল ৪,৬০০ মাইল এবং সমুদ্র সীমানা ছিল ৪,৩০০ মাইল। ইহার মোট এলাকা ছিল ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গ মাইল।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বর্ত্তমান ভারতের এলাকা ইহা অপেক্ষা সঙ্কুচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার মোট এলাকা হইল ১২ লক্ষ ৯ হাজার বর্গ মাইল।

ভারত একটী মহাদেশ বিশেষ। ইহাকে একটী উপমহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের সংমিশ্রণেই ভারতের আর্থিক সম্পদ ও মহিমা। মোটামুটি তিনটী এলাকা পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

(১) হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল—পশ্চিমে, উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ অবধি এই অঞ্চল বিস্তৃত এবং ইহার দক্ষিণ-মুখী গড় প্রস্থ হইল দুই শত মাইল। হিমালয় মৌসুমী বায়ু প্রতিহত করিয়া ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটায়, একাধিক বিরাট নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়াছে ও বনজ ও প্রাণীজ সম্পদে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ।

(২) সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকা—হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং দাক্ষিণাতের মধ্যে সিন্ধু গাঙ্গেয় সমতল ভূমি অবস্থিত। ইহার এলাকা প্রায় ৩ লক্ষ

বর্গ মাইল। বিভিন্ন নদনদীর দ্বারা এই অঞ্চল পূর্ণ। ইহার আবহাওয়া উত্তম, মাটি আর্দ্র এবং খনিজ সম্পদে ইহা পূর্ণ।

(৩) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি**—বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহার দুই পার্শ্ব যথাক্রমে পূর্ব্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট নামে পরিচিত। এই অঞ্চল সমতল ভূমি নহে। এই অঞ্চলেও কতিপয় বৃহৎ নদী রহিয়াছে।

(অণু-২) ভারতের মাটি—*India's Soil*

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির প্রকার ভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম।

(১) **পলি মাটি** (alluvial soil)—উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল পলি মাটি বিশিষ্ট; দক্ষিণে মাদ্রাজের কতিপয় স্থানে পলি মাটি বিদ্যমান। এই মাটিতে চাউল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ ভাল হয়।

(২) **কৃষ্ণ মাটি** (black soil)—মধ্য প্রদেশের বিদর্ভ, হায়দ্রাবাদ, কাথিয়াবার বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের অংশ বিশেষে কৃষ্ণ মাটি রহিয়াছে। গম, ছোলা, তুলা প্রভৃতি সামগ্রী কৃষ্ণ মাটিতে উৎপন্ন হয়।

(৩) **লাল মাটি** (red soil)—মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মহীশূরে লাল মাটি পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য কতিপয় স্থানেও লাল মাটি আছে যথা মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের কতিপয় স্থান। এই মাটি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরতাবিহীন।

(অণু-৩) বৃষ্টিপাত (মৌসুমী বায়ু)—*Rainfall (The Monsoons)*

জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বলা হয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত এই বায়ুর গতির পরিবর্ত্তন হয় এবং ইহার দ্বারাই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ভারতে বৃটিপাতের জন্য যে মৌসুমী বায়ু দায়ী উহা উৎপত্তি ও গতি অনুয়ায়ী দুই ভাগে বিভক্ত। একটী হইল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (South-western monsoons) এবং অপরটী হইল উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু (North-eastern monsoons)। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া বহিয়া আসে; ইহা হইতে বারিপাত ঘটে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে। আমরা যে সময়টীকে বাঙ্গালা দেশে বর্ষাকাল বলি (সাধারণতঃ জুন ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে) সেই সময়ে এই বারিপাত ঘটিয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু হইতে যে বৃষ্টিপাত হয় উহার অংশ পায় মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের কতকাংশ, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ,

হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি কয়েকটী অঞ্চল। এই বারিপাত ঘটে শীতকালে এবং স্থলভাগের উপর দিয়া বহিয়া আসার দরুণ, ইহার মধ্যে জলীয় অংশ থাকে অল্প। সমগ্র দেশ উহার বৃষ্টিপাতের অধিক অংশই পাইয়া থাকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হইতে।

দেশের বিভিন্ন অংশে অসমান বারিপাত আমাদের দেশের বৃষ্টিপাতের একটী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আসামের খাসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাত হইল ৪৬০ ইঞ্চি, কিন্তু পশ্চিম রাজপুতানায় উহার পরিমাণ ২০ ইঞ্চিরও কম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমান বণ্টন ব্যতীতও, আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের আরও দুইটী বৈশিষ্ট্য আছে : (১) বিভিন্ন বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে অসাম্য দেখা যায় এবং (২) বর্ষার আরম্ভ ও শেষ কখনও বিলম্বিত হয় আবার কখনও ত্বরান্বিত হয়।

(অণু-৪) মৌসুমী বায়ু (বা বৃষ্টিপাত) ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি—*Monsoons (or Rainfall) and Economic Prosperity*

মৌসুমী বায়ুর আচরণের দ্বারা অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময়ের দ্বারা, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বহু পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়। দেশের সামগ্রীক অর্থনীতি ইহার উপর নির্ভর করে বলিলেও অত্যুক্তি ঘটিবে না।

ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৮৭ ভাগ গ্রামের অধিবাসী এবং শতকরা ৬৬ ভাগ কৃষিজীবী। অতএব মোট অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে অধিক অংশেরই কৃষিই হইল প্রধান উপজীবিকা। অবশ্য ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্ত্তমানে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নতির প্রবণতা অবহেলা করা যাইবে না ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষিকার্য্যে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত আছে এবং জনসাধারণের মোট আয়ের এত অধিক পরিমাণ কৃষি হইতে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে যে এ দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো যে কৃষির সাফল্য বা অসাফল্যের উপর নির্ভর করে, তাহা বলা বাহুল্য হইবে মাত্র।

কিন্তু কৃষির সাফল্য ও অসাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের উপরে। কৃষিকার্য্যের পক্ষে জল অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান। যে পরিমাণ জল প্রয়োজন হয় তাহা নদ নদী হইতে মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা সরবরাহ করা বহু ক্ষেত্রেই অসম্ভব এবং যেখানে উহা সম্ভব সেখানে উহা সহজসাধ্য নহে। অতএব আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

যথা সময়ে, এবং যথোচিত পরিমাণে, যদি বৃষ্টিপাত ঘটে তাহা হইলে বর্ত্তমান কৃষি পদ্ধতির মধ্যে যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তাহা উৎপাদিত হইবে ; ইহাতে কৃষিজীবীদিগের উত্তম আয় হইবে। ইহাতে তাহারা অধিক

পরিমাণে ভোগ সামগ্রী ক্রয় করিবে। কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি হইলে জমিদারের খাজনা আদায় হইবে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ হইবে। গ্রামের কারিগর ও দোকানদার বেশী করিয়া সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে। গ্রামের শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি স্বাধীন পেশাজীবী ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য বেশী বিক্রয় হইয়া তাহাদের আয় বাড়িবে। ইহাতে গ্রাম সমূহে অর্থ নৈতিক জীবনের মান উন্নত হইবে।

গ্রাম-প্রধান দেশে, গ্রামের অর্থ নৈতিক জীবনের মান উন্নত হইবার প্রতিক্রিয়া (সমগ্র দেশের অর্থনীতির উপরে) সহজেই অনুমেয়। সাধারণ গ্রামবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য উপস্থিত হইলে তাহারা শিল্পজাত সামগ্রী বেশী করিয়া কিনিবে। ইহাতে সহরাঞ্চলে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, উহাদের মালের অধিক কাটৃতি হইবে ; শিল্পপতিদের বেশী লাভ হইবে এবং তাহারা উৎপাদন বাড়াইবে। ইহাতে বহু লোকের-চাকুরীর সংস্থান হইবে এবং শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের আয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে স্বাধীন পেশাজীবীদেরও (যথা উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি) আর্থিক উন্নতি হইবে—কারণ সাধারণের হাতে পয়সা হওয়ায় ইঁহাদের কাজ তাহারা বেশী করিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

ইহাতে, গ্রামে ও সহরে, জনগণের সকল স্তরেই আর্থিক স্বাচ্ছল্য উপস্থিত হইবে। সরকার অধিক পরিমাণে কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারিবেন। সমগ্র দেশ অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিবে।

অপর পক্ষে, বৃষ্টিপাত যদি সময় মত বা পরিমাণ মত না হয় তাহা হইলে ঠিক ঐ সকলের বিপরীত ফল ফলিবে এবং সমগ্র দেশ আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইবে।

(অনু-৫) ভারতের খনিজ সম্পদ—*Mineral resources of India*

কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে যেরূপ জলের গুরুত্ব শিল্প সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে একটী, এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায় হইল খনিজ সম্পদ। ভারতে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদ আছে ; ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র, স্বর্ণ, লবণ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

(১) কয়লা—কয়লা উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে। এখানে বৎসরে আড়াই কোটি হইতে তিন কোটি টাকার মতন কয়লা উত্তোলিত হয়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই উৎপাদিত হয় গণ্ডোয়ানা কয়লা এলাকা হইতে। এই এলাকা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং মধ্য-ভারতের কয়েকটী অঞ্চল লইয়া প্রসারিত। সর্ব্বাধিক পরিমাণ কয়লা উৎপাদিত

হয় বাঙ্গালার রাণীগঞ্জ এবং বিহারের ঝরিয়ায় ; মোট উৎপাদনের শতকরা ৭২ ভাগ এই দুই স্থান হইতে পাওয়া যায়।

অতএব কয়লা সম্পদ আমাদের দেশে নগণ্য নহে কিন্তু বিশেষ স্থানে ইহার গণ্ডীবদ্ধতাই হইল ইহার অসুবিধা। কয়লা হইল শিল্পের চালনশক্তিগুলির (Power) মধ্যে অন্যতম ; অতএব বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লার খনি যদি ছড়াইয়া থাকিত তাহা হইলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিত।

(২) **লৌহ**—লৌহ-আকরিক (iron ore) হইতে লৌহ আহৃত হয়। উৎকৃষ্ট গুণের লৌহ-আকরিক ভারতে প্রচুর পরিমাণেই আছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ লৌহ-আকরিক প্রতি বৎসর উত্তোলিত হয়, উহা ২০ লক্ষ টনের মতন হইবে। প্রধানতঃ বিহার এবং উড়িষ্যায় লৌহ-আকরিকের খনিগুলি অবস্থিত। এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি উড়িষ্যায় অবস্থিত। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ (বরাকর অঞ্চল), বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরেও লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটী বিক্ষিপ্ত অঞ্চলেও আকরিকের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু কাছাকাছি লৌহ খনি না থাকায় আকরিক গলাইয়া লৌহ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

(৩) **অভ্র**—পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই উৎকৃষ্ট গুণের অভ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ ভারতবর্ষে হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভ্র পাওয়া যায় বিহারে ; এতদ্ব্যতীত, মাদ্রাজ ও রাজপুতানাতেও অভ্র মিলে।

(৪) **ম্যাঙ্গানীজ**—ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। ১৯৪৫ সালে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদিত হইয়াছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়।

(৫) **তাম্র**—তাম্র-আকরিক প্রধানতঃ বিহারে পাওয়া যায়। রাজপুতানা যুক্ত প্রদেশ ও উত্তর পূর্ব্ব ভারতের কতিপয় অঞ্চলেও ইহা পাওয়া যায়। প্রয়োজনের তুলনায় দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহা যথেষ্ট নহে। ১৯৪৫ সালে ৩ লক্ষ টনের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ পরিমাণে তাম্র-আকরিক উৎপাদিত হইয়াছিল।

(৬) **স্বর্ণ**—স্বর্ণখনি প্রধানতঃ মহীশূর রাজ্যে কোলার অঞ্চলে অবস্থিত। সমগ্র জগতে মোট যে পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদিত হয় তাহার মধ্যে ভারতের অংশ নগণ্য। ইহার উৎপাদন হয় ১½ লক্ষ আউন্সের মতন।

(৭) **লবণ**—লবণ উৎপন্ন হয় সম্বর লবণ হ্রদে, রাজপুতানার অন্যান্য কয়েকটি

অঞ্চলে এবং সমুদ্র সৈকতে। বর্ত্তমান ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ টন লবণ উৎপাদিত হয়। কিন্তু ইহাতে আমদের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটে না।

(৮) **পেট্রোলিয়াম**—বর্ত্তমান ভারতে প্রায় ৭ কোটি গ্যালন পেট্রোলিয়ম উৎপাদিত হয়। আসামের ডিগবয় অঞ্চলে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়।

ইহা ব্যতীত, বক্সাইট্, ক্রোমাইট, ম্যাগনেসাইট প্রভৃতি কতিপয় খনিজ সামগ্রীও ভারতে আছে।

(অণু-৬) ভারতের বন সম্পদ—*India's Forest Resources*

বন সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ। অবিভক্ত ভারতের এলাকার শতকরা ১৩ ভাগ ছিল অরণ্য। বৃক্ষের প্রকৃতি এবং ভূমির অবস্থান অনুযায়ী ভারতের বনভূমিকে সাধারণতঃ পাঁচটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায় :—(১) শুষ্কারণ্য (Arid forest)—ইহা বাবুল জাতীয় বৃক্ষবহুল। (২) পর্ণমোচী বৃক্ষারণ্য (Deciduous forest)—এইগুলি ঘন বনভূমি; ইহাকে মৌসুমী অরণ্যও বলা চলে। (৩) চিরহরিৎ অরণ্য (Evergreen forest)—হিমালয়ের পূর্ব্ব দিকে আদ্র´ ও নিম্ন অঞ্চলে ও আসামের পার্ব্বত্য এলাকায় এইরূপ অরণ্য রহিয়াছে; ইহাতে তাল, খেজুর, বাঁশ ইত্যাদি হয়। (৪) পার্ব্বত্য অরণ্য (Hill forest)—ইহা হিমালয়ের উচ্চভূমিতে অবস্থিত। ইহাতে দেবদারু, ফার, পাইন প্রভৃতি প্রশস্ত অথবা সরল বর্গীয় পত্রযুক্ত বৃক্ষ আছে। (৫) উপকূল অরণ্য (Tidal forests)—ইহা উপকূল অঞ্চলের বনভূমি; ইহাতে ম্যাটগ্রোভ নামক বৃক্ষের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব (*Economic importance*)—দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বনসম্পদের গুরুত্ব সমধিক।

প্রথমতঃ, এই সকল অরণ্য হইতে আমরা তক্তা বা জ্বালানী কাঠ পাইয়া থাকি। শাল, সেগুণ, দেবদারু, জারুল, সিডার, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে তক্তা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক বৃক্ষ আছে যাহাদিগের গাত্র হইতে অথবা ফল বা বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। এইরূপ বৃক্ষ হইল নিম, মহুয়া, জয়পাল, পাইন, কুসুম, চালমুগরা, চন্দন ইত্যাদি। গঁদ বা অন্যান্য বৃক্ষ-নির্য্যাস পাওয়া যায় এইরূপ বহু বৃক্ষও আছে।

তৃতীয়তঃ, অরণ্য এলাকা বায়ু মণ্ডলকে আর্দ্র রাখে এবং বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে।

চতুর্থতঃ, অরণ্য সম্পদের দ্বারা মাটির উপরিভাগের ক্ষয় (soil erosion) বহু পরিমাণে নিবারিত হয়।

পঞ্চমতঃ, বন হইতে আহরিত বিভিন্ন বস্তু শুধুই যে সরাসরি ভোগ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহাই নহে ; একাধিক শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহৃত হয় এবং উহা বৈদেশিক বাণিজ্যও পরিপুষ্ট করে।

ষষ্ঠতঃ, বনভূমি সরকারের একটী আয়ের খাত। উহা হইতে সরকারের রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে বনসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ঐ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারের একটী স্বতন্ত্র বন বিভাগ আছে। ইহার কার্য্যও হইল অরণ্য সম্পদের রক্ষা ও ইহার সুনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। বনসমূহ এই বিভাগের দ্বারা কতিপয় পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে: (১) **সংরক্ষিত বন** (Reserve forest) এই বনসমূহ সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন, জনসাধারণের জন্য ইহা নিষিদ্ধ। (২) **রক্ষণযোগ্য বন** (Protected forest) এই বন সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে পারে বটে, তবে সরকার কর্ত্তৃক রচিত নিয়ম কানুনের মধ্যেই এইরূপ ব্যবহার চলিতে পারিবে। (৩) **অ-শ্রেণীভুক্ত বন** (Unclassified forest) এই বন ব্যবহারের জন্য কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নাই ; ইহা জনগণের দ্বারা ব্যবহার্য্য।

(অনু-৭) প্রাণীজ সম্পদ—*Animal Resources*

প্রাণী এবং প্রাণীজ সম্পদে ভারত বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ। দেশের সঙ্গতি হিসাবে গণনা করিবার যোগ্য পশুর মধ্যে গরু, বৃষ, বলদ, মেষ, ছাগল, মহিষ, অশ্ব, শূকর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই পশুসমূহ পাওয়া যায়। জগতের অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা অধিক। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে (ইহার মধ্যে কিছু এলাকা বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পশুপালন হইয়া থাকে ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পশু উৎপাদিত হয় গুজরাটে। সংখ্যায় অধিক হইলেও ভারতের সাধারণ গবাদি পশু অন্যান্য দেশের গবাদি পশুর তুলনায় যে নিকৃষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার মধ্যে অবশ্য কোন কোন এলাকার পশু উৎকৃষ্ট ধরণের আছে কিন্তু উহা ব্যতিক্রম মাত্র। ভারতীয় পশুর নিকৃষ্ট ধরণের জন্য কতিপয় কারণ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যথাযথ প্রজনন ব্যবস্থা অবলম্বন হয় না ; (২) ধর্ম্ম ও সংস্কারের জন্য হিন্দুগণ

রোগগ্রস্ত ও বার্দ্ধক্য-পীড়িত গোজাতীয় পশু হত্যা করে না ; (৩) পশুদিগের পক্ষে উপযুক্ত চারণভূমি ও যথাযোগ্য খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দেশের অর্থনীতিতে প্রাণী সম্পদের গুরুত্ব চারিটী বিষয়ে :—

(১) **কৃষিকার্য্যে**—কৃষিকার্য্যে শস্য উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের কার্য্যে এবং উৎপন্ন ফসল স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কার্য্যে বলদের ব্যবহার হয়। (২) **শিল্পে**—প্রাণী সমূহের কার্য্য হইতে বা দেহ হইতে লভ্য বহু সামগ্রী নানা শিল্প কার্য্যে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; যথা, চামড়া, পশম, রেশম, লাক্ষা, পশুর শিং, হস্তীদন্ত ইত্যাদি। (৩) **বহির্ব্বাণিজ্যে**—বহির্ব্বানিজ্যে প্রাণীজ সামগ্রীর বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণ প্রাণীজ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়। (৪) **সাধারণ ভোগ কার্য্যে**—প্রাণীর নিকট হইতে সাধারণ ভোগ সামগ্রী আহৃত হয়, যথা—মধু দুগ্ধ, মাংস ইত্যাদি।

(অনু-৮) **শক্তি সঙ্গতি**—*Power Resources*

যন্ত্র চালনা করিবার জন্য চালন শক্তির প্রয়োজন হয়। কয়লা, খনিজ তৈল ও বিদ্যুৎ—এই তিনটী বিষয় হইতে চালন শক্তি পাওয়া যায়। কয়লা আমাদের দেশে পাওয়া যায় বটে কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশে কয়লা হইতে শক্তি উৎপাদনের সমান সুযোগ নাই। বিস্তৃত খনিজ তৈলের ক্ষেত্রও আমাদের দেশে নাই ; সমগ্র জগতের তৈল, অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম, উৎপাদনের তুলনায় ভারত ও পাকিস্থানের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর।

বিদ্যুৎ হইতে যন্ত্র চালন শক্তি পাওয়া যায়। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের বিস্তৃত আয়োজন আছে। বস্তুতঃ পক্ষে কোন্ দেশে কি পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করা হয়—তাহার দ্বারাই সেই দেশ কতখানি শিল্পোন্নত এবং উহার অধিবাসীগণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের মান কতখানি উন্নত তাহা বিচার করা হয়। বৎসরের হিসাবে ভারতে ঘণ্টায় জনপ্রতি বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হইল ১২ কিলওয়াট ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উহা ১৭৭৫ কিলওয়াট।

আমাদের দেশে কয়েকটী জলপ্রপাত ও নদী হইতে জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিতান্তই অল্প। কৃষি, যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য সস্তায় বহু পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের বিশেষ প্রয়োজন। বহু নদনদী এবং জলপ্রপাত থাকায় আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ

উৎপাদন করিবার প্রচুর অবকাশ আছে। এখানে জল হইতে প্রায় ৪ কোটি কিলওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব বলিয়া অনুমান করা হয়।

Questions & Hints

1. "The prosperity of India depends entirely on the monsoon." Elucidate this proposition (1937) Describe the economic consequences of variations in rainfall in India (1939). [অণুচ্ছেদ-৪]

2. Give a brief account of India's mineral resources (1933). [অণু-৫]

3. Give an account of the coal and iron resources of India (1936). [অণু-৫ এর (১) কয়লা ও (২) লৌহ]

4. Discuss the importance of forests in the economic life of India. (1940) [অণু ৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা

Population

(অণুচ্ছেদ-১) জনসংখ্যা—*The Population*

অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হইল মানুষের ক্রিয়াকলাপ, অতএব দেশের জনগণের উপরেই মূলতঃ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভরশীল। জনগণের সংখ্যা, তাহাদিগের বসবাসের পদ্ধতি, জনগণের প্রাণশক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা, তাহাদিগের অনুসৃত নীতি—এই সকলের দ্বারা জনগণের ক্রিয়াকলাপের ধরণ নির্দ্ধারিত হয় এবং সেই ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হয়।

১৯৪১ সালে আদম সুমারী অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৯ কোটি। বর্ত্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি।*

(অণু-২) জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাববিস্তারী প্রধান বিষয়—*Chief of factors influencing growth of population.*

জন্মহার (Birth rate)—ভারতে জন্মহার অত্যধিক। আমাদের দেশে বিবাহ অনুষ্ঠান খুব ব্যাপক। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে। ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য হিসাবেই বহু অভিভাবক অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই পুত্র কন্যাদের বিবাহ দিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান বলিয়া পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় কম বয়সেই যৌবনাগম হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচু বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা এবং উচ্চতর ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনযাপন ও উপভোগের পরিসর সীমাবদ্ধ; সেই কারণেও জন্মহার অধিক হয়।

এই সকল কারণে আমাদের দেশে বৎসরে প্রতি হাজার লোকপিছু ৩৪টী শিশুর জন্মলাভ ঘটে। ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা না হইলেও যে খুবই উচ্চ সংখ্যা তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* পাকিস্থানের লোকসংখ্যা ৬$\frac{১}{২}$ কোটি। একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গেই চার কোটি লোকের বাস এবং অন্যান্য সমগ্র এলাকায় অবশিষ্ট লোকের বসবাস।

মৃত্যুহার (Death rate)—মৃত্যুহারও অধিক বলিয়া জন্মহারের পরিপূর্ণ ফল সংঘটিত হয় না। ভারতের জনসাধারণের অশেষ দারিদ্র্য। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া, পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জনগণের প্রাণশক্তি ক্ষয় হইয়া যায় এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও লুপ্ত হয়। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ব্যক্তি ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও সংক্রামক ব্যাধি সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমাদের দেশে বৎসরে প্রতি হাজার লোক পিছু ২১।২২ জন লোক মারা যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা। শিশু মৃত্যুর হারও অত্যধিক। ১৯৩৮ সালে দেখা গিয়াছিল, বৎসরে আমাদের দেশে প্রতি হাজারে ১৬৭টী শিশুর মৃত্যু হয়; এই সংখ্যা অতিশয় ভয়াবহ বলিতে হইবে। জনগণের স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টির অভাবের ইহা ফল ও চিহ্ন।

মৃত্যুহার অপেক্ষা জন্মহার অধিক বলিয়া মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই প্রবণতা থাকে। ১৯৩১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতে যে লোক সংখ্যা ছিল ১৯৪১ সালে উহার তুলনায় লোকসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতএব সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরবর্ত্তী দশকেও যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; তবে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দরুণ এই বৃদ্ধির হার পূর্ব্ব দশকের বৃদ্ধির হারের সমান নাও হইতে পারে।

(অনু-৩) জনসংখ্যার বসতি ঘনত্ব—*Density of population*

বসতি ঘনত্ব বলিতে বুঝায় প্রতি বর্গমাইলের মধ্যে গড় লোক বসতির সংখ্যা—অর্থাৎ গড়ে কতজন লোক এক বর্গমাইলের মধ্যে বাস করে। বর্ত্তমান ভারতে (প্রজাতন্ত্রে) গড় ঘনত্ব (average density) হইল প্রতি বর্গ মাইলে ২৬২ জন। * কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্বের পার্থক্য দেখা যায়। যথা, পশ্চিম বঙ্গে বসতি ঘনত্ব হইল প্রতি বর্গ মাইলে ৭৫৬ জন কিন্তু মধ্য প্রদেশে উহা হইল ১৭০।

বসতি ঘনত্বের এই তারতম্য একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(১) **আবহাওয়া** (Climate)—যে সকল অঞ্চলে আবহাওয়া উত্তম—অর্থাৎ অধিক শীতও নহে, অধিক গরমও নহে সেই সকল অঞ্চলে বসবাসের জন্যই মানুষ বেশী করিয়া প্রণোদিত হয়।

(২) **ভূমি আকৃতি** (Configuration of soil)—কোন অঞ্চলের ভূমি সমান

* পাকিস্থানে গড় ঘনত্ব হইল ১৯২। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্বের তারতম্য আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে উহা হইল ৭৯২ কিন্তু সিন্ধু প্রদেশে উহা ৯৪ মাত্র।

ৰ্কি অসমান, ইহার উপরেও বসতি ঘনত্ব নির্ভর করে। সেই কারণে সমতল অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব হয় বেশী এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব হয় কম।

(৩) জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সহজসাধ্যতা বা কষ্টসাধ্যতা (Ease or difficulty of earning a living)—যে সকল অঞ্চলে সহজেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করা যায় সেই সকল অঞ্চলে জনগণ অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। জনসাধারণের আয়ের—অর্থাৎ প্রকৃত সামগ্রী উৎপাদনের দুইটী উপায়। একটী হইল কৃষিকার্য্য, অপরটী শিল্প।

(ক) কৃষিকার্য্য—যে সকল অঞ্চলে মাটি উর্ব্বর এবং জল সহজলভ্য, সেই সকল অঞ্চলে সহজেই ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। এইরূপ অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব হয় অধিক। অপরপক্ষে সে সকল অঞ্চলে মাটি অনুর্ব্বর এবং জল সহজলভ্য নহে, সে সকল স্থানে কৃষিকার্য্য কষ্টসাধ্য এবং সেই সকল অঞ্চলে লোকে অধিক সংখ্যায় বাস করিতে চাহে না।

(খ) শিল্প—যে সকল অঞ্চলে কলকারখানা আছে অর্থাৎ যে সকল অঞ্চল শিল্প-সমৃদ্ধ, সেই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকা হইতে কর্ম্মক্ষম লোকেরা আসিয়া সমবেত হয়। শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায় বলিয়াও ইহারা লোক আকর্ষণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের বসতি ঘনত্ব অধিক ; উহার কারণ শুধু যে উহার মাটি সুজলা সুফলা তাহাই নহে, উহার আব একটী কারণ হইল যে এই স্থানে শিল্পাঞ্চল ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল অবস্থিত।

(অণু-৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনাধিক্যের মতবাদ—*Population-growth and Theory of over-population*

১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৩২ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি। ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ কোটি ; এই বৃদ্ধি শতকরা ১৫ ভাগ। ভারতের জনসংখ্যা শুধু যে বিপুল তাহাই নহে এই বিপুল জনসমষ্টির জীবন-যাত্রার মান অতিশয় নীচু। ভারতবাসীর মাথা-পিছু আয় অতিশয় কম। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর অভাব,—এই সকলের মধ্যেই সাধারণ লোকের জীবন অতিবাহিত হয়। ভারতবাসীর গড় পরমায়ু ২৭ বৎসর যখন নাকি উহা হওয়া উচিত ৬০ বৎসর। ভারতের বিপুল জনসমষ্টির কাঠামো দৃঢ় নহে; এই বিপুল জনসমষ্টি হীন-স্বাস্থ্য

মুমূর্ষু প্রাণীযুথের মত প্রতীয়মান হয়; তেজোদৃপ্ত বলবান জাতির অস্তিত্ব যেন ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলিলেন যে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে; ঠিক 'ম্যালথাস্' যে জনাধিক্যের কথা বলিয়াছিলেন তাহাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—সেই অনুপাতে খাদ্য-শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে যেহেতু জনসংখ্যার পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ অপ্রচুর এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়াস নাই, বরং উহার বিরুদ্ধেই সংস্কার বদ্ধমূল, সেহেতু ভারত 'ম্যালথাস্' বর্ণিত জনাধিক্যের দ্বারা প্রপীড়িত।

অনেক অর্থনীতিবিদ এই নৈরাশ্যব্যাঞ্জক মতবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন যে একটি দেশের অধিবাসীদিগের মাথাপিছু আয় (per-capita income) বর্দ্ধিত করিবার যদি উপায় থাকে, তাহা হইলে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী থাকিলেও দেশ অতি জনাকীর্ণ (overpopulated) হয় না। (১) দেশকে শিল্পে উন্নত করিবার ব্যবস্থা করিলে এবং (২) উৎপাদিত সম্পদ সকলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করিলে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় বর্দ্ধিত হইবে। শিল্প সমৃদ্ধ হইবার পক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন সবই ভারতের আছে—ভারতের প্রাকৃতিক সঙ্গতি প্রচুর; ইহাকে যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা কাজে লাগাইয়া অনেক অধিক সম্পদ উৎপাদন করা যায় এবং সেই সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হইলে (অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র ধনীর হাতে উহা কেন্দ্রীভূত না হইলে) ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে ভারতকে অতি জনাকীর্ণ বলা ভুল।

Questions & Hints

1. What are the chief factors that influence the growth of population in India? (1937) [অনু-২]

2. Discuss the causes of the unequal density and unequal distribution of population in the various parts of India. [অনু-৩]

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থা

The Social System

(**অণুচ্ছেদ-১**) সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জনগণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই কারণে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা এবং উহাদের অর্থনৈতিক ফলাফল পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ-প্রথা (Caste system), একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যবস্থা (Joint family system) এবং উত্তরাধিকার ব্যবস্থা (System of inheritence) আলোচ্য।

(**অণু-২**) **জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা**—*The Caste System*

হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা একটী বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা। প্রত্যেক ব্যক্তির একটী করিয়া জাতি থাকে এবং এই জাতি নির্দ্ধারিত হয় জন্মের দ্বারা—কোন ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা নহে। মোট চারিটী জাতি আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের আবার উপবিভাগ (sub-division) আছে অনেক। কেহ যেমন তাহার জাতি নিজে ঠিক করিতে পারে না, তেমনি কেহই তাহার স্বীয় জাতি পরিবর্ত্তন করিতেও পারে না। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য একাধিক কঠোর সামাজিক নিয়মও আছে। উপরন্তু একটী জাতির একটী পেশা বা বৃত্তি নির্দ্ধারিত থাকে।

জাতিভেদ প্রথার গুণ—অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একাধিক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, জাতিভেদের দ্বারা সমাজের মধ্যে শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকে। শ্রম বিভাগের দ্বারা অধিকতর উৎপাদন সম্ভব হয়; অতএব এই প্রথা সমগ্র সমাজে অধিকতর সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার দ্বারা বংশানুক্রমিক ভাবে শিল্পনৈপুণ্য হস্তান্তরিত হইতে থাকে; পিতা তাহার সন্তানকে শিশু বয়স হইতেই তাহার বিশেষ শিল্পে কুশলী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, জাতির দ্বারা পেশা নির্দ্ধারিত

বলিয়া, শিশু বয়স হইতেই প্রত্যেকে একটী বিশেষ শিল্প বা বৃত্তির আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হয়; নিত্যকার পর্য্যবেক্ষণ হইতে ঐ শিল্প বা বৃত্তির অনেক জ্ঞান সে আপনা-আপনি আহরণ করিয়া লইতে পারে। চতুর্থতঃ, প্রত্যেকেরই পেশা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেকেরই একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। **পঞ্চমতঃ,** প্রত্যেকে জাতি বা বর্ণ তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে পারস্পরিক সাহায্য-সঙ্ঘের ন্যায় কার্য্য প্রদান করে। জাতি চেতনার (Caste consciousness) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া একটী জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সেই জাতিভূক্ত কোন বিপদগ্রস্ত বা দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে প্রণোদিত হয়।

জাতিভেদ প্রথার অপগুণ—কিন্তু জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একাধিক অর্থনৈতিক অপগুণ বিশ্লেষণ করা চলে। **প্রথমতঃ,** জাতির দ্বারা পেশা নির্দ্ধারিত হওয়ায়, কোন একজন ব্যক্তি তাহার জাত-ব্যবসা যদি পছন্দ না করে বা উহার পক্ষে যদি সে উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলেও তাহাকে সেই পেশাতে থাকিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। **দ্বিতীয়তঃ,** কাহারও যদি অপর কোন পেশা বা বৃত্তিতে বিশেষ যোগ্যতা বা প্রতিভা থাকে তাহা হইলেও তাহার সেই যোগ্যতা বা প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ থাকে না। ইহাতে যোগ্যতার সহিত কাজের সামঞ্জস্য বিধান হয় না এবং প্রতিভার অপচয় ঘটে। **তৃতীয়তঃ,** ইহার দ্বারা বৃহদায়তন বা বড় বহরের উৎপাদন (Large-scale production) ব্যাহত হয়; বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যবস্থায় যে কোন প্রকার শ্রমের দ্রুত যোগান থাকা প্রয়োজন। জাতিভেদ প্রথায় এক জাতির ব্যক্তি অপর জাতির পেশায় যাইতে পারে না; অতএব যে কোন পর্য্যায়ের শ্রমিকের দ্রুত যোগান বৃদ্ধি হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। **চতুর্থতঃ,** শূদ্র অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমীর স্থান সকল জাতির নিম্নে; ইহা কায়িক পরিশ্রমের প্রতি অবজ্ঞার পরিচায়ক। কায়িক পরিশ্রমের প্রতি এই অবজ্ঞা মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে বেকার সমস্যার জন্য আংশিক ভাবে দায়ী।

(অণু-৩) একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যবস্থা—*The Joint Family System*

একান্নবর্ত্তী পরিবারে বসবাস ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে আর একটী বৈশিষ্ট্য। পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ বহু ব্যক্তি একত্রিত ভাবে একই পরিবারের মধ্যে বসবাস করে। পরিবারের মধ্যে একজন কর্ত্তা থাকেন এবং তিনিই সমগ্র পরিবারটীর পরিচালনা করেন। পরিবারস্থ সকলের সম্পত্তি একত্রিতভাবে

যুক্ত মালিকানার মধ্যে থাকে ; সকলের ব্যক্তিগত আয় একই স্থানে জমা হয় এবং উহা হইতে সমগ্র পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের গুণ—একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যে গুণসমূহ বিশ্লেষণ করা যায় সেগুলি এইরূপ :—**প্রথমতঃ**, ইহাতে প্রত্যেকের জীবন ধরণের খরচ অনেক কম পড়ে। পৃথক পৃথক বসতি হইলে যেরূপ খরচা হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম খরচা হয় যদি অনেকে একত্রিত ভাবে বসবাস করে। ইহাতে সঞ্চয়ে সুবিধা হয় এবং দেশের পুঁজি বৃদ্ধি হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিছক ভরণ পোষণের সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। ইহাতে প্রত্যেকেই তাহার কর্ম্মজীবন সুরু করিবার পক্ষে সহায়তা পায় এবং দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের অপেক্ষাকৃত সহজে জীবন ধারণ সম্ভব হয়। **তৃতীয়তঃ**, এইরূপ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতার বৃত্তি জাগরিত হয় সেক্ষেত্রে একজনের অভাবে বা বিপদে আর সকলের আগাইয়া আসা স্বাভাবিক। সেই কারণে ঝুঁকি-বহুল ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, কোন কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্নাভাবে পড়িতে হইবে না।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের অপগুণ—একান্নবর্ত্তী পরিবারে একাধিক অপগুণ দেখিতে পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ**, যিনি পরিবারের কর্ত্তা, যাঁহার উপর একটী বৃহৎ পরিবার নির্ভরশীল, তাঁহার পক্ষে সামান্য ঝুঁকি-বহুল শিল্পেও যোগদান করা সম্ভব হয় না। **দ্বিতীয়তঃ**, পারিবারিক সংগঠনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লোকে যে যাহার গ্রামের মধ্যেই উপার্জ্জনের সন্ধান করে। ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি সঙ্কুচিত থাকে। **তৃতীয়তঃ**, ইহাতে একজন ব্যক্তি অধিক আয় করিতে নিরুৎসাহ হয় কারণ তাহার আয় অপরের আয় অপেক্ষা বেশী হইলেও অভিন্ন তহবিলে জমা হইবে। **চতুর্থতঃ**, প্রত্যেকেই অন্যের সহযোগিতায় অন্ন সংস্থানের জন্য নিশ্চিন্ত থাকে। উপার্জ্জন না করিলেও ভরণ পোষণের অভাব হইবে না এইরূপ চেতনা অনেককেই শিল্পোদ্যোগী হইতে বিমুখ করিয়া তুলে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রেরণায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবে এবং পরিবর্ত্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

(অণু-৪) উত্তরাধিকার ব্যবস্থা—*Sytems of Inheritence*

সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্তে দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে,—দায়ভাগ এবং মিতাক্ষর। বাঙ্গালায় দায়ভাগ পদ্ধতি প্রচলিত, অন্যান্য প্রদেশে

মিতাক্ষরা পদ্ধতি বর্ত্তমান। উভয় পদ্ধতির দ্বারাই পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান অধিকার এবং কন্যার অধিকারের উপরে পুত্রের অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়।

এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যও আছে। দায়ভাগ পদ্ধতিতে পিতার জীবদ্দশায় সমগ্র সম্পত্তির তিনি অবিসংবাদিত মালিক; পিতার মৃত্যু হইলে তবেই পুত্রদিগের মধ্যে সম্পত্তির (সমান) উত্তরাধিকার ঘটিবে। মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে পিতার জীবিত কালেই তাঁহার সম্পত্তির উপর পুত্রদিগের, এবং পৌত্র থাকিলে তাহাদিগেরও মালিকানা থাকিবে; পিতার মৃত্যুর পর মালিকানার পরিবর্ত্তন ঘটিল না কারণ এক্ষণে যাহারা সম্পত্তির মালিক হইল পিতা বর্ত্তমান থাকিতেও তাহারাই ঐ সম্পত্তির মালিক ছিল।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তির মালিক তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পত্তির উপর অপ্রতিহত অধিকার রাখেন। মুসলমান আইনে শুধুমাত্র পুত্রগণই নহে, কন্যাগণও সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে। মালিকের মৃত্যুর পর বহু ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন ঘটে,—পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্ত্রী ইত্যাদি। হিন্দুদিগের মধ্য অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে সম্পত্তি অধিকতর ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য হয়।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার গুণ

(১) পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান অংশ থাকায় সকল পুত্রই জীবন যাত্রা সুরু করিতে কিছু না কিছু সহায়তা পায়। ইহা "সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার" (Social security scheme) ন্যায় কার্য্য দেয়।

(২) সম্পত্তির মালিকানা ছড়াইয়া পড়ে, দুই চারি জন ব্যক্তির হস্তেই পুঞ্জীভূত হয় না। ইহাতে কিছুটা ধন বণ্টনে সাম্য (equality in the distribution of wealth) প্রচলিত থাকে।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অপগুণ

(১) সম্পদের মালিকানা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় কাহারও পক্ষে উৎপাদনের কার্য্যে অধিক পরিমাণে পুঁজি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(২) চাষের জমির মালিকানা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত হওয়ায় জমি ক্রমশঃই অধিকতর ক্ষুদ্রক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে। ইহাতে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and fragmentation) ঘটে; ইহা একাধিক কারণে উৎকৃষ্ট চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

Questions & Hints

1. Discuss the economic significance of the caste system (1945) [অনু-২]
2. Discuss the economic aspects of the joint family and the caste system in India. (1935) [অনু-২ অনু-৩]

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিকার্য্য

Agriculture

(**অণুচ্ছেদ-১**) **কৃষিজাত ফসল**—*Agricultural crops*

ভারতে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হয়; এইগুলিকে মোটা-মুটি দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়: খাদ্যজাতীয় এবং বাণিজ্যমূলক।

খাদ্যজাতীয় ফসল (*Food crops*)

(১) চাউল—সমগ্র পৃথিবীর মোট চাউল উৎপাদনের মধ্যে অর্দ্ধেক ভারতেই উৎপাদিত হয়। ভারতের কৃষিভূমির শতকরা ৩০ ভাগ অংশ চাউল উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। চাউল উৎপাদনের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং পলিমাটিগঠিত সমভূমি আবশ্যক; সেই জন্য দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতেই ধান চাষ বেশী হইয়া থাকে।

(২) গম—চাউলের পরেই গম উৎপাদনের স্থান। অবিভক্ত ভারতে বৎসরে প্রায় এক কোটী টন গম উৎপাদন হইত। বর্ত্তমানে ঐ পরিমাণের শতকরা ৬৬ ভাগ উৎপন্ন হয় ভারত প্রজাতন্ত্রে এবং ৩৪ ভাগ পাকিস্থানে। ভারতে যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই ও রাজপুতনায় গম উৎপন্ন হয়।

(৩) নীবার ও ভূট্টা—ভারতে জোয়ার, বজরা প্রভৃতি নীবার উৎপন্ন হয়। রাজপুতানা, মাদ্রাজ, দক্ষিণাপথ ও মধ্য প্রদেশে এই প্রকারের খাদ্যশস্য প্রচুর জন্মে। উত্তর ভারতে ভূট্টার চাষ হয়।

(৪) ইক্ষু—উত্তর ভারতের প্রদেশ গুলিতেই প্রধানতঃ আখের চাষ হইয়া থাকে। সমগ্র পরিমাণের মধ্যে যুক্ত প্রদেশেই উৎপন্ন হয় অর্দ্ধেকের অধিক। প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে ৫০ লক্ষ টনের মতন আখ পাওয়া যাইত; ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অংশ শতকরা ১৫½ ভাগ।

(৫) ডাইল—ছোলা, মুগ, মসুর, মটর, কলাই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ডাইল ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাণিজ্য মূলক ফসল (*Cash crop or Commercial crop*)

(১) তুলা—পৃথিবীর মধ্যে তুলা উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। বোম্বাই মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে তুলার চাষ হইয়া থাকে।

(২) পাট—অবিভক্ত ভারতের মোট পাট উৎপাদনের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র বর্ত্তমান ভারত প্রজাতন্ত্রে হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ পাকিস্থানে উৎপাদন হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার কতিপয় অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হয়।

(৩) চা ও কফি—চা উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। এখানে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনের প্রধান এলাকা হইল আসাম, দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার অঞ্চল। দক্ষিণ ভারতে কিছু পরিমাণ কফি উৎপন্ন হয়।

(৪) তৈল-বীজ—পৃথিবীর মধ্যে ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈল-বীজ উৎপন্ন হয়। তিল, রেড়ি, সরিষা, তিসি, চীনাবাদাম, তুলা বীজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তৈল বীজ এখানে জন্মে।

(৫) ভেষজ—কতিপয় ভেষজ সামগ্রীও ভারতে উৎপন্ন হয়। সরকারের একচেটিয়া কারবার হিসাবে সিঙ্কোনার চাষ হইয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আফিমের চাষ হয়। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও মালাবারে গাঁজা উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীর তামাক উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ ভারতে হইয়া থাকে।

(অনু-২) কৃষির অনগ্রসরতা ও ইহার কারণ—*Backwardness of Agriculture and its Causes*

কৃষিপ্রধান হইলেও আমাদের দেশ কৃষিতে পশ্চাদপদ। বিভিন্ন দেশে সমপরিমাণ জমিতে কতখানি ফসল হয় তাহা তুলনা করিলে কৃষিকার্য্যে দেশের পারদর্শিতা বিচার করা যায়। আমাদের দেশে প্রতি একর জমিতে গড়ে ৮৫৪ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়; চীন দেশে হয় ১৪০০ পাউণ্ড, মিশরে ১৮৪৫ পাউণ্ড, ইটালীতে ২৭৯৭ পাউণ্ড। গম উৎপন্ন হয় আমাদের দেশে প্রতি একরে ৬৩৬ পাউণ্ড; কানাডায় উহা ৯৭২ পাউণ্ড মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৪৬ পাউণ্ড। অন্যান্য কৃষিসামগ্রীর ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় কৃষির এই অনগ্রসরতার কারণ বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের সহিত উহা জড়িত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) **ভূমি**—(ক) ভারতের বিভিন্ন এলাকার ভূমিতে যে প্রাকৃতিক বারিধারা পতিত হয়, উহার অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা কুখ্যাত। উহার কুফল রদ করিবার

জন্য একদিকে জলনিকাশ ও অপরদিকে জলসেচের ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু যথোপযুক্ত জল নিকাশ ও জলসেচ ব্যবস্থার অভাব রহিয়াছে। (খ) উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং একজন চাষীর যেটুকু জমি আছে তাহাও সবটাই একস্থানে সুসংবদ্ধভাবে থাকে না। জমির এই খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা উত্তম কৃষিকার্য্যের প্রতিবন্ধক। (গ) যথোপযুক্ত সার ব্যবহারের ব্যবস্থা না থাকার দরুণ জমির উর্ব্বরতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। (ঘ) শুধু যে বর্ত্তমানের কর্ষিত জমিতে কম ফসল হয় তাহাই নহে, পরন্তু বহু পরিমাণ জমি আছে যেগুলিতে কৃষিকার্য্য হইতে পারে কিন্তু হয় না। অবিভক্ত ভারতে এইরূপ কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি একরেরও অধিক।

(২) **শ্রমিক**—(ক) কৃষকদিগের দারিদ্র্য অন্যতম প্রতিবন্ধক। যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে এবং তাহারা সহজেই ব্যাধি কবলিত হয়। অন্যান্য দেশের কৃষকের তুলনায় তাহাদের স্বাস্থ্য নিকৃষ্ট। (খ) বিভিন্ন কারণে কৃষকগণ গভীরভাবে ঋণ-জালে আবদ্ধ; এই ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া তাহাদের পক্ষে কষ্টকর এবং চল্‌তি আয়ের অধিকাংশ ঋণেই খাইয়া যায়। চরম দারিদ্র্য ও ঋণের বোঝা তাহাদিগকে নৈরাশ্যবাদী ও অদৃষ্টবাদী করিয়াছে; উহা কর্ম্মদক্ষতার শত্রু। (গ) কৃষকগণ অত্যধিক মাত্রায় রক্ষণশীল। চিরাচরিত যে পদ্ধতির দ্বারা তাহারা চাষ করে উহা ভিন্ন কোন নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে তাহারা বিমুখ। ইহাতে উন্নত ধরণের আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না।

(৩) **পুঁজি**—কৃষকদিগের আয় এতই কম যে সঞ্চয় নাই বলিলেই চলে; অধিকাংশ কৃষকই ঋণগ্রস্ত। তাহাদিগের পক্ষে কৃষির উন্নতি-মূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ ও নিয়োগ একরূপ অসম্ভব। প্রতি বৎসর মামুলী কৃষিকার্য্যের জন্য যে পুঁজির দরকার হয় তাহাও সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

(৪) **ব্যবস্থাপনা**—(ক) সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত কোন পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধানের প্রয়াস বা অন্যান্য অগ্রসর দেশ গুলিতে যে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয় সেগুলিকে গ্রহণের প্রয়াস আমাদের কৃষকদিগের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। (খ) এক একজন চাষীর জমির পরিমাণ এতই অল্প যে উহাতে আধুনিক ব্যবস্থা সম্মত বৃহদায়তনের উৎপাদন (large scale production) সম্ভব হয় না। (গ) উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে বহু ত্রুটি আছে। বিক্রয় ব্যবস্থার এই সকল ত্রুটির দরুণ প্রকৃত চাষী তাহার উৎপন্ন

ফসলের ন্যায্য মূল্যের অর্দ্ধেক মাত্র পাইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক ফড়ে মহাজনরূপ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের দ্বারা আত্মসাৎ হয়।

(অণু-৩) কৃষি উন্নতির উপায়—*Suggestions for Agricultural Improvement*

(১) যথোপযুক্ত সার ব্যবহারের দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গোময় একটী অল্প মূল্যের উৎকৃষ্ট সার—জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার না করিয়া সার হিসাবে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত, রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রসার করিতে হইবে। পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ ও খালের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক ভাবে জমির একত্রীকরণ (consolidation of holdings) করিতে হইবে; কৃষিযোগ্য পতিত জমির উদ্ধার করিয়া উহাতে চাষের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

(২) কৃষকদিগকে ঋণ-জাল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সমবায় ক্রয় সমিতি স্থাপনে সহায়তা করিতে হইবে; ইহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয়সঙ্কোচ হইবে। তাহাদিগের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে; কাজ হয় শুধু দেহ দিয়াই নহে মানসিক বৃত্তি দিয়াও। মানসিক বৃত্তির যথাযথ পরিস্ফূরণ হইলে কৃষকদিগের রক্ষণশীলতা দূরীভূত হইবে।

(৩) কৃষকদিগকে পুঁজি সংগ্রহে সহায়তা করিতে হইবে। অল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য সমবায়-সমিতি ও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন ও সেগুলির প্রসার প্রয়োজন।

(৪) জমির সংহতি সাধনের পর, বৃহদায়তনের উৎপাদন করিতে যাহাতে চাষীরা অগ্রসর হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনার দ্বারা ও প্রদর্শনীর মারফৎ কৃষকদিগের নিকট উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতির শিক্ষা আনিয়া দেওয়া যায়। বিক্রয় ব্যবস্থারও উন্নতি-বিধান প্রয়োজন। মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া কৃষকের সহিত তাহার ফসলের বাজারের যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে—যাহাতে বিক্রয়-দামের ন্যায্য অংশ চাষীর প্রাপ্য হয়।

(অণু-৪) কৃষি ও সরকার—*Agriculture and Government*

কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার সমূহ কৃষি-উন্নতির জন্য যে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেগুলি এইরূপ :—

(১) উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকার কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দানের জন্য দুইটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, জমি উন্নয়ন ঋণ আইন (১৮৮৩) এবং কৃষক ঋণ আইন (১৮৮৪)। ইহার দ্বারা সরকার জমির উন্নয়নের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য কৃষকদিগকে দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দিবার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপ ঋণ দান ব্যবস্থা বিশেষ কোন সাফল্য অর্জ্জন করে নাই।

(২) সরকারী উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে; অধিকাংশ সমিতিই গ্রাম্য ঋণ দান সমিতি।

(৩) সরকারের প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তৃত জলসেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে সাধিত জলসেচ ব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশই খালের দ্বারা সেচ ব্যবস্থা।

(৪) খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জমির সংহতি-সাধনের জন্যও সরকার কিছু কিছু প্রচেষ্টা করিয়াছেন। সমবায়ের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজন হইলে বাধ্যতামূলকভাবে জমির সংহতি সাধনের জন্য কোন কোন প্রাদেশিক সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

(৫) কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক "কৃষি গবেষণা পরিষদ" স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয়-সরকারের একটী কৃষি-দপ্তর আছে। এই দপ্তর সর্ব্ব ভারতীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টিত থাকে এবং কৃষি সংক্রান্ত কতিপয় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিয়া থাকে—শর্করা ব্যুরো, পশু চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় পশু প্রজননালয় ইত্যাদি। প্রদেশগুলিতেও প্রাদেশিক সরকার সমূহেব কৃষিদপ্তর আছে। ইহার মারফৎ প্রাদেশিক সরকার উন্নত ধরণের কৃষির জন্য প্রচার কার্য্য করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও কৃষকদিগকে উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি দেখাইবার জন্য প্রদর্শন খামার স্থাপিত হইয়াছে।

(৬) জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের সহযোগে একটী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছেন।

(৭) ১৯৩৫ সালে একটী কেন্দ্রীয় বিক্রয় ব্যবস্থা দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য হইল কৃষিজাত সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, যথা গ্রেডিং প্রবর্ত্তন, নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন, উৎপাদকদিগকে সুসংগঠিত করা ও গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রেডিং ও বিক্রয় বন্দোবস্তের জন্য "কৃষিজাত ফসল আইন" বিধিবদ্ধ করেন।

পাট, তূলা, তামাক প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার একটী করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিয়াছেন।

(৮) যুদ্ধের মধ্যে ও যুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষ করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ভারত-সরকার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

(অনু-৫) জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা—*Subdivision and Fragmentation of Holdings*

জমির কোন মালিকের মৃত্যুর পর তাহার জমি তাহার বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। এইভাবে জমি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে; ইহাকে বলা হয় খণ্ডীকরণ (Subdivision)। উপরন্তু একজন কৃষকের মোট যত পরিমাণ জমি আছে তাহার সমস্তটাই একস্থানে একসঙ্গে আছে, এইরূপ নহে। গ্রামের বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া আছে এইরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার জমিরই সমান অংশ বিভিন্ন উত্তরাধিকারীগণ গ্রহণ করিবে। অতএব একজন ব্যক্তির জমি গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে। ইহারই নাম অসম্বদ্ধতা (Fragmentation)।

ইহার কারণ (Its causes)

(১) আমাদের দেশের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বহু ব্যক্তি জমির উত্তরাধিকার হইয়া থাকে।

(২) দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে; অতএব উত্তরাধিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া জমির ক্রমবর্দ্ধমান উপবিভাজন ঘটিতেছে।

(৩) আধুনিক যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যাহারা ঐরূপ শিল্পে জীবনধারণ করিত তাহারা কৃষিকার্য্যকেই উপজীবিকা করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে যে ব্যক্তি যেটুকু জমিরই মালিক হয় সে সেইটুকু জমিই নিজের মালিকানায় রাখিয়া দেয়।

(৪) একান্নবর্ত্তী পরিবারে বসবাসের প্রথা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জমির খণ্ডীকরণ অধিক মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জমি পৃথক পৃথক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইতেছে, একান্নবর্ত্তী পরিবার থাকিলে যাহা প্রয়োজন হইত না।

কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহার কুফল—(Evil effects on agriculture)

(১) ছোট ছোট জমিগুলি স্বতন্ত্র করিবার জন্য যে বেড়া অথবা আল দেওয়া হয় উহাতে বহু পরিমাণ জমি অকর্ষিত থাকিয়া যায়। এক জন কৃষকের দিক হইতে

এই জমির পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক হইতে এই লোকসান নগণ্য নহে।

(২) চাষীর সকল জমি একত্রিত ভাবে নাই বলিয়া তাহার পক্ষে সেচ-ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

(৩) কৃষিকার্য্যের উপকরণগুলি লইয়া চাষীকে এক জমি হইতে আর এক জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ইহাতে বহু শ্রম ও সময় নষ্ট হয়।

(৪) খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুণ আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যে বৃহদায়তনের উৎপাদন সম্ভব হয় না। যে সকল দেশে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য্য হয় সেই সকল দেশে ফসল উৎপন্ন হয় অনেক বেশী। উপরন্তু আমাদের দেশের চাষীর জমির পরিমাণ এতই অল্প এবং তাহাও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন যে উহাতে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয় না।

প্রতিবিধান—(Remedies)

(১) জমির সংহতি সাধনের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন জমির মালিকগণ পরস্পরের মধ্যে জমি হস্তান্তরিত করিয়া প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন জমিখণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া লইতে পারে। এইরূপ সংহতি সাধন ইচ্ছামূলক হইতে পারে, আবার বাধ্যতামূলকও হইতে পারে। চাষীরা যদি নিজ ইচ্ছায় উহা করে, তাহা হইলে উহা ইচ্ছামূলক এবং সরকার যদি চাষীদিগকে উহা করিতে বাধ্য করেন তাহা হইলে উহা বাধ্যতামূলক।

(২) পাশাপাশি অবস্থিত জমিখণ্ডগুলি বিভিন্ন মালিকের অধিকারভূক্ত হইলেও সকল মালিকের সহযোগিতার দ্বারা একসাথে চাষ হইতে পারে। ইহাকে বলা হয় যৌথ কৃষি (collective farming)

(অনু-৬) কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততা—*Agricultural Indebtedness*

আমদের দেশের কৃষক গভীর ভাবে ঋণজালে আবদ্ধ। তাহারা মহাজনদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণের সুদ দিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয় আসল পরিশোধ করা হইয়া উঠে না। "ভারতীয় কৃষকের ঋণের মধ্যেই জন্ম, ঋণের মধ্যেই বাঁচা, ঋণের মধ্যেই মৃত্যু"। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত কমিটি অনুমান করেন যে সমগ্র ভারতে কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল মাদ্রাজ প্রদেশে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। উহার পরবর্ত্তী সময়ে

এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই বিপুল ঋণভার আমাদের দেশের একটী গুরুত্বপূর্ণ কৃষিসমস্যা।

কারণ সমূহ (Causes)—কৃষকদিগের এই ঋণগ্রস্ততার মোটামুটি তিনটী কারণ (১) কৃষকদিগের আয়ের স্বল্পতা (২) ব্যায়ের আধিক্য ও (৩) ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা।

(১) **আয়ের স্বল্পতা**—আমাদের দেশের কৃষকগণ অতিশয় দরিদ্র। এখানে অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। জমিব খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুণ বৃহদায়তনের উৎপাদন হয় না—আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। সেই কারণে ফসল হয় কম। আবার যে পবিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় তাহার পূর্ণ মূল্যেব ন্যায্য অংশ কৃষকদিগের হস্তগত হয় না। উহা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা আত্মসাৎ হয়। উপরন্তু কৃষকদিগের সারা বৎসর কাজ থাকে না। কুটীর শিল্প থাকিলে উহা কৃষকদিগকে পার্শ্ব উপজীবিকা হিসাবে কাজ দিতে পারিত। আবার বৃষ্টিপাতের তারতম্যের দরুন যথোচিত ফসল উৎপন্ন না হইবার জন্য কৃষককে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই সকল কারণে কৃষকদের গড়পড়তা আয় অতিশয় কম।

(২) **ব্যয়ের আধিক্য**—বিভিন্ন কাবণে কৃষকদিগেব সামর্থ্যের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য ঘটে। তাহাদিগের মধ্যে মামলা মোকৰ্দ্দমা হইয়া থাকে অত্যধিক। জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনে বহু জটিলতা থাকায় এবং বহু উত্তরাধিকার থাকায় অনেক সময়ে মামলা মোকৰ্দ্দমা অপবিহার্য্য হইয়া পড়ে। চাষীগণ অনেক সময়ে বহু অর্পব্যয় করে। সামাজিক বা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে তাহারা ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে। ব্রিটিশ সরকার যে ভূমিরাজস্ব আদায় করিতেন তাহার পরিমাণ ছিল অত্যধিক। দরিদ্র কৃষকগণ এত অধিক হারে রাজস্ব দিতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িত এবং এই ঋণের বোঝা বংশানুক্রমিক ভাবে বহন করিতে হইত। উপরন্তু চাষের বলদের মৃত্যু হইলে বা নূতন লাঙ্গল কিনিতে হইলে চাষীর পক্ষে ঋণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

(৩) **ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা**—ব্রিটিশ শাসনেব আমলে বিভিন্ন কারণে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীদিগের পক্ষে ঋণ পাওয়া সহজসাধ্য হইয়া উঠে এবং ব্রিটিশের উৎকৃষ্ট বিচার ব্যবস্থার দরুণ প্রাপ্য অর্থ আদায়ের সুবিধা থাকায় মহাজন ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকে।

প্রতিবিধান—(Remedies)

(১) কৃষকদিগের যাহাতে আয় বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য কৃষিসামগ্রীর উৎপাদন

বৃদ্ধির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি হইলে তবেই আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান হইবে এবং পুরাতন ঋণ তাহারা শোধ করিতে পারিবে। জমির সংহতি সাধন, জলসেচ ব্যবস্থার বিস্তার, উৎকৃষ্ট বীজ ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি প্রয়োজন।

(২) বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন, যাহাতে কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় লব্ধ অর্থ চাষীর হস্তগত হয় এবং যাহাতে তাহারা মহাজনদিগের নিকট দাদন লইয়া পূর্ব্ব হইতেই মহাজনদিগকেই ফসল বিক্রয় করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য না হয়।

(৩) সাধ্যাতীত সামাজিক ব্যয় যে কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল নহে, ইহার স্বপক্ষে জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(৪) যে সময়ে কৃষকদিগের হাতে কাজ থাকে না সেই সময়ে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনবিহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য না হয় সেই উদ্দেশ্যে পার্শ্ব-উপজীবিকা (subsidiary occupation) গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(৫) পুরাতন ঋণের বোঝা যাহাতে লাঘব করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং মহাজনেরা যাহাতে কৃষকদিগকে ঠকাইতে না পারে তাহাও দেখিতে হইবে।

(৬) সমবায় ঋণদান সমিতি ও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রসারের দ্বারা কৃষকদিগকে ন্যায় সঙ্গত সুদে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

(অনু-৭) অবলম্বিত ব্যবস্থা—*Measures adopted (for checking agricultural indebtedness)*—কৃষকদিগের ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলি হইল এইরূপ :—

(১) সরকার অল্প সুদে কৃষকদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ঋণ দুই প্রকারের—দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী। কৃষিভূমির স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়—অর্থাৎ যে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য একটু বেশী সময় দেওয়া হইত। উপরন্তু চাষের চলতি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সরকার স্বল্প মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করেন; এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সময় দেওয়া হইত। সরাসরিভাবে সরকার কর্ত্তৃক কৃষকদিগকে ঋণদানের এই প্রচেষ্টা নানা কারণে সাফল্যলাভ করে নাই।

(২) সরকার আইনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এই নিয়ম করিয়া দেন যে

চাষীর গৃহস্থালীর সামগ্রী এবং চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বলদ দেনার দায়ে ক্রোক করা যাইবে না।

(৩) ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষক সাহায্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়া অত্যধিক সুদের হার কমাইয়া দিবার জন্য আদালতগুলিকে ক্ষমতা দেন। ১৯১৮ সালের সুদখোরী ঋণ আইনের (Usurious Loans Act) দ্বারাও সরকার অন্যান্য সুদের হার কমাইয়া দিবারও অধিকার আদালতগুলিকে দিয়াছিলেন।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে মহাজনগণ কৃষকদিগকে সুদের জালে গভীর ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়া তাহাদিগের নিকট জমি বিক্রয় করিয়া দিতে চাষীদিগকে বাধ্য করিত। কোন কোন প্রাদেশিক সরকার এইরূপ অ-কৃষকদিগের নিকট জমির হস্তান্তর বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

(৫) সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ও নিয়ন্ত্রণে সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে অধিকাংশই হইল গ্রাম্য ঋণদান সমিতি; ইহাদের উদ্দেশ্য হইল কৃষক ও অল্প আয়ের ব্যক্তিদিগকে অল্প সুদে ঋণ প্রদান করা।

(৬) বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার মহাজন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মহাজনদিগের অসৎ ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৭) পুরাতণ ঋণ লাঘবের জন্য একাধিক প্রাদেশিক সরকার "কৃষিখাতক আইন" বিধিবদ্ধ করিয়া ঋণ শালিশী বোর্ড গঠন করিয়াছেন। মহাজন বা খাতক, যে কেহ এই বোর্ডগুলির নিকট নালিশের জন্য আবেদন জানাইতে পারে।

(অণু-৮) কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা—*Agricultural Marketing*

ফসল উৎপাদনের মধ্যে যে শুধু গলদ আছে তাহাই নহে—ফসল বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও চাষীদিগকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। যে দামে খরিদ্দারগণ কৃষিসামগ্রী ক্রয় করে তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও কম চাষীদিগের হস্তগত হয়। বিক্রয় ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটির জন্য এইরূপ ঘটে।

বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি—(১) কৃষকগণ এতই দরিদ্র এবং ঋণভারগ্রস্ত যে ফসল উৎপন্ন হইবার পরেই যথাশীঘ্র সম্ভব তাহারা উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ফসল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারে নাই বলিলে চলে; মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা ঐ ফসল কিনে এবং ধরিয়া রাখে—বর্দ্ধিত দামে তাহা বিক্রয় করিয়া ইহারাই মোটা লাভ পায়।

(২) অনেক ক্ষেত্রে, যে মহাজন কৃষককে ঋণ দেয় সেই স্বয়ং ব্যাপারী এবং

এই ব্যাপারী-মহাজন চাষীদিগকে এই সর্ত্তে ঋণ দেয় যে চাষী ফসল উৎপন্ন করিয়া উহা তাহাকেই (মহাজনকেই) বিক্রয় করিবে। ঋণের অনুগ্রহপ্রার্থী চাষী উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না বা সুবিধাজনক দরকষাকষি করিতে পারে না। (৩) দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ভাল রাস্তা না থাকায় দূরের বাজারে ফসল বিক্রয় করিতে যাওয়া চাষীদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না, দূরে লইয়া-যাইবার মতন যানবাহনও তাহাদের নাই। ফলে তাহারা গ্রামের মধ্যে কম দরেই ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। (৪) চাষীদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। বাজার দাম সম্পর্কে তাহারা সকল সময়ে সম্যক অবহিত থাকে না। ব্যাপারীদিগের দেওয়া দামই তাহারা যথার্থ দাম বলিয়াই বিবেচনা করে। (৫) পাল্লার ওজনের মধ্যেও নানারূপ তারতম্য দেখা যায়। ফড়িয়াগণ অনেক সময়ে অধিক ওজনের পাল্লার সাহায্যে কৃষকদিগের নিকট ফসল ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজনের পাল্লা থাকায় ব্যাপারীদিগের পক্ষে চাষীদিগকে প্রবঞ্চিত করা সহজ।

প্রতিবিধান—এই ত্রুটিগুলি দূরীভূত করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। (১) সমবায় বিক্রয় সমিতির গঠন ও প্রসার প্রয়োজন। এই সমিতি চাষীদিগের পক্ষ হইতে তাহাদের সামগ্রী সরাসরি বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবে। (২) গ্রামে গ্রামে লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদাম ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই গুদাম ঘরে চাষীরা তাহাদের ফসল জমা রাখিয়া রসিদ লইবে এবং সেই রসিদ জমা রাখিয়া তাহারা সমবায় ঋণদান সমিতির নিকট হইতে ঋণ পাইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে চাষীরা ঋণ গ্রহণ করিয়া অন্যায় সর্ত্তে মহাজনদিগের নিকট ফসল বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইবে না। (৩) মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড ও সরকারের উদ্যোগে গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের সহিত সহরের সংযোগ স্থাপন করিয়া ভাল পথ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। (৪) সর্ব্বত্র সমান ওজনের পাল্লা যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে।

(অনু-৯) সেচ ব্যবস্থা—*Irrigation*

আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চল আছে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না (যথা রাজপুতানা) আবার অনেক অঞ্চল আছে যেখানে বর্ষাকালে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু রবিশস্য ফলনের সময়ে অর্থাৎ শীতকালে, জল পাওয়া যায় না (যথা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি)। অতএব বৃষ্টিহীন এলাকায় সকল সময়ে এবং যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে সেই সকল এলাকাতেও বৎসরের কোন কোন সময়ে কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম ভাবে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় এইরূপ কৃত্রিম জল সরবরাহের ব্যবস্থাকে সেচ ব্যবস্থা (irrigation) বলা হয়।

ভারতে মোটামুটি তিন প্রকারের সেচ কার্য্য আছে : (ক) কূপ (খ) পুষ্করিণী ও (গ) খাল।

(ক) কূপ (Wells)—কূপের মধ্যে পাতকুয়া ও নলকূপ—উভয়ই আছে। মোট সেচকার্য্য সমন্বিত এলাকার প্রায় একচতুর্থাংশ কূপের সাহায্যে সিক্ত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কূপ সাহায্যে জল সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ চালিত কূপও আছে।

(খ) পুষ্করিণী (Tanks)—পুষ্করিণীর সাহায্যে জল সেচ ব্যবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। মাদ্রাজ প্রদেশেই পুষ্করিণীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

(গ) খাল (Canals)—খালের সাহায্যে জল সেচ ব্যবস্থাই বিভিন্ন কারণে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ জল সেচের খাল তিন প্রকারের—প্লাবন খাল, নিত্যবহ খাল ও সঞ্চয়ী খাল। (১) প্লাবন খাল (Inundation canal)—এই প্রকার খালে সারা বৎসর জল থাকে না। এই খাল নদী হইতে কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু নদী অপেক্ষা খাল কম গভীর। অতএব নদীতে একটী নির্দ্দিষ্ট স্তর অবধি জল উঠিলে তবেই এই খাল জলপূর্ণ হয়। মাদ্রাজের বহু খাল এই পর্য্যায়ের। (২) নিত্যবহ খাল (Perennial canal)—এই প্রকার খালে সারা বৎসরই জল থাকে। হিমালয় হইতে যে সকল নদীর উৎপত্তি সেইগুলিতে নিত্যবহ খাল নির্ম্মিত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই প্রকারের খাল আছে। (৩) সঞ্চয়ী খাল (Storage canal)—বর্ষাকালে উপত্যকায় আড়াআড়ি ভাবে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জল সঞ্চয় করা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহে এই সঞ্চিত জল খালের সাহায্যে পাঠানো হয়। দক্ষিণাপথ ও মধ্যপ্রদেশে এইরূপ খাল আছে।

সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব—(Importance of Irrigation Works)—এই সকল সেচ ব্যবস্থা হইতে ভারতের কৃষিকার্য্য প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, যে সকল অঞ্চল শুষ্ক এবং সেহেতু যে সকল স্থানে কৃষিকার্য্য হইত অতিশয় কম সেই সকল স্থান সেচ ব্যবস্থার দ্বারা সুজলা সুফলা হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গত শতাব্দী অপেক্ষা বর্ত্তমান শতাব্দীতে গম ও ইক্ষুর চাষ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল সরকারের দ্বারা সম্পন্ন সেচ কার্য্য। তৃতীয়তঃ, কৃষি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষজনিত ব্যয় কমিয়া গিয়াছে বলা চলে। চতুর্থতঃ, যে সকল অঞ্চল সেচ ব্যবস্থার দ্বারা

-লাভবান হইয়াছে সেই সকল অঞ্চলে সরকার কৃষকদিগের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে কর আদায় করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। পঞ্চমতঃ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সেচকার্য্য হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেচ কার্য্য এখনও হয় নাই। অবিভক্ত ভারতের মোট কৃষিভূমির শতকরা ২০ ভাগ জমিতে সেচ ব্যবস্থা ছিল; বর্ত্তমান ভারত প্রজাতন্ত্রে এই শতকরা ভাগ আরও কম হইবে। যে সকল বিস্তীর্ণ এলাকাকে মরুভূমি সদৃশ জমি হইতে শস্যশ্যামলা জমিতে পরিণত করা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

Questions & Hints

1. Mention the principal food crops in India and indicate the areas in which they are grown (1948) [অনুচ্ছেদ—১, (খাদ্যজাতীয় ফসল)]

2. What are the handicaps from which Indian Agriculture suffers ? (1950) [অনু—২]

3. Briefly describe the measures which you would advocate for the improvement of Indian agriculture (1947) [অনু—৩]

4. What steps have the Government taken to improve agriculture in India ? (1927) [অনু—৪]

5. "One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless subdivision and fragmentation of land". Elucidate (1941) [অনু—৫]

6. Indicate the main causes of agricultural indebtedness in India and suggest methods for alleviating the burden (1935) [অনু—৬]

7. Describe and comment on the measures that have been adopted to check the indebtedness of the Indian cultivator (1942) [অনু—৭]

8. Briefly describe the irrigation works in India (1943). Discuss their economic importance (1938) [অনু—৯]

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি স্বত্ব ও রাজস্ব

Land Tenure and Revenue

(অণুচ্ছেদ-১) বিভিন্ন প্রকারের ভূমি স্বত্ব—*Different Types of Land Tenure*

আমাদের দেশের জমির মোটামুটি তিন প্রকারের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় :—জমিদারী বন্দোবস্ত, মহালওয়ারী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।

(১) **জমিদারী বন্দোবস্ত** (Zamindary Settlement)—জমিদারী বন্দোবস্তের মধ্যে সরকার জমিদারকেই জমির মালিক বলিয়া গণ্য করেন। জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন এবং উহা হইতে সরকারকে রাজস্ব দেন; সরকার জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। জমিদারী বন্দোবস্ত আবার দুই পর্য্যায়ের দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) চিরস্থায়ী ও (খ) মালগুজারী।

(ক) **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** (Permanent Setlement)—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করেন। সেই সময়ে একবার যে রাজস্বের পরিমাণ ধার্য্য করা হইল তাহা আর ভবিষ্যতে কখনও পরিবর্ত্তন করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। জমিদারগণ জমির মালিক এবং তাঁহারা নির্দ্ধারিত খাজনা সরকারকে দেন। তবে সরকারের দুইটী ক্ষমতা আছে—সরকার যথাসময়ে রাজস্ব না পাইলে জমিদারী নিলাম করিয়া দিতে পারিবেন এবং প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ও কল্যাণের জন্য তাঁহারা আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক অঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(খ) **মালগুজারী বন্দোবস্ত** (Malguzari Settlement)—মালগুজারী বন্দোবস্ত একপ্রকার জমিদারী বন্দোবস্ত তবে ইহা চিরস্থায়ী নহে। মালগুজারগণ রায়তদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া সরকারকে দেন এবং এই রাজস্ব হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট কমিশন পান। ইহারা সরকারের দ্বারা জমিদাররূপে স্বীকৃত। কিন্তু ইহাদের সহিত মেয়াদী বন্দোবস্ত থাকে; কয়েক বৎসর অন্তর নূতন করিয়া রাজস্ব ধার্য্য হয়।

(২) **মহালওয়ারী বন্দোবস্ত** (Mahalwari Settlement) এই ব্যবস্থায় একটি মহালের সকল কৃষক যৌথভাবে ভূমির মালিকরূপে গণ্য হয়। একটি এষ্টেট বা একটির অধিক গ্রাম লইয়া একটি মহাল গঠিত হয়। মহালভুক্ত সকল কৃষকের জমির উপর মালিকানা সরকার স্বীকার করেন এবং উহাদের নিকট হইতে যৌথভাবে কর আদায় করিয়া থাকেন। যুক্ত প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। পাঞ্জাবেও এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান তবে ঐ স্থানে 'লম্বরদার' নামে অভিহিত একজন করিয়া মোড়লের মারফৎ সকলের খাজনা আদায় করা হয়।

(৩) **রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত** (Ryotwari Settlement)—রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রায়তদিগকেই জমির মালিকানা দেওয়া হইযাছে। তাহারা সরকারকে কত রাজস্ব দিবে তাহা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত নাই; সাধারণতঃ ২০—৩০ বৎসর অন্তর খাজনার পরিমাণ পুনর্নির্দ্ধারিত হয়। এই খাজনা রায়তগণ সরাসরি সরকারকে প্রদান করে—অপর কাহারও মারফতে নহে। আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজে রায়ত-ওয়ারী বন্দোবস্ত আছে।

(অণু-২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাপগুণ (*Merits and Demerits of Permanent Settlement*)

গুণ—(১) রাষ্ট্র একটী নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে। (২) কয়েক বৎসর অন্তর রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয় না বলিয়া জমিদার তাহার অধীনস্থ প্রজার নিকট হইতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন না এবং কৃষকগণ নির্ভাবনায় কৃষিকার্য্যে ও উহার উন্নতিতে মনঃসংযোগ করিতে পারে। (৩) জমিদারগণ কৃষির ও কৃষকের উন্নতির সহিত নিজেদের স্বার্থের অভিন্নতা অনুভব করিতে পারেন এবং তাহার দরুণ উন্নতিমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে প্রণোদিত হইতে পারেন। (৪) জমিদার ও তাঁর পোষ্যবর্গের মধ্য হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে এবং দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভূত অবদান বহন করিয়াছে।

অপগুণ—(১) প্রকৃতপক্ষে জমিদারগণ জমির উন্নতি বিধানের দিকে মনোযোগ করেন নাই। অনেকে গ্রাম্য-জীবন পরিত্যাগ করিয়া সহরাঞ্চলে আরামপ্রদ জীবন যাপনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অবহেলিত জমিদারী উত্তরকালে জমিদার ও প্রজা উভয়কেই ধ্বংস করিয়াছে। (২) গ্রামে বসবাসকারী জমিদারগণ কৃষকদিগের স্বার্থ ও নিজেদের স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং সেই মত কার্য্য করিয়াছেন। (৩) জমি হইতে সরকারের রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকায়, সরকারের যতই প্রয়োজন হউক ভূমি-রাজস্বের খাতে সরকারের আয়-বৃদ্ধির কোন উপায় নাই। (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই এরূপ স্থানেও, যথা বোম্বাইএ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ জমিদার তাঁহার মালিকানা স্বত্ব অপরকে দিয়া দিতে পারেন এবং এইভাবে বহু মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এই মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতির দরুণ জমিদারের সহিত প্রজার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না ; জমিদার যখন ইচ্ছা খাজনাও বৃদ্ধি করিতে পারেন না এবং প্রজার হিতের জন্যও উৎসাহিত হন না। ফলে সমাজ কৃষি-উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য স্যার ফ্রানসিস্ ফ্লাউডের সভাপতিত্বে একটী ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সংখ্যাধিক সদস্য সুপারিশ করিয়াছিলেন যে কৃষকদিগের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দেওয়া উচিত এবং সরকারের সহিত প্রকৃত কৃষকদিগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বিধেয়।

(অণু-৩) অস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব নির্দ্ধারণের নীতি—*Principles of Assessment in Temporarily Settled areas*

অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে কিছুকাল অন্তর সেটেল্মেণ্ট কার্য্য হইয়া থাকে এবং রাজস্ব নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। রাজস্ব নির্দ্ধারণের এই সময়ের ব্যবধান হইল ১০ হইতে ৩০ বৎসর। নূতন করিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারণের সময়ে, অর্থাৎ সেটেলমেণ্টের সময়ে, গ্রামের সকল জমি সার্ভে করা হয় এবং অধিকার দলিল (Record of rights) তৈয়ারী করা হয়। অতঃপর জমির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকের জমিই কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে তাহা স্থির করা হয়। জমির শ্রেণী বিভাগ করা হয় প্রধাণতঃ জমির উর্ব্বরতা অনুযায়ী এবং এক এক শ্রেণীর জমিতে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব করা হয়। এই উৎপন্ন ফসলের

একটী গড় দাম ধরিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট দাম হিসাব করা হয়। ইহা হইতে ফসল উৎপাদনের খরচা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল নীট উৎপাদন (Net produce)। এই নীট উৎপাদনের একটী অংশ রাজস্বরূপে গ্রহণ করা হয়। এই অংশ আবার সকল প্রদেশে সমান নহে।

বোম্বাই প্রদেশে যখন প্রথম রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তখন সেখানে মাটির উর্ব্বরতা অনুযায়ী বিভিন্ন জমির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক লোকের জমি ভাড়া দিলে কি পরিমাণ খাজনা (rental) হইতে পারে তাহার হিসাব করা হইয়াছিল। এইরূপ খাজনা মূল্যের (rental value) একটী অংশ রাজস্ব হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পরে কয়েক বৎসর অন্তর নূতন সেটেলমেণ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ অঞ্চলের জিনিষপত্রের দাম ও সমৃদ্ধি বা মন্দা অনুযায়ী রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি করা হয়।

(অণু-৪) **অস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাপগুণ**—*Merits and Demerits of Temporary Settlements*

গুণ—(১) ইহাতে সরকারের সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে এবং রায়তের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কল্যাণপ্রদ কার্য্য করিতে সরকার অগ্রসর হইতে পারেন। (২) অনুপস্থিত জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীর আধিক্য হইতে ইহা দেশকে রক্ষা করে। চাষী জমির উন্নতিসূচক কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রণোদিত হয়। (৩) কালের পরিবর্ত্তনের সহিত সাধারণ সমৃদ্ধি ঘটিলে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী বর্দ্ধিত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণ উপকৃত হয়।

অপগুণ—(১) কয়েক বৎসর পরে তাহার জমির নূতন করিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারণ হইবে ইহা জানিয়া রায়তগণ জমির উন্নতি বিধানে মনোযোগ নাও দিতে পারে। (২) নূতন রাজস্ব নির্দ্ধারণের সময়ে রায়তগণকে প্রচুর হয়রাণি সহ্য করিতে হয় এবং রাজকর্ম্মচারীগণকে পক্ষপাতিত্বের প্রচুর অবকাশ দেওয়া হয়। (৩) নূতন সেটেল্‌মেণ্টের সময়ে রায়তগণ চাষের কাজে ইচ্ছাপূর্ব্বক শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে পারে যাহাতে মন্দা দেখাইয়া রাজস্বের হার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়।

Questions & Hints

1. Discu s the main types of land tenure in British India (1945) [অণু-১]

2. Describe the main features of the Permanent Settlement of land revenue. What are its merits and drawbacks? (1941) [অণু-১ (ক) এবং অণু-২]

3. State the underlying principles of land revenue assessment in the temporarily settled areas in British India (1944) [অণু-৩]

4. Describe briefly the main types of land tenure in British India and indic the'r merits and defects. (1946) [অণু-১, অণু-২ ও অণু-৪]

ষষ্ঠ অধ্যায়

দুর্ভিক্ষ

Famine

(অণুচ্ছেদ-১) *Meaning of Famine*

দুর্ভিক্ষ বলিতে এরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বুঝায় যাহার মধ্যে খাদ্যের চরম দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ বহু-সংখ্যক লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়।

(অণু-২) **দুর্ভিক্ষের কারণ সমূহ**—*Causes of Famine*

আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের কারণগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে—প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও অসন্তোষ-জনক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

প্রাকৃতিক কারণ—প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে প্রথম হইল বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা। কৃষিভূমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির দরুণ সহজেই ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অবিবেচকের ন্যায় অরণ্য সমূহের ধ্বংসও দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ—অরণ্যের সহিত যথারীতি বৃষ্টি-পাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, শস্যভূক বিভিন্ন প্রাণীর দ্বারা বৎসরে বহু কোটি টাকার শস্য ধ্বংস হয়।

অর্থনৈতিক কারণ—অর্থনৈতিক কারণ বলিতে বুঝায় জনগণের চরম দারিদ্র্য এবং খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি। বিভিন্ন কারণে দেশের জন সাধারণের আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন। প্রথমতঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, দেশের কুটীর শিল্প ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী আধুনিক শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে নাই। তৃতীয়তঃ, কৃষিকার্য্যের প্রাচীন পদ্ধতির জন্য কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত কম। চতুর্থতঃ, ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রসিদ্ধ বিশ্লেষক স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছিলেন যে দরিদ্র কৃষক-দিগের উপর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এতই অধিক ছিল যে কৃষকগণ রাজস্ব প্রদানের জন্য সমগ্র খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইত। এই সকল শস্য বৈদেশিক

বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্য বিদেশে চালান করা হইত। কৃষকগণ ঋণজালে আবদ্ধ হইত এবং তাহাদের ঋণের বোঝা বংশানুক্রমিকভাবে বহন করা হইত।

কোন কোন সময়ে খাদ্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং তখন খাদ্যসামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে একস্তরের লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, স্বাভাবিক ভাবে যে পরিমাণ খাদ্য শস্য বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা অপেক্ষা বহু গুণ অধিক খাদ্য শস্য বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল; উপরন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় যে চাউল আমদানী হইত যুদ্ধ জনিত অবস্থার দরুণ তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে বন্যার জন্য খাদ্য-শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সৈন্য চলাচল ও রণসম্ভার প্রেরণে রেল বিভাগ অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় রেলযোগে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য শস্য আনয়নের দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। এই সময়ে ধীরে ধীরে খাদ্য শস্যের দাম বাড়িতে থাকে। বেপারীগণ এবং জনসাধারণের মধ্যে কিছু সঙ্গতিশালী ব্যক্তি খাদ্য শস্য মজুদ করিতে থাকায় কিছু কালের মধ্যে উহাদের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যুদ্ধ জনিত প্রয়োজনে খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং যুদ্ধ জনিত ব্যয়ের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) ঘটায় দাম স্তর (Price level) অত্যধিক উচ্চ হইয়াছিল।

অসন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকাও আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের আর একটী কারণ। কোন বিশেষ অঞ্চলে খাদ্য শস্যের অভাব ঘটিলে, অন্য অঞ্চল হইতে খাদ্য শস্য দ্রুত আনয়ন করা সম্ভব হয় না।

(অনু-৩) দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধান—*Remedies of Famine*

(১)—দেশের মোট কৃষিভূমির একপঞ্চমাংশে মাত্র জলসেচ ব্যবস্থা আছে। জলসেচ ব্যবস্থার অধিকতর প্রসার প্রয়োজন। কৃষকগণ সমবায়ের ভিত্তিতে জলসেচের জন্য বিশেষ সমিতি গঠন করিতে পারে এবং সরকারও জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য অধিক প্রয়াস করিতে পারেন (২) অরণ্য সংরক্ষণের জন্য সরকারকে অধিকতর চেষ্টিত থাকিতে হইবে। (৩) অবিভক্ত ভারতে কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ছিল, দেশীয় রাজ্যসমূহ বাদেই, প্রায় সাড়ে তের কোটি একরের মতন। এই সকল পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া উহাতে কৃষির ব্যবস্থা করিতে পারিলে, শস্য উৎপাদন বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। (৪) অতিবৃষ্টি হইলে যাহাতে শস্য নষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্য জল নিকাশের সুব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যাপক জলনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৫) জনসাধারণের চরম দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায়ে

কৃষির উন্নতিবিধান প্রয়োজন। জমির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব করিবার জন্য আধুনিক ব্যবস্থাবদ্ধ যন্ত্রশিল্পের প্রসার প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বজায় রাখিয়া একটী ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উভয়েরই উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। (৬) কোন অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিলেই সরকার কর্তৃক মজুত-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন ও খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। (৭) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উত্তম রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। (৮) দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দিলেই সরকার কর্তৃক ভূমি রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখা উচিত এবং কৃষকদিগকে ভূমি রাজস্বের দায় হইতে কতকাংশে নিষ্কৃতি দান কর্ত্তব্য।

(অণু-৪) দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ব্যবস্থা—*Famine Relief Measures*

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) এবং (খ) ত্রাণ ব্যবস্থা (Relief measures)।

(ক) **প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা**—দুর্ভিক্ষ যাহাতে ঘটিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় সেইগুলিকে বলা হয় প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা। ১৮৭৬ সালে একটী দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল সৃষ্ট হয়। সরকারের মোট রাজস্ব হইতে কিছু কিছু অংশ এই তহবিলে জমা করা হইয়া থাকে। এই তহবিল হইতে খরচা করিয়া অল্প বৃষ্টিপাতের এলাকা সমূহে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয়; এইগুলিকে সংরক্ষণী সেচ কার্য্য বলা হয়। এই সেচ কার্য্য হইতে সরকার কোন আয় করেন না। ইহার দ্বারা ফসল উৎপাদনের সহায়তা করা হয় মাত্র। অনুরূপভাবে দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল হইতে সংরক্ষণী রেলপথও সরকার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

(খ) সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ ঘটিলে উহার প্রকোপ লাঘবের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন উহাকে ত্রাণ ব্যবস্থা (Relief measures) বলা হয়। ত্রাণ ব্যবস্থার প্রথম কার্য্য হইল বৃষ্টিপাত পর্য্যবেক্ষণ। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির দিকে নজর রাখা হয় এবং এই দুইটীর কোনটীর দ্বারা ফসলের ক্ষতি হইলে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হন। প্রাথমিক অবলম্বিত ব্যবস্থা হইলে, সরকার বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য কামনা করেন এবং রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত গ্রাম সমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং যাহাদের পক্ষে সাহায্য প্রয়োজন তাহাদের নামের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর পরীক্ষামূলক কর্ম্মশালা স্থাপন করা হয়। পরীক্ষামূলক কর্ম্মশালার উদ্দেশ্য হইল

দুর্ভিক্ষ প্রকৃতপক্ষে হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং হইয়া থাকিলে উহার ব্যাপকতা কিরূপ তাহা নির্ণয় করা। ইহাতে অল্প মজুরীতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং অত্যধিক নিয়োগ প্রার্থীর সমাগম হইলে দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার পর ত্রাণমূলক কার্য্য সম্পন্ন হয়। কার্য্য করিতে অক্ষম এইরূপ বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্যদিগকে সাহায্য দান করা হয় এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে রাস্তা রেলপথ ইত্যাদি নির্ম্মাণের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা হয় এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য রসুইখানা (Public Kitchens) স্থাপন করা হয়। পরবৎসর কৃষক ও কৃষি-মজুরদিগকে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে এবং কৃষিকার্য্য সুরু করিতে উৎসাহিত করা হয়। উহার জন্য সরকার হইতে তাহাদিগকে ঋণও দেওয়া হয়।

Questions & Hints.

1. What is a Famine ? (1929) [অনুচ্ছেদ-১]

2. Indicate the causes of Indian famimes. What steps have been taken to fight them ? (1931) [অনু-২, অনু-৪]

3. Describe the organisation of famine relief in India (1935) [অনু-৪ (খ)]

সপ্তম অধ্যায়

সমবায়

Cooperation

(অণুচ্ছেদ-১) সমবায় কাহাকে বলে—*Meaning of Cooperation*

একজন দুইজন ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ভাবে করিবার চেষ্টা করিলে যে কার্য্য করা সম্ভব হয় না, কয়েকজন ব্যক্তির সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা উহা সম্ভব হইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও উহা সমভাবেই প্রযোজ্য। যাহাদিগের অল্প আয়, এইরূপ কৃষক ও শ্রমশিল্পীদিগের পক্ষে, নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষ উপকারী। নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করিয়াই তাহারা উৎপাদন বা ভোগকার্য্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য্য লাভজনক ভাবে করিতে পারিবে। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে, উৎপাদনকারী বা ভোগকারী হিসাবে সাধারণ লোকদিগের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে সমবায় (Cooperation) বলা হইয়া থাকে। 'স্ট্রীকল্যাণ্ড' বলেন, "সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা, কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিসমূহের সঙ্ঘকে সমবায় বলা হয়।"

সমবায়ের দ্বারা, সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগণ নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর দুইটী জিনিষ পরিহার করে:—প্রথমতঃ প্রতিযোগিতা; দ্বিতীয়তঃ পুঁজিপতি। সমবায়ের দ্বারা তাহারা, নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা বাদ দিয়া সকলের পক্ষে হিতকর, সহযোগিতা অবলম্বন করে। কয়েকজন পুঁজিপতি তাহাদিগের পুঁজির জোরে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরূপে অবস্থান করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে মুনাফা খাইয়া থাকেন। সমবায়ের দ্বারা সাধারণ লোকে নিজেদের পুঁজি নিজেরাই সংগ্রহ করে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরিহার করে।

(অণু-২) ভারতে সমবায় আন্দোলন—*Cooperative Movement in India*

আমাদের দেশে মূলতঃ কৃষকদিগের দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা দেখিয়া, সরকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'মিঃ নিকল্‌সন্' নামক এক রাজকর্ম্মচারীকে ইউরোপে

প্রেরণ করেন—, যাহাতে তিনি ইউরোপের দেশ সমূহে দরিদ্র জনসাধারণের অনুরূপ অবস্থার কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন ; এবং সেই মত ভারতের ক্ষেত্রেও অবলম্বনযোগ্য ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারেন। মিঃ নিকল্‌সন্ জার্ম্মাণীতে সমবায় ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁহার বিবরণীতে জার্ম্মাণীতে 'রাইফেসেন' (Raiffeisen) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'রাইফেসেন' জার্ম্মাণীতে সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া ঋণভারগ্রস্ত কৃষকদিগকে ঋণের দায় হইতে মুক্ত হইতে এবং আর্থিক উন্নতি করিতে বহু পরিমাণে সাহায্য করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার "সমবায় ঋণদান সমিতি আইন" বিধিবদ্ধ করিয়া জার্ম্মাণীর 'রাইফেসেন সমিতির' অনুরূপ "প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। জার্ম্মাণীতে কৃষকদিগের উপকারের জন্য রাইফেসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলি ভিন্নও, 'ডেলিজ্' নগরে 'সুল্‌জ্' নামে এক ব্যক্তির দ্বারা দরিদ্র কারিগরদিগের সাহায্যের জন্য এক প্রকারের সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার নাম 'সুলজডেলিজ্' (Schulze Delitzsch) সমিতি। আমাদের দেশেও ঐ সময়ে নগর কারিগরদিগের সাহায্যের জন্য 'সুলজ-ডেলিজ' সমিতি স্থাপিত হইল। এই সবগুলিই ঋণদান সমিতি ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আর একটী "সমবায় সমিতি আইন" বিধিবদ্ধ করিয়া ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সমিতি (অর্থাৎ যে সমিতিগুলি প্রাথমিক সমিতিকে সাহায্য করিবে) এবং অ-ঋণদান সমিতি গঠনের উদ্যোগ করেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সমবায় ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসনতালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়—এবং উহার পর সকল প্রাদেশিক সরকার নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যে সমবায় ব্যবস্থা প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

(অণু-৩) **সমবায়ের মূলনীতিসমূহ**—*Fundamental principles of Cooperation*

সমবায় সমিতি সাধারণ ধরণের ব্যবসা সম্পর্কিত সঙ্ঘ নহে। ইহা বিশেষ ধরণের সঙ্ঘ এবং ইহার কয়েকটী মূল নীতি আছে। (১) **একতা**—(Unity) 'অর্থনৈতিকভাবে দুর্ব্বল কয়েকজন ব্যক্তি পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'একতায় বল' প্রবাদ বাক্যটীর সার্থকতা উপলব্ধি করে। (২) **স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতা** (Voluntary association)—সমবায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা থাকে না; কারণ বাধ্যবাধকতার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতার মনোভাবের উদ্রেক করা যায় না।

(৩) **সমষ্টিবোধ**—(Solidarity)—সমবায় সমিতির সদস্যগণ যদিও স্বার্থের প্রেরণায় সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবু তাহাদের স্বার্থের অভিন্নতার উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক সদস্যই সকলের সমবেত স্বার্থের প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিবেন। (৪) **সান্নিধ্য** (Proximity)—সমবেত স্বার্থ উপলব্ধির জন্য এবং ঐ উদ্দেশ্যে সম্পদে ও বিপদে সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কার্য্য করিবার জন্য, সদস্যগণের মধ্যে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য প্রত্যেক সমবায় সমিতি কোনো অল্প পরিসর স্থানের কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হয়। (৫) **সাম্য** (Equality)—সমবায় সমিতির মধ্যে পদমর্য্যাদা বা আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই। (৬) **ব্যয়সংক্ষেপ** (Economy)—ধনী ব্যক্তিদিগের জন্য বা বিলাসের অভাব তৃপ্তির জন্য সমবায় সমিতির স্থাপনা নহে। দরিদ্র, কৃষক, কারিগর এবং অন্যান্য অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিই হইল এইরূপ সমিতির লক্ষ্য। অতএব সমিতির পরিচালনায় যতদূর সম্ভব ব্যয়সংক্ষেপ করা প্রয়োজন।

(অণু ৪) বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি—*Different Types of Cooperative Societies*

সমবায় সমিতিগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমতঃ ঋণ-দান সমিতি এবং দ্বিতীয়তঃ অ-ঋণদান সমিতি। ঋণ-দান সমিতির (Credit societies) উদ্দেশ্য হইল অল্পসুদে সদস্যদিগকে ঋণ সরবরাহ করা। কৃষক, কারিগর এবং অন্যান্য দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। মহাজনগণ ঋণ দিতে হইলে অতিরিক্ত সুদ দাবী করিয়া থাকেন। ঐরূপ অতিরিক্ত সুদে ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সেইজন্য ঋণ গ্রহণ যাহাদের প্রয়োজন, তাহারা সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করে। কিন্তু শুধুমাত্র ঋণদানের দ্বারাই কি দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব? ঋণদান ছাড়া আরও অনেক কার্য্য আছে যাহার মারফৎ এই সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক উপকার সাধন করা যায়। যথা, কৃষকের উৎপাদিত ফসল বা কারিগরের উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী, যাহাতে ন্যায্য দরে বিক্রয় করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। যে সকল সমবায় সমিতি ঋণদান ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যের জন্য স্থাপিত হয় সেইগুলিকে বলা হয় অ-ঋণদান সমিতি (Non credit societies)।

ঋণদান সমিতি কৃষকদিগের জন্য গঠিত হইতে পারে, ইহাদের কার্য্য হইল কৃষকদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ঋণদান। ইহাদিগকে বলা হয় কৃষিগত ঋণদান

সমিতি (Agricultural credit societies)। অপর পক্ষে যাহারা কৃষক নহে এইরূপ ব্যক্তিদের জন্যও ঋণদান সমিতি গঠিত হইতে পারে যথা শ্রমিক, কারিগর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীয়া। এই সমিতিগুলি হইল অকৃষিগত ঋণদান সমিতি (Non-agricultural credit societies)

ঋণদান সামিতিগুলি কৃষকদিগের ও কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্য স্থাপিত হইতে পারে। যথা সমবায় সমিতির মারফৎ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা অথবা কৃষিজাত সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, অথবা কৃষকদিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এইগুলি হইল অ-ঋণদান কৃষিগত সমিতি (Non-credit agricultural societies)। অপর পক্ষে অ-ঋণদান সমিতিগুলি কৃষক নহে এইরূপ ব্যক্তিদের জন্য স্থাপিত হইতে পারে—যথা অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিদের গৃহ নির্মাণের জন্য অথবা তাহাদের জন্য সস্তায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য। এইগুলি অ ঋণদান অ-কৃষিগত সমিতি (Non credit non agricultural societies)।

(অণু-৫)—গ্রাম্য ঋণদান সমিতি—*Rural Credit Societies*

আমাদের দেশে গ্রাম এবং গ্রামবাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। এই গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কৃষক আছে আবার অকৃষকও আছে—যথা কারিগর। এই সকল কৃষক এবং কারিগরদিগের ঋণের প্রয়োজন খুব বেশী। ইহারা যাহাতে অল্প সুদে ঋণ পায় তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে বহু ঋণ দান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই গুলিকে গ্রাম্য ঋণ দান সমিতি (Rural Credit Societies) বলে। আমাদের দেশে স্থাপিত সকল প্রকার সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে গ্রাম্য ঋণদান সমিতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সমিতিগুলির গঠনপদ্ধতি ও কার্য্যকারিতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

একই গ্রামের বা সন্নিহিত গোটাকয়েক গ্রামের কয়েকজন অধিবাসী মিলিয়া একটী গ্রাম্য ঋণদান সমিতি গঠন করিতে পারে—তবে ১০ জনের কম সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা একটী সমিতি গঠিত হইতে পারে না। সদস্যগণের পক্ষে সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। সমিতির সদস্যগণের দায়িত্ব অসীম (Unlimited liability)। সমিতি অপর কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যদি দেনা করে এবং সেই দেনা পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে প্রয়োজন বোধে সমিতির সদস্যগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও সমিতির দেনা পরিশোধ করা যাইতে পারে। সমিতির সকল সদস্যকে লইয়া উহার জেনারেল কমিটি

গঠিত হয়। এই জেনারেল কমিটির অধিবেশনে সদস্যগণ একটী ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করিয়া দেয়। ইহার নাম ম্যানেজিং কমিটি। একজন সেক্রেটারীর সাহায্যে ম্যানেজিং কমিটি সমিতির কার্য্য পরিচালনা করে। সেক্রেটারী বা ম্যানেজিং কমিটির অন্তর্ভূক্ত কোন সদস্য কোনোরূপ বেতন পায় না। এই সমিতির কার্য্য হইল সদস্যগণের প্রয়োজনের সময়ে অল্প সুদে ঋণ দেওয়া। ঋণদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাহারা নানাপ্রকারে সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি সদস্য হইলে তিনি একটী ভর্ত্তি-ফি দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, সমিতি অংশ বিক্রয় করিয়া থাকে—এবং প্রত্যেক সদস্য কিছু পরিমাণ অংশ ক্রয় করিতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ, কোন সদস্যের বাড়তি অর্থ থাকিলে তিনি উহা সমিতিতে জমা রাখিতে পারেন; বাহিরের লোকের নিকট হইতেও আমানত গ্রহণ করা হয়। চতুর্থতঃ. এই সকল প্রাথমিক সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি থাকে। এক একটী কেন্দ্রীয় সমিতির এলাকার মধ্যে কয়েকটী প্রাথমিক সমিতি থাকে এবং এই কেন্দ্রীয় সমতি তাহার এলাকার অন্তর্ভূক্ত প্রাথমিক সমিতিগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করে। এই বিভিন্ন সূত্র হইতে লব্ধ অর্থ হইতে গ্রাম্য ঋণ-দান সমিতি তাহার সদস্যদিগের মধ্যে যাহার প্রয়োজন তাহাকে ঋণ দেয়। এই ঋণ সাধারণতঃ উৎপাদনশীল ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়—যাহাতে ঐ অর্থ কৃষির বা শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কার্য্যে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার হয়; তবে সময়ে সময়ে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ এইরূপ অনুৎপাদনশীল কার্য্যের জন্যও ঋণ দেওয়া হয়। ঋণ গ্রহণের সময়ে ঋণ-গ্রাহক সদস্যের জন্য অপর দুইজন সদস্য জামীন (Surety) থাকিবেন। ঋণ গ্রাহকের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য সুবিধাজনক কিস্তিবন্দিতে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য ঋণ-গ্রাহককে নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়। ইহা হইতে সমিতির লাভ হইতে পারে। মুনাফা পাওয়া যাইলে প্রত্যেক সমিতি উহার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিবে; অবশিষ্ট পরিমাণ সদস্যগণের মধ্যে বণ্টিত হইবে। মুনাফা হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ কোন সুকার্য্যে দান করাও যাইতে পারে। এই সমিতিগুলি প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। সরকার এই সকল সমিতি পরিদর্শন (inspection) করেন এবং ইহাদের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেন।

(অণু-৬) অ-ঋণদান কৃষিগত সমিতিসমূহ—*Agricultural Non-credit Societies*

ঋণ গ্রহণ করা কৃষকদিগের একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বটে, তবে তাহাদিগের

অবস্থার এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য, ঋণ সরবরাহ ভিন্ন অন্যান্য কতিপয় ব্যবস্থাও প্রয়োজন। এই সকল কার্য্যের জন্যও বিভিন্ন পর্য্যায়ের সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং হইতে পারে। (১) **সমবায় ক্রয় সমিতি**—(Cooperative Purchase Society)—কৃষকগণ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া উহার মারফৎ উত্তম বীজ, সার, যন্ত্রপাতি এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে। সমিতির পক্ষ হইতে এই সকল সামগ্রী বেশী পরিমাণে ক্রয় করা হয় বলিয়া, সমিতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী সস্তায় ক্রয় করিতে পারে—কারণ, খুচরা দর অপেক্ষা পাইকারী দর কম। এই সকল সামগ্রী সমিতির সদস্যগণের মধ্যে ন্যায্য দরে বিক্রয় করা হয়—মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ যে মুনাফা পাইত তাহা বাঁচিয়া যায়। সমিতির আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সদস্যগণকে এই সকল সামগ্রীর মূল্য কিস্তিবন্দিতে পরিশোধ করিবার সুযোগও দেওয়া হয়। (২) **সমবায় বিক্রয় সমিতি** (Cooperative Sale Society)—এই সমিতি সদস্যগণের দ্বারা উৎপাদিত ফসল একত্রিত ভাবে ন্যায্য দামে বিক্রয় করিয়া দেয় এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ সদস্যগণের ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। (৩) **সমবায় জলসেচ সমিতি** (Cooperative Irrigation Societies) —এই সমিতিগুলি সদস্যদিগের জমিতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। (৪) **সমবায় গবাদি পশু বীমা সমিতি** (Cooperative Cattle Insurance Society)—এই সমিতি সদস্যদিগকে গবাদি পশু ক্রয় করিতে সাহায্য করে। সদস্যগণ প্রতি মাসে প্রিমিয়াম হিসাবে সামান্য পরিমাণ চাঁদা সমিতিকে দিয়া যায়। যখন তাহাদের গবাদি পশুর মৃত্যু হয় তখন আর একটি অনুরূপ পশু কিনিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সমিতি প্রদান করে।

ইহা ভিন্ন জমির সংহতি সাধনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য—**সমবায় জমি-সংহতি সাধন সমিতি** (Cooperative Consolidation of holdings) কোনো কোনো স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। **সমবায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি** (Cooperative Anti-malarial Society), **উন্নত জীবনযাপন সমিতি** (Better Living Societies)—প্রভৃতিও স্থাপিত হইয়াছে।

(অণু-৭) অ-কৃষিগত সমবায় সমিতিসমূহ—*Non-agricultural Cooperative Societies*

কৃষক নহে, অথচ সঙ্গতি অল্প এইরূপ ব্যক্তিদিগের উপকারের জন্যও বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তিগণ হইল কারিগর, শ্রমিক বা অল্প উপার্জ্জনকারী মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া। কারিগরদিগের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও

অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য সমবায় ক্রয় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী ন্যায্য দরে বিক্রয় করিবার জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কারিগর, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াদিগের জন্যও অল্প সুদে ঋণ দানের উদ্দেশ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হইয়াছে। অনেক স্থলে 'কনজিউমার্স ষ্টোরস্' স্থাপিত হইয়াছে। ইহা সদস্যদিগকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করিয়া থাকে। অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্মাণের জন্য "সমবায় গৃহ নির্মাণ" সমিতিও গঠিত হইয়াছে।

(অণু-৮) সমবায়ের আর্থিক গঠন—*Financial Structure of Cooperation*

গ্রামে বা নগরে যে সকল প্রাথমিক সমিতি আছে সেইগুলি ভর্ত্তি ফি আদায় করিয়া, অংশ বিক্রয় করিয়া এবং ইহাদের নিকট আমানত রাখিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া, পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল উপায়ে সংগৃহীত পুঁজির দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন মিটে না। সেইজন্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (Central Cooperative Bank) গঠিত হয়। এক একটী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে কয়েকটী করিয়া প্রাথমিক সমিতি থাকে; প্রাথমিক সমিতি সমূহ তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা প্রাথমিক সমিতিগুলির নিকট হইতে এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনেকগুলি প্রদেশে একটী করিয়া প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Provincial Cooperative Bank) স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের কাজ হইল প্রদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য সুসংহত করা এবং উহাদিগকে প্রয়োজন হইলে অর্থ সরবরাহ করা। এইগুলি সমগ্র প্রদেশে শীর্ষ ব্যাঙ্ক (Apex Bank)। ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে এবং প্রয়োজন বোধে ইম্পিরিয়াল বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াও থাকে।

(অণু-৯) সমবায়ের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী—*Qualities required for the success of Cooperation*

সমবায় সমিতি সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা অল্প সঙ্গতি বিশিষ্ট ও দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও চাকুরীয়াদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান। ইহার সাফল্য ব্যবসায় বুদ্ধি অপেক্ষা সদস্যদিগের গোটাকয়েক চারিত্রিক

গুণের উপরেই অধিক নির্ভর করে। (১) **সাধুতা** (Honesty)—সমবায়ে যোগদানকারীগণ সকল সময়েই সাধু উপায় অবলম্বন করিবে। সহযোগিতা হইবে ঐকান্তিক, উহার মধ্যে অসাধুতার স্থান থাকিবে না। (২) **মিতব্যয়িতা** (Thrift) অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের অবস্থা অধিকতর উন্নত করিবার জন্য সমবায় সমিতি গঠিত হয় না। অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিদিগের জন্যই এইরূপ সমিতি গঠিত হয়—অতএব সমিতির কার্য্যের সকল ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার অনুশীলন প্রয়োজন। সমিতির পরিচালনেই যদি ব্যয় বাহুল্য থাকে তাহা হইলে সমিতির দ্বারা আনীত উপকার সসদস্যগণের নিকট পৌঁছাইবে না। (৩) **বন্ধুত্বভাব পোষণ** (Fellow feeling)—সমবায়ে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন থাকিবেন এবং সকলের সমবেত স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। (৪) **সময়ানুবর্ত্তিতা** (Punctuality)—ঠিক যে সময়ে যে কাজটী করিবার প্রয়োজন ঠিক সেই সময়ে সেই কাজটী করিবার জন্য প্রত্যেককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—নচেৎ সমিতিকে বজায় রাখা কষ্টকর হইবে। যথা, সমবায় ঋণদান সমিতির যে সকল সদস্য উহা হইতে ঋণ গ্রহণ করেন তাঁহারা যদি উহা যথাসময়ে পরিশোধ না করেন তাহা হইলে সমিতির কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। (৫) **বুদ্ধি** (Intelligence)—সমবায়ের সাফল্যের জন্য উহাতে যোগদানকারী ব্যক্তিগণের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে উহার দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেকের যথার্থ স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। উপরন্তু সমিতির সাফল্যের জন্য সদস্যগণের কি কি কর্ত্তব্য এবং কি কি দায়িত্ব আছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই সকল বিষয় যথাযথ হৃদয়ঙ্গমের জন্য তাঁহাদিগের পক্ষে বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

(অনু-১০) কৃষিগত ঋণগ্রস্ততা ও সমবায় আন্দোলন—*Agricultural Indebtedness and Cooperative movement*

কৃষকদিগের দুরবস্থা বিশেষ করিয়া তাহাদের ঋণগ্রস্ততা দেখিয়াই সরকার সমবায় সমিতি গঠনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততা দূর করিবার জন্য যে কয়েকটী কার্য্য প্রয়োজন ছিল, তাহার মধ্যে প্রথম হইল অল্প সুদে কৃষকদিগকে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা। গ্রামের মধ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করিয়া এই কার্য্য সাধন করিবার ব্যবস্থা হয়। কৃষকদিগের চাষের চল্‌তি প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই সাধারণতঃ এই সকল সমিতি ঋণ দিয়া থাকে তবে অনুৎপাদনশীল কার্য্যের জন্য ঋণও ইহা দিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে সকল কার্য্যের জন্য কৃষকগণ মহাজনদের নিকট হইতে অত্যধিক চড়া সুদে কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয় প্রায় সেই সকল কার্য্যের জন্য

তাহারা সমবায় সমিতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল সমিতির প্রতিযোগিতায় মহাজনগণও তাহাদের সুদের হার হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা পুরাতন ঋণের বোঝা বহন করিতেছে তাহাদিগকে উহা হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কোনো কোনো প্রদেশে ঋণদান সমিতিগুলি কৃষকদিগকে ২।৩ বৎসরের জন্য কর্জ্জ দেয়, যাহাতে তাহারা মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততা হ্রাস করিবার আর একটী উপায় হইল, তাহাদিগের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া কর্জ্জ করিবার প্রয়োজনীয়তা কমাইয়া দেওয়া এবং পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের সহায়করূপে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সমবায় সমিতিগুলির দ্বারাই তাহাদের ঋণগ্রস্ততা লাঘবের সহায়তা করা হয়। সমবায় ক্রয় সমিতির দ্বারা তাহারা ব্যয় সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে—বিক্রয় সমিতির মারফৎ তাহারা তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারে; ঋণদান সমিতি এবং বিক্রয় সমিতি একযোগে কার্য্য করিলে, কৃষকদিগের পক্ষে মহাজনদিগের নিকট হইতে দাদন লইয়া অন্যায় দরে তাহাদিগের নিকট ফসল বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিতে হয় না। সমবায় গবাদিপশু বীমা সমিতির স্থাপনার দ্বারা তাহাদের বলদের মৃত্যু হইলে নূতন বলদ কিনিবার সুব্যবস্থা কৃষকগণ করিয়া রাখিতে পারে—ইহার জন্য মহাজনদের নিকট ঋণগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। সমবায় জলসেচ সমিতি স্থাপন করিয়া, ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেকেও কৃষকগণ নিজ নিজ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারে। কোনো কোনো প্রদেশে সমবায় ভূমি-সংহতি সমিতি (Co-operative consolidation of land holdings) প্রতিষ্ঠিত করিয়া উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যের সহায়তা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কৃষকের পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার এবং নূতন ঋণ গ্রহণ না করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(অণু-১১) ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ—*Main features of the Cooperative movement in India*

ভারতে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে এখানে অধিকাংশ সমিতিই কৃষিগত সমিতি। অধিকাংশ সমিতিই কৃষিগত কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট; অবশ্য আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক কারণ আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষিজীবীদিগের বিপুল সংখ্যাধিক্য। অকৃষিগত সমিতির সংখ্যা অল্পই। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিগত সমিতিগুলির মধ্যে ঋণদান

সমিতি আছে এবং অ-ঋণদান সমিতিও আছে কিন্তু ঋণদান সমিতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রথম সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময়ে শুধুমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতিই স্থাপিত হইয়াছিল—সেই অবধি এইরূপ সমিতিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসার হইয়াছে। কৃষিগত সমিতিগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগই হইল ঋণদান সমিতি। কিন্তু এই সকল কৃষিগত ঋণদান সমিতির পরিচালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি গুরুতর-রূপে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপনার দিক হইতে এই সকল কৃষিগত ঋণদান সমিতিগুলির অধিকাংশেরই অবস্থা অসন্তোষজনক। বরং অকৃষিগত ঋণদান সমিতি-গুলির সুষ্ঠু পরিচালনার নিদর্শন পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন সরকারের দ্বারা প্রবর্ত্তিত। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমবায় স্পৃহা হইতে এবং সমবায়ের উপকারিতার উপলব্ধি হইতে সমবায় আন্দোলনের জন্মলাভ হয় নাই। শুধুমাত্র উৎপত্তির দিক হইতেই নহে—সমবায় সমিতিগুলির গঠন ও প্রসার সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক প্রদেশে সমবায় রেজিষ্ট্রার নামক একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী থাকেন। ইনিই প্রদেশের সমগ্র সমবায় আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণকারী। অবশ্য ইনি সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক মন্ত্রীর নির্দ্দেশে কার্য্য করেন। চতুর্থতঃ, সমবায় আন্দোলনের বৈষয়িক দিক ব্যতীত একটী নৈতিক দিকও আছে। মানুষ হিসাবে উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের প্রচেষ্টা করা সমবায় আন্দোলনের নৈতিক উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের নৈতিক দিকটীর উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

সমবায় সমিতিগুলির গঠনবিধির বৈচিত্র্য হইল যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সমিতি লইয়া ইহার কঠোমো গঠিত। প্রাথমিক সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য ও মুদ্রা বাজারের সহিত সমবায় ব্যবস্থার সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য, মাধ্যমিক সমিতিগুলির অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির—অস্তিত্ব।

(অনু-১২) ভারতে সমবায় সমিতির উপকারিতা ও ত্রুটি—*Benefits and short-comings of Cooperative movement in India*

উপকারিতা—সমবায় আন্দোলন হইতে গোটাকয়েক উপকারিতা পাওয়া গিয়াছে। (১) অস্বচ্ছল অবস্থার ব্যক্তিদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি উহাদের একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভাব অনেকাংশে মিটাইয়াছে। ঋণদান সমিতিগুলি যেমন চল্‌তি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কর্জ্জ দিতেছে তেমনি কৃষকগণের পূর্ব্বেকার ঋণের বোঝা লাঘব করিবার জন্য কোনো কোনো স্থানে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে। সাধারণ ঋণদান সমিতিগুলি দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ

দিতে পারে না। দীর্ঘ-মেয়াদী, অর্থাৎ অনেকদিন পরে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ—ঋণ না পাইলে কৃষকগণ তাহাদের পুরাতন ঋণ একসাথে পরিশোধ করিয়া দিবার মতন সুযোগ পাইবে না। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে তাহারা এইরূপ ঋণ পাইয়া থাকে। এই ঋণদান সমিতিগুলি মহাজনদিগের ও তাহাদের কার্য্যের উপরে কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনেক স্থলে গ্রামের মহাজনগণ সুদের হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। কোথাও কোথাও মহাজনগণ সমবায়ে যোগদান করিয়া তাহাদের অর্থ সমবায় সমিতিতে আমানত রাখিয়াছে। (২) কৃষকগণ ও কুটীরশিল্পীগণ যথাক্রমে তাহাদের কৃষিকার্য্যের ও শিল্পের উন্নতি সাধনের অনেক সুবিধা বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির মারফৎ পাইয়াছে। জনসাধারণও সমবায় দুগ্ধ সমিতি, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, গৃহ নির্ম্মাণ সমিতি—ইত্যাদির মারফৎ অনেকাংশে উপকৃত হইয়াছে। (৩) সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে ব্যাঙ্ক-মারফৎ লেনদেনের অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিয়াছে এবং ড্রাফ্‌ট, চেক্‌ ইত্যাদি কর্জ্জপত্র ব্যবহার জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। (৪) সমবায় আন্দোলন হইতে জনসাধারণ মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে শিখিয়াছে এবং ইহা তাহাদের শিক্ষালাভের স্পৃহা জাগরিত করিয়াছে। সমিতি পরিচালনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে সদস্যগণের মধ্যে পৌরশিক্ষার (Civic education) প্রসার লাভ হয়। যে সকল এলাকায় উৎকৃষ্ট সমবায় সমিতির অস্তিত্ব আছে সেই সকল স্থানে জনসাধারণের মধ্যে মামলা-মোকর্দ্দমা হ্রাস পাইয়াছে।

ত্রুটি—কিন্তু আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। (১) পরিচালন কমিটির সদস্যগণের মধ্যে অনেক সময়ে সততার অভাব দেখা যায়—যোগ্যতা বা কর্ম্মদক্ষতার অভাব তো থাকেই। বহু ক্ষেত্রে তাঁহারা স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হন এবং সমিতির সুযোগ সুবিধাগুলি যাহাতে নিজেরাই এবং তাঁহাদের অনুগৃহীতরাই অধিক ভোগ করিতে পারেন তাহার জন্য সচেষ্ট থাকেন। (২) সময়ানুবর্ত্তিতাকে অবহেলা করা হয়; ফলে, যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করা হয় না। বহু টাকা এইভাবে অনাদায়ে পড়িয়া থাকে এবং তখন আর সমিতির পক্ষে কার্য্য করা সম্ভব হইয়া উঠে না। (৩) এই আন্দোলন প্রধানতঃ ঋণদানের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ আছে। অঋণদান সমবায়ের অগ্রগতি খুবই অল্প। আবার ঋণদান সমিতির মারফৎ যে সাহায্য কৃষকগণ পায়—উহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকগণ পূর্ব্বেকার ঋণের বিরাট বোঝা বহন করে; উহার ভার লাঘব না করিলে, তাহাদের ঋণগ্রস্ততা হ্রাস পায় না। পূর্ব্বেকার ঋণগ্রস্ততা হইতে মুক্ত করিতে হইলে

তাহাদিগকে অল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিতে হইবে। সাধারণ ঋণদান সমিতির পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। অবশ্য এই কার্য্য করিবার জন্য কোনো কোনো স্থানে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মোট প্রয়োজনের তুলনায় ইহারা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। (৪) সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন; এইরূপ কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণে সমবায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না; কারণ সমবায়ের ভিত্তিই হইল স্বাবলম্বন।

Questions & Hints

1. State the fundamental principles of Cooperation (1929) [অনু—৩]

2. Discuss the organisation and functions of Rural Cooperative Credit Societies. (1941) [অনু—৫]

3. Describe the functions of Cooperative Banks in India (1936) [অনু—৮]

4. In what different ways has the Cooperative movement helped to remove the agricultural indebtedness of India (1926) [অনু—১০]

5. Indicate the different ways in which the Cooperative movement has benefitted the agriculturists, artisans and in general, persons of limited means (1945) [অনু—৫, ৬ এবং ৭ সংক্ষেপে]

6. Describe the main features of the Cooperative movement in India (1939) [অনু—১১]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিল্প

Industries

(অণুচ্ছেদ-১) কুটির শিল্প—*Cottage Industries*

স্বল্প পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা উৎপাদকের গৃহেই করা হইয়া থাকে, তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয়। শিল্পী তাহার গৃহেই অথবা গৃহের সন্নিকটেই কোন স্থানে সামগ্রী উৎপাদন করে। এইরূপ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন হয় স্বল্প পরিধিতে এবং শিল্পী তাহার পরিজনবর্গের সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পী হইল স্বাধীন উৎপাদক; কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পীগণ কোন মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরূপ পুঁজিপতির তাঁবেদার হিসাবেও কার্য্য করে। এই পুঁজিপতিগণ কুটীর শিল্পীদিগকে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহ করে এবং উৎপাদিত সামগ্রী তাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে।

(অণু-২) ভারতের কয়েকটী কুটির শিল্প—*Some Cottage Industries of India*

(১) রেশমকীট পালন ও রেশম শিল্প (Sericulture and silk Industry) —এই পারস্পরিক নির্ভরশীল শিল্প দুইটী আমাদের দেশে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহীশূর, আসাম ও পশ্চিম বাঙ্গালায় রেশম কীট পালন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে চারিপ্রকারের রেশম উৎপন্ন হয়—যথা মালবেরি রেশম, তসর, এণ্ডি ও মুগা। ইহার মধ্যে মালবেরি সিল্ক উৎপাদিত হয় পশ্চিমবঙ্গে, মহীশূরে এবং কাশ্মীরে; আসামে উৎপাদিত হয় এণ্ডি ও মুগা; তসর উৎপাদিত হয় বিহারে ও পশ্চিম বঙ্গে।

(২) পশম শিল্প (Woollen Industry)—পশম শিল্পে শাল, কার্পেট ও কম্বল উৎপাদিত হইয়া থাকে। কুটির শিল্প হিসাবে পশম শিল্প আমাদের দেশে

প্রধানতঃ মহীশূর ও কাশ্মীরেই বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। উৎকৃষ্ট শাল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র কাশ্মীর; অমৃতসর, মৃজাপুর, বানারস ও কাশ্মীরেও কার্পেট উৎপাদিত হয়। সাধারণ ব্যবহার্য্য কম্বল বিভিন্ন স্থানেই উৎপাদিত হয়।

(৩) পিতল ও কাঁসা শিল্প (Brass and Bell-metal Industries)—ভারতের বিভিন্ন স্থানে পিতল ও কাঁসার বাসন কুটির শিল্পে উৎপাদিত হয়। বানারস. মোরাদাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের প্রসার অধিক।

(৪) তুলা তাঁত শিল্প (Hand-loom Cotton Industry)—আমাদের দেশে তুলা তাঁত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। অবিভক্ত ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত থাকিত এবং প্রায় ১ কোটি লোকের এই শিল্প হইতে অন্নের সংস্থান হইত। অবিভক্ত ভারতে মোট উৎপাদিত বস্ত্রের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ তাঁতে উৎপন্ন হইত এবং প্রতিবৎসর ভারতে যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার হইত, তাহার মধ্যে তাঁত-উৎপাদিত বস্ত্র ব্যবহার হইত শতকরা ২৫ভাগ।

(অণু-৩) তাঁতশিল্পের সম্ভাবনা—*Possibilities of Hand-loom Industry*

যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁত শিল্প বহু পরিমাণেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তাহাই নহে, ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে বিদেশী শাসকগণ বহু অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যের দ্বারা এই শিল্পের ধ্বংস সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তাঁতশিল্প টিকিয়া ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যন্ত্রশিল্পের দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র বর্দ্ধিত প্রয়োজন মিটাইতে না পারার দরুণ এবং বস্ত্রের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁত বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়; সরকারও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তন্তু সামগ্রী (textile goods) সংগ্রহের জন্য তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এবং উহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিবার পরেও তাঁতশিল্প যুদ্ধকালীন অগ্রগতি বজায় রাখিয়াছিল। কারণ, যুদ্ধোত্তর কালেও, যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং অনেক স্থানে বস্ত্র দুর্লভ হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীতও, তাঁত শিল্পের কতিপয় নিজস্ব সুবিধা থাকার দরুণ ভবিষ্যতে এই শিল্প বজায় রাখা সম্ভব হইবে। প্রথমতঃ, তাঁত বয়নকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় স্থির পুঁজি (Fixed capital) খুব অধিক নহে এবং পুঁজি-সামগ্রী সংগ্রহ করা খুব কষ্টকর নহে। দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত মোটা তাঁত বস্ত্র কলে উৎপাদিত বস্ত্রের অপেক্ষা বেশী টেঁকসই হয়। তৃতীয়তঃ, শুধু

দরিদ্রদিগের পছন্দমত বস্ত্রই যে ইহাতে উৎপাদিত হয় তাহাই নহে। ধনীদিগের পছন্দমত কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র একমাত্র তাঁতেই তৈয়ারী করা যায়। চতুর্থতঃ, তাঁত বয়নকারী কতিপয় অন্যান্য সুবিধাভোগ করিয়া থাকে যথা—বংশানুক্রমিক দক্ষতা এবং পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তা। তবে তাঁতের কতিপর অসুবিধাও আছে। এই সকল অসুবিধা অবশ্য অন্যান্য কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও আছে। তাঁতীর প্রধান অসুবিধা হইল তাহাকে সুতার জন্য মিলের উপর বা বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

(অনু-৪) কুটির শিল্পের উপকারিতা বা গুরুত্ব—*Utility or Importance of Cottage Industries*

আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই গ্রামে বাস করে এবং ইহাদের মধ্যে বিপুলভাবে সংখ্যাধিক ব্যক্তিই কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষকের সারা বৎসর নিযুক্ত থাকিবার মত যথেষ্ট কার্য্য থাকে না। বৎসরের প্রায় আট মাস কোন নির্দ্দিষ্ট উপজীবিকা কৃষকের থাকে না। তাহার চরম দারিদ্র্যের ইহাই অন্যতম কারণ। কৃষিজীবীগণ কোন না কোন কুটীর শিল্পে নিযুক্ত থাকিলে বাড়তি উপার্জ্জন করিতে পারে। নিজের গৃহেই সুতাকাটা, তাঁত বয়ন, ঝুড়ি তৈয়ারী, দড়ি তৈয়ারী, বেতের কার্য্য প্রভৃতি করিয়া তাহারা অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। শুধু যে কুটির শিল্প কৃষকদিগকে বাড়তি কার্য্য দিয়া তাহাদিগের উপার্জ্জন বৃদ্ধির সাহায্য করে তাহাই নহে, বহু ব্যক্তি কোন না কোন কুটির শিল্পের দ্বারা প্রধানতঃ জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে কুটির শিল্পীদিগের সংখ্যা কৃষিজীবীদিগের সংখ্যার প্রায় সমানই ছিল। সেইজন্য জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িত না। বিভিন্ন কারণে ব্রিটিশ শাসনের প্রচলনের সহিত কুটির শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। অথচ কারখানা শিল্প এরূপভাবে গড়িয়া উঠে নাই যাহাতে উহা অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারে। অতএব কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথোপযুক্ত ভারসাম্যের জন্য কুটির শিল্পের সমধিক গুরুত্ব। এখনও কুটির শিল্প বহু ব্যক্তির সর্ব্ব সময়ের জন্য উপজীবীকা (whole time occupation) এবং বহু কৃষিজীবীর আনুষঙ্গিক উপজীবিকা (By-occupation)। অবশ্য বিভিন্ন অসুবিধা ও ত্রুটীর জন্য কুটির শিল্প যতটা অর্থনৈতিক উপকার সাধন করিতে পারে ততটা করিতে বর্ত্তমানে সক্ষম নহে। সেইজন্য অর্থনীতিবিদগণের কুটির শিল্পের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

কুটির শিল্পের যথোচিত উন্নতি বিধান করিতে পারিলে ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং উপকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। কৃষির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব করিবার জন্য বর্ত্তমানে কুটির শিল্পের উন্নতি অত্যাবশ্যক। অবশ্য ইউরোপের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কারখানা শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ হইলে, কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। কিন্তু যতই আশাবাদী আমরা হই না কেন, বর্ত্তমান অবস্থায় কারখানা শিল্পের প্রসারের দ্বারা কৃষির উপর চাপ লাঘব করা বহু সময় সাপেক্ষ—ইহা স্বীকার করাই সমীচীন। কিন্তু সুপরিকল্পিত ভাবে কুটির শিল্পের প্রসারের দ্বারা আমাদের দেশের কৃষির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব করা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব। কুটির শিল্পের প্রসার গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধিশালী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবে।

(অনু-৫) **কুটির শিল্পের ত্রুটী ও অসুবিধা**—*Defects and difficulties of Cottage Industries*

কুটির শিল্পের মধ্যে একাধিক ত্রুটী ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটী সমূহের দরুণ কুটির শিল্পের দ্বারা জনসাধারণের যতটা উপকার সাধিত হইতে পারে তাহা বর্ত্তমানে সম্ভব হইতেছে না। প্রথমতঃ, গ্রামাঞ্চলের কারিগরদিগের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। শিক্ষাভাব সকলের পক্ষে যেমন, কারিগরদিগের পক্ষেও তেমনই একটি নিদারুণ অভিশাপ। অশিক্ষা হইতে অতিরিক্ত গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতা উদ্ভূত হয়। নূতন কিছু করিবার প্রতি বিতৃষ্ণা ও গতানুগতিকতার প্রশ্রয়, ইহাই রক্ষণশীলতা; ইহার দ্বারা শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয় কারণ ইহাতে কারিগরগণ নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদিগের ন্যায় কারিগরদিগকেও (কৃষক ও কারিগর অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি) মূলধনের অভাব ভোগ করিতে হয়। একদিকে তাহাদের অল্প আয়, অপর দিকে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অত্যধিক ব্যয়—সেই কারণে কারিগরগণ মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত। কাঁচামাল কিনিবার জন্য তাহাদিগকে মহাজনের নিকট কর্জ্জ করিতে হয়। এই ঋণের জন্য তাহাদিগকে উচ্চহারে সুদ দিতে হয় এবং তাহাদের উপার্জ্জনের অধিকাংশই সুদ প্রদানে এবং ঋণ পরিশোধে ব্যয় হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ, উৎকৃষ্ট ধরণের কাঁচামাল সমূহ প্রতিযোগিতামূলক দাম দিয়া বৃহৎ কারখানা শিল্পগুলি কিনিয়া লয়। কুটির শিল্প অপেক্ষা কারখানা শিল্পের সঙ্গতি অধিক। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে কুটির শিল্পী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুণের কাঁচা মাল দিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ফলে উদপাদিত

সামগ্রীও নিকৃষ্ট ধরণের হয়। চতুর্থতঃ, সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক ত্রুটী। যথোচিত দামে পণ্য বিক্রয় করা কুটীর শিল্পীদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না; কারণ দূর বাজারে তাহাদের মাল প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। কোথায় তাহাদের পণ্যের উত্তম বাজার আছে সেই সম্বন্ধেও তাহারা ওয়াকিবহাল থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা মহাজনদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া তাহাদের নিকটেই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ থাকে।

(অণু-৬) কুটির শিল্পের উন্নয়নের উপায় সমূহ—*Methods of developing Cottage Industries*

কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য উহার ত্রুটী ও অসুবিধা সমূহ দূর করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ কুটির শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। ইহাতে মানসিক বিকাশ সাধন হইবে এবং কারিগরগণ তাহাদের রক্ষণশীলতা বর্জ্জন করিতে পারিবে ও আধুনিক কালের শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য তাহারা আগ্রহান্বিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে যন্ত্রবিদ্যা বা কারিগরী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহাতে তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপন প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, কুটির শিল্পীগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও যাহাতে তাহারা সুবিধাজনক দরে ক্রয় করিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই কাজ সমবায়ের মধ্য দিয়া করা সম্ভব। কারিগরদিগকে সমবায় ক্রয় সমিতি স্থাপনের জন্য প্রণোদিত ও সাহায্য করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, কারিগরদিগের ঋণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতিও গঠনের প্রয়োজন। ইহাতে তাহারা অল্প সুদে ঋণ পাইবে এবং মহাজনদিগের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কুটির শিল্পগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প সাহায্য আইনের বিধান অনুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা কারিগরদিগকে ঋণ দানের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, অধিকতর সুবিধাজনক সর্ত্তে যাহাতে কুটির শিল্পের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কারিগরগণ যাহাতে সমবায় বিক্রয় সমিতি গঠন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি কারিগরদিগের

সম্ভব হইলেও পরিমাণের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় সাপেক্ষ, সেইগুলিও ঐ দেশের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। **দ্বিতীয়তঃ**, ঐ দেশের মধ্যেই কর্মক্ষম মজুর যথেষ্ট সংখ্যায় থাকিতে হইবে। এই মজুরদিগের শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের দক্ষতা থাকিতে হইবে; এবং কাঁচামালের দিক হইতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের দিক হইতে, দেশের মধ্যে যত পরিমাণ শিল্প-সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে, ততপরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে মজুরদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া চাই। **তৃতীয়তঃ**, যন্ত্রচালনা করিবার শক্তি দেশের মধ্যে থাকা চাই। আধুনিক সময়ে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা ও পেট্রোলের সাহায্যে যন্ত্র চালিত হইয়া থাকে। **চতুর্থতঃ**, শিল্পের গঠন এবং সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। পুঁজি সামগ্রী (Capital goods) ক্রয় করিবার জন্য এবং চলতি খরচা চালাইবার জন্য মূলধন অত্যাবশ্যক। জনসাধারণের সঞ্চয় হইতে এই মূলধন আসিতে পারে তবে ইহার জন্য জনসাধারণের বিনিয়োগ স্পৃহা থাকা প্রয়োজন। ঋণ দিবার মতন প্রতিষ্ঠানও থাকা প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক হইল এইরূপ প্রতিষ্ঠান। **পঞ্চমতঃ**; দেশের মধ্যে শিল্প প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অস্তিত্বও প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উত্তমরূপে সংগঠিত করিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে এরূপ উদ্যোগী ও বুদ্ধিমান শিল্পপরিচালক না থাকিলে শিল্পোন্নতি সম্ভব নহে। **ষষ্ঠতঃ**, সামগ্রী শুধু উৎপাদিত হইলেই হইবে না—ঐগুলি বিক্রয় হইতে হইবে। পণ্যের বাজার যতই বিস্তৃত হইবে, উহা উৎপন্ন করিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ততই প্রণোদিত হইবেন। **সপ্তমতঃ**, শিল্পোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের অনেক কার্য্যকলাপ আছে যাহার দ্বারা শিল্প প্রচেষ্টা উৎসাহিত হইতে পারে অথবা ব্যাহত হইতে পারে।

(অনু ৯) এই বিষয়গুলির মধ্যে ভারতের কি আছে ও কি নাই—
What India has and what she has not

(১) শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে ভারতে বহু পরিমাণে কাঁচামাল আছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত একটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী দেশ। শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মধ্যে কয়েকপ্রকারের প্রধান কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সামগ্রী ভারতের রহিয়াছে।

(২) ভারতের জনসংখ্যাও প্রচুর,—ভারত প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটী। মোট জন সংখ্যার মধ্যে শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা যদি শতকরা ৫০ ভাগ ধরা যায় তাহা হইলেও কার্য্যক্ষম মজুরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭।১৮ কোটী।

(৩) যন্ত্রচালন শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়াম আমাদের দেশে অল্প বটে—কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর।

(৪) সামগ্রী বিক্রয়ের বাজারও আমাদের আছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলি বহু সামগ্রীর জন্য আমাদের দেশের উপর নির্ভরশীল; আর তাহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ বাজার হইল আমাদের দেশেরই বিপুল জনসংখ্যা।

কিন্তু ভারতের অভাব মূলধন বা পুঁজির। পুঁজি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপরে এবং সেই সঞ্চিত অর্থ শিল্পে বিনিয়োগের উপরে। আমাদের দেশের জনসাধারণের সঞ্চয় খুবই কম কারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় অতি কম, কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য ব্যয় অত্যধিক। আবার যাহা সঞ্চয় হইয়া থাকে তাহা জমি ক্রয়ে বা মূল্যবান ধাতু ক্রয়ে নিযুক্ত হয় অথবা নগদে রাখিয়া দেওয়া হয়—শিল্পে নিয়োগ করা হয় খুবই কম পরিমাণ। ভালো ব্যাঙ্কের সংখ্যা অধিক হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ ঋণ পাইতে পারিত। কিন্তু ভালো ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম! উপরন্তু তাহারা স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিতে পারে—কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিতে পারে না। কিন্তু শিল্প প্রসারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন - অর্থাৎ যে ঋণ পরিশোধের জন্য ১৫।২০ বৎসরের মতন যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে শিল্পপ্রতিভার একান্ত অভাব। জামসেদজী টাটা অথবা স্যার রাজেন মুখোপাধ্যায়ের মতন শিল্পোদ্যোগী আমাদের দেশে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিল্প প্রতিভার অস্তিত্ব সম্ভব হয় সেই পরিবেশের একান্ত অভাব ছিল আমাদের দেশে। স্বাধীনতার পরিবেশ, সামাজিক সাম্য ও শিক্ষার (সাধারণ ও কারিগরী) বহুল প্রসার—এইগুলি হইল শিল্প প্রতিভার সহায়ক। আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে ইহার একান্ত অভাব ছিল।

(অনু ১০) **ভারত কৃষিপ্রধান না শিল্পপ্রধান হইবে?**—*Should India be Industrial or Agricultural?*

ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ গ্রামের অধিবাসী এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ কৃষিজীবী। ভারতের জমি উর্ব্বর এবং এখানে বহু পরিমাণ কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতে প্রচুর পরিমাণ চাউল, গম, ইক্ষু, চা, তুলা, বাদাম, ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীর মধ্যে এইখানেই গবাদি-পশুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এবং যে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার পরিমাণও অল্প নহে। পরন্তু মোট জন সংখ্যার শতকরা মাত্র আট ভাগের উপজীবিকা হইল শিল্প। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে ভারত যদি শিল্প প্রচেষ্টায় উদ্যম ও সঙ্গতি ব্যয় না করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সকল উদ্যম ও সঙ্গতি

প্রয়োগ করে তাহা হইলে, ভারতের অর্থনৈতিক হিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধিত হইবে।

এই মত কিন্তু গ্রহণযোগ্য নহে। তাহার কারণ শিল্প প্রধান হইবার মতন বহু উপকরণ আমাদের দেশে রহিয়াছে; এবং যেগুলি নাই তাহাদের অভাব দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নহে। আমাদের দেশে কাঁচামালের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা. ইক্ষু, পাট, ইত্যাদি কৃষিজ সামগ্রী আছে; রবার, গঁদ, বৃক্ষ-তৈল, মণ্ড (pulp) তক্তা ইত্যাদি বনজ-সম্পদ আছে; পশম, রেশম, লাক্ষা, চামড়া ইত্যাদি প্রাণীজ সম্পদ আছে এবং উৎকৃষ্ট গুণের কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, কায়ানাইট, ক্রোমাইট, এ্যালুমিনিয়ম, চুণ ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। তেত্রীশ কোটী দরিদ্র লোকের বসতিপূর্ণ দেশে সস্তায় লভ্য মজুরের সংখ্যা প্রচুর। বিদ্যুতশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রও প্রচুর আছে। উপরন্তু পণ্য বিক্রয়ের জন্য ভারতের অভ্যন্তরেই বিস্তীর্ণ বাজার রহিয়াছে—দূর প্রাচ্য এবং মধ্য প্রাচ্যের বাজারগুলির কথা যদি ছাড়িয়াও দিই। আমাদের অভাব—পুঁজির, শ্রমিকের দক্ষতার, এবং শিল্প প্রতিভা ও ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির। কিন্তু এইগুলি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নহে। যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং যে পরিবেশের মধ্যে ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের ও শিল্পপ্রতিভার অস্তিত্ব সম্ভব তাহাও সৃষ্টি করিতে পারা যায়।

শুধু যে শিল্পে উন্নতি করা ভারতের পক্ষে সম্ভব তাহাই নহে, আমাদের দেশে যথোপযুক্ত ভারসাম্যযুক্ত অর্থনীতির (Properly balanced economy) জন্য উহা অবশ্য প্রয়োজন। যথোপযুক্ত ভারসাম্যযুক্ত অর্থনীতি বলিতে বুঝায় যে দেশের অধিবাসীবৃন্দ অত্যধিক পরিমাণে কৃষির উপরে নির্ভরশীল থাকিবে না। জনসাধারণ উপজীবিকা অনুসারে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত থাকিবে যাহাতে গড় মাথা পিছু আয় হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

(অণু ১১) **শ্রম-দক্ষতা**—*Efficiency of Labour*

আমাদের দেশের শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় কর্ম্ম দক্ষতা কম। একজন ইংরেজ বা আমেরিকাবাসী দৈনিক যত পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে, আমাদের দেশে গড়ে একজন শ্রমিক তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে। শ্রমিকদিগের দক্ষতার অভাব আমাদের শিল্পোন্নতির একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক। অবশ্য এই প্রতিবন্ধক অপসারণ করিতে পারা যায়। ইহার জন্য দক্ষতাহীনতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

(১) আমাদের শ্রমিকদের অত্যধিক দারিদ্র্যহেতু তাহারা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয় উহাতেই তাহাদের শ্রম দক্ষতা হ্রাস পায়। ঘন-বসতিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর চালার মধ্যে বাস করিবার দরুণ তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যও তাহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। (২) আমাদের দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান—এইরূপস্থানে অধিকক্ষণ কঠোর শারীরিক পরিশ্রম সম্ভব হয় না বা সম্ভব হইলেও সহ্য হয় না। (৩) শ্রমিকদিগের শিক্ষার একান্ত অভাব—সাধারণ শিক্ষা ও কারীগরী শিক্ষা, উভয় শিক্ষা হইতেই তাহারা বঞ্চিত। আমাদের দেশের শিক্ষিতের শতকরা হার অতি কম এবং কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যাপক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নাই। অথচ এইগুলির উপরে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে। (৪) শ্রমিকগণ অত্যধিক দারিদ্র্যের দরুণ মহাজন দিগের নিকট ঋণগ্রস্ত - সুদ দিতে ও ঋণ পরিশোধ করিতে তাহাদিগের চলতি আয়ের অধিকাংশই ব্যয় হইয়া যায়—অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহার দ্বারা দক্ষতা বজায় রাখা অসম্ভব। (৫) শিল্পের আভ্যন্তরীণ বহু ত্রুটির দরুণ শ্রমিকগণ আশানুরূপ উৎপাদন করিতে পারে না।

দক্ষতাহীনতার এই সকল কারণগুলি দূরীভূত করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য তাহাদের বাসস্থানের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। অস্বাস্থ্যকর বস্তীগুলি নষ্ট করিয়া উহার পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস জাগাইতে হইবে। শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। **দ্বিতীয়তঃ**, তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা প্রদানের আয়োজন অবশ্য প্রয়োজনীয়। যন্ত্রবিদ্যা প্রদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপনও প্রয়োজন। **তৃতীয়তঃ**, শ্রমিকদিগের ঋণের বোঝা লাঘব করিতে হইবে এবং তাহারা যাহাতে অল্প সুদে ঋণ পায় তাহার জন্য তাহাদিগের মধ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠনের উৎসাহ দিতে হইবে। **চতুর্থতঃ**, শিল্পের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ত্রুটি সমূহ দূরীভূত করিয়া ব্যবস্থাপনার উন্নতিবিধান করাও প্রয়োজন।

(অনু—১২) বিদেশী মূলধন—*Foreign Capital*

জনসাধারণের দারিদ্র্যের দরুণ আমাদের দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ অল্প। যাহা সঞ্চয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণও যথেষ্ঠ নহে। শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিবার স্পৃহা ভারতবাসীর ছিল না—জমি বা মূল্যবান ধাতু ক্রয়ের জন্যই

সঞ্চয় নিযুক্ত হইত। উপরন্তু শিল্পোদ্যোগীর সংখ্যা ছিল কম কারণ আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অভিজ্ঞতাও ভারতবাসীর ছিল না। সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় শিল্পোদ্যোগীর কাছে বিতরণ করিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশে যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় তাহাও আমাদের দেশে ছিল না। আমাদের এই সকল ত্রুটি ও অসুবিধার স্থলে বিদেশীদিগের উৎসাহ, সাহস ও উদ্যোগপ্রতিভা ছিল এবং তাহাদিগের পিছনে ছিল রাজশক্তি। এই সকল কারণে প্রথম দিকে বৈদেশিক মূলধনের দ্বারাই আমাদের দেশে একাধিক শিল্প স্থাপিত হইয়াছিল, বিদেশী পুঁজিপতিরাই ছিল উহাদের মালিক ও পরিচালক। পাট, রবার, চা, কফি, কয়লা. স্বর্ণ, কাগজ প্রভৃতি শিল্প বিদেশী মূলধনে স্থাপিত এবং ইহাদের অধিকাংশই বর্ত্তমানেও বিদেশী মূলধনে পরিচালিত।

আমাদের শিল্পে বৈদেশিক পুঁজিপতিদিগের সক্রিয় অংশ হইতে অনেকগুলি সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ইহারা যখন আমাদের দেশে শিল্প স্থাপন করেন, তখন এখানে শিল্প প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল না বলিলেই চলে। ইহাদের দৃষ্টান্ত হইতে ভারতবাসী আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিয়াছে এবং শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিবার স্পৃহা জাগরূক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার মধ্যে অনেক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে; বিদেশীগণ এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে অনেকগুলি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার ইহা অন্যতম কারণ হিসাবে ক্রিয়া করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বিদেশীদিগের দ্বারা স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়গণ নিযুক্ত হইয়াছে এবং উহা হইতে তাহারা কিছু পরিমাণে শিল্প পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

কিন্তু বৈদেশিক পুঁজিপতিদিগের দ্বারা এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ হইতে একাধিক কুফলও ফলিয়াছে। প্রথমতঃ বৈদেশিক পুঁজি দ্বারা পুষ্ট শিল্পগুলি হইতে বৎসরে বহু কোটি টাকা লাভ হইয়া থাকে কিন্তু এই অর্থ বিদেশীর তহবিল পুষ্ট করে; ইহা বিদেশে চলিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, খনিজ শিল্পগুলি বৈদেশিক পুঁজিতে স্থাপিত, কিন্তু বিদেশীদিগের এদেশের সম্পদ যথাযোগ্য সংরক্ষণের জন্য কোন আগ্রহ ছিল না। তাহারা খনিগুলিকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়াছিল। ইহাতে দেশের সম্পদের অপব্যয় ঘটে। তৃতীয়তঃ, বিদেশী শিল্পপতিগণ ভারতীয়দিগকে শিল্প শিক্ষা দিতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ছিল না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহারা ভারতীয়দিগকে নিয়োগ করিত না। ইহাতে ভারতের নিজস্ব শিল্প প্রসারে কোন সহায়তা করা হয় নাই। চতুর্থতঃ তাঁহারা তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে যথাসাধ্য বাধা দান করিয়াছেন। এই সকল কারণে

একাধিক অর্থনীতিবিদ দেশের মধ্যে বৈদেশিক পুঁজির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন।

ভারতীয় অর্থনীতির বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু বৈদেশিক পুঁজির সমস্যা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিবার এবং ঐ সম্পর্কে নূতন মনোভাব অবলম্বন করিবার প্রয়োজন উদ্ভূত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশা করা হইয়াছে। অধিক এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের দ্বারা এই অগ্রগতি আনিতে হইবে কিন্তু ইহার জন্য যে পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন সেই পরিমাণ পুঁজি আমাদের দেশে নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বৈদেশিক পুঁজি আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবে তবে উহার অপকার সাধনের সম্ভাবনাও প্রতিরোধ করিতে হইবে। আবার ঐ অপকার সাধনক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে গিয়া বৈদেশিক পুঁজিপতিদিগের মধ্যে সংশয় ও ভীতির ভাব উদ্রেক করিলে চলিবে না। বৈদেশিক পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণাকালে (১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে) পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছিলেন, "বৈদেশিক পুঁজির দ্বারা ভারতীয় পুঁজি পরিপূরিত করিতে হইবে শুধু এই কারণেই নহে যে যে-হারে আমরা ইচ্ছা করি সেই হারে দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য আমাদের জাতীয় সহায় পর্য্যাপ্ত নহে, ইহার আরও কারণ হইল যে বৈদেশিক পুঁজির সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক, টেকনিক্যাল এবং শিল্পগত জ্ঞান এবং শিল্প সামগ্রী পাওয়া সম্ভব হয়।"

(অনু-১৩) সংরক্ষণ নীতি—*Policy of Protection*

কতিপয় শিল্প ছিল যেগুলি ভারতীয় পুঁজি এবং উদ্যোগেই গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু বৈদেশিক শিল্প সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় এই শিল্পগুলি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। সেই কারণে অনেকদিন যাবৎই দাবী উঠিয়াছিল যে আমদানী সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্প সামগ্রীকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। অবশেষে ১৯২২ সালে ভারত সরকার এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবার জন্য ভারতীয় রাজস্ব কমিশন গঠন করেন। এই রাজস্ব কমিশন সুপারিশ করেন যে নির্ব্বিচারে সকল শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া উচিত হইবে না, কারণ সংরক্ষণের অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আছে। তাঁহারা সেই কারণে বাছাই করা সংরক্ষণ বা বিচারমূলক সংরক্ষণের (Discriminating Protection) সুপারিশ করেন। ইহার অর্থ হইল যে যে প্রতিষ্ঠানই সংরক্ষণ চাহিবে তাহাকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না; উহা সেই শিল্পগুলিকে দেওয়া হইবে যেগুলি কতিপয় সর্ত্ত পূরণে সক্ষম। সর্ত্তগুলি হইল (১) সংরক্ষণকামী শিল্পটীকে স্বাভাবিক সুবিধাসম্পন্ন হইতে হইবে, যথা ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয়

কাঁচামালের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ, যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক, দেশের মধ্যেই পণ্য বিক্রয়ের বিস্তৃত বাজার। (২) শিল্পটীকে এরূপ হইতে হইবে যে উহা সংরক্ষণ না পাইলে আদৌ অগ্রসর হইতে পারিবে না অথবা দেশের কল্যাণের জন্য যতটা দ্রুত উন্নতি বিধান প্রয়োজন, ততটা দ্রুত উন্নতি উহা করিতে পারিবে না। (৩) শিল্পটীকে এরূপ হইতে হইবে যাহাতে বুঝা যায় যে উহা ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই বিশ্বের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে।

রাজস্ব কমিশনের এই বিচারমূলক সংরক্ষণের সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে টেরিফবোর্ড গঠন করা হইয়াছিল। বিচারমূলক সংরক্ষণের এই সর্ত্ত কোন শিল্প পূরণ করে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা ছিল ইহার কার্য্য। যে সকল শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষণ চাহিত তাহাদিগকে এই টেরিফবোর্ডের নিকট তাহাদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে হইত—যৌক্তিকতা প্রদর্শনের ভিত্তি ছিল বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্ত্তগুলি পূরণ করিবার সক্ষমতা প্রদর্শন।

বিচারমূলক সংরক্ষণের আওতায় যে সকল শিল্প সংরক্ষণ পাইয়াছিল সেগুলি হইল, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প, শর্করা শিল্প, বস্ত্র শিল্প ইত্যাদি।

(অনু-১৪) সংরক্ষণের ভিত্তি—*Grounds for granting Protection*

আমাদের শিল্প সমূহের সংরক্ষণের জন্য যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম হইল শিশু শিল্পের যুক্তি। শিশুদিগকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিলে উত্তরকালে তাহারা প্রমাণ মানুষে পরিণত হইয়া স্বাবলম্বী জীবন যাপন করিতে পারে এবং সামাজিক জীবনের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, সেইরূপ আমাদের দেশে অনেক শিল্প আছে যেগুলি অরক্ষিত অবস্থায় টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে যাহাদের সম্ভাবনা প্রচুর। প্রয়োজন হইল, কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করা। তবে এই 'কিছুকাল' যতই সংক্ষিপ্ত হয় ততই মঙ্গল, কারণ যে পণ্যের বৈদেশিক আমদানীর উপর শুল্ক বসাইয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়, সে পণ্যের দাম কৃত্রিমভাবে উহার দ্বারা বর্দ্ধিত করা হয়। যতদিন সংরক্ষণ থাকে ততদিন উহার কৃত্রিমভাবে বর্দ্ধিত দাম থাকে। উপরন্তু অধিককালের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন হইলে, সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্বাবলম্বী হইবার অক্ষমতাই প্রতিপন্ন হয়। শিশুশিল্পের যুক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য বিবেচ্য বিষয় হইল প্রধানতঃ দুইটী। প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট শিল্প সমূহের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা থাকিতে

হইবে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শ্রমিক ও বাজার থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশের অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই এইগুলি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সহায়তা না পাইলে এই শিল্প বাঁচিতে পারিবে না, এইরূপ হইতে হইবে। আমাদের দেশে বহু শিল্পেরই এই অবস্থা ছিল; কারণ, সুসংগঠিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা এবং দেশের মধ্যে শিল্প অভিজ্ঞতার অভাব।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের পক্ষে বিবিধ শিল্প সৃষ্টির যুক্তিও প্রযোজ্য। অল্প কতিপয় মাত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল হইলে, দেশের অর্থনীতি ঐ কতিপয় শিল্পের ভাগ্যের সহিতই জড়িত থাকে। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, কারণ ঐ দুই একটী শিল্পে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে দেশের সমগ্র অর্থনীতি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। সেই কারণে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, ভূমির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। উহার জন্য আমদানী সামগ্রীর উপরে শুল্ক আরোপ করিলে, আপাততঃ ক্রেতা হিসাবে জনসাধারণের অসুবিধা হইলেও, ভবিষ্যতে উহার দ্বারা দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সংরক্ষণের আওতায় শ্রমিকের মজুরীর হার বৃদ্ধি পায় এবং জীবন-যাত্রার মান (Standard of living) উন্নীত হয়। আমাদের দেশে সংরক্ষণের পক্ষেও ইহা বিবেচ্য।

এই সকল কারণে আমাদের দেশের অবাধ বাণিজ্যের স্থলে সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। তবে অত্যধিক সংরক্ষণ নীতি কার্য্যকরী করিলে বিদেশীগণ আমাদের সামগ্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, উহাতে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হইবে এবং অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স সৃষ্টির প্রয়াস ব্যাহত হইবে। অতএব অবাধ বাণিজ্যই (Free Trade) হইবে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সংরক্ষণ হইবে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা।

(অণু-১৫) রাষ্ট্র ও শিল্প সমূহ—*State and Industries*

ব্রিটিশ বণিকদিগের প্রেরণাতেই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের পত্তন হইয়াছিল এবং তাহাদের স্বার্থেই ভারতের প্রাচীন কুটীর শিল্প ধ্বংস করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতবাসী যখন যন্ত্রশিল্পের (বস্ত্রশিল্প) প্রতিষ্ঠা করিল তখনও ব্রিটিশ বণিকের স্বার্থেই ভারত সরকার শিশুশিল্পের উপর দুঃসহ করভার চাপাইয়া দিতে দ্বিধা করিলেন না। যে সকল শিল্প ব্রিটিশ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করে নাই সেগুলিকে

কার্য্যকরীভাবে বাধা না দিলেও উৎসাহ বা সাহায্য দিবার কোন চেষ্টাই সরকার করেন নাই। কাঁচামাল উৎপাদনকারী এবং ব্রিটিশ পণ্য ক্রয়কারী একটী দেশে ভারতকে পরিণত করাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সরকারের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও কিছু কিছু শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সরকারের ঔদাসীন্য থাকিলে আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্পের সম্প্রসারণ অতিশয় কষ্টকর; সেই কারণে প্রত্যেক দেশেই সরকার অল্প বিস্তর শিল্পোন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথঞ্চিৎ সজাগ হইতে বাধ্য হন। যুদ্ধের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত যুদ্ধোপকরণ সংসদ (Munition Board) গঠিত হয় এবং এই সংসদ ভারতে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করেন। সরকার ঐ সময়ে শিল্পোন্নতির পন্থা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার দায়িত্ব দিয়া একটী শিল্প কমিশন (Industrial Commission) গঠন করেন। শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া কমিশন অভিমত প্রদান করেন। ইহাদের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রে এবং প্রদেশ সমূহে একটী করিয়া শিল্প দপ্তর স্থাপিত হয়। ইহাদের কার্য্য হইল শিল্পোদ্যোগীদিগকে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করা। ভারতীয় সামগ্রী-ক্রয় দপ্তর (Indian Stores Department) স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহা ভারতে উৎপাদিত সামগ্রী অধিক ক্রয়ের (সরকারী প্রয়োজনে) ব্যবস্থা করিয়াছিল। কোন কোন প্রদেশে "শিল্প সাহায্য আইন" (State Aid to Industries Act) প্রণয়ন করিয়া সরকার শিল্পকে ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালের পর হইতে রাজস্ব কমিশনের (Fiscal Commission) সুপারিশ মতন ভারত সরকার শিল্পের ক্ষেত্রে "বিচার মূলক সংরক্ষণ" নীতি গ্রহণ করেন। শিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য একটী সংসদ গঠন করা হইয়াছিল—ইহার নাম "বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা সংসদ" (Board of Scientific and Industrial Research)।

দেশ স্বাধীন হইবার পর, জাতীয় সরকার শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের সুবিধার জন্য ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার 'ইনডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন' নামে একটী বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। ঐ সময়েই তাঁহারা শিল্প সম্পর্কিত তাঁহাদের নূতন কার্য্যকরী নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। শিল্প সমূহকে তিনটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া এক এক পর্য্যায়ের শিল্প সম্পর্কে এক এক পর্য্যায়ের নীতি তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন। (১) কতিপয় শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পরূপে থাকিবে, যথা-অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, আণবিক শক্তি ইত্যাদি।

(২) কতিপয় শিল্পের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ১০ বৎসরের জন্য কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে তবে নূতন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবেন কেবলমাত্র সরকার যথা, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদি। (৩) অন্য সকল সামগ্রীর ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারবারের ক্ষমতা থাকিবে তবে সরকারের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকিবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সমূহ 'পাব্লিক কর্পোরেশনের' দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(অণু-১৬) দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য কি প্রয়োজন—*Actions necessary for rapid industrialisation*

দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পের ত্রুটি ও অসুবিধাগুলি দূরীভূত করা প্রয়োজন; উপরন্তু সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পের সহায়ক কতিপয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে পুঁজির যে একান্ত অভাব তাহা নহে; আসল অভাব হইল পুঁজি সামগ্রীর। কারণ অর্থ ব্যয় করিয়াও প্রয়োজন মত পুঁজি সামগ্রী দেশের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিদেশ হইতে পুঁজি সামগ্রী আনয়নের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কারিগরী শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে টেকনিশিয়ানের একান্ত অভাব। বিদেশ হইতে টেকনিশিয়ান লইয়া আসা প্রয়োজন। উহাতে অমর্য্যাদার কিছুই নাই; জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি একাধিক দেশ বিদেশী টেক্‌নিশিয়ানের সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে।

তৃতীয়তঃ সস্তায় যন্ত্রচালন শক্তির সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন স্থানে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুখের বিষয় সরকার এবিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। বিভিন্ন উপত্যকা পরিকল্পনা গুলির (যথা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা) ইহাই হইল অন্যতম উদ্দেশ্য।

চতুর্থতঃ, কারিগরী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার করাইতে হইবে। অপটু শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু শিল্প উন্নয়নের জন্য দক্ষ শিল্প শ্রমিক প্রয়োজন কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের দক্ষতা আনয়ন করিবে।

পঞ্চমতঃ, জনসাধারণের বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক করিবার এবং উহাকে ঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন প্রয়োজন। বিশেষ ধরণের শিল্প-ব্যাঙ্ক বা বন্ধকী-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। শিল্পে ঋণ সরবরাহের জন্য ভারত সরকার 'ইনডাস্ট্রিয়েল ফিনান্স কর্পোরেশন' গঠন করিয়াছেন—বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের

পক্ষে ইহা সহায়ক হইবে বটে কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুরূপ কোন আয়োজন করা সঙ্গত হইবে।

ষষ্ঠতঃ, ব্যাপক কৃষিউন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করা হইবে কারণ শিল্পের উন্নতি বহুপরিমাণে কৃষির উন্নতির উপর নির্ভরশীল।

Questions & Hints

1. Describe four of the most important cottage industries of India and indicate the difficulties experienced by them (1941) [অনু-২; অনু-৫]

2. Estimate the possibilities of handloom industries in India (1930) [অনু-৩]

3. Indicate the importance of cottage industries in Indian rural economy. (1943) [অনু-৪]

4. Describe the utility of rural industries in India. Indicate the methods by which such industries may be fostered. (1940) [অনু ৫; অনু-৬]

5. Describe the chief manufacturing industries of India. (1944) [অনু ৭]

6. "India possesses an abundance of natural resources and a plentiful supply of cheap labour, but she lacks capital, enterprise and organisation; the defects are however remediable." Elucidate the statement. (1939) [অনু ৮; অনু ৯]

7. Do you think that nature has destined India to be an agricultural and not a manufacturing country? (1943) [অনু-১০]

8. Describe the causes of the low level of efficiency of industrial labour in India (1934). Discuss the main factors which influence the efficiency of labour in India. (1948) [অনু-১১]

9. "Unrestricted admission of foreign capital can by no means be salutary from the point of view of the interests of India". Comment on the statement. (1946) [অনু- ২]

10. State the grounds on which a policy of "discriminating protection" was recommended for India in 1922. (1947) [অনু-১৩, অনু-১৪]

11. How far is the infant industries argument for protection applicable to Indian conditions? (1941) [অনু-১৪]

অষ্টম অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা

Transport System

(অণুচ্ছেদ-১) রেলপথ *The Railways*

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের দেশে রেলপথ নির্ম্মাণ সুরু হয়। রেলপথ নির্ম্মাণের ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমকাল, ১৮৫০ হইতে ১৮৬৯ সাল, দ্বিতীয় কাল, ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯সাল, তৃতীয়কাল, ১৮৭৯ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

প্রথমকালের মধ্যে (১৮৫০-১৮৬৯ সাল) সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতে রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য সরকার ন্যূনতম সুদের হার প্রদান করিবার জন্য বিনিয়োগকারীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অর্থাৎ সরকার একটী ন্যূনতম হার উল্লেখ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে বিনিয়োগকারীগণ রেলপথের আয় হইতে ঐ হারে প্রতিদান না পাইলে সরকার নিজেরাই বাকীটা দিয়া দিবেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হইত গ্যারান্টি পদ্ধতি। এই ব্যবস্থাতে আরও বলা ছিল যে ২৫ বা ৫০ বৎসরের মতন একটী নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত হইবার পর সরকারের যে কোন রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিবে; এবং ৯৯ বৎসর পরে এই সকল রেলপথ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। কিন্তু এইরূপ গ্যারান্টি পদ্ধতিতে সরকারের ক্ষতি হইতে লাগিল।

১৮৬৯ সাল হইতে সরকার সরাসরি নিজেদের অর্থে রেলপথ নির্ম্মাণ সুরু করিলেন। বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না লওয়াই স্থির হইল। কিন্তু সরকারের অর্থাভাবের দরুণ এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল না। সেইজন্য সরকারকে পুনরায় এক নূতন গ্যারান্টি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইল।

১৮৭৯ সালে এই নূতন গ্যারান্টি পদ্ধতি কার্য্যকরী হয়। এই নূতন গ্যারান্টি-পদ্ধতি অনুযায়ী সরকার রেলপথ নির্ম্মাণে কিছু পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করেন

এবং কোম্পানীসমূহের দ্বারা নিয়োজিত পুঁজির উপরে একটা ন্যূনতম হারে সুদ প্রদানের গ্যারাণ্টি দেন। উপরন্তু এই নূতন গ্যারাণ্টি প্রথায় রেলপথগুলির স্বত্বাধিকারী হইলেন সরকার,—যদিও কোম্পানীসমূহ মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারিত।

(অনু-২) রেলপথের অর্থনৈতিক ফলাফল—*Economic effects of Railways*

রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বারা যে সকল অর্থ নৈতিক ফলাফল ঘটিয়াছে সেগুলিকে আমরা বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করিতে পারি—(১) গ্রাম্য অর্থব্যবস্থায় (২) শিল্পে (৩) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বহির্ব্বাণিজ্যে।

(১) **গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থা** (Rural economy)—আমাদের গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামের আত্ম পর্য্যাপ্ত জীবন। গ্রামগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করিত। বিভিন্ন গ্রামের পরস্পরের মধ্যে অথবা গ্রামের সহিত সহরের বিশেষ সংযোগ ছিল না। ইহার জন্য গ্রামের কৃষক ও মজুরদিগের ফসল ও পরিশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা চড়া বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব ছিল না। একই সামগ্রীর বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন দাম ছিল এবং কোনো এক গ্রামে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইলে অন্য গ্রাম হইতে খাদ্য লইয়া আসা দুরূহ ছিল। রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বারা গ্রামের আত্ম পর্য্যাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন পদ্ধতি নষ্ট হইয়া গেল; বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে এবং গ্রাম ও সহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। গ্রামের কৃষক ও মজুর তাহাদের পণ্য ও পরিশ্রম যতদূর সম্ভব সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইল; বিভিন্ন গ্রামের দ্রব্যাদির মূল্যেরও সমতা আসিল। শুধু তাহাই নহে গ্রাম্য অর্থব্যবস্থার সহিত বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার যোগ স্থাপিত হইল—কারণ গ্রামে উৎপাদিত কৃষিজ সামগ্রীর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চাহিদা সুরু হইল।

(২) **শিল্প** (Industries)—রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বারা শিল্পসমূহ প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। রেলপথ বাহিয়াই বৈদেশিক শিল্প সামগ্রীসমূহ আমাদের ঘরে ঘরে প্রসার লাভ করে এবং মিলজাত সস্তা সামগ্রীসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া প্রাচীন কুটীর শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে কিন্তু আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য বহু সুযোগ সুবিধা রেলপথগুলি প্রদান করিতে থাকে। ইহার দ্বারা বিস্তৃত পরিধির উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে; কারণ রেলপথের দ্বারা পণ্য-সামগ্রীর বৃহত্তর বাজার সৃষ্ট হয় এবং পণ্যের বাজারের বিস্তৃতির উপরে উৎপাদনের

পরিধি নির্ভর করে। রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বারা বিভিন্ন শিল্পের স্থানিকতা (Localisation of Industries) সম্ভব হইয়াছে এবং এইরূপ স্থানিকতা হইতে সকলপ্রকার সুবিধা শিল্পসমূহ ভোগ করিতে পারে। শ্রমিকদিগের স্থানান্তর গমনের সহায়তা করিয়া ইহা বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক সংগ্রহের সমস্যাকে সহজ করিয়া দিয়াছে। শিল্পগুলির পক্ষে এখন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং পণ্য সামগ্রী দূর স্থানে প্রেরণ করা সহজ হইয়াছে।

(৩) **আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্বাণিজ্য**—(Internal and Foreign Trade)

রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। এযাবৎকাল দেশের যে সকল বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল তাহাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং মাল চলাচল বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু আমাদের বিভিন্ন সামগ্রীর বিশেষ করিয়া কৃষিজাত সামগ্রীর, বৈদেশিক বাজারে চাহিদা হইতে থাকে এবং প্রভূত পরিমাণে দেশজাত সামগ্রী বাহিরে চালান হইবার জন্য রেলপথের সাহায্যে বন্দর সমূহের দিকে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। অপরদিকে বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদা দেশের মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং রেলপথের সাহায্যে বন্দর হইতে এইসকল সামগ্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো সম্ভব হইয়াছে। মোটকথা রেলপথের সাহায্যে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(অণু-৩) **রেলপথের বিস্তৃতি**—*Extent of the Railways*

ভারত বিভক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, রেলপথের মোট বিস্তৃতি ছিল ৪০,৫২৪ মাইল। দেশ বিভক্ত হইলে উহার মধ্যে ৬৬৫৯ মাইল পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত হইল এবং অবশিষ্ট ৩৩৮৬৫ মাইল রেলপথ ভারতের রহিল। রেলপথের বিস্তৃতির দিক হইতে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ।

(অণু-৪ **স্থলপথ**—*Roads*

শুধুমাত্র রেলপথ দ্বারা চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; উহার জন্য ভালো রাস্তা প্রয়োজন। ইহাতে গোশকট ও মোটরযান চলাচল করিয়া মাল চলাচল ও জনসাধারণের গমনাগমন সহজ করিয়া তুলে। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে এবং গ্রাম ও সহরের মধ্যে এই সকল পথের দ্বারা সংযোগ স্থাপিত হয় ; গ্রাম হইতে সহরে এবং সহর হইতে গ্রামে বিভিন্ন পথে মালচলাচল করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ভালো রাস্তার বিস্তৃতি প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। অবিভক্ত ভারতে মোট ২৯৬৪৩৮

মাইল রাস্তা ছিল। আমাদের দেশের পক্ষে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে অনগ্রসরতার জন্য ভালো রাস্তার স্বল্পতাই অনেকাংশে দায়ী। গ্রামের রাস্তাগুলির অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব খারাপ এবং বর্ষাকালে যানবাহন চলাচল খুবই অসুবিধাজনক হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে চারিটী দীর্ঘ ট্রাঙ্ক রোড আছে—প্রথম কলিকাতা হইতে খাইবার-পাশ পর্য্যন্ত ; ইহা বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ও পেশোয়ারের মধ্য দিয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয় কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ; তৃতীয় বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যে ; চতুর্থ কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে।

বর্ত্তমানে মোট রাস্তার দৈর্ঘের মধ্যে পাকিস্থানে ৪৯৮৬৩ মাইল অবস্থিত অবশিষ্ট দৈর্ঘ্যের পথ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

১৯২৯ সালে সরকার একটী "রাস্তা উন্নয়ন তহবিল" (Road development fund) গঠন করেন। পেট্রোলের উপর কর ধার্য্য করিয়া এই তহবিল গঠিত হয়। নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং পুরাতন রাস্তার উন্নয়নের জন্য এই অর্থ বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সমূহকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। রাস্তা নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য হইল প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত। রাস্তাগুলির কিছু পরিমাণ প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের (P. W. D.) অধীনে এবং কিছু পরিমাণ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের অধীনে। এই সকল পথে চলাচলের জন্য গোশকটই বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই মোটরযানের প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(অণু-৫) জলপথ—*Waterways*

দেশের অর্থব্যবস্থার পক্ষে জলপথের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। স্থলপথ ও রেলপথ অপেক্ষা ইহার গোটাকয়েক সুবিধা আছে। জল হইল প্রাকৃতিক সম্পদ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ খরচা নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু জলযান নির্ম্মাণ চালন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচা কম। অবশ্য কৃত্রিম খাল তৈয়ারী করা ব্যয়-সাপেক্ষ হয় বটে কিন্তু উত্তরকালে উহা বিশেষ লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। জলপথ তিন প্রকারের হয়। (১) **উপকূল পথ** (Coastal shipping)—অবিভক্ত ভারতে ৪০০০ মাইল ব্যাপী উপকূল পথ ছিল। উপকূল যাত্রীবাহী নৌচালন ভারতের উপকূলে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার সম্প্রসারণের প্রভূত অবকাশ আছে। ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারত সরকার উপকূল পথ ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষিত করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

(২) **আভ্যন্তরীণ জলপথ** (Inland waterways)—বাঙ্গালার ও আসামের যথাক্রমে হুগলী ও ব্রহ্মপুত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ জলপথ। বিহার ও বাঙ্গালার নিম্ন-প্রদেশে গঙ্গায় নৌচালন হইয়া থাকে। গোদাবরী ও কৃষ্ণার কিছু অংশ ব্যতীত দাক্ষিণাত্য ও মোটামুটিভাবে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি সহজে নৌচালনযোগ্য নহে। ৪৩০০ মাইল ব্যাপী নৌচালন যোগ্য অঞ্চলও আমাদের দেশে আছে—যথা, বাঙ্গালার গোলাকার খাল (Circular Cannals), উড়িষ্যার উপকূল খাল (Coast Cannal) ও বাকিংহাম খাল। (৩) **সমুদ্রপথ** (Ocean Shipping)—সমুদ্র পথে ভারতের স্থান অকিঞ্চিৎকর। অল্পকাল পূর্ব্বে ভারতের সমুদ্রগামী জাহাজ একেবারেই ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপেই ব্রিটিশ জাহাজের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। বর্ত্তমানের অবস্থা প্রায় অনুরূপ, তবে ভারতীয় জাহাজ নির্ম্মাণের প্রতি ক্রমশঃই মনোযোগ দেওয়া হইতেছে।

(অণু-৬) বিমান চলাচল—*Aviation*

১৯২৭ সালে ভারতের বিমাণ অবতরণ-স্থল বা এরোড্রোম নির্ম্মিত হয়, ঐ সময় হইতেই আমাদের দেশে অসামরিক ও বাণিজ্যগত বিমান চলাচল আরম্ভ হয়।

১৯২৮ সালে সরকারী সাহায্যে তুই একটী ফ্লাইং-ক্লাব স্থাপিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারত সরকার পাঁচ বৎসরের জন্য অসামরিক বিমান চলাচলের সম্প্রসারণের জন্য একটী তহবিল গঠন করেন। ইতিমধ্যে একদিকে ইংলণ্ড ও অরপদিকে করাচী, দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে ডাক চলাচল ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতে জাসাধারণের পক্ষ হইতে বিমানে যাতায়াতের চাহিদা অপ্রত্যাশিত-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর, অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাতে বহু উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের শেষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৩০টী আকাশ পথে বিমান চলাচল ব্যবস্থা চালু ছিল। যুদ্ধের সময় যে সকল ফ্লাইং ক্লাবের কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তরকালে সরকারী সাহায্যে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে।

১৯৪৫ সালের মে মাসে ভারত সরকার অসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন, "কম সংখ্যক উত্তম ও নির্ভরযোগ্য গোটাকয়েক বেসরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিমান চলাচল কার্য্যকরী করা ও উহার উন্নতিবিধান করাই সাধারণভাবে ভারত সরকারের নীতি। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব পুঁজি

থাকিবে এবং ইহারা সাধারণ বাণিজ্যগত নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবে।" একজন ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে একটী অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার দপ্তর (Civil aviation department) স্থাপিত হইয়াছে। আকাশ পথে চলাচল ব্যবস্থার লাইসেন্স্ দিবার জন্য বিমান চলাচল লাইসেন্স সংসদ (Air Transport Licensing Board) গঠিত হয়।

Questions & Hints

1. Discuss the influence of the development of the Railway System in India upon (a) rural economy of the country and (b) its foreign trade. (1935)

[অনু-২]

নবম অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

Foreign Trade

(অণুচ্ছেদ-১) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—*Chief features of the foreign trade of India*

অবিভক্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে গোটাকয়েক বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ আমাদের শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে ব্রিটিশ আমলে শিল্প সামগ্রীর রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভারত হইতে প্রভূত পরিমাণে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানী হইতে থাকে। এই সকল সামগ্রীর অনেকগুলি বিদেশীয় শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইত। অপরপক্ষে আমাদের দেশে প্রধানতঃ শিল্প সামগ্রীই আমদানী হইত। বৈদেশিক শাসক, শাসনযন্ত্রকে নানাভাবে ব্যবহার করিয়া ভারতকে কাঁচামাল রপ্তানীকারী ও শিল্প সামগ্রী আমদানীকারী দেশে পরিণত করে। অবশ্য বর্ত্তমানে, অর্থাৎ যুদ্ধজনিত অবস্থা সৃষ্টি হইবার পর এবং যুদ্ধোত্তর কালে, আমরা কিছু পরিমাণ শিল্প সামগ্রী রপ্তানী করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং খাদ্যাভাবের দরুণ বিদেশ হইতে সরকারী উদ্যোগে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ জগতের প্রায় সকল সভ্য দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকিলেও মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির সহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার যুক্তরাজ্যের সহিত (United Kingdom) অধিক পরিমাণ বাণিজ্য হয়। যুদ্ধোত্তর কালে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের যত পরিমাণ বহির্ব্বাণিজ্য হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A) সহিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক। তৃতীয়তঃ, অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের আর একটী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৬—৪৭ সালে ভারতের অনুকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ১০লক্ষ টাকার সমান। কিন্তু দেশ বিভক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি বাণিজ্য ব্যালান্স পুনরায় অনুকূল হইতে সুরু করিয়াছে। ১৯৫০ সালের মার্চ্চ

মাসে ভারত রপ্তানী করিয়াছিল ৪৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার সামগ্রী এবং আমদানী করিয়াছিল ৩২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার মতন সামগ্রী। সম্প্রতি ভারতের পার্লামেণ্টে প্রদত্ত প্রেসিডেণ্টের অভিভাষণ হইতে জানা যায় যে ১৯৫০ সালের ৩০শে জুন যে একবৎসর হয় (১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই হইতে) তাহাতে ভারতের নীট অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স হইয়াছে।

(অণু—২) অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের কারণ সমূহ—*Reasons of favourable balance of trade*)

ভারতের অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের অনেকগুলি কারণ আছে। **প্রথমতঃ**, আমাদের দেশে পুঁজির অভাবের দরুণ প্রথমদিকে শিল্পসমূহ বৈদেশিক পুঁজির সাহয্যেই স্থাপিত হয়। উপরন্ত ভারত সরকারের আয় হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ না হইবার দরুণ সরকারকে বহু কোটি টাকা বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল ঋণের জন্য ভারতকে প্রতিবৎসর বহু টাকা সুদ বাবদ বিদেশে প্রেরণ করিতে হইত। বিদেশী পুঁজির সাহায্যে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান চালিত হইত তাহাদের মুনফা বাবদ বহু টাকা বিদেশে প্রেরিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, ভারতের নিজস্ব জাহাজ নাই; অথচ প্রতিবৎসর বহু কোটি টাকার মাল জাহাজে করিয়া বিদেশে পাঠানো হইয়া থাকে। এই সকল মাল পাঠানো হয় বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে। অতএব বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ প্রতিবৎসর বহুটাকা পাঠাইয়া থাকেন। **তৃতীয়তঃ**, আমরা প্রতিবৎসর ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক এবং ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির নিকট বহুবিধ কার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এই কার্য্যের মূল্য প্রদান করিতে বহুটাকা বিদেশে পাঠাইতে হয়। **চতুর্থতঃ**, ভারত সরকারকে প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে অনেক টাকা পাঠাইতে হইত। যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী ভারতে চাকুরী করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতেন ভারত সরকারকে প্রতিবৎসর তাঁহাদের পেনসন বাবদ টাকা পাঠাইতে হইত। ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারত সচিবের অফিস খরচা ভারত সরকারকে পাঠাইতে হইত। সরকারী কার্য্যে ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার ইংলণ্ড হইতে বহু সামগ্রী ও সরঞ্জাম ক্রয় করিতেন এবং উহার দরুণ ভারত সরকার মূল্য পাঠাইতেন। ভারত সরকারের দ্বারা সরাসরিভাবে ইংলণ্ডে প্রেরিত এই সকল খরচাকে একত্রিতভাবে স্বরাষ্ট্র খরচ (Home Charges) বলা হইত। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ভারত সরকারের এই ঋণভার মিটাইবার জন্য যতপরিমাণ মূল্যের সামগ্রী আমদানী করা হইত

তাহার অধিক পরিমাণ মূল্যের সামগ্রী ভারতকে রপ্তানী করিতে হইত। অর্থাৎ হিসাব ব্যালান্সের (Balance of Account) ভারসাম্যের জন্যই ভারত অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স (Favourable Balance of trade) সৃষ্টি করিতে বাধ্য থাকিত।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বাঁটোয়ারা—*Distributon of India's foreign trade*

এক্ষণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১) **দেশ অনুযায়ী বণ্টন**—

যুক্তরাজ্য (*U. K*)—ইংলণ্ড আমাদের দেশে যন্ত্রপাতি, মিল সরঞ্জাম, ঔষধ, কাগজ ও পিস্‌বোর্ড, রবার সামগ্রী, সিগারেট ও তামাক, লৌহাদি নির্ম্মিত দ্রব্য (hardware) ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে। ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হয় কাঁচা পাট এবং পাট সামগ্রী, কাঁচা তুলা, চামড়া, চা, পশম সামগ্রী কফি, লাক্ষা, তামাক, কাঁচা রবার, কয়েক প্রকার তৈলবীজ ইত্যাদি। ১৯৪৬ সালে প্রায় সাত কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মাল ভারত হইতে যুক্তরাজ্যে রপ্তানী করা হইয়াছিল এবং ৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মাল যুক্তরাজ্য হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—(*U. S. A*)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা আমদানী করিয়া থাকি কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, চর্ম্মপ্রস্তুতকারী কষ, কাগজ, পিস্‌বোর্ড, কাঁচাতুলা, তৈল, তাম্র, লোহ নির্ম্মিত দ্রব্য, রবার সামগ্রী ইত্যাদি। ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া থাকে—চট, চামড়া, কাঁচাতূলা, কাঁচা পশম এবং পশম সামগ্রী, চা, লাক্ষা ইত্যাদি। ১৯৪৬ সালে ভারত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হইতে ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকার মতন মাল আমদানী এবং ঐ দেশে ৭২ কোটি টাকার মতন মাল রপ্তানী করিয়াছিল।

বর্ম্মা (*Burma*)—স্বাভাবিক সময়ে বর্ম্মার সহিত ভারতের প্রভূত পরিমাণ বাণিজ্য হইত। বর্ম্মা হইতে ভারত—চাউল, তৈল, শালকাঠ ইত্যাদি আমদানী করে এবং ভারত বর্ম্মায় রপ্তানী করে চা, চিনি, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, সূতীবস্ত্র ও পাট সামগ্রী।

জাপান (*Japan*)—স্বাভাবিক অবস্থায় জাপানের সহিত ভারতের বিশেষ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। জাপানের নিকট হইতে ভারত সূতীবস্ত্র, সিল্কবস্ত্র, রবার সামগ্রী, কাগজ, পিস্‌বোর্ড, খেলনা ইত্যাদি আমদানী করিত এবং জাপানে রপ্তানী

করিত কাঁচা পাট ও পাট সামগ্রী, কাঁচা তূলা, অভ্র, লাক্ষা, চামড়া, অবিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড (pig iron) ইত্যাদি।

জার্ম্মাণী (*Germany*)—যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর সহিত অনেক দ্রব্যে ভারতের বাণিজ্য ছিল। জার্ম্মাণীতে ভারত কাঁচা পাট, কাঁচা তূলা, বাদাম, চামড়া, 'তিসি, লাক্ষা, চা ইত্যাদি রপ্তানী করিত এবং জার্ম্মাণী হইতে আমদানী করিত ঔষধ, লৌহ-, নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাঁচ সামগ্রী, ছুরি, কাঁচি, কলকব্জা ইত্যাদি।

ফ্রান্স (*France*)—আমাদের দেশ হইতে ফ্রান্সে তূলা, পাট, বাদাম, চামড়া, কফি, লাক্ষা, ডাইল ইত্যাদি রপ্তানী করা হয় এবং ঐ স্থান হইতে আমাদের দেশে আমদানী করা হয় মদ, কলকব্জা, চর্ম্মপ্রস্তুতকারী কষ, তূলা সামগ্রী, পশম সামগ্রী, সিল্ক সামগ্রী, প্রসাধন সামগ্রী, ইত্যাদি।

ইহা ভিন্ন রাশিয়া, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, ইরাণ, সিংহল, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্য, মিশর—ইত্যাদি দেশ সমূহের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য হইয়া থাকে।

(২) সামগ্রী অনুযায়ী বণ্টন—

রপ্তানী—অবিভক্ত ভারতের রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মোট মূল্যের মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগ ছিল রপ্তানীকৃত পাটের মূল্য। কাঁচা পাট, থলে ও চট বিদেশে রপ্তানী হইত। পাট ও পাট সামগ্রীগুলি ক্রয় করিত যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, বর্ম্মা, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মাণী, জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটী রাষ্ট্র। বহু পরিমাণ তূলাও রপ্তানী হইত। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন, ইত্যাদি দেশে তূলা রপ্তানী হইত।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান আমাদের অন্যতম তূলার ক্রেতা ছিল। বর্ম্মা, মিশর, সিংহল ইত্যাদি স্থানে সূতী বস্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হয়। মোট রপ্তানীর সর্ব্ববৃহৎ অংশ যায় যুক্তরাজ্যে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইরাণ, প্রভৃতি স্থানেও চা রপ্তানী হয়। পশুচর্ম্মও রপ্তানী হয়, কাঁচা অবস্থায় এবং পরিশুদ্ধ অবস্থায়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানে উহা রপ্তানী হয়। সম্প্রতি চামড়ায় প্রস্তুত সামগ্রীও রপ্তানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ রপ্তানী হইয়া থাকে। সিংহল, আরব, ইরাণ, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শস্য রপ্তানী হইয়া থাকে—যথা: চাউল, গম, ডাল, বালি ইত্যাদি।

আমদানী—ভারত বিদেশ হইতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানী করিয়া থাকে। ইহা মিশর পূর্ব্ব আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে। তূলা সামগ্রীও আমদানী করা হয়, ইংলণ্ড, জাপান, চীন, হল্যাণ্ড,

বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে। ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে পশম ও পশম সামগ্রী আমদানী হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আমদানী করা হয়। এইগুলি জার্ম্মাণী, আমেরিকা, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড হইতে আনা হয়। প্রায় দুই কোটি টাকার মতন লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যও আমদানী করা হয়—ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে। ঐ দেশগুলি হইতে বিভিন্নপ্রকার ঔষধাদিও আমদানী করা হয়। কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, প্রভৃতি দেশ হইতে কাগজ ও পিস্‌বোর্ড আমদানী করা হয়। বর্ত্তমানে খাদ্য দ্রব্যের অভাবের দরুণ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, ও আমেরিকা হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়।

Questions & Hints

1. Discuss the chief features of India's foreign trade. (1934)

[অনু-১]

2. Explain why India has normally a fovourable balance of trade (1948)

[অনু-২]

3. Give some idea of the distribution of India's foreign trade (a) by principal countries and (b) principal commodities. (1935) Give an account of India's foreign trade. (1940)

[অনু-৩]

দশম অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও মুদ্রাপ্রচলন

Banking and Currency

(অণুচ্ছেদ-১) প্রধান ধরণের ব্যাঙ্কসমূহ—*Principal types of Banks*

(১) দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ী—*Indigenous Banks*

বহুকাল হইতেই ভারতের গ্রামে গ্রামে এদেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা কারবার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগকে সাহুকার, মহাজন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের কারবার পরিচালনার পদ্ধতি আধুনিক পাশ্চাত্য ধরণের সংগঠিত ব্যাঙ্কগুলির পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। এই কারবারগুলি এক একজন ব্যক্তির স্বত্ত্বাধিকারে—যৌথ পুঁজি কারবার নহে। খুব জোর সহ মালিকানার ভিত্তিতে এই কারবার গঠিত হয়। ইঁহারা গ্রামে বা সহরে আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকেন; কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা গচ্ছিতও লন। ইঁহারা হুণ্ডি কাটেন ও হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া থাকেন। ইঁহাদের কারবারে চেক্ ব্যবহারের পদ্ধতি নাই, ইঁহাদের ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে অনুষ্ঠান নিষ্ঠা (formality) কম। তবে ইঁহারা যে হারে সুদ দাবী করিয়া থাকেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই অত্যধিক। গ্রাম ও সহরের ছোটোখাটো ব্যবসা বাণিজ্যে ইঁহারা ঋণ দিয়া সহায়তা করিয়া থাকেন।

(২) যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্ক—*Joint stock Banks*

ভারতীয় কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলি হইল যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্ক। ইহারা জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে, হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দেয়, বিভিন্ন প্রকার জামিন লইয়া দাদন দিয়া থাকে, শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করে। ইহারা স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে এবং উহার দ্বারা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে যতটা সহায়তা করা যায় তাহা করিয়া থাকে। কৃষকদিগকে ইহারা সাহায্য করে না বলিলেই চলে। ধনী জমিদার ও আবাদকারীদিগকে (planters) কখনো কখনো এই ব্যাঙ্কগুলি সাহায্য করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্ক-গুলির মধ্যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি চার পাচটি ব্যাঙ্ক প্রসিদ্ধ। ইহাদের কারবারের পদ্ধতি পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে পরিচালিত। যুদ্ধোত্তর কালে যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে

বিশেষ সঙ্কট সময় উপস্থিত হইয়াছিল ; অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বহু ব্যাঙ্ক ফেল করিয়া যায়।

(৩) **ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক**—*Imperial Bank*

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক একটী যৌথ পুঁজির কারবার; কিন্তু তবু ইহা একটী বিশেষ ধরণের ব্যাঙ্ক। ১৯২১ সালে বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, ও বোম্বাইয়ের তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের সমন্বয়ের দ্বারা এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হইবার পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্ক ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের বহু প্রকার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্য করিত। বিশেষ আইন দ্বারা ইহার কার্য্য-বিধি নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং ইহার কার্য্যের উপর অনেক বিধি-নিষেধ ছিল। ইহার পরিচালক সংসদের মধ্যে সরকারের দ্বারা মনোনীত সদস্য থাকিতেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ইহা আর সরকারের ব্যাঙ্ক রহিল না এবং ইহার কার্য্যের উপর অনেক বাধা নিষেধ সরাইয়া লওয়া হইল। কিন্তু ব্যবস্থা থাকিল যে, যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেই সকল স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা থাকিলে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট হিসাবে কার্য্য করিবে।

(৪) **বিনিময় ব্যাঙ্ক**—*Exchange Banks*

ইহাদের প্রধান কার্য্য হইল বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে ঋণদান করিয়া ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য পুষ্ট করা। ইহারা বিদেশী মুদ্রায় বিল ক্রয় করে, জাহাজী বিল এবং অন্যান্য দলিলের উপরে ঋণদান করে। বৈদেশিক হুণ্ডি হইল এইরূপ দলিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহারা টাকা ধার দিয়া থাকে তবে ইহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে বন্দরে রপ্তানীযোগ্য মালচালান দিবার জন্য অথবা আমদানীকৃত মাল বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাইবার জন্য। ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, গ্রিন্ডলে এণ্ড কোং, হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রভৃতি ব্যাঙ্ক সমূহ বিখ্যাত বিনিময় ব্যাঙ্ক। বিদেশীগণই এই সকল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী এবং তাহাদের দ্বারাই এইগুলি পরিচালিত।

(৫) **পোষ্টঅফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক** *Post-office Savings Banks*

অল্প সঞ্চয়ীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অর্থাৎ অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে সঞ্চয় করিতে প্রণোদিত হয় তাহার জন্য সরকার পোষ্টঅফিস সমূহে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপনা করিয়াছেন। ইহাতে অল্প পরিমাণ করিয়া টাকা জমা রাখা যায়

কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক কেহ একজনের নামে জমা রাখিতে পারে না। সরকার ইহার সুদ দিয়া থাকেন তবে সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় জনসাধারণকে ইহা হইতে ঋণদান করা হয় না।

(৬) **সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ**—*(Co-operative Banks)*—(৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(৭) **জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক**—*Land Mortgage Banks*

সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি অধিক কালের জন্য টাকা দিতে পারে না। তাহারা কম সময়ের জন্য অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদী, ঋণদান করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষকদের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যে কার্য্যের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হয় সেই কার্য্যগুলি এমন ধরণের যে সেই উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ অল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব নহে। এই কার্য্যগুলি হইল, জমির স্থায়ী উন্নতি বিধান করা অথবা নূতন জমি ক্রয় অথবা পুরাতন দেনা পরিশোধ। দেনাদার তাহার জমি এই ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিবে এবং সহজ কিস্তিবন্দীতে সে এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া পুঁজি সংগ্রহ করে। সমবায়ের ভিত্তিতে প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলি গঠিত হইয়াছে। কোনো একটী স্থানের কৃষকগণ সম্মিলিতভাবে একটী বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করিতে পারে এবং তাহারা নিজেরাই চাঁদা করিয়া পুঁজি তহবিল গঠন করিতে পারে। উহারা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে। কেন্দ্রীয় জমিবন্ধক ব্যাঙ্কগুলি মিশ্র পদ্ধতিতে গঠিত। অর্থাৎ প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ইহার অংশ ক্রয় করিতে পারে আবার সাধারণ ব্যক্তিও ইহার অংশীদার হইতে পারে।

সমবায় আন্দোলনের আনুসঙ্গিক হিসাবে, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও আসামে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

(৮) **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক**—*Reserve Bank*

১৯৩৪ সালের ভারতীয় রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব পূরণের জন্য ভারতে একটী রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৩৫ সাল হইতে ইহা কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। পাঁচ কোটি টাকা ইহার অংশ পুঁজি (Share Capital) এবং একটী অংশের মূল্য ১০০৲ টাকা। ইহার পরিচালনার জন্য ১৬ জন সদস্য লইয়া একটী কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ (Central Board of Directors) গঠিত ছিল। ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ছিলেন সরকারের দ্বারা মনোনীত এবং অর্দ্ধেক ছিলেন অংশীদারগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত। ইহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে একজন গভর্ণর থাকিতেন। এই কেন্দ্রীয় সংসদ ব্যতীত ব্যাঙ্কের ক্রিয়া-পরিসরকে চারিটী অঞ্চলে

বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অঞ্চলে একটী করিয়া স্থানীয় সংসদ গঠিত ছিল। কেন্দ্রীয় সংসদ যে কার্য্য তাহাদিগকে দিত স্থানীয় সংসদগুলি নিজ নিজ এলাকায় সেই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিত। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ্ ব্যাঙ্কের এইরূপ গঠন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ঐ তারিখ হইতে রিজার্ভ্ ব্যাঙ্কের জাতীয়-করণ (Nationalisation) হইয়াছে; ইহা অংশীদারদিগের ব্যাঙ্ক হইতে এক্ষণে সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। সরকার অংশীদারদিগের অংশপত্রগুলি কিনিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে কেন্দ্রীয় সংসদে আছেন একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর, একজন সরকারী দপ্তরের কর্ম্মচারী এবং দশজন পরিচালক,—ইহারা সকলেই সরকারের দ্বারা নিযুক্ত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী :—

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা প্রচলনের জন্য দায়ী। সরকারের মুদ্রা প্রচলন বিভাগের সকল সম্পত্তি (assets), এই ব্যাঙ্কের মুদ্রা প্রচার বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ১ টাকা এবং উহার ভগ্নাংশ মুদ্রা ব্যতীত অন্য (কাগজী) মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। অবশ্য সরকারের দ্বারা প্রণীত আইনের দ্বারা রিজার্ভ্ ব্যাঙ্কের নোট প্রচার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত।

(২) ইহা ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করে। শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Banks) গুলি তাহাদের আমানতের একটী নির্দ্ধারিত অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখে; পরিবর্ত্তে প্রয়োজনের সময়ে এই ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাহায্য করিতে পারে। যে সকল ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত তহবিল (Reserve) এবং আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital) মিলিয়া ৫ লক্ষ টাকার সমান, সেইগুলি শিডিউল-ভুক্ত হইতে পারে।

(৩) ইহা সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবেও কার্য্য করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহ তাহাদের অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে।

(৪) ইহা ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

(৫) টাকার পরিবর্ত্তে ষ্টার্লিং ক্রয় বিক্রয়ও এই ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে।

(৬) ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী এ্যাক্টের দ্বারা দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করিবার ব্যাপক ক্ষমতা রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ককে প্রদান করা হইয়াছে।

(৭) কৃষিগত ঋণ বিভাগ নামে ইহার একটী বিভাগ আছে। কৃষিগত

ঋণ সম্পর্কে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করা এবং ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা এই বিভাগের কার্য্য।

অণু (২) মুদ্রা প্রচলন—*Currency*

রৌপ্য নির্ম্মিত টাকা হইল আমাদের দেশের প্রমাণ মুদ্রা (Standard money)। কেবল মাত্র সরকার কর্ত্তৃক এই মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ওজনে একটী টাকা ১৮০ গ্রেণের সমান, পূর্ব্বে ইহার মধ্যে ২০ গ্রেণ থাকিত খাদ এবং অবশিষ্ট থাকিত রূপা। যুদ্ধ জনিত অবস্থার দরুণ বর্ত্তমানে প্রতি টাকায় ৯০ গ্রেণ রূপা থাকে অবশিষ্ট থাকে খাদ। যুদ্ধের মধ্যে সরকার একটাকার কাগজী মুদ্রাও প্রচলন করিয়াছেন। এইগুলি রৌপ্য মুদ্রার সহিত সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন। সরকার বিভিন্ন খাতের অল্পমূল্য-বিশিষ্ট ধাতু মুদ্রাও প্রচলন করেন যথা—আট-আনি, চার-আনি, দুই পয়সা, এক পয়সা ইত্যাদি।

বিভিন্ন খাতের বহু পরিমাণ কাগজী মুদ্রাও প্রচলিত আছে। কাগজীমুদ্রা সমূহ বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচার করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক এইগুলি গ্যারাণ্টি প্রদত্ত এবং একটাকায় পরিবর্ত্তনীয়। ২৲, ৫৲, ১০৲, ও ১০০৲ টাকার নোট আছে। পূর্ব্বে উহা অপেক্ষা অধিক টাকার নোট ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সেগুলি প্রচলিত নাই। এই সকল নোটের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত তহবিল রাখিতে হয়। এই সংরক্ষিত তহবিলের শতকরা ৪০ ভাগ থাকে স্বর্ণ অথবা ষ্টার্লিং; অবশিষ্ট অংশ থাকে টাকা-রূপ ধাতু মুদ্রায় ভারত সরকারের শিকিউরিটিতে।

Questions & Hints

1. Describe the main types of banks in India. Indicate also their functions.
[অণু-১]

2. State the functions of the Reserve Bank of India (1948)
[অণু-১ এর (৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী]

একাদশ অধ্যায়

বণ্টন

Distribution

(অণুচ্ছেদ-১) খাজনা—*Rent*

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ 'রিকার্ডো' বলিয়াছিলেন যে জমির ব্যবহারকারীগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা, উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্য হইতে খরচ খরচা বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা জমির মালিককে প্রদান করিতে বাধ্য হয়। এই উদ্বৃত্তের নাম হইল খাজনা। 'রিকার্ডোর' মতে খাজনার পরিমাণ নির্দ্ধারণে প্রতি-যোগিতা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল।

আমাদের দেশেও কৃষিভূমির খাজনা নির্দ্ধারণে প্রতিযোগিতা কার্য্যকরী হইয়া থাকে। মোট জন সংখ্যার অধিকাংশই আমাদের দেশে কৃষিজীবী। দেশের প্রাচীন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে অন্য কোনো পেশার অভাবে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় লোকে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। উপরন্তু লোকসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে জমির যেরূপ চাহিদা ছিল তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্দ্ধিত চাহিদার প্রতিক্রিয়া খাজনার উপরে ফলিত হইতে দেখা যায়। কারণ ইহাতে জমির জন্য প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয় ও খাজনা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতার দ্বারা যেরূপ উচ্চ হারে খাজনা নির্দ্ধারিত হইবার কথা উহা সেইরূপ উচ্চ হারে নির্দ্ধারিত হয় না দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ হইল প্রাচীন দেশ হিসাবে আমাদের সামাজিক জীবনে যেরূপ বহু প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে সেইরূপ অর্থনৈতিক জীবনেও অনেকগুলি প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা স্বভাবতঃই একটু অধিক মাত্রায় প্রথা নৈষ্ঠিক। সেইজন্য জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রথা মাফিক যেরূপ খাজনা নির্দ্দিষ্ট থাকে, জমিদারগণ বহুক্ষেত্রে ঐরূপ খাজনা লইয়া সন্তুষ্ট হন অথবা লইতে বাধ্য হন।

একসময় আসিয়াছিল যখন প্রথা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না এবং জমির চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে ইহা বিশেষ অসুবিধাজনক ও কষ্টকর হওয়ায়,

সরকার খাজনা আইন ও ভূমিস্বত্ব আইন প্রণয়ন করিয়া খাজনার পরিমাণ এবং প্রজাগণের অধিকার নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

অতএব আমাদের দেশে খাজনা নির্দ্ধারণে তিনটী বিষয় কার্য্য করিয়া থাকে—প্রতিযোগিতা, প্রথা ও আইন।

(অণু-২) সুদ—*Interest*

জনসাধারণের আয় অল্প এবং ব্যয় অধিক হওয়ার দরুণ তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অল্প; আবার যাহা সঞ্চিত হয় তাহাও সম্পূর্ণ পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয় না। সেইজন্য আমাদের দেশে পুঁজির পরিমাণ কম। অপর পক্ষে কৃষিকার্য্যের জন্য ও শিল্পের জন্য পুঁজির যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় সুদের হার আমাদের দেশে কিঞ্চিৎ অধিকই বলা চলে।

শুধু তাহাই নহে, সুদের হার সকল ক্ষেত্রে সমানও নহে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদের হার কম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদের হার বেশী। যথা—কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা দুইটাকা বা তিনটাকা হারে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন; অপর পক্ষে গ্রামের একজন চাষী শতকরা ২৫।৩০ টাকায় এমন কি তাহার উর্দ্ধেও ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সমবায় সমিতির সদস্যগণ শতকরা ৯।১০ টাকা হারে কর্জ্জ পায়।

সরকার যে ঋণ গ্রহণ করেন তাহার জন্য ঋণদাতার ঝুঁকি খুবই কম। সরকার তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করিবেন এবং প্রতিশ্রুত সুদ ঠিক নিয়মিতভাবে প্রদান করিয়া যাইবেন। ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা খুবই কম। তদুপরি ঋণদাতার পক্ষে হিসাব-নিকাশ করার ঝঞ্ঝাট বহন করিতে হয় না—ঐ কাজ সরকার করিয়া থাকেন। প্রাপক সরকারকে ঋণের পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে এবং উহার জন্য কোনোই ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয় না। এই সকল কারণে যাহাদের কর্জ্জ দিবার মত অর্থ আছে তাহারা অনেকেই সরকারকে ঋণ দিবার জন্য ইচ্ছুক থাকে। এক্ষেত্রে পুঁজির সরবরাহ যথেষ্ট হওয়ায় সুদের হার অল্প।

গ্রামের কৃষক মহাজনের নিকট হইতে যখন কর্জ্জ করে তাহাকে তখন অত্যধিক চড়া হারে সুদ দিতে হয়। ইহার কারণ হইল এই যে, দরিদ্র কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। বন্ধক রাখিবার মতন তাহার কিছুই মূল্যবান সম্পত্তি নাই। অপর পক্ষে এইরূপ লোককে টাকা ধার দিলে বিশেষ ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে, কারণ ইহারা নিরক্ষর এবং অজ্ঞ। ইহাদের

পক্ষ হইতে সকল হিসাব মহাজনকেই রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে ইহাদিগকে হিসাব বুঝাইতে হইবে। অর্থ আদায়ের জন্যও বহুবার তাগিদ দিতে হইবে। এই সকল কারণে গ্রামাঞ্চলে মহাজনগণ যে ঋণদান করে উহার দরুণ দেয় সুদের হার খুবই অধিক।

এইরূপ চড়া সুদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাধারণ ব্যক্তিগণ সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করে। ইহাতে সুদের হার মহাজনকে প্রদেয় সুদের তুলনায় কম হয়; কারণ একের অধিক ব্যক্তির সমবেত প্রচেষ্টার উপর জনসাধারণের অধিক আস্থা হয়। উহাতে সাধারণের বাজার সম্ভ্রম (Credit) বৃদ্ধি পায়। সমবায় সমিতিগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে উহার সদস্যগণের মধ্যে ঋণ বণ্টন করিতে পারে। তবে এই সুদ সরকারের দ্বারা গৃহীত ঋণের সুদের ন্যায় অল্প নহে। কারণ সমবায় সমিতির বাজার-সম্ভ্রম সরকারের অপেক্ষা কম; যৌথ প্রচেষ্টা-মূলক হইলেও সমবায় সমিতিগুলি সাধারণ অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিদিগের দ্বারাই গঠিত এবং সেইহেতু ইহাদের কার্য্যে অসাফল্য একেবারে অসম্ভব নহে। সেই কারণে সমবায় সমিতির উপর সাধারণের ঠিক ততখানি আস্থা থাকে না, যতখানি আস্থা থাকে সরকারের উপর।

(অণু-৩) মুনাফা—*Profits*

উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিবার জন্য বহুলাংশে দায়ী। কৃষিতে অথবা শিল্পে সামগ্রী বিক্রয় হইতে অধিক মুনাফা পাইলে উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে প্রণোদিত হয়, অপর পক্ষে মুনাফা কম হইলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে উৎপাদনকারী বাধ্য হয়।

মুদ্রার হিসাবে দেখিতে গেলে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উৎপাদনে মুনাফা ১৯৩৯-৪০ সালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে কম নহে এবং ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে যে কোন সময় অপেক্ষা বর্ত্তমানে মুনাফা অধিক। কিন্তু সামগ্রীর হিসাবে (অর্থাৎ মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হিসাবে) দেখিলে ১৯৩৯ সালে যেরূপ মুনাফা ছিল বর্ত্তমানের মুনাফা তাহা অপেক্ষা কম। বেশীর ভাগ কোম্পানীর পক্ষে তাহাদের উপস্থিত ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড (Depreciation Fund) হইতে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(অনু-৪) মজুরী—*Wages*

কৃষি শ্রমিকই সর্ব্বাপেক্ষা কম মজুরী পাইয়া থাকে। ইহার কারণ একদিকে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরদিকে কৃষি-শ্রমিকদিগের মধ্যে

সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব। তবে "১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরী বিধি" যে সকল ক্ষেত্রে মজুরীর সর্ব্বনিম্ন হার বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার মধ্যে কৃষিকার্য্যকেও অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে।

কৃষি-শ্রমিক অপেক্ষা শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা কিছুটা উন্নত। শিল্পে মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত অধিক। তবে একদিকে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যেমন মজুরীর হারের পার্থক্য আছে, সেইরূপ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মজুরীর হার দেখিতে পাওয়া যায়।

Questions & Hints

1. "Rent of agricultural land in India depends on the inter-action of three forces,—Custom, Competition and Legislation." Explain the statement. (1943) [অনু-১]

2. Why does the Government of India borrow at cheaper rates than the Indian peasants in the villages? (1942) [অনু-২]

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

Public Finance

(অণুচ্ছেদ-১) কেন্দ্রীয় সরকারের আয়—*Revenues of the Central Government*

(১) বহির্ব্বাণিজ্য শুল্ক (Customs)—একসময় ছিল যখন মোট আদায়ের পরিমাণের দিক হইতে বহির্ব্বাণিজ্য শুল্কের দ্বারা লব্ধ রাজস্বই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৩৮-৩৯এর রাজস্ব বৎসরে ৪০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এই শুল্ক হইতে আদায় হইয়াছিল। অন্য কোনো একটী খাতে উহার সমান রাজস্ব আদায় হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে মোট পরিমাণের দিক হইতে বহির্ব্বাণিজ্য শুল্কের আদায় বাড়িয়াছিল বটে কিন্তু আয়কর লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ উহা অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশের বাহিরে রপ্তানীকৃত এবং দেশের মধ্যে আমদানীকৃত সামগ্রীর উপরে এই শুল্ক আদায় হয়; তবে সকল প্রকার সামগ্রীর উপরে একই হারে শুল্ক আদায় হয় না।

(২) আয়কর (Income Tax)—জনসাধারণের আয়ের উপর কর ধার্য্য করিয়া রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। অবশ্য প্রত্যেক উপার্জ্জনকারীকেই আয় কর দিতে হয় না—কেবলমাত্র যাহাদের আয় একটী নির্দ্ধারিত পরিমাণের সমান বা অধিক তাহাদের নিকট হইতে এই কর গ্রহণ করা হয়। ইহা ক্রমবর্দ্ধমান হারে ধার্য্য করা হয়। আয়কর লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে ১০৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার মতন রাজস্ব আয়করের খাতে অনুমিত হইয়াছিল। সকল বিষয়গুলির মধ্যে ইহাই ছিল সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব।

(৩) কর্পোরেশন কর (Corporation Tax)—ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের উপর এই কর ধার্য্য করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে এই বাবদ রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি টাকার উপর।

(৪) পুঁজিলাভ কর (Capital Gains Tax)—যাহারা মুদ্রাস্ফীতির দরুণ সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা অত্যধিক হারে অনর্জ্জিত লাভ করিয়া থাকে তাহাদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় করা হয়।

(৫) বাড়তি মুনাফা কর ও কারবারী মুনাফা কর (Excess Profits

Tax and Business Profits Tax)—যুদ্ধের সময়ে চড়া দামে মাল বিক্রয় করিয়া যাহারা স্বাভাবিক মুনাফার উপরেও অতিরিক্ত লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বাড়তি মুনাফার উপরে সরকার কর ধার্য্য করেন। যুদ্ধের পর ঐ কর উঠাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সালে কারবারী মুনাফা কর বসানো হয়।

(৬) **আবগারী শুল্ক** (Excise duties)—দেশের মধ্যে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত কয়েক প্রকার সামগ্রীর উপরে (যথা—দিয়াশলাই, শর্করা, কেরোসীন তৈল ইত্যাদি)—আবগারী শুল্ক বসানো হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে আবগারী শুল্ক হইতে প্রায় ৪১ কোটি টাকার রাজস্ব অনুমিত হইয়াছিল।

(৭) **লবণকর** (Salt tax)—ভারতবর্ষের মধ্যে উৎপাদিত এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত লবণের উপর কর ধার্য্য করা হইত। বৎসরে ইহা হইতে প্রায় ৮ কোটি টাকার উপরে রাজস্ব আদায় হইত। দরিদ্র ব্যক্তির অবশ্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপরে এই কর ধার্য্য হইত বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রবল বিক্ষোভ ছিল। স্বাধীন ভারতে এই কর উঠাইয়া দেওয়া হয়।

(৮) **রেলপথ** (Railways)—রেলপথের অধিকাংশই সরকারের মালিকানায়। রেলপথের আয় হইতে একটী অংশ সরকারের সাধারণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে রেলপথ হইতে ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে প্রাপ্য রাজস্ব ধরা হয় ৭½ কোটি টাকা।

(৯) **ডাক ও তার বিভাগ** (Post and Telegraphs)—ডাক ও তার বিভাগ হইতে সরকারের আয় হইয়া থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪ কোটি টাকার উপর আয় এই খাতে অনুমিত হয়।

(১০) **ধাতু মুদ্রা নির্ম্মাণ ও মুদ্রা প্রচলন** (Coinage and Currency)

সরকার যে টাকা তৈয়ারী করেন উহা হইতে তাঁহারা লাভ পাইয়া থাকেন। মুদ্রা প্রচলনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে মুনাফা পায় তাহার কিছু অংশ ভারত সরকার পাইয়া থাকেন। এই খাতে সরকারের আয় হয় ১৫ কোটী টাকার মতন।

রাজস্বের এই বিভিন্ন দফাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহাদের গোটাকয়েক বিষয় কর-পর্য্যায়-ভুক্ত রাজস্ব (Tax revenue)—অর্থাৎ এই অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হইয়া থাকে, যথা—আয়কর। অপর পক্ষে গোটাকয়েক বিষয় আছে যেগুলি জনসাধারণ প্রদান করিতে বাধ্য নহে, বাধ্যতা মূলক ভাবে অর্থাৎ কর হিসাবে যেগুলি আদায় করা হয় না—যথা রেলপথ হইতে আয়। এইগুলি হইল কর নিরপেক্ষ রাজস্ব (Non tax revenue)

উপরে রাজস্বের যে সকল দফা বর্ণিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বহির্বাণিজ্য শুল্ক, কর্পোরেশন কর, পুঁজিলাভ কর, বাড়তি মুনাফাকর ও কারবারী মুনাফা কর, আবগারী শুল্ক—এইগুলি হইল কর-পর্য্যায়-ভূক্ত রাজস্ব; এবং রেলপথের, ডাক ও তার বিভাগের এবং ধাতু মুদ্রা নির্ম্মাণ ও মুদ্রাপ্রচলনের আয়,—এইগুলি হইল কর নিরপেক্ষ রাজস্ব। সেইজন্য বলা হয় ভারত সরকারের মোট রাজস্ব দুইভাগে ভাগ করা চলে—করলব্ধ রাজস্ব এবং করনিরপেক্ষ রাজস্ব।

(অণু-২) **কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের দফা**—*Items of expenditure of the Central Government*)—কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল দফায় ব্যয় করিয়া থাকেন সেগুলি হইল এইরূপ—(১) **দেশরক্ষা ব্যবস্থা** (Defence)—দেশরক্ষা ব্যবস্থার দরুণ ভারত সবকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। শুধু যুদ্ধের সময়েই নহে শান্তির সময়েও এই বাবদ ব্যয় অত্যধিক। ইহার মূল কারণ ছিল ইউরোপীয় অফিসার এবং সৈন্য ভারতীয় বাহিনীতে নিযুক্ত থাকায়, উহাদের বেতন ও ভাতা বাবদ বহু টাকা দিতে হইত।

(২) **অসামরিক বিভাগ সমূহ** (Civil Departments)—শাসনকার্য্য পরিচালনাব জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল অসামরিক বিভাগ আছে—যথা ডাক ও তার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, সরবরাহ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ ইত্যাদি—উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সবকারকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

(৩) **রাজস্ব আদায়ের জন্য খরচ** (Cost of Collecting revenue)—রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় এবং অফিস রক্ষা করিতে হয়। উহার দরুণ প্রায় তিন কোটি টাকা সরকারকে ব্যয় করিতে হয়।

(৪) **অসামরিক নির্ম্মাণ কার্য্য** (Civil works)—সরকারী গৃহাদি নির্ম্মাণ ও মেরামতীর জন্য প্রতিবৎসর কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক ব্যয় করিতে হয়।

(৫) **সরকারী ঋণ** (Public Debt)—আবশ্যক হইলে সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহার দরুণ প্রতি বৎসর তাঁহাদিগকে বহু টাকা সুদ হিসাবে প্রদান করিতে হয়।

(৬) **প্রদেশগুলিকে সাহায্য** (Subvention to provinces)—বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলিকে তাঁহাদের রাজস্ব প্রদেশের মধ্যে ব্যয় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবৎসর কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়া থাকেন।

(অণু-৩) প্রদেশ সমূহের রাজস্ব—(*Revenues of the Provinces*)

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধি অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার সমূহ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে তাহাদের রাজস্ব পাইয়া থাকে।

(১) **ভূমি রাজস্ব**—(Land revenue)—এক সময় ছিল যখন প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে ভূমিরাজস্বই প্রধান আয়ের পথ ছিল। এখনো কোন কোন প্রদেশের মোট আয়ের অধিকাংশই ভূমি রাজস্ব হইতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার দরুণ ইহা হইতে সরকারের আয় খুব বেশী হয় না।

(২) **আবগারী শুল্ক** (Excise duty)—মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপরে এই শুল্ক ধার্য্য হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের নীতি গৃহীত হওয়ায় এই বাবদ রাজস্ব হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

(৩) **ষ্ট্যাম্প কর** (Stamp duty)—ষ্ট্যাম্প কর দুই প্রকারের আছে; প্রথম, যে কর্ মোকর্দ্দমাকারীদিগকে দিতে হয় (যাহাকে বলা হয় কোর্ট ফি)। দ্বিতীয়, যে কর ব্যবসা সংক্রান্ত দলিল তৈয়ারীর জন্য দিতে হয় যথা, কুড়ি টাকার উর্দ্ধে কোন পরিমাণ অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের জন্য এক আনার ষ্ট্যাম্প প্রয়োজন হয়। প্রথম ষ্ট্যাম্প-করটী প্রাদেশিক সরকারই ধার্য্য করেন, সংগ্রহ করেন ও ভোগ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় করটী কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ধার্য্য করা হয় ও সংগৃহীত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ঐ করলব্ধ অর্থ প্রদেশগুলির মধ্যেই বন্টন করিয়া দেন।

(৪) **জলসেচ কার্য্য** (Irrigation)—সেচ কার্য্য হইতে প্রাদেশিক সরকার সমূহ আয় করিয়া থাকেন। কারণ সেচ কার্য্য হইতে যে সকল জমি উপকৃত হইয়া থাকে তাহাদের মালিকগণের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকার কর আদায় করিয়া থাকেন।

(৫) **আয়করের অংশ** (Share of income tax)—কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর আদায় করিয়া থাকেন এবং উহার একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নির্দ্ধারিত পরিমাণে বন্টন করিয়া দেন।

(৬) **রেজিষ্ট্রীকরণ** (Registrarion)—কয়েক প্রকার দলিল আছে যেগুলি রেজিষ্ট্রী না করিলে আইনসঙ্গত বলিয়া সরকারের দ্বারা গণ্য হয় না। এই দলিল প্রাদেশিক সরকারের কাছে রেজিষ্ট্রী করিতে হয় এবং উহার জন্য ঐ সরকার একটী ফি আদায় করিয়া থাকেন।

(৭) **বন** (Forest)—তক্তা এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ বিক্রয় করিয়া প্রাদেশিক সরকার সমূহ উঁহাদের এলাকাস্থিত বন হইতে কিছু আয় করিয়া থাকেন।

এই সকল আয়ের পথ ভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের আরও কয়েক প্রকারের কর আদায় করিবার উপায় আছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এইগুলির বিভিন্ন দফা হইতে কর আদায় করিয়া থাকেন—যথা বিক্রয় কর, কৃষিগত কর, মোটরযান এবং পেট্রোল কর, বিদ্যুৎ কর, আমোদ প্রমোদ কর ইত্যাদি।

(অণু-৪) প্রদেশ সমূহের ব্যয়ের দফা—(*Items of expenditure for the provinces*)

প্রাদেশিক সরকার সমূহ প্রধানতঃ যে সকল খাতে ব্যয় করিয়া থাকেন সেগুলি হইল এইরূপ :— (১) **কর সংগ্রহের খরচা** (Cost of Collecting revenue)—কর সংগ্রহের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে লোকনিয়োগ করিতে হয় এবং অফিস্ রক্ষা করিতে হয়।

(২) **সেচকার্য** (Irrigation)—সেচ কার্য্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারের একটী বিভাগ থাকে।

(৩) **পুলিশ** (Police)—শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ রক্ষা করিতে হয় এবং পুলিশ বিভাগের জন্য প্রাদেশিক সরকারের বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে।

(৪) **বিচার ব্যবস্থা ও জেল** (Justice and Jails)—ন্যায় বিচার ব্যবস্থার জন্য আদালত রাখিতে হয় এবং বিচারক নিয়োগ করিতে হয়। দণ্ডিতদিগের শাস্তি বিধানের জন্য জেল রক্ষা করিতেও বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে।

(৫) **শিক্ষা** (Education)—শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক সরকার সমূহের ব্যয় হইয়া থাকে। তবে অধিকাংশ প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে শিক্ষার জন্য যত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা উচিত, তত পরিমাণ ব্যয় করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

ইহা ভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমূহ, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি, জন-স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিয়া থাকে।

(অণু-৫) সরকারী ঋণ সমূহ (*Public Debts*)—

সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে ঋণগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়, সরকারের পক্ষেও সেইরূপ ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাকে সরকারী ঋণ বলা হয়। কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের

শাসন ব্যবস্থা যখন ইংলণ্ডেশ্বর গ্রহণ করেন তখন কোম্পানীর সমস্ত ঋণদায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করেন। এই ঋণ অন্যায় ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছিল (অর্থাৎ ভারতবাসীকে ইংলণ্ডের পদানত করিবার জন্য)—এবং এই ঋণের বোঝা ভারতবাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী যুগে এই ঋণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে--তবে সুখের বিষয় উহার মধ্যে বিশেষ অংশ উৎপাদনশীল কার্য্যের জন্য গৃহীত ও ব্যয়িত হয়। তবে অনুৎপাদনশীল কার্য্যের জন্যও ঋণ গৃহীত হইতে থাকে। যে সকল কার্য্যে ব্যয় করিলে পরে উহা হইতে আয় হইবে (যথা রেলপথ বা সেচকার্য্য নির্ম্মাণ)—উহাকে উৎপাদনশীল কার্য্য বলা হয় এবং এবং ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য গৃহীত ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ(Productive debt) বলা হয়। অপর পক্ষে যে সকল কার্য্যে ব্যয় করিলে উহা হইতে সঠিক কোনো আয় হইবে না (যথা যুদ্ধ) ঐ সকল কার্য্যের জন্য গৃহীত ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ (Unproductive debts) বলা হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সরকারী ঋণের অধিকাংশই উৎপাদনশীল।

এই সকল ঋণের মধ্যে কোনো কোনো ঋণ অল্পকালের জন্য গৃহীত হয় যথা ট্রেজারী বিল, পোষ্ট অফিসে আমানত ইত্যাদি। এই প্রকার ঋণকে বলা হয় স্বল্প মেয়াদী ঋণ (Unfunded debt)। অপরপক্ষে কোনো কোনো ঋণ আছে যেগুলি পরিশোধের তারিখ অনেক পরে অথবা নির্দ্দিষ্ট কোনো পরিশোধ তারিখ উল্লিখিত থাকে না—তবে যথারীতি সুদ দিয়া যাওয়া হয়। এই প্রকার ঋণকে বলা হয় দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Funded debt)। ভারতের সরকারী ঋণ উভয় প্রকারেরই আছে।

সরকারী ঋণের সমগ্র পরিমাণই যে ভারতের মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে; ভারতের বাহির অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতেও উহা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে টাকার মারফৎ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহাকে বলা হয় টাকা ঋণ (Rupee loans)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ষ্টার্লিংএ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে; উহাকে বলা হয় ষ্টার্লিং ঋণ (Sterling loans)। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতের মোট টাকা ঋণ ছিল ২১৩৯.৭৬ কোটি টাকা এবং ষ্টার্লিং-ঋণ ছিল ৫৯.০৬ কোটি টাকার সমান। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সরকারী ঋণের মধ্যে টাকার ঋণের পরিমাণ কম ছিল এবং ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারত সরকারের হাতে ষ্টার্লিং আসায়, তাঁহারা তাঁহাদের ঋণকে টাকা ঋণে পরিণত করেন।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

Questions & Hints.

1. Comment on the main heads of revenue and expenditure of the Government of India (1946) [অণু-১ ; অণু-২]

2. The revenue of the Government may be divided into two (a) tax revenue and (b) non tax revenue. Elucidate the statement. (1948) [অণু ১]

3. Describe the present sources of revenue and main heads of expenditure of the Province of West Bengal (1949) [অণু-৩ ; অণু ৪]

4. Give an account of the Public debt of India (1944) [অণু-৫]

সমাপ্ত